ভূগোল

প্রথম পত্র

কোর্স কোড : HSC-1875

হায়ার সেকেন্ডারি সার্টিফিকেট প্রোগ্রাম
(এইচএসসি প্রোগ্রাম)

ওপেন স্কুল

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

BANGLADESH OPEN UNIVERSITY

এইচএসসি প্রোগ্রাম

ভূগোল

প্রথম পত্র

কোর্স কোড : HSC 1875

রচনায়

মোঃ জাকিরুল ইসলাম
সহকারী অধ্যাপক, ভূগোল ও পরিবেশ
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

শাহীনা আক্তার
সহকারী অধ্যাপক, ভূগোল ও পরিবেশ
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

ড. মাকসুদুর রহমান
অধ্যাপক, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ড. নূরুল ইসলাম
অধ্যাপক, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদনা
ড. নূরুল ইসলাম নাজেম
অধ্যাপক, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সমন্বয়কারী
মোঃ জাকিরুল ইসলাম
শাহীনা আক্তার

ওপেন স্কুল

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
BANGLADESH OPEN UNIVERSITY

ভূগোল প্রথম পত্র

কোর্স কোড : HSC-1875
এইচএসসি প্রোগ্রাম

প্রকাশ কাল ঃ জুন, ২০১৬
পুনর্মুদ্রণ: এপ্রিল, ২০১৭

প্রকাশনায়
প্রকাশনা, মুদ্রণ ও বিতরণ বিভাগ
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়
গাজীপুর-১৭০৫

প্রচ্ছদ
কাজী সাইফুদ্দীন আব্বাস

কভার গ্রাফিকস
আবদুল মালেক

কম্পিউটার কম্পোজ
মোঃ সিদ্দিকুল ইসলাম
মোঃ শরিফুল ইসলাম

© বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

ISBN : 978-984-34-3171-4

প্রি-প্রেস কার্যক্রম
ওপেন স্কুল, বাউবি

মুদ্রণ
বাংলাবাজার প্রেস এন্ড পাবলিকেশন
৫৩ নর্থ ব্রুক হল রোড
ঢাকা-১১০০।



? কোর্স বই অনুসরণ করার প্রয়োজনীয় পরামর্শ

কোর্স পরিচিতি (Course Overview)

কোর্সের নাম : ভূগোল প্রথম পত্র **কোর্স কোড : HSC-1875**

পরিবর্তনশীল বিশ্বে একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে দেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন সুশিক্ষিত ও দক্ষ মানবসম্পদ। জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় মাধ্যমিক স্তরের ধারাবাহিকতায় উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্রমেও দেশের ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক অর্থনৈতিক, সামাজিক, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধি, সমকালীন চাহিদা এবং পরিবেশগত বিষয়গুলো বিবেচনায় নিয়েছে। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হলো শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত মেধা ও সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশে সহায়তা করা এবং মাধ্যমিক স্তরের অর্জিত শিক্ষার মৌলিক জ্ঞান ও দক্ষতা সম্প্রসারিত এবং সুসংহত করার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য যোগ্য করে তোলা। এরই ধারাবাহিকতায় ভূগোল প্রথম পত্র শিক্ষাক্রম প্রণয়ন করা হয়েছে। এই শিক্ষাক্রমটি এমনভাবে সাজানো হয়েছে যাতে শিক্ষার্থীরা বাস্তব জীবনে ভূগোল ও পরিবেশের জ্ঞান প্রয়োগ করতে পারে।

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের দূরশিক্ষণ পদ্ধতির শিক্ষার্থীদের কথা বিবেচনায় রেখে নতুন শিক্ষাক্রমের আলোকে ভূগোল প্রথম পত্র পাঠ্যপুস্তকটি (কোর্স মডিউল) স্ব-শিখন পাঠসামগ্রীরূপে রচনা করা হয়েছে। যেহেতু বইটি একই সঙ্গে পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষকের ভূমিকা পালন করবে, তাই বিষয়বস্তু যতদূর সম্ভব নিজে পড়ে বুঝার উপযোগী করে রচনা করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকটির বিষয় নির্বাচন ও উপস্থাপনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ সাধনের দিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। প্রতিটি ইউনিটের শুরুতে ভূমিকা, ইউনিট সম্পর্কীয় নির্দেশনা ও ইউনিট বিভাজন (পাঠ) দেয়া হয়েছে। আবার প্রতিটি পাঠের শুরুতে ঐ পাঠের উদ্দেশ্য যুক্ত করা হয়েছে যাতে শিক্ষার্থী উদ্দেশ্য অনুযায়ী জ্ঞান অর্জিত হলো কী না তা যাচাই করতে পারে। শিক্ষার্থীর কাছে পাঠটিকে আকর্ষণীয়, আনন্দদায়ক ও সহজতর করার জন্য 'শিক্ষার্থীর কাজ' (যা 'অ্যাক্টিভিটি' নামে পরিচিত) সংযোজন করা হয়েছে। প্রয়োজন অনুযায়ী ছবি, ডায়াগ্রাম, চার্ট, গ্রাফ, সারণি ও মানচিত্র ইত্যাদি সংযোজন করা হয়েছে। প্রতিটি পাঠ আলোচনা শেষে ঐ পাঠের গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়সমূহ সংক্ষিপ্ত আকারে (সারসংক্ষেপ) দেয়া হয়েছে যাতে শিক্ষার্থী পাঠটি কতটুকু বুঝতে পেরেছে তা পুনরায় যাচাই করতে পারে। শিক্ষার্থীদের স্ব-মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে প্রতিটি পাঠের শেষে রয়েছে পাঠোত্তর মূল্যায়ন। এই অংশে বহুনির্বাচনি প্রশ্নমালাসহ ইউনিটের শেষে সৃজনশীল রচনামূলক প্রশ্ন দেয়া হয়েছে। স্ব-শিখন পাঠসামগ্রী হিসেবে বইটি পড়ে অধিকতর সুফল লাভ করার জন্য শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যে কিছু নির্দেশনা নিম্নে তুলে ধরা হলো।

- ইউনিটের শিরোনাম ও ভূমিকা পড়ে সম্ভাব্য বিষয়বস্তু কী হতে পারে সে সম্পর্কে ধারণা করুন।
- প্রথমে পাঠের সবগুলো 'উদ্দেশ্য' পড়ে এই পাঠ থেকে কী কী শিখতে পারবেন তা জেনে নিন।
- এরপর ইউনিটের বিষয়বস্তু ভালোভাবে অধ্যয়ন করুন। বিষয়বস্তু অধ্যয়নের পর শিখনফলগুলো অর্জিত হলো কী না তা ভালোভাবে যাচাই করুন। যদি শিখনফল অর্জিত না হয় তাহলে বিষয়বস্তু পুনরায় অধ্যয়ন করুন। কোথাও চিত্র থাকলে চিত্রের সাথে বিষয়বস্তু মিলিয়ে পড়ুন।
- কোনো ইউনিটের বিষয়বস্তু অধ্যয়নের সময় যে বিষয়গুলো অপেক্ষাকৃত কঠিন/দুর্বোধ্য মনে হয়েছে তা চিহ্নিত করে আপনার নোট খাতায় লিপিবদ্ধ করুন এবং কঠিন বিষয়গুলো সমাধানের জন্য বিষয়বস্তু পুনরায় অধ্যয়ন করুন।
- প্রতিটি ইউনিটের বিষয়গুলো ভালোভাবে বুঝার জন্য প্রতিটি পাঠে শিক্ষার্থীদের জন্য অ্যাক্টিভিটি (শিক্ষার্থীর কাজ) সংযোজন করা রয়েছে। ইউনিটের বিষয়বস্তু ভালোভাবে অধ্যয়ন করে অ্যাক্টিভিটিগুলো সম্পন্ন করুন।
- পাঠশেষে পাঠোত্তর মূল্যায়নের প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করুন। ইউনিটের শেষে দেওয়া উত্তরমালার সাথে আপনার উত্তর মিলিয়ে দেখুন। সবগুলো প্রশ্নের উত্তর সঠিক না হলে পাঠটি আবারও ভালো করে পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর দিতে চেষ্টা করুন। এরপর চূড়ান্ত মূল্যায়ন অংশের সৃজনশীল প্রশ্নগুলোর উত্তর জানা আছে কী না দেখুন। জানা না থাকলে সংশ্লিষ্ট অংশ আবারও পড়ুন।

পরিশেষে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ণের বিপুল কর্মযজ্ঞটিতে কিছু অনিচ্ছাকৃত ভুল-ত্রুটি থেকে যেতে পারে। যা পরবর্তী সংস্করণগুলোতে ত্রুটিমুক্ত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।

টিউটোরিয়াল ক্লাস সম্পর্কিত পরামর্শ

ওপেন স্কুলের এই বইটি ছাড়াও স্থানীয় স্টাডি সেন্টারে প্রতি মাসে টিউটোরিয়াল ক্লাসের ব্যবস্থা রয়েছে। আপনি প্রথমেই আপনার বিষয়ে কতটি টিউটোরিয়াল ক্লাস পাবেন তা স্টাডি সেন্টার থেকে জেনে নিন এবং আপনার স্টাডি সেন্টারের প্রতিটি টিউটোরিয়াল ক্লাসে অংশগ্রহণ করুন।

টিউটোরিয়াল সার্ভিসকে কার্যপোযোগী করতে আপনার পাঠ্যপুস্তকটির সকল ইউনিটকে টিউটোরিয়াল ক্লাসের সংখ্যা অনুযায়ী ততটি অংশে ভাগ করে নিন। প্রথম টিউটোরিয়াল ক্লাসে যাওয়ার আগে আপনার ভাগকৃত প্রথম অংশটি ভালোভাবে অধ্যয়ন করুন। অধ্যয়নের সময় যে বিষয়গুলো অপেক্ষাকৃত কঠিন/দুর্বোধ্য মনে হয়েছে তা চিহ্নিত করুন এবং প্রয়োজনে নোট খাতায় লিপিবদ্ধ করুন। টিউটোরিয়াল ক্লাসে যোগ দিয়ে আপনি বইটি পড়তে গিয়ে যেগুলো কঠিন/দুর্বোধ্য বলে চিহ্নিত করেছেন সে সকল বিষয় বুঝতে সংশ্লিষ্ট টিউটরের (শিক্ষকের) সহায়তা নিন। একই পদ্ধতি অনুসরণ করে ইউনিটের সবগুলো পাঠ অধ্যয়ন শেষ করুন।

মার্জিন আইকন (Margin Icons)

বইটি অধ্যয়ন করার পূর্বে বইটিতে পর্যায়ক্রমে যে সমস্ত আইকন/প্রতীক ব্যবহৃত হয়েছে সে সম্পর্কে আপনাকে প্রথমেই পরিচিত হতে হবে। এতে পুরো কোর্স মডিউল-এর কোনটি শিখনফল, কোনটি বিষয়বস্তু/মূলপাঠ, কোনটি পাঠোত্তর মূল্যায়ন, কোনটি চূড়ান্ত মূল্যায়ন ইত্যাদি সম্পর্কে সহজেই অবহিত হতে পারবেন। নিম্নে ব্যবহৃত বিভিন্ন আইকন বা প্রতীকগুলো দেখানো হলো।

					
কোর্স বই অনুসরণের পরামর্শ	কোর্স /ইউনিট সমাপ্তির সময়	উদ্দেশ্য	বিষয়বস্তু/মূলপাঠ	শিক্ষার্থীর কাজ	সারসংক্ষেপ
					
পাঠোত্তর মূল্যায়ন	চূড়ান্ত মূল্যায়ন	উত্তরমালা	অডিও বা শোনা	ভিডিও বা দেখা	সাহায্য/প্রয়োজনে

	**কোর্স সমাপ্তির সময়**	**সর্বোচ্চ সময় ৩২ সপ্তাহ**

 **অডিও/ভিডিও**	বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপেন স্কুল পরিচালিত এইচএসসি প্রোগ্রামের শিক্ষার্থী বন্ধুদের জন্য বইটির গুরুত্বপূর্ণ পাঠসমূহের উপর অডিও/ভিডিও প্রোগ্রাম বিটিভি/বাংলাদেশ বেতার কর্তৃক সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ে প্রচারিত হয়ে থাকে। শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আপনারা স্টাডি সেন্টার থেকে প্রোগ্রাম সিডিউল সংগ্রহ করে নির্দিষ্ট দিনের নির্দিষ্ট সময়ের প্রচারিত প্রোগ্রামটি দেখলে উপকৃত হবেন বলে আশা করছি। অনুষ্ঠান চলাকালীন সময় সংশ্লিষ্ট আলোচনার বিষয়গুলো বুঝার সুবিধার্থে বইটি সামনে নিয়ে বসুন এবং প্রয়োজনীয় বিষয়গুলি নোট করার জন্য কাগজ-কলম সাথে রাখুন। কোনো বিষয় বুঝতে অসুবিধা হলে প্রয়োজনে আপনার টিউটরের সহায়তা নিন।

	**যে কোনো সাহায্য বা সহায়তার জন্য পরামর্শ নিন–** আপনার স্টাডি সেন্টারের কোর্স টিউটর অথবা	
	মোঃ জাকিরুল ইসলাম সহকারী অধ্যাপক (ভূগোল ও পরিবেশ)	**শাহীনা আক্তার** সহকারী অধ্যাপক(ভূগোল ও পরিবেশ)

প্রয়োজনে	ওপেন স্কুল, বাউবি গাজীপুর-১৭০৫।	ওপেন স্কুল, বাউবি গাজীপুর-১৭০৫।

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা

ইউনিট-১ : প্রাকৃতিক ভূগোল **১-১১**

পাঠ ১.১ : প্রাকৃতিক ভূগোলের সংজ্ঞা, প্রকৃতি ও পরিধি ---------- ২

পাঠ ১.২ : প্রাকৃতিক ভূগোলের সাথে অন্যান্য শাস্ত্রের সম্পর্ক ---------- ৬

পাঠ ১.৩ : প্রাকৃতিক ভূগোল অধ্যয়নের গুরুত্ব ---------- ১০

ইউনিট-২ : পৃথিবীর গঠন **১২-১৬**

পাঠ ২.১ : পৃথিবীর বাহ্যিক গঠন ---------- ১৩

পাঠ ২.২ : পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ গঠন ---------- ১৪

পাঠ ২.৩ : শিলা ও এর শ্রেণিবিভাগ ---------- ১৬

পাঠ ২.৪ : আগ্নেয় শিলা ---------- ১৭

পাঠ ২.৫ : পাললিক শিলা ---------- ২০

পাঠ ২.৬ : রূপান্তরিত শিলা ---------- ২২

পাঠ ২.৭ : খনিজ ও এর শ্রেণিবিভাগ ---------- ২৪

ইউনিট-৩ : পৃথিবীর ভূমিরূপ **২৭-৫৩**

পাঠ ৩.১ : পৃথিবীর প্রধান ভূমিরূপসমূহ ---------- ২৮

পাঠ ৩.২ : ভাঁজ ও চ্যুতি ---------- ৩০

পাঠ ৩.৩ : সমভূমি ---------- ৩৩

পাঠ ৩.৪ : মালভূমি ---------- ৩৬

পাঠ ৩.৫ : পাহাড় ও পর্বত ---------- ৩৯

পাঠ ৩.৬ : মরুভূমি ---------- ৪২

পাঠ ৩.৭ : বাংলাদেশের ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ---------- ৪৪

ব্যবহারিক

পাঠ ৩.৮ : সমোন্নতি রেখার সাহায্যে বিভিন্ন ভূমিরূপ প্রদর্শন ---------- ৪৯

ইউনিট-৪ : ভূমিরূপ পরিবর্তন **৫৪-৭১**

পাঠ ৪.১ : ভূ-আন্দোলন ---------- ৫৫

পাঠ ৪.২ : পাত সঞ্চালন ---------- ৫৭

পাঠ ৪.৩ : ভূমিকম্পের কারণ, ফলাফল ও প্রভাব ---------- ৬০

পাঠ ৪.৪ : ভূমিকম্প তরঙ্গ ও ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চল ---------- ৬৩

পাঠ ৪.৫ : আগ্নেয়গিরি, অগ্ন্যুৎপাত ও এর প্রভাব ---------- ৬৬

পাঠ ৪.৬ : সুনামি ও এর প্রভাব ---------- ৭০

ইউনিট-৫ : বিচূর্ণীভবন ও নগ্নীভবন **৭২-৮৪**

পাঠ ৫.১ : ক্ষয়ীভবন ও নগ্নীভবনের ধারণা ---------- ৭৩

পাঠ ৫.২ : বিচূর্ণীভবনের ধারণা ---------- ৭৫

পাঠ ৫.৩ : বিচূর্ণীভবনের কারণ ও শ্রেণিবিভাগ ---------- ৭৭

পাঠ ৫.৪ : যান্ত্রিক বিচূর্ণীভবন ---------- ৭৯

পাঠ ৫.৫ : রাসায়নিক বিচূর্ণীভবন ---------- ৮১

পাঠ ৫.৬ : জৈবিক বিচূর্ণীভবন ---------- ৮৩

ইউনিট-৬ : নদী ও ভূমিক্ষয় **৮৫-১০৩**

পাঠ ৬.১ : নদীর উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও উন্নয়ন ---------- ৮৬

পাঠ ৬.২ : নদীর ক্ষয়কার্য ও সৃষ্ট ভূমিরূপ ---------- ৮৯

পাঠ ৬.৩ : নদীর বহনকার্য ---------- ৯২

পাঠ ৬.৪ : নদীর সঞ্চয়কার্য ও সৃষ্ট ভূমিরূপ ---------- ৯৪

পাঠ ৬.৫ : বাংলাদেশের নদী ব্যবস্থা ---------- ৯৭

পাঠ ৬.৬ : বাংলাদেশের নদীভাঙ্গন ও এর প্রভাব ---------- ১০০
পাঠ ৬.৭ : নদীশাসন ---------- ১০২
ইউনিট-৭ : বায়ুমণ্ডল এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ দূষণ **১০৪-১২৫**
পাঠ ৭.১ : বায়ুমন্ডল এবং গঠনকারী উপাদান ---------- ১০৫
পাঠ ৭.২ : বায়ুমন্ডলের স্তরবিন্যাস ---------- ১০৭
পাঠ ৭.৩ : প্রাকৃতিক পরিবেশ দূষণের কারণ ও ফলাফল ---------- ১০৯
পাঠ ৭.৪ : বায়ু দূষণ ---------- ১১১
পাঠ ৭.৫ : জীবজগতের উপর বায়ু দূষণের প্রভাব ---------- ১১৩
পাঠ ৭.৬ : বায়ু দূষণ প্রতিরোধের উপায় ---------- ১১৫
পাঠ ৭.৭ : পানি দূষণ ---------- ১১৭
পাঠ ৭.৮ : শব্দ দূষণ ---------- ১২০
পাঠ ৭.৯ : মৃত্তিকা দূষণ ---------- ১২৩
ইউনিট-৮ : আবহাওয়া এবং জলবায়ু **১২৬-১৪৭**
পাঠ ৮.১ : আবহাওয়া এবং জলবায়ুর উপাদান ও নিয়ামক ---------- ১২৭
পাঠ ৮.২ : তাপবলয় ---------- ১৩১
পাঠ ৮.৩ : চাপবলয় ---------- ১৩৩
পাঠ ৮.৪ : বায়ুপ্রবাহ ---------- ১৩৫
পাঠ ৮.৫ : বায়ুর আর্দ্রতা ---------- ১৩৭
পাঠ ৮.৬ : কুয়াশা ও মেঘ ---------- ১৩৮
পাঠ ৮.৭ : বৃষ্টিপাত ---------- ১৪০
পাঠ ৮.৮ : কালবৈশাখী ---------- ১৪৩
পাঠ ৮.৯ : ঘূর্ণিঝড় ---------- ১৪৪
পাঠ ৮.১০ : টর্নেডো ---------- ১৪৬
ইউনিট-৯ : জলবায়ু অঞ্চলসমূহ ও জলবায়ু পরিবর্তন **১৪৮-১৬৭**
পাঠ ৯.১ : জলবায়ুর শ্রেণিবিভাগ ---------- ১৪৯
পাঠ ৯.২ : নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চল ---------- ১৫১
পাঠ ৯.৩ : ভূ-মধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চল ---------- ১৫৩
পাঠ ৯.৪ : মৌসুমী জলবায়ু ---------- ১৫৫
পাঠ ৯.৫ : বাংলাদেশের জলবায়ু ---------- ১৫৭
পাঠ ৯.৬ : গ্রিন হাউজ প্রভাব ও বিশ্ব উষ্ণায়ন ---------- ১৫৯
পাঠ ৯.৭ : জলবায়ু পরিবর্তন ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত ---------- ১৬১
ব্যবহারিক
পাঠ ৯.৮ : সমতাপ রেখা, সমচাপ রেখা, সমবর্ষণ রেখা অংকন এবং মানচিত্রে বিশ্লেষণ ---------- ১৬৩
পাঠ ৯.৯ : বৃষ্টিপাত উপাত্তের সাহায্যে রেখাচিত্র অংকন ও বিশ্লেষণ ---------- ১৬৬
ইউনিট-১০ : বারিমণ্ডল **১৬৮-১৯১**
পাঠ ১০.১ : পৃথিবীর পানির উৎস ও বণ্টন ---------- ১৬৯
পাঠ ১০.২ : পৃথিবীর মহাসাগর ও সাগর ---------- ১৭১
পাঠ ১০.৩ : মহাসাগরের তলদেশের ভূমিরূপ ---------- ১৭৪
পাঠ ১০.৪ : প্রশান্ত মহাসাগরের তলদেশের ভূমিরূপ ---------- ১৭৭
পাঠ ১০.৫ : আটলান্টিক মহাসাগরের তলদেশের ভূমিরূপ ---------- ১৮০
পাঠ ১০.৬ : ভারত মহাসাগরের তলদেশের ভূমিরূপ ---------- ১৮২
পাঠ ১০.৭ : বঙ্গোপসাগরের তলদেশের ভূমিরূপ ---------- ১৮৪
পাঠ ১০.৮ : পানি চক্র ও এর গুরুত্ব ---------- ১৮৬
ব্যবহারিক
পাঠ ১০.৯ : মহাসাগরের আয়তন পাইচিত্রে প্রদর্শন ---------- ১৮৯

ইউনিট-১১ : সমুদ্র স্রোত **১৯২-২০৯**
পাঠ ১১.১ : সমুদ্রস্রোত ও সমুদ্রস্রোতের কারণ----------১৯৩
পাঠ ১১.২ : সমুদ্রস্রোতের শ্রেণিবিভাগ----------১৯৬
পাঠ ১১.৩ : আটলান্টিক মহাসাগরীয় স্রোত ---------- ১৯৮
পাঠ ১১.৪ : প্রশান্ত মহাসাগরীয় স্রোত---------- ২০২
পাঠ ১১.৫ : ভারত মহাসাগরীয় স্রোত ---------- ২০৫
পাঠ ১১.৬ : সমুদ্রস্রোতের প্রভাব---------- ২০৮
ইউনিট-১২ : জোয়ার ও ভাঁটা **২১০-২১৮**
পাঠ ১২.১ : জোয়ার ভাঁটা ও এর কারণ----------২১১
পাঠ ১২.২ : জোয়ার ভাঁটার শ্রেণিবিভাগ----------২১৩
পাঠ ১২.৩ : জোয়ার ভাঁটার সময় ও ব্যবধান ----------২১৫
পাঠ ১২.৪ : বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে জোয়ার ভাঁটার প্রভাব----------২১৭
ইউনিট-১৩ : জীবমণ্ডল **২১৯-২৩৪**
পাঠ ১৩.১ : জীববৈচিত্র্য---------- ২২০
পাঠ ১৩.২ : ইকোলজি, ইকোসিস্টেম ও বায়োম ---------- ২২২
পাঠ ১৩.৩ : জীব-ভূ-রাসায়নিক চক্র ---------- ২২৫
পাঠ ১৩.৪ : কার্বন চক্র ---------- ২২৭
পাঠ ১৩.৫ : নাইট্রোজেন চক্র ---------- ২২৯
পাঠ ১৩.৬ : বাংলাদেশের বনাঞ্চল ----------২৩১
পাঠ ১৩.৭ : বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য ---------- ২৩৩
ইউনিট-১৪ : জিআইএস ও দূর অনুধাবন **২৩৫-২৪৫**
পাঠ ১৪.১ : জিআইএস এর ধারণা---------- ২৩৬
পাঠ ১৪.২ : দূর অনুধাবন এর ধারণা---------- ২৩৯
পাঠ ১৪.৩ : জিআইএস ও দূর অনুধাবন এর ব্যবহার----------২৪১
পাঠ ১৪.৪ : বাংলাদেশে জিআইএস ও দূর অনুধাবন এর বিকাশ ---------- ২৪৪
ইউনিট-১৫ : ব্যবহারিক ঃ মানচিত্র ও স্কেল **২৪৬-২৭৬**
পাঠ ১৫.১ : মানচিত্রের ধারণা, উপাদান ও ব্যবহার---------- ২৪৭
পাঠ ১৫.২ : মানচিত্রের শ্রেণিবিভাগ ---------- ২৪৯
পাঠ ১৫.৩ : স্কেল ও এর শ্রেণিবিভাগ ----------২৫১
পাঠ ১৫.৪ : সরল ও কর্ণীয় স্কেল---------- ২৫৬
পাঠ ১৫.৫ : মানচিত্রের সংকোচন ও প্রসারণের সুবিধা-অসুবিধা ---------- ২৬৮
পাঠ ১৫.৬ : স্কেলের সাহায্যে অবস্থান ও দূরত্ব নির্ণয় ---------- ২৭০
পাঠ ১৫.৭ : মানচিত্রের সংকোচন পদ্ধতি---------- ২৭২
পাঠ ১৫.৮ : মানচিত্রের প্রসারণ পদ্ধতি ---------- ২৭৪
নমুনা প্রশ্ন ----------২৭৭-২৭৯

মানবণ্টন

পূর্ণমান- ১০০

তত্ত্বীয়-৭৫

(ক) সৃজনশীল (কাঠামোবদ্ধ) প্রশ্ন- ৪০ নম্বর ৪×১০ = ৪০

মোট ৬টি প্রশ্ন থাকবে। যে কোনো ৪টি প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে।

প্রতিটি সৃজনশীল প্রশ্নের শুরুতে একটি দৃশ্যকল্প বা উদ্দীপক থাকবে যা হতে পারে একটি সাধারণ সূচনা বক্তব্য, চার্ট, সমীকরণ, চিত্র, গ্রাফ ইত্যাদি। দৃশ্যকল্প বা উদ্দীপকের শেষে ৪টি প্রশ্ন থাকবে। প্রশ্ন ৪টির নম্বর বন্টন হবে নিম্নরূপ:

প্রশ্নের ধরণ	**নম্বর**
ক. জ্ঞান স্তর-	১
খ. অনুধাবন স্তর-	২
গ. প্রয়োগ দক্ষতা স্তর	৩
ঘ. উচ্চতর দক্ষতা স্তর	৪
	মোট=১০

(খ) বহুনির্বাচনি প্রশ্ন- ৩৫ নম্বর

মোট ৩৫টি প্রশ্ন থাকবে। সবগুলোর উত্তর দিতে হবে। প্রতিটি প্রশ্ন ০১ নম্বর। ৩৫×০১ = ৩৫

ব্যবহারিক - ২৫ নম্বর

৫টির মধ্যে ২টি ব্যবহারিক-	৯+৯=১৮	= ২৫
ব্যবহারিক খাতা-	৩	
মৌখিক পরীক্ষা-	৪	
		সর্বমোট = ১০০

ইউনিট
১

প্রাকৃতিক ভূগোল
(Physical Geography)

ভূমিকা

জ্ঞান বিজ্ঞানের যে শাখা স্থান ও সময়ের প্রেক্ষিতে মানুষের সাথে পরিবেশের বহুমুখী সম্পর্ক ব্যাখ্যা করে তাকে ভূগোল বলে। ভূগোল চর্চা দুইটি মূলধারায় বিভক্ত। যথা: প্রাকৃতিক ভূগোল ও মানব ভূগোল। ভূগোলকে 'মানব-পরিবেশ মিথস্ক্রিয়ার' বিজ্ঞানও বলা হয়। সর্বপ্রথম ১৬৫০ সালে ভ্যারেনিয়াস তাঁর 'Geographia Generalis' গ্রন্থে প্রাকৃতিক ও মানব ভূগোলের পার্থক্য নির্দেশ করেছিলেন। এই ইউনিটে প্রাকৃতিক ভূগোলের প্রকৃতি, পরিধি, গুরুত্ব এবং প্রাকৃতিক ভূগোলের সাথে অন্যান্য শাস্ত্রের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।






ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ ১.১ : প্রাকৃতিক ভূগোলের সংজ্ঞা, প্রকৃতি ও পরিধি
পাঠ ১.২ : প্রাকৃতিক ভূগোলের সাথে অন্যান্য শাস্ত্রের সম্পর্ক
পাঠ ১.৩ : প্রাকৃতিক ভূগোল অধ্যয়নের গুরুত্ব

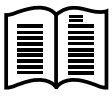
পাঠ-১.১ প্রাকৃতিক ভূগোলের সংজ্ঞা, প্রকৃতি ও পরিধি
(Definition, Nature and Scope of Physical Geography)



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- প্রাকৃতিক ভূগোলের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি বলতে পারবেন এবং
- প্রাকৃতিক ভূগোলের পরিধি ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে পারবেন।



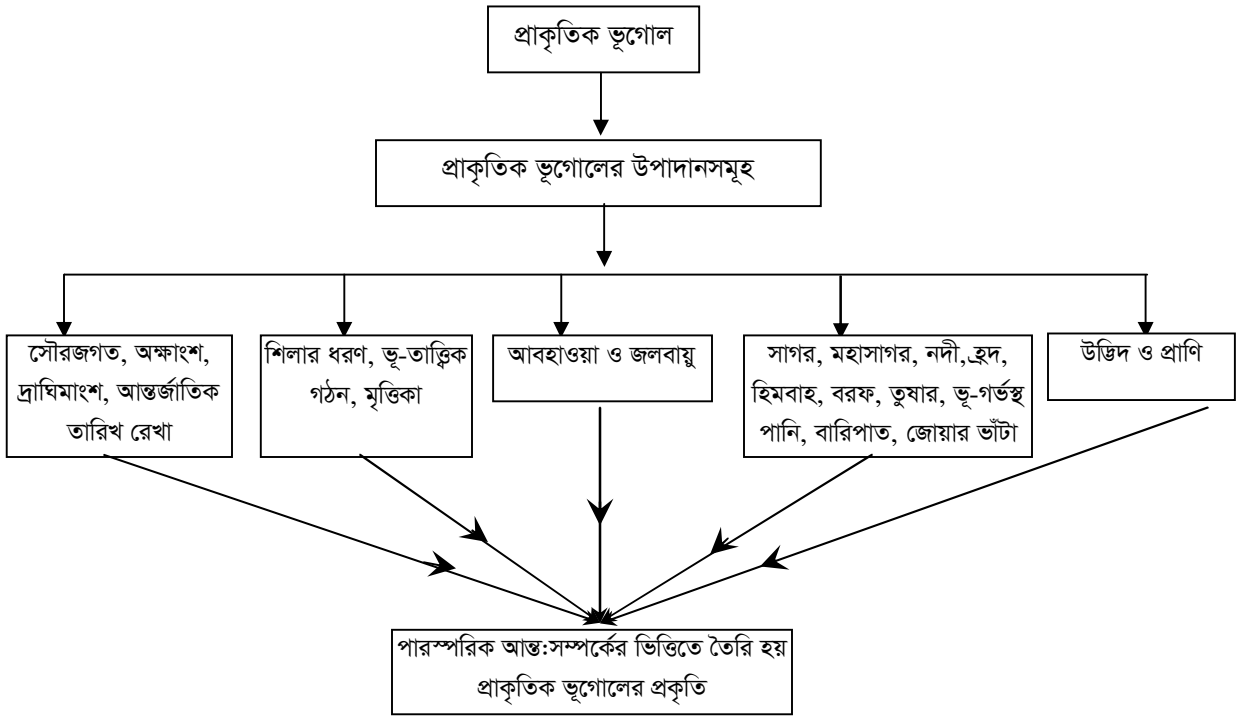
প্রাকৃতিক ভূগোলের সংজ্ঞা, প্রকৃতি ও পরিধি

প্রাকৃতিক ভূগোল হলো- প্রাকৃতিক প্রপঞ্চসমূহের স্থানিক ও কালিক (Spatial and Temporal) বিশ্লেষণ। অন্যভাবে বলা যায়, ভূগোল বিজ্ঞানের যে অংশে পৃথিবীর জন্ম, ভূ-প্রকৃতি, ভূ-ত্বক, পাহাড়, পর্বত, মরুভূমি, সমভূমি, বায়ুমন্ডল ও বারিমন্ডল প্রভৃতি বিষয় বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয় তাকে প্রাকৃতিক ভূগোল বলে। অধ্যাপক কার্ল রিটারের (Professor Carl Ritter) মতে, ''প্রাকৃতিক ভূগোল হচ্ছে বিজ্ঞানের সেই শাখা যা পৃথিবীর সমস্ত অবয়ব, বৈচিত্র্য ও সম্পর্কসহ একটি স্বতন্ত্র একক হিসেবে বিচার করে''। অধ্যাপক রিচার্ড হার্টশোন (Professor Richard Hartshorne) এর মতে, ''ভূ-পৃষ্ঠের পরিবর্তনশীল বৈশিষ্ট্যের সঠিক, সুবিন্যস্ত ও যুক্তিসঙ্গত বর্ণনা ও ব্যাখ্যা সরবরাহ করা প্রাকৃতিক ভূগোলের কাজ''।

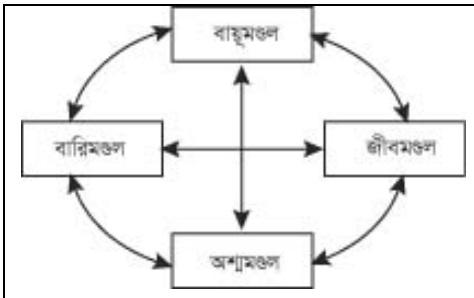
প্রাকৃতিক ভূগোলের প্রকৃতি (Nature of Physical Geography) : ভূগোলের প্রধান শাখা হিসাবে প্রাকৃতিক ভূগোল প্রাকৃতিক বিষয়গুলোকে এককভাবে প্রকাশ করে। যার প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য হলো-

১. প্রাকৃতিক ভূগোল পরিপূর্ণ প্রাকৃতিক বিজ্ঞান।
২. পৃথিবীর উৎপত্তি ও বিবর্তন সম্পর্কে প্রাকৃতিক ভূগোল পর্যালোচনা করে।
৩. মহাবিশ্ব এবং সৌরজগৎ এর উৎপত্তি ও বিকাশ, এদের অবস্থান ও গাণিতিক পরিমাপ প্রভৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করে। এছাড়া পৃথিবীর আকার, আয়তন, কক্ষপথ, গতি, অক্ষাংশ, দ্রাঘিমাংশ প্রভৃতি বিষয়ের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে।
৪. পৃথিবীর পরিবেশের সাথে সম্পর্কিত বাস্তুতন্ত্রের বিভিন্ন চক্র, চন্দ্র-সূর্যের অবস্থান প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিষয়াবলি বর্ণনা করে।
৫. পৃথিবীর অভ্যন্তর ও শিলামন্ডল, বিভিন্ন ভূ-গাঠনিক প্রক্রিয়া, ভূ-আলোড়ন, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, ভূমিরূপ গঠনকারী শক্তি এবং এর ফলে সৃষ্ট ভূমিরূপ, পাত সঞ্চালন তত্ত্ব প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা করে।
৬. ভূ-প্রকৃতি, জলবায়ু, কিংবা প্রাকৃতিক উদ্ভিদ ও প্রাণির বণ্টন অনুসারে পৃথিবীকে কয়েকটি প্রাকৃতিক অঞ্চলে বিভক্ত করে বর্ণনা করাও প্রাকৃতিক ভূগোলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।
৭. পৃথিবীর সাগর, মহাসাগরের আয়তন, স্রোত, ভূমিরূপ, জোয়ার ভাঁটা প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে।

প্রাকৃতিক ভূগোলের প্রধান প্রকৃতি নিম্নরূপে দেখানো যায়। যথা–



প্রাকৃতিক ভূগোলের পরিধি (Scope of Physical Geography) : প্রাকৃতিক ভূগোল প্রকৃতির সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করে বিধায় প্রাকৃতিক ভূগোলের পরিধিও ব্যাপক। প্রাকৃতিক ভূগোলের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে বলা যায়, প্রাকৃতিক ভূগোলে অশ্মমন্ডল, বারিমন্ডল, বায়ুমন্ডল ও জীবমন্ডল এ চারটি মন্ডলের উপাদানগুলোকে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করে। এই চারটি মন্ডল আবার পারস্পরিক আন্তঃসম্পর্কিত (চিত্র ১.১.১ ও ১.১.২)। যথা-



চিত্র-১.১.১: পৃথিবীর চারটি মন্ডলের পারস্পরিক সম্পর্ক (বি- জ, ১৯৯৩ অনুসরণে)



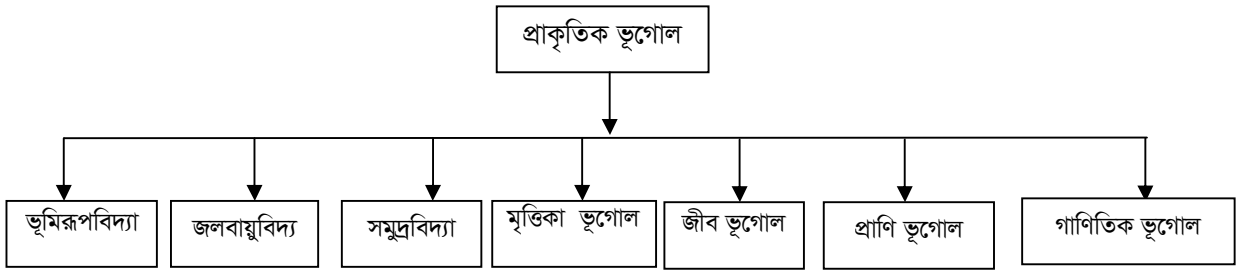
চিত্র-১.১.২: পৃথিবীর চারটি মন্ডলের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক

অশ্মমন্ডল : ভূ-পৃষ্ঠের উপরের কঠিন বহিরাবরণকে অশ্মমন্ডল বলে। অশ্মমন্ডলের উপরের পাতলা আবরণকে ভূ-ত্বক বলে।

বায়ুমন্ডল : ভূ-পৃষ্ঠ থেকে উপরের দিকে বায়ুমন্ডলের হাজার কিলোমিটার বিস্তৃত হলেও ভূ-পৃষ্ঠ সংলগ্ন স্তরেই অধিকাংশ জীবের (উদ্ভিদ ও প্রাণির) বসবাস। বায়ুমন্ডল পর্যালোচনায় বায়ুর তাপ, চাপ, আর্দ্রতা, প্রবাহ, বায়ু দূষণ, তাপ বিকিরণ ও সমতা, গ্রিন হাউজ প্রতিক্রিয়া, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বিপর্যয়ের প্রতিকার প্রভৃতি আলোচনা করা হয়।

বারিমন্ডল : ভূ-মন্ডলের প্রায় ৭১ শতাংশ পানি দ্বারা আবৃত। তন্মধ্যে ৯৭ শতাংশ লবণাক্ত যা বিভিন্ন সাগর মহাসাগরে সঞ্চিত আছে। মাত্র ৩ শতাংশ মিঠা পানি বা স্বাদু পানি যা ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন নদ-নদী, জলাশয় ও হ্রদ এবং পাহাড় বা মেরু অঞ্চলে বরফ আকারে সঞ্চিত আছে।

জীব মন্ডল : পৃথিবীর ভূ-ত্বক, বায়ুমন্ডলের নিচের অংশ এবং সমগ্র বারিমন্ডল নিয়ে জীবের বসবাসের উপযোগী যে সমন্বিত মন্ডল গড়ে উঠেছে তাকে জীব মন্ডল বলে (চিত্র ১১.২)। জীবমন্ডল বাস্তুতান্ত্রিক উপাদান, জীব ভূ-রাসায়নিকচক্র (Bio-Geo-Chemical Cycle) স্থিতিশীলতা, মানুষ ও পরিবেশের সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে।
এছাড়া পৃথকশাস্ত্র বিবেচনা করলে প্রাকৃতিক ভূগোলের পরিধিকে নিম্নরূপে ভাগ করা যায়। যথা-



১. **ভূমিরূপবিদ্যা (Geomorphology)** : প্রাকৃতিক ভূগোলের এই শাখায় পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ অবস্থা, পৃথিবীর উৎপত্তি, ভূ-আলোড়ন বা ভূ-আন্দোলন, বিভিন্ন প্রকার ভূমিরূপ, ভূ-তাত্ত্বিক সময় মাপনি, ভূ-ত্বকের পরিবর্তন, পৃথিবীর উৎপত্তি সংক্রান্ত মতবাদ, খনিজ, শিলা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করা হয়। মূলত অশ্মমন্ডল বা ভূ-ত্বকের সকল বিষয় ভূমিরূপবিদ্যার অন্তর্গত।

২. **জলবায়ুবিদ্যা (Climatology) :** এই শাখা বায়ু, বায়ুস্তর, বায়ুর গঠন, বায়ুর ধর্ম, বায়ুর তাপ ও তাপমাত্রা, বায়ুচাপ, বায়ুপ্রবাহ, বায়ুপুঞ্জ, বায়ুপ্রাচীর, ঘূর্ণিবাত, প্রতীপ ঘূর্ণিবাত, বায়ুমন্ডলের জলীয়বাষ্প, মেঘ, বৃষ্টি, কুয়াশা, আবহাওয়া ও জলবায়ু নিয়ে আলোচনা করে। সংক্ষেপে বায়ুমন্ডল ও বায়ুমন্ডলের সাথে সম্পর্কিত সকল বিষয়ের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ প্রদান করে।

৩. **সমুদ্রবিদ্যা (Oceanography) :** বারিমন্ডলের প্রধান উপাদান সাগর, মহাসাগরসমূহের উৎপত্তি, বিন্যাস, বিস্তরণ, সমুদ্রস্রোত, সমুদ্র তলদেশের ভূমিরূপ, জোয়ার-ভাঁটা, মানব জীবনের উপর সমুদ্রস্রোতের প্রভাব ও বিভিন্ন মহাদেশের মধ্যে সমুদ্রপথে যোগাযোগ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে।

৪. **মৃত্তিকা ভূগোল (Soil Geography) :** মৃত্তিকা ভূগোল ভূ-ত্বকের বা অশ্মমন্ডলের উপরিভাগের অংশ অর্থাৎ মৃত্তিকার গঠন, উপাদান, বণ্টন ও বিন্যাস সম্পর্কে আলোচনা করে।

৫. **জীব ভূগোল (Biogeography) :** উদ্ভিদ বাস্তুব্যবিদ্যা, উদ্ভিদের ক্রমবিকাশ, পরিবেশের উপর উদ্ভিদের প্রভাব প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করে।

৬. **প্রাণি ভূগোল (Zoogeography) :** এ শাখা পৃথিবী পৃষ্ঠের প্রাণিজগৎ ও প্রাণিজগতের বণ্টন নিয়ে আলোচনা করে।

৭. **গাণিতিক ভূগোল (Mathematical Geography) :** গাণিতিক ভূগোলে জ্যোতিষ্কমন্ডলী, সৌরজগৎ, পৃথিবী ও এর আকৃতি, গতি, আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা ও সময়, আহ্নিক গতি ও বার্ষিক গতির ফলাফল প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	প্রাকৃতিক পরিবেশের কোন্ কোন্ উপাদান প্রাকৃতিক ভূগোলে আলোচনা করা হয় তার একটি তালিকা প্রস্তুত করুন।

সারসংক্ষেপ

ভূগোল বিষয়ের যে অংশ পাঠ করলে পৃথিবীর জন্ম, ভূ-প্রকৃতি অর্থাৎ পাহাড়, পর্বত, বারিমন্ডল, বায়ুমন্ডল প্রভৃতি বিষয় ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা যায় তাকে প্রাকৃতিক ভূগোল বলে। প্রাকৃতিক ভূগোলের প্রধান প্রকৃতি হলো- প্রকৃতির সাথে সম্পর্কিত সকল বিষয়কে প্রাকৃতিক ভূগোল এককভাবে প্রকাশ করে। তাই প্রাকৃতিক ভূগোলের পরিধিও ব্যাপক এবং ভবিষ্যতে প্রাকৃতিক ভূগোলের পরিধি আরো অধিক বিস্তৃত হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.১

সঠিক উত্তরের পাশ টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। প্রাকৃতিক ভূগোলের পরিধিভুক্ত হলো-

i. নদ-নদী

ii. পাহাড়, পর্বত

iii. মরুভূমি ও সমভূমি

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii

(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২। বারিমন্ডলের উপাদানসমূহ হলো-

i. সমুদ্রস্রোত ii. সমুদ্রের তলদেশের ভূমিরূপ

iii. বায়ু প্রবাহ iv. ভূমিকম্প

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) iii ও iv

(গ) i, ii ও iii (ঘ) iv

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

শিক্ষক একাদশ শ্রেণির ক্লাসে বললেন প্রাকৃতিক ভূগোল প্রকৃতির সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করে তাই এর পরিধিও ব্যাপক। বারিমন্ডল, বায়ুমন্ডল ও অশ্মমন্ডলের সকল বিষয় প্রাকৃতিক ভূগোলে আলোচনা করা হয়।

৩। প্রাকৃতিক ভূগোলের কোন শাখায় অশ্মমন্ডল সম্পর্কে আলোচনা করা হয়?

(ক) ভূমিরূপবিদ্যায় (খ) জলবায়ুবিদ্যায়

(গ) জীব ভূগোলে (ঘ) সমুদ্রবিদ্যায়

৪। বায়ুর চাপ, বায়ুপ্রবাহ, বায়ুপুঞ্জ, বায়ুপ্রাচীর প্রভৃতি প্রাকৃতিক ভূগোলের কোন শাখায় আলোচনা করা হয়?

(ক) জলবায়ুবিদ্যায় (খ) সমুদ্রবিদ্যায়

(গ) ভূমিরূপবিদ্যায় (ঘ) জীব ভূগোলে

পাঠ-১.২ প্রাকৃতিক ভূগোলের সাথে অন্যান্য শাস্ত্রের সম্পর্ক

(Relationship of Physical Geography with other Subjects)

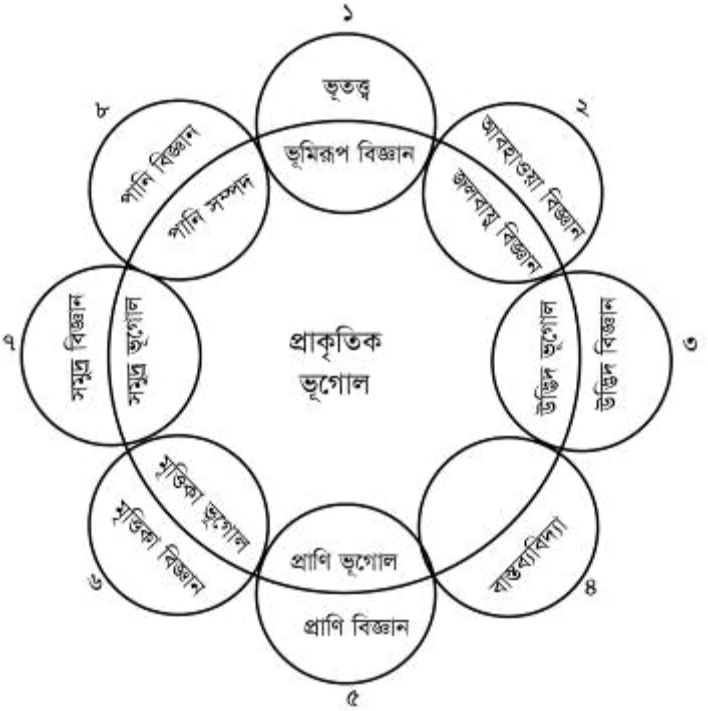
উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- প্রাকৃতিক ভূগোলের সাথে অন্যান্য শাস্ত্রের সম্পর্ক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

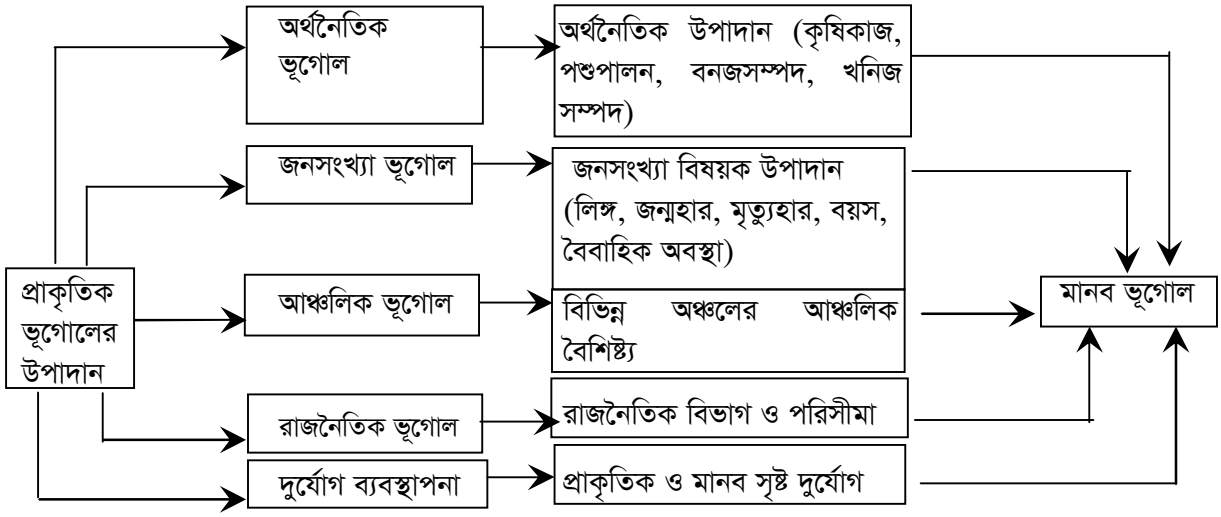
প্রাকৃতিক ভূগোলের সাথে অন্যান্য শাস্ত্রের সম্পর্ক

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে রয়েছে বৈচিত্র্যময় প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ। এ কারণে ভূগোলকে একদিকে যেমন প্রকৃতির বিজ্ঞান বলা হয় অন্যদিকে তেমনি পরিবেশের সামাজিক বিজ্ঞানও বলা হয়। আবার মানব পরিবেশ মিথক্রিয়ার বিজ্ঞানও বলা হয়। প্রাকৃতিক ভূগোলের সাথে অন্যান্য যে সকল শাস্ত্রের সম্পর্ক রয়েছে সেগুলো হলো- ভূমিরূপবিদ্যা, জলবায়ুবিদ্যা, সমুদ্রবিদ্যা, মৃত্তিকা ভূগোল, ভূ-তত্ত্ব ও জীব ভূগোল। এই সকল বিষয়সমূহ মূলত প্রাকৃতিক ভূগোলের শাখা, পরবর্তীতে অধিক গুরুত্বের কারণে স্বতন্ত্র বিষয় বা শাস্ত্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে (চিত্র ১.২.১)।



চিত্র ১.২.১ : প্রাকৃতিক ভূগোলের সাথে অন্যান্য শাস্ত্রের সম্পর্ক (বি□জ, ১৯৯৩ অনুসরণে)

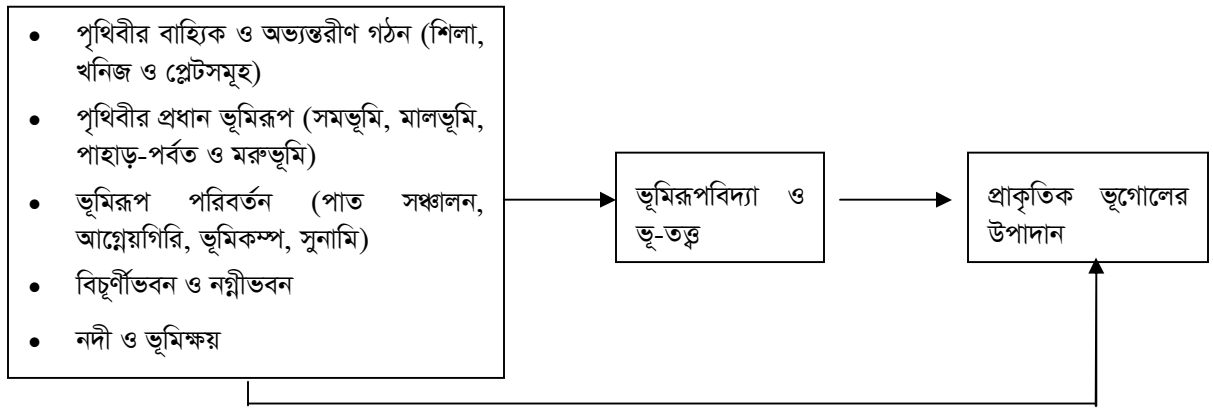
১. প্রাকৃতিক ভূগোলের সাথে মানব ভূগোলের সম্পর্ক : মানব ভূগোল মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য ও অবস্থার সাথে প্রাকৃতিক পরিবেশের সম্পর্ক আলোচনা করে। মানব ভূগোল পাঠে জানা যায়- পরিবেশ কীরূপে মানুষের অর্থনৈতিক কার্যাবলী নিয়ন্ত্রণ করে এবং মানুষ নিজেকে পরিবেশের সাথে কী পরিমাণ খাপ খাওয়াতে পারে অথবা মানুষের ক্রিয়াকলাপের ফলে কীরূপে পার্থিব পরিবেশের পরিবর্তন ঘটে। মানব ভূগোলের সাথে প্রাকৃতিক ভূগোলের সম্পর্ক নিম্নের ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো-



ছক: প্রাকৃতিক ভূগোলের সাথে মানব ভূগোলের সম্পর্ক

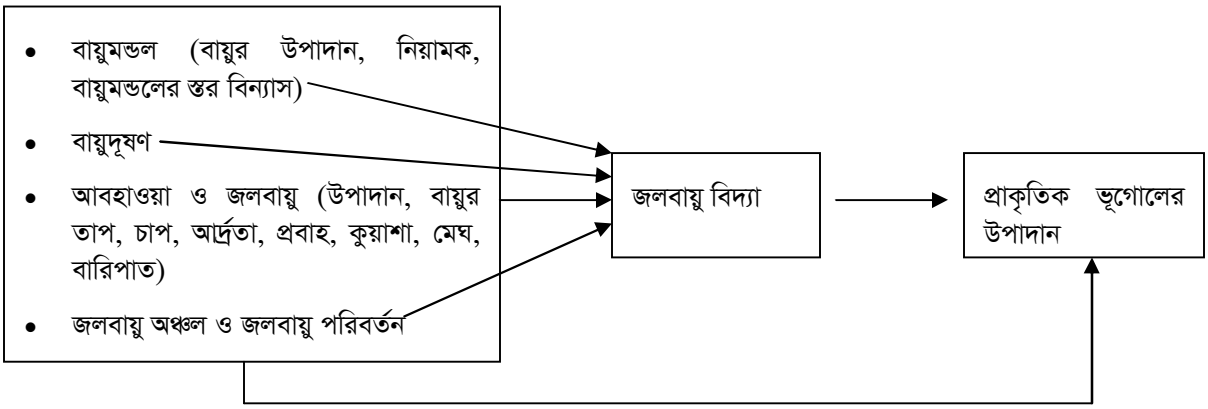
২. প্রাকৃতিক ভূগোলের সাথে পদ্ধতিগত ভূগোলের সম্পর্ক : ভূগোলের যে অংশে ভৌগোলিক বিষয়াদির গাণিতিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা হয় তাকে পদ্ধতিগত ভূগোল বলে। পদ্ধতিগত ভূগোলের অন্তর্ভুক্ত বিষয় হচ্ছে গাণিতিক ভূগোল। গাণিতিক ভূগোল মূলত প্রাকৃতিক ভূগোলের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সৌরজগত, পৃথিবীর আকার, আয়তন ও গতি, অক্ষাংশ, দ্রাঘিমারেখা প্রভৃতির গাণিতিক ব্যাখ্যা প্রদান করে।

৩. প্রাকৃতিক ভূগোলের সাথে ভূমিরূপবিদ্যা ও ভূ-তত্ত্বের সম্পর্ক : পৃথিবীর উপরিভাগ কঠিন পদার্থ দ্বারা আবৃত, যা 'অশ্মমন্ডল' নামে পরিচিত। অশ্মমন্ডলের উপরিভাগ এবং ভূ-অভ্যন্তরের যাবতীয় বিষয় ভূমিরূপবিদ্যা ও ভূ-তত্ত্বের মূল আলোচ্য বিষয়। এই দুইটি শাস্ত্র প্রাকৃতিক ভূগোলের প্রায় সকল বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। যেমন- ভূ-অভ্যন্তরের স্তরসমূহ ও এর গঠন উপাদান, ভূ-আলোড়নের ফলে সৃষ্ট ভূমিরূপ ও এর শ্রেণিবিভাগ, পর্বত, মালভূমি, সমভূমি প্রভৃতির গঠন, ভূমিকম্পের কারণ, ফলাফল, ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চল, সৃষ্ট ভূমিরূপ, খনিজ ও শিলার গঠন, উপাদান, শ্রেণিবিভাগ, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের কারণ, আগ্নেয়গিরির ফলে সৃষ্ট ভূমিরূপ, আগ্নেয়প্রবণ অঞ্চল ও আগ্নেয়গিরির ফলাফল, বিচূর্ণীভবন ও নগ্নীভবন প্রক্রিয়া, এর ফলে সৃষ্ট ভূমিরূপ, নদীর উৎপত্তি ও এর ক্রমবিকাশ, নিষ্কাশন ধরণ, ক্ষয় ও ক্ষয়জাত ভূমিরূপ, পরিবহন, সঞ্চয় ও সঞ্চয়জাত ভূমিরূপ প্রভৃতি। নিম্নে প্রাকৃতিক ভূগোলের সাথে ভূমিরূপবিদ্যা ও ভূ-তত্ত্বের সম্পর্ক দেখানো হলো-



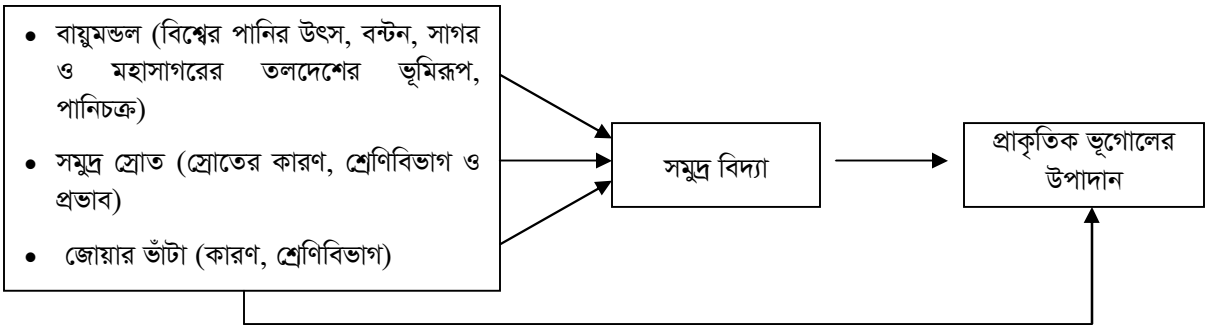
ছক : প্রাকৃতিক ভূগোলের সাথে ভূমিরূপবিদ্যা ও ভূ-তত্ত্বের সম্পর্ক

৪. প্রাকৃতিক ভূগোলের সাথে জলবায়ুবিদ্যার সম্পর্ক : জলবায়ুবিদ্যায় প্রাকৃতিক ভূগোলের যে সকল উপাদান নিয়ে আলোচনা করা হয় সেগুলো হলো- বায়ুমন্ডল, সৌরশক্তি, বায়ুর চাপ, বায়ুপ্রবাহ, বারিপাত, বায়ুপুঞ্জ, বায়ুপ্রাচীর, বায়ুমন্ডলীয় গোলযোগ, আবহাওয়া বিশ্লেষণ, ব্যাখ্যা ও পূর্বাভাস, জলবায়ু ও জলবায়ুর পরিবর্তন প্রভৃতি। প্রাকৃতিক ভূগোলের প্রধান উপাদানসমূহ জলবায়ুবিদ্যার প্রধান আলোচ্য বিষয়। নিম্নে ছকের মাধ্যমে প্রাকৃতিক ভূগোলের সাথে জলবায়ুবিদ্যার সম্পর্ক দেখানো হলো–



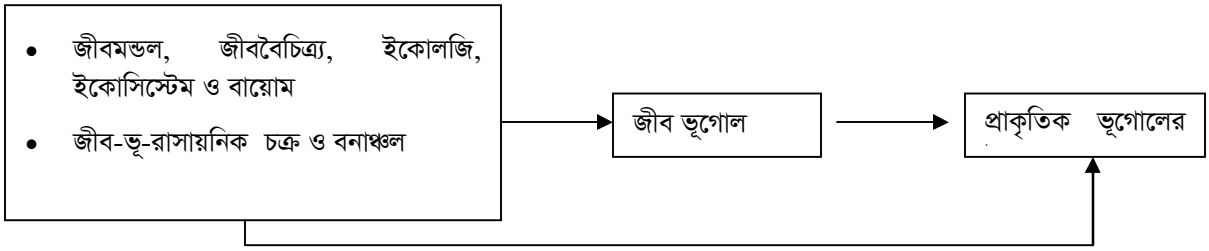
প্রাকৃতিক ভূগোলের সাথে জলবায়ু বিদ্যার সম্পর্ক

৫. প্রাকৃতিক ভূগোলের সাথে সমুদ্রবিদ্যার সম্পর্ক : সমুদ্রবিদ্যায় সাগর, মহাসাগর এবং উপসাগরসমূহের আয়তন, আকৃতি, গভীরতা, মহাসাগরের তলদেশের ভূমিরূপ, সমুদ্রস্রোত, জোয়ার ভাঁটা প্রভৃতি আলোচনা করা হয়। এগুলো মূলত প্রাকৃতিক ভূগোলের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এবং বারিমন্ডলের প্রধান আলোচ্য বিষয়। ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগের পানিরাশিকে বারিমন্ডল বলে। সাগর ও মহাসাগরই বারিমন্ডলের প্রধান অংশ যা পৃথিবীর পানির বেশিরভাগ ধারণ করে আছে।



প্রাকৃতিক ভূগোলের সাথে সমুদ্রবিদ্যার সম্পর্ক

৬. প্রাকৃতিক ভূগোলের সাথে জীব ভূগোলের সম্পর্ক : জীবমন্ডলই জীব ভূগোলের প্রধান আলোচ্য বিষয়। জীবমন্ডলের উপাদানগুলো হলো বায়ুমন্ডল, বারিমন্ডল ও অশ্মমন্ডল। জীব ভূগোলে স্থল, জল ও বায়ুমন্ডলে বসবাসকারী জীবসমূহ এবং জীবমন্ডলের উপাদানসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক আলোচনা করে। জীবমন্ডলের প্রতিটি উপাদান যে কোনোভাবেই হোক পরস্পরকে সহায়তা করে জীবজগত টিকিয়ে রেখেছে।



প্রাকৃতিক ভূগোলের সাথে জীব ভূগোলের সম্পর্ক

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থী তার নিজের এলাকা পর্যবেক্ষণ করে প্রাকৃতিক ভূগোলের উপাদান সমূহের একটি তালিকা প্রণয়ন করবেন এবং ঐ সকল উপাদানকে প্রাকৃতিক ভূগোলের উপাদান বলার পক্ষে যুক্তি প্রদান করবেন।

সারসংক্ষেপ

প্রাকৃতিক ভূগোল, ভূগোলের নিজস্ব শাখার সাথে সম্পর্কিত অপরদিকে প্রাকৃতিক ভূগোলের অন্যান্য শাখার সাথে ও গভীরভাবে সম্পর্কিত। যেমন ভূ-তত্ত্ব, ভূমিরূপবিদ্যা, জলবায়ুবিদ্যা, সমুদ্রবিদ্যা ও জীব ভূগোল প্রভৃতি প্রাকৃতিক ভূগোলের নিজস্ব শাখা। পরবর্তীতে স্থান ও কালের পরিপ্রেক্ষিতে অধিক গুরুত্বের কারণে পৃথক শাস্ত্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। বলা যায়, প্রাকৃতিক ভূগোল জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল গুরুত্বপূর্ণ শাখার সাথে সম্পর্কিত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ১ ও ২নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

ভূগোল হলো পৃথিবীর বর্ণনা। স্থান ও কালের বিবেচনায় মানুষ ও পরিবেশের সাথে সম্পর্কিত সকল বিষয় ভূগোল আলোচনা করে।

১। প্রাকৃতিক বিভিন্ন বিষয়ের বর্ণনা ভূগোলের কোন শাখার অন্তর্গত?

(ক) প্রাকৃতিক ভূগোল (খ) মানব ভূগোল (গ) অর্থনৈতিক ভূগোল (ঘ) পদ্ধতিগত ভূগোল

২। প্রাকৃতিক ভূগোলের অন্তর্ভুক্ত বিষয়?

i. পৃথিবীর কেন্দ্র হতে ভূ-ত্বক পর্যন্ত ii. ভূ-ত্বক হতে ঊর্ধ্বে বায়ুমন্ডলের শেষ সীমা পর্যন্ত
iii. ভূমিরূপ
নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩। প্রাকৃতিক ভূগোলের প্রধান উপাদান হলো-

i. অশ্মমন্ডল ii. বারিমন্ডল iii. বায়ুমন্ডল
নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) ii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৪। বারিমন্ডলের উপাদান নয় কোনটি?

(ক) মহাসাগর (খ) সাগর (গ) সমুদ্রস্রোত (ঘ) ভূমিকম্প

পাঠ-১.৩ প্রাকৃতিক ভূগোল অধ্যয়নের গুরুত্ব
(Importance of Physical Geography Studies)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- প্রাকৃতিক ভূগোল অধ্যয়নের গুরুত্ব ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

প্রাকৃতিক ভূগোল অধ্যয়নের গুরুত্ব

প্রাকৃতিক ভূগোল অধ্যয়নের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ পৃথিবীর জন্ম থেকে শুরু করে ভূ-পৃষ্ঠ, ভূ-অভ্যন্তর, বায়ুমন্ডল, বারিমন্ডল এবং মহাশূন্য পর্যন্ত সকল বিষয়ের যুক্তিপূর্ণ, বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রাকৃতিক ভূগোল প্রদান করে। নিম্নে প্রাকৃতিক ভূগোল অধ্যয়নের গুরুত্ব বর্ণনা করা হলো।

১. প্রাকৃতিক ভূগোলের উপাদান যেমন- ভূমিরূপ (পাহাড়-পর্বত, মালভূমি, সমভূমি, মরুভূমি), ভূমিরূপ গঠনকারী শক্তি (আগ্নেয়গিরি, ভূমিকম্প, প্লেট সঞ্চালন), ক্ষয়কারী শক্তি (বিচূর্ণীভবন, নগ্নীভবন) এবং এদের নিয়ামকসমূহ (বায়ুর চাপ, তাপ, প্রবাহ, পানি প্রবাহ, বারিপাত, হিমবাহ, সমুদ্রের ঢেউ, জোয়ার ভাঁটা) পরস্পর আন্তঃসম্পর্কিত যা জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখাকে প্রভাবিত করে।

২. পৃথিবীর জন্ম সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ, পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ অবস্থা প্রভৃতি প্রাকৃতিক ভূগোল অধ্যয়নের মাধ্যমে জানা যায়।

৩. পৃথিবীর অভ্যন্তরের সম্ভাব্য ভূ-তাত্ত্বিক অবস্থা, উত্তাপ ও পৃথিবীর গঠন অর্থাৎ অশ্মমন্ডল, গুরুমন্ডল ও কেন্দ্রমন্ডল সম্পর্কে জানা যায়।

৪. ভূ-আলোড়নকারী শক্তি, ভূমিরূপ, আগ্নেয়গিরি, ভূমিকম্প, পর্বত, মালভূমি, সমভূমি প্রভৃতি সম্পর্কে জানা যায়।

৫. ভূমিরূপ পরিবর্তনকারী প্রক্রিয়াসমূহ যেমন- নগ্নীভবন, বিচূর্ণীভবন, নদীর কাজ, হিমবাহের কাজ, মরুভূমির প্রধান ভূমিরূপ সম্পর্কে প্রাকৃতিক ভূগোল অধ্যয়নের মাধ্যমে জানা যায়।

৬. বায়ুর স্তরবিন্যাস, উপাদান, ধর্ম, তাপ, চাপ প্রভৃতি সম্পর্কে জানা যায়।

৭. বায়ুমন্ডলের গভীরতা, বায়ুমন্ডলের জলীয়বাষ্প, বায়ুর আর্দ্রতা, বৃষ্টিপাতের কারণ ও প্রকারভেদ, বৃষ্টিবলয় প্রভৃতি সম্পর্কে জানা যায়।

৮. বায়ুপ্রবাহের কারণ, দিক, শ্রেণিবিভাগ, বিভিন্ন প্রকার ঘূর্ণিবাতের বিষয় সম্পর্কে জানা যায়।

৯. পৃথিবীর মহাসাগরসমূহের অবস্থান, আকৃতি, তলদেশের অবস্থা, জোয়ার ভাঁটা, সমুদ্রস্রোত প্রভৃতি বিষয় সম্পর্কে জানা যায়।

১০. এছাড়া দৈনন্দিন আবহাওয়া ও পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের জলবায়ু সম্পর্কে জানা যায় প্রাকৃতিক ভূগোল অধ্যয়নের মাধ্যমে।

শিক্ষার্থীর কাজ	আপনার পরিচিত পরিবেশ থেকে প্রাকৃতিক ভূগোল অধ্যয়নের গুরুত্ব বিবেচনা করে গুরুত্ব অনুসারে প্রাকৃতিক বিষয়াদির তালিকা প্রস্তুত করুন।

সারসংক্ষেপ

প্রাকৃতিক ভূগোল অধ্যয়নের গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ পৃথিবীর জন্ম থেকে শুরু করে পৃথিবীর প্রাকৃতিক বা ভৌত পরিবেশ সম্পর্কে বিস্তারিত জানার একমাত্র শাস্ত্র হচ্ছে প্রাকৃতিক ভূগোল। অশ্মমন্ডল, বায়ুমন্ডল, বারিমন্ডল ও জীবমন্ডলের ভৌত পরিবেশগত বিষয়াদির বর্ণনা প্রাকৃতিক ভূগোল প্রদান করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) দিন।

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন দিন।

একাদশ শ্রেণির শিক্ষক মুনতাসির শ্রেণিকক্ষে প্রাকৃতিক ভূগোল অধ্যয়নের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করলেন এবং বাস্তবমুখী জ্ঞান অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীদের শিক্ষাসফরে নিয়ে গেলেন । শিক্ষার্থীরা কক্সবাজার গেলেন এবং সাগর, পাহাড়, বেলাভূমি এবং ঝাউবন দেখলেন।

১। সাগর, বেলাভূমি, পাহাড় প্রভৃতি ভূগোলের কোন শাখার আলোচ্য বিষয়?

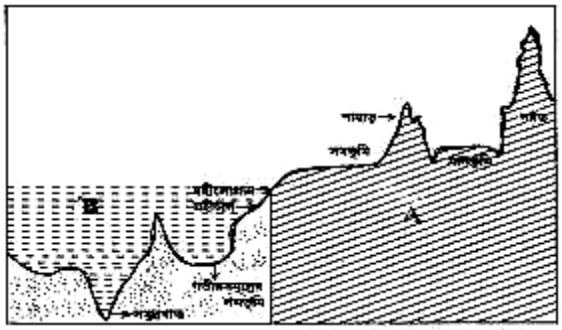
(ক) মানব ভূগোল (খ) প্রাকৃতিক ভূগোল (গ) গাণিতিক ভূগোল (ঘ) অর্থনৈতিক ভূগোল

২। সমুদ্র এবং সমুদ্রস্রোত সম্পর্কে আলোচনা প্রাকৃতিক ভূগোলের কোন শাখার অন্তর্ভুক্ত?

(ক) জলবায়ুবিদ্যা (খ) সমুদ্রবিদ্যা (গ) আবহাওয়া বিজ্ঞান (ঘ) মৃত্তিকা ভূগোল

সৃজনশীল প্রশ্ন : ১

নিচের ছবিটি লক্ষ্য করুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।



ক) প্রাকৃতিক ভূগোল কাকে বলে?

খ) প্রাকৃতিক ভূগোলের প্রকৃতি কী?

গ) ছবিটির `A' চিহ্নিত স্থানটি প্রাকৃতিক ভূগোলের কোন শাখার সাথে সম্পর্কিত এবং কীভাবে?

ঘ) ছবিতে `A' ও `B' চিহ্নিত স্থানসমূহের বর্ণনা উলে□খপূর্বক প্রাকৃতিক ভূগোল অধ্যয়নের গুরুত্ব বিশ্লেষণ করুন।

প্রশ্ন : ২ : মুনতাসির পাহাড়-পর্বত, সাগর-মহাসাগর, বায়ুমন্ডল ও মহাকাশ সম্পর্কে জানতে বেশ আগ্রহী। এ সংক্রান্ত বিভিন্ন প্রশ্ন নিয়ে সে তার বাবাকে প্রায়ই প্রশ্ন করে। তাই বাবা তাকে একটি বই কিনে দিলেন, যেটিতে শুধু এসব বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

(ক) ক্রয়কৃত বইটির নাম কী?

(খ) ভূমিরূপবিদ্যার বিষয়বস্তু কী?

(গ) ক্রয়কৃত বইটির প্রকৃতি ব্যাখ্যা করুন।

(ঘ) বইটি যে বিষয়ের ওপর লিখিত, সে বিষয়ের পরিসর কতটুকু? বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা

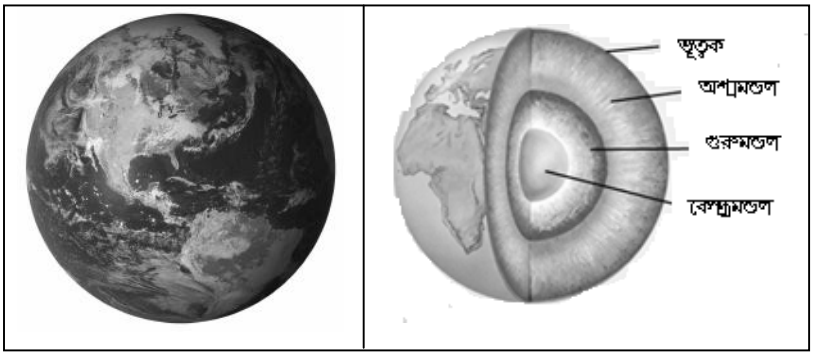
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.১ :	১. ঘ	২. গ	৩. ক	৪. ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.২ :	১.ঘ	২. গ	৩. ক	৪. ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১.৩ :	১. খ	২. খ		

পৃথিবীর গঠন
(Structure of the Earth)

ইউনিট ২

ভূমিকা

সৃষ্টির প্রথম অবস্থায় পৃথিবী একটি জলন্তগ্যাসপিন্ড ছিল। সময়ের পরিবর্তনে তাপমাত্রা হ্রাস পেয়ে গ্যাসীয় অবস্থা পরিবর্তিত হয়ে তরল অবস্থায় রূপান্তরিত হয়েছে। ফলে ভারী পদার্থসমূহ পৃথিবীর কেন্দ্রে এবং হালকা পদার্থসমূহ পৃথিবীর উপরের দিকে জমা হয়ে ভূ-অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক গঠনে ভিন্নতা তৈরি হয়েছে। বর্তুলাকার পৃথিবীর ব্যাসার্ধ প্রায় ৬৪০০ কিলোমিটার। পৃথিবীর বহিরাবরণকে ভূ-ত্বক বলে। ভূ-ত্বকের নিচেই অভ্যন্তরভাগ রয়েছে। ভূ-বিজ্ঞানীরা বিভিন্নভাবে পৃথিবীর মাত্র ০.৫% ভাগ ভূ-অভ্যন্তর সম্বন্ধে জানতে পেরেছেন। পৃথিবী বিভিন্ন প্রকার খনিজ ও শিলা দ্বারা গঠিত। মানুষের আবাসস্থল হিসেবে পৃথিবীর গুরুত্ব অপরিসীম। এই ইউনিটে আমরা পৃথিবীর বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ গঠন, গঠনের উপাদান, বিভিন্ন প্রকার শিলা, খনিজ প্রভৃতি সম্পর্কে আলোচনা করব।



ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ ২.১ : পৃথিবীর বাহ্যিক গঠন
পাঠ ২.২ : পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ গঠন
পাঠ ২.৩ : শিলা ও এর শ্রেণিবিভাগ
পাঠ ২.৪ : আগ্নেয় শিলা
পাঠ ২.৫ : পাললিক শিলা
পাঠ ২.৬ : রূপান্তরিত শিলা
পাঠ ২.৭ : খনিজ ও এর শ্রেণিবিভাগ

পাঠ-২.১ পৃথিবীর বাহ্যিক গঠন (External Structure of the Earth)

উদ্দেশ্য

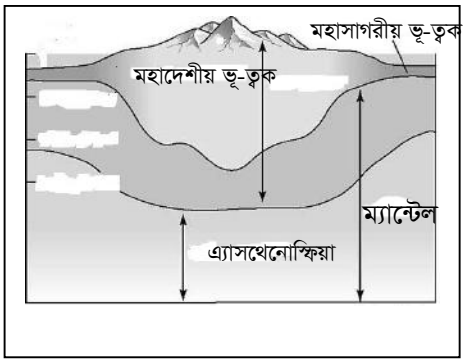
এই পাঠ শেষে আপনি–

- পৃথিবীর বাহ্যিক গঠন বর্ণনা করতে পারবেন।

পৃথিবীর বাহ্যিক গঠন

বর্তুলাকার পৃথিবী সৃষ্টির সময় ছিল একটি উত্তপ্ত গ্যাসীয়পিন্ড। সময়ের আবর্তে এটি শীতল ও ঘনীভূত হয়ে বর্তমান অবস্থায় রূপান্তরিত হয়। এই সময় পৃথিবীর বাইরের ভারী উপাদানগুলো পৃথিবীর কেন্দ্রের আকর্ষণে কেন্দ্রের দিকে জমা হয় এবং হালকা উপাদানগুলো ভরের তারতম্য অনুসারে পর্যায়ক্রমে নিচ থেকে উপরে স্তরে স্তরে জমা হয়। পৃথিবীর এই বিভিন্ন স্তরকে মন্ডল বলে। ভূ-পৃষ্ঠ সংলগ্ন নিচের দিকে পাতলা আবরণকে ভূ-ত্বক বলে (চিত্র ২.১.১)। বর্তুলাকার পৃথিবীর ব্যাসার্ধ প্রায় ৬,৪০০ কি.মি।

ভূ-ত্বকের গঠন (Composition of the Earth's Crust) : পৃথিবীর উপরিভাগের শক্ত আবরণ ভূ-ত্বক বিভিন্ন ধরনের খনিজ ও শিলা দ্বারা গঠিত। ভূ-ত্বক অশ্মমন্ডলেরই উপরিভাগ যার মধ্যে অক্সিজেন ও সিলিকনের পরিমাণ বেশি। আজ পর্যন্তআবিষ্কৃত মোট ১০৫টি মৌলিক উপাদানের মধ্যে ২০টি উপাদান ভূ-ত্বকের প্রায় শতকরা ৯৯.৫ অংশ দখল করে আছে। ভূ-ত্বকের গভীরতা সর্বত্র সমান নয়। তবে এর গড় গভীরতা ২০ কিলোমিটার। গ্রানাইট স্তরের গড় গভীরতা ৮ কিলোমিটার। ভূ-ত্বক গঠনকারী শিলারাশির ঘনত্ব ২.৭৫ থেকে ৩.০ পর্যন্ত। ভূ-ত্বক বা অশ্মমন্ডলের উপরিভাগেই পৃথিবীর বাহ্যিক দিকগুলো দেখা যায়। যেমন- সমভূমি, মালভূমি, পাহাড়, পর্বত, নদী,হ্রদ, সাগর, মহাসাগর ইত্যাদি।



চিত্র ২.১.১: ভূ-ত্বক এর অবস্থান।

শিক্ষার্থীর কাজ	ভূ-পৃষ্ঠ সংলগ্ন নিচের দিকে পাতলা আবরণকে কী বলে?

সারসংক্ষেপ

পৃথিবীর বহিরাবরণই হচ্ছে ভূ-ত্বক। ভূ-ত্বক বিভিন্ন উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত। এদের মধ্যে অক্সিজেন ও সিলিকনের পরিমাণ বেশি। ভূ-ত্বক বা অশ্মমন্ডলের উপরিভাগেই পৃথিবীর বাহ্যিক দিকগুলো দেখা যায়। যেমন- সমভূমি, মালভূমি, পহাড়, পর্বত, নদী,হ্রদ, সাগর, মহাসাগর ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.১

সঠিক উত্তরের পাশ টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ভূ-ত্বক মূলত কতটি মৌলিক উপাদানে গঠিত?

(ক) ২০টি (খ) ২৫টি (গ) ৩০টি (ঘ) ৩৫টি

২। পৃথিবীর ব্যাসার্ধ প্রায় কত কি.মি?

(ক) ৬৪০০ কি.মি. (খ) ৭৪০০ কি.মি. (গ) ৬১০০ কি.মি. (ঘ) ৬৪০০ কি.মি.

পাঠ-২.২ পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ গঠন (Internal Structure of the Earth)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ভূ-অভ্যন্তর সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন এবং
- ভূ-অভ্যন্তরের প্রধান স্তরসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ গঠন

পৃথিবীর অভ্যন্তরের কঠিন আবরণ ভেদ করে গভীরে প্রবেশ করে ভূ-অভ্যন্তরের অবস্থা জানার তেমন কোনো সুযোগ নেই। খনিজ সম্পদ আহরণের জন্য এ পর্যন্তসবচেয়ে গভীরতম কূপ মাত্র ৮ কিলোমিটার ভূ-অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পেরেছে। ক্ষয়কার্যের ফলে মাত্র ২০-২৫ কিলোমিটার গভীরের শিলা উন্মুক্ত হয়েছে। এজন্য ভূ-বিজ্ঞানীরা ভূ-অভ্যন্তরভাগ সম্পর্কে জানার জন্য তিন ধরনের তথ্যের উপর নির্ভর করে থাকেন। এগুলো হলো-

ক) আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত থেকে প্রাপ্ত ভূ-অভ্যন্তরের শিলার নমুনা,
খ) পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের বৈশিষ্ট্য ও ঘনত্ব এবং
গ) ভূ-কম্পন তরঙ্গের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ।

ভূ-অভ্যন্তরের স্তরসমূহ : ভূ-অভ্যন্তরের প্রধান স্তরসমূহ এবং উপরিভাগের শিলামন্ডল, বারিমন্ডল এবং বায়ুমন্ডল ২.২.১ নং চিত্রে দেখানো হয়েছে। নিম্নে ভূ-অভ্যন্তরভাগের প্রধান তিনটি স্তরের বর্ণনা দেওয়া হলো।

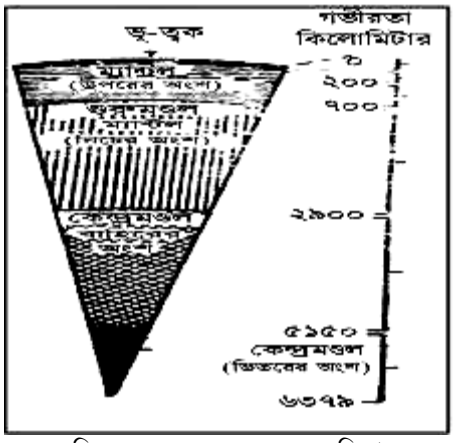


চিত্র ২.২.১: ভূঅভ্যন্তরের গঠন কাঠামো

ক. অশ্মমণ্ডল (Lithosphere) : ভূ-পৃষ্ঠ থেকে অভ্যন্তরে প্রায় ৭০০ কিলোমিটার গভীর পর্যন্তপ্রথম স্তরকে অশ্মমন্ডল বলে। ভূ-কম্পন তরঙ্গ থেকে জানা যায় যে, এ স্তরটি মূলত সিলিকন ও অ্যালুমিনিয়াম উপাদান দিয়ে গঠিত যা সিয়াল(Sial) নামে পরিচিত। ভূ-ত্বকের নিচের দিকে প্রতি কিলোমিটারে ৩০° সেলসিয়াস তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। অশ্বমন্ডলের নিচে গুরুমন্ডল ও কেন্দ্রমন্ডল নামে আরো দুটি প্রধান স্তর রয়েছে (চিত্র : ২.২.২)।

খ. গুরুমন্ডল (Bryosphere) : কেন্দ্রমন্ডলের বহি:ভাগ থেকে ভূ-ত্বকের নিম্নস্তর পর্যন্তপ্রায় ৭০০-২৯০০ কিলোমিটার বিস্তৃত স্তরকে গুরুমন্ডল বলে। এটি মূলত ব্যাসল্ট, শিলা, সিলিকা, ম্যাগনেসিয়াম, লোহা, কার্বন ও অন্যান্য খনিজ পদার্থ দ্বারা গঠিত। তবে সিলিকা ও ম্যাগনেসিয়াম উপাদানের আধিক্যের কারণে এটি সিমা(Sima) নামে পরিচিত।

গুরুমন্ডলের ১০০ কিলোমিটার গভীরতায় তাপমাত্রা আনুমানিক ১১০০°-১২০০° সেলসিয়াস। বহিঃকেন্দ্রমন্ডলের সীমানায় এ তাপমাত্রা ৩০০০° সেলসিয়াসের কাছাকাছি। গুরুমন্ডল দুই ভাগে বিভক্ত। (১) ঊর্ধ্ব গুরুমন্ডল যা ৭০০ কিলোমিটার পর্যন্তবিস্তৃত। লোহা ও ম্যাগনিসিয়াম দ্বারা গঠিত। (২) নিম্ন গুরুমন্ডল যা প্রধানত আয়রন অক্সাইড, ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড ও সিলিকন ডাই-অক্সাইড দ্বারা গঠিত। এটি ৭০০ কি.মি হতে ২,৯০০ কি.মি পর্যন্তবিস্তৃত (চিত্র : ২.২.২)।



চিত্র ২.২.২: ভূ-অভ্যন্তরের স্তরবিন্যাস

গ) কেন্দ্রমণ্ডল (Centrosphere) : গুরুমন্ডলের ঠিক পরেই রয়েছে কেন্দ্রমন্ডল। কেন্দ্রমন্ডল, গুরুমন্ডলের নিম্নভাগ থেকে কেন্দ্র পর্যন্তপ্রায় ৩,৪৭৯ কিলোমিটার বিস্তৃত (চিত্র : ২.২.২)। এর গড় ঘনত্ব প্রায় ১০.৭৮ সে.মি.। কেন্দ্রের দিকে ঘনত্ব বাড়তে থাকে। ভূ-কম্পন তরঙ্গের সাহায্যে জানা গেছে যে, কেন্দ্রমন্ডলে একটি তরল বহিরাবরণ আছে, যা প্রায় ২,২৭০ কিলোমিটার পুরু

এবং কঠিন অন্তঃভাগ আছে যা প্রায় ১,২১৬ কিলোমিটার পুরু। কেন্দ্রমন্ডলের উপাদানগুলো হলো লোহা, নিকেল, পারদ ও সিসা। তবে প্রধান উপাদান হলো নিকেল ও লোহা যা নাইফ(Nife) নামে পরিচিত।

শিক্ষার্থীর কাজ	ভূ-অভ্যন্তরের তথ্য জানার উপায়গুলো কী কী?

সারসংক্ষেপ

পৃথিবীর ভূ-অভ্যন্তর তিনটি স্তরে বিন্যস্ত। প্রথম স্তর হচ্ছে অশ্মমন্ডল, যা সিলিকা ও এ্যালুমিনিয়াম দ্বারা গঠিত এবং এর ৭০০ কি.মি. পর্যন্তগভীর। এর পরের স্তর হচ্ছে গুরুমন্ডল, যা সিলিকা, ম্যাগনেসিয়াম, লোহা, কার্বন ও অন্যান্য খনিজ পদার্থ দ্বারা গঠিত। যার গভীরতা প্রায় ৭০০-২৯০০ কি.মি.। তৃতীয় স্তর হচ্ছে কেন্দ্রমন্ডল, যা প্রায় ২৯০০ থেকে ৬৩৭৯ কি.মি বিস্তৃত এবং লোহা, নিকেল, পারদ ও সিসা দ্বারা গঠিত। তবে প্রধান উপাদান হলো নিকেল ও লোহা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.২

সঠিক উত্তরের পাশ টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ভূ-ত্বকের নিচের দিক থেকে প্রতি কি.মি তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় কত?

(ক) ৩০° সেলসিয়াস (খ) ৩৫°সেলসিয়াস

(গ) ২০° সেলসিয়াস (ঘ) ২৫°সেলসিয়াস

২। কঠিন অন্তঃকেন্দ্রমন্ডল কী দিয়ে গঠিত ?

(ক) লোহা ও ম্যাগনেসিয়াম দ্বারা (খ) লোহা ও পারদ দ্বারা

(গ) লোহা ও নিকেল দ্বারা (ঘ) লোহা ও সিসা দ্বরা

৩। গুরুমন্ডলের বিস্তৃতি প্রায় কত কি.মি?

(ক) ২৫০০-২৮০০ কি.মি. (খ) ২৭০০-৩০০০ কি.মি.

(গ) ৭০০-২৯০০ কি.মি. (ঘ) ২৮৮৫ কি.মি.

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

আব্দুর রহমান তাঁর ছাত্রদেরকে পৃথিবীর ভূ-অভ্যন্তরের গঠন ও স্তরসমূহ পাঠদান করান। তার মধ্যে অশ্মমন্ডল, গুরুমন্ডল ও কেন্দ্রমন্ডলের আলোচনাও ছিল। তিনি পৃথিবীকে কমলালেবুর আকারে বোর্ডে এঁকে ছাত্র-ছাত্রীদের ভূ-অভ্যন্তরের ধারণা দিলেন।

৪। ভূ-অভ্যন্তরের স্তর কতটি?

(ক) ২ (খ) ৩

(গ) ৪ (ঘ) ৫

৫। ধারাবাহিকভাবে ভূ-অভ্যন্তরের স্তরগুলো হলো–

(ক) অশ্মমন্ডল, কেন্দ্রমন্ডল ও গুরুমন্ডল (খ) কেন্দ্রমন্ডল, অশ্মমন্ডল ও গুরুমন্ডল

(গ) গুরুমন্ডল, অশ্মমন্ডল ও কেন্দ্রমন্ডলে (ঘ) অশ্মমন্ডল, গুরুমন্ডল ও কেন্দ্রমন্ডল

পাঠ-২.৩ শিলা ও এর শ্রেণিবিভাগ (Rock and its Classification)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- শিলা কী তা জানতে পারবেন এবং
- শিলার প্রকারভেদ বলতে পারবেন।

শিলা

ভূ-ত্বক যেসব উপাদান দ্বারা গঠিত তাদের সাধারণ নাম শিলা। ভূ-তত্ত্ববিদগণের মতে, দুই বা ততোধিক খনিজ দ্রব্যের সংমিশ্রণে এসব শিলার সৃষ্টি হয়। ভূ-ত্বক গঠনকারী সকল কঠিন ও কোমল পদার্থই শিলা (চিত্র ২.৩.১)।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায়- নুড়ি, কাঁকর, গ্রানাইট, কাদা, বালি প্রভৃতি শিলা। অন্যভাবে বলা যায় যে, এক বা একাধিক খনিজের একত্রিত রূপই হচ্ছে শিলা। খনিজের এই মিশ্রণ প্রাকৃতিক অবস্থায় পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে প্রতিটি শিলার গঠনকারী খনিজের বৈশিষ্ট্য বজায় থাকে। কোনো কোনো শিলা একটি মাত্র খনিজ পদার্থ দিয়েও গঠিত হতে পারে। এক্ষেত্রে খনিজ ও শিলা একই পদার্থ। যেমন: কেলসাইট একটি খনিজ এবং শিলা হিসাবে এটি চুনাপাথর।



চিত্র ২.৩.১: বিভিন্ন প্রকার শিলা

শিলার শ্রেণিবিভাগ : ভূ-ত্বক বিভিন্ন প্রকার শিলা দ্বারা গঠিত এবং প্রত্যেক ধরনের শিলা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন। কোনো শিলা কাঁদার মত নরম এবং কোনো শিলা গ্রানাইট পাথরের মত শক্ত। সব ধরনের শিলাই প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট। উৎপত্তি ও গঠনের দিক থেকে শিলাকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

ক) আগ্নেয় শিলা: উদাহরণ- গ্রানাইট।
খ) পাললিক শিলা: উদাহরণ-চুনাপাথর।
গ) রূপান্তরিত শিলা : উদাহরণ-মার্বেল।

উপরিউক্ত শ্রেণিবিভাগগুলো ছাড়াও প্রত্যেক প্রকার শিলার কতকগুলো উপবিভাগ রয়েছে। যা পরবর্তী পাঠগুলোতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিলা কাকে বলে? উদাহরণসহ লিখুন।

সারসংক্ষেপ

বিভিন্ন প্রকার খনিজ একত্রিত হয়ে যে পদার্থ গঠন করে তাকে শিলা বলে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়- নুড়ি, কাঁকর, গ্রানাইট, কাঁদা, বালি প্রভৃতি শিলা। অর্থাৎ এক বা একাধিক খনিজের একত্রিত রূপই হচ্ছে শিলা। শিলা প্রধানত তিন প্রকার। যথা- আগ্নেয় শিলা, পাললিক শিলা ও রূপান্তরিত শিলা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৩

সঠিক উত্তরের পাশ টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ভূ-ত্বক গঠন করে–
(ক) শিলা (খ) খনিজ (গ) খনিজ ও শিলা (ঘ) পাথর

২। শিলায় এক বা একাধিক কী থাকে ?
(ক) শিলা (খ) খনিজ (গ) খনিজ ও শিলা (ঘ) পাথর

৩। শিলা প্রধানত কত প্রকার?
(ক) ২ (খ) ৩ (গ) ৪ (ঘ) ৫

পাঠ-২.৪ আগ্নেয় শিলা (Igneous Rock)

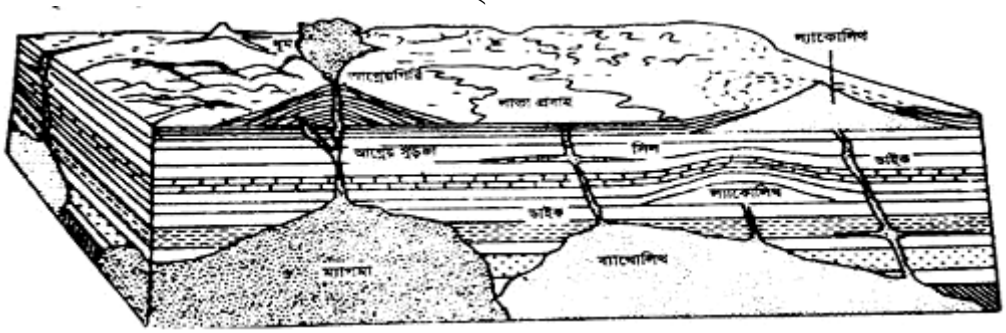
উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- আগ্নেয় শিলার সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য বলতে পারবেন এবং
- আগ্নেয় শিলার প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন।

আগ্নেয় শিলা

সৃষ্টির প্রথমে পৃথিবী উত্তপ্ত গ্যাসীয়পিন্ড ছিল। এই গ্যাসপিন্ড ক্রমান্বয়ে তাপ বিকিরণ করে তরল হয়। পরে আরো তাপ বিকিরণ করে উপরিভাগ শীতল ও কঠিন আকার ধারণ করে। এভাবে গলিত অবস্থা থেকে ঘনীভূত বা কঠিন হয়ে যে শিলা গঠিত হয় তাকে আগ্নেয় শিলা বলে। ভূ-অভ্যন্তরে উত্তপ্ত ম্যাগমা শীতল ও কেলাসিত হয়ে আগ্নেয় শিলা গঠিত হয়। অগ্নিময় অবস্থা থেকে এই শিলার সৃষ্টি বলে একে আগ্নেয় শিলা বলা হয় (চিত্র ২.৪.১)। ইংরেজিতে এ ধরনের শিলাকে Igneous Rock বলে। Igneous শব্দের অর্থ আগুন। আগ্নেয় শিলা পৃথিবীর প্রথম পর্যায়ের শিলা বলে একে প্রাথমিক শিলাও বলা হয়। এ শিলায় কোনো স্তর নেই, তাই এই শিলার অপর নাম অস্তরীভূত শিলা। এই শিলায় কোনো জীবাশ্ম নেই। আগ্নেয়গিরি বা ভূমিকম্পের ফলে অনেক সময় ভূ-ত্বকের দুর্বল অংশে ফাটলের সৃষ্টি হয়। তখন পৃথিবীর অভ্যন্তর থেকে উত্তপ্ত গলিত লাভা নির্গত হয়ে আগ্নেয় শিলার সৃষ্টি করে। এভাবে ব্যাসল্ট ও গ্রানাইট শিলার সৃষ্টি হয়েছে।



চিত্র ২.৪.১: আগ্নেয় শিলা

আগ্নেয় শিলার বৈশিষ্ট্য

১। স্তরবিহীন : উত্তপ্ত গলিত অবস্থা থেকে ঠান্ডা হয়ে জমাট বেঁধে এই জাতীয় শিলার সৃষ্টি হয় বলে এতে কোনো স্তর থাকে না।

২। জীবাশ্মবিহীন : উত্তপ্ত গলিত পদার্থ থেকে আগ্নেয় শিলার উৎপত্তি বিধায় কোনো প্রাণি বা উদ্ভিদের অস্তিত্ব আশা করা যায় না। এ কারণে এ জাতীয় শিলার মধ্যে জীবাশ্ম পাওয়া যায় না।

৩। কেলাসিত : উত্তপ্ত গলিত অবস্থা থেকে তাপ বিকিরণ করে এ জাতীয় শিলা তৈরি হয় বলে ক্ষেত্রবিশেষে কেলাসিত হয় বা নির্দিষ্ট আকারে দানা বাঁধে।

৪। অপ্রবেশ্য : আগ্নেয় শিলার দানাগুলির মধ্যে কোনো ছিদ্র না থাকায় এই শিলায় পানি প্রবেশ করতে পারে না। তাই আগ্নেয় শিলা অপ্রবেশ্য।

৫। সুদৃঢ় ও সুসংহত : উত্তপ্ত গলিত অবস্থা থেকে তাপ বিকিরণ করে উৎপন্ন হয় বলে এ শিলা সুদৃঢ় ও সুসংহত।

৬। প্রাচীনতম : আগ্নেয় শিলার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এটি পৃথিবীর প্রাচীনতম শিলা। এই শিলা থেকে অন্যান্য শিলার উৎপত্তি হয়েছে।

৭। অপেক্ষাকৃত ভারী : আগ্নেয় শিলা অন্যান্য শিলার চেয়ে অপেক্ষাকৃত ভারী।

আগ্নেয় শিলার বুনট

আগ্নেয় শিলার প্রধান উপাদান ম্যাগমা। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের সময় উত্তপ্ত গলিত পদার্থ ভূ-অভ্যন্তরের গভীর তলদেশ থেকে (প্রায় ২০০ কি.মি.) ভূ-ত্বকের অভ্যন্তরেই জমাটবদ্ধ হয় যা ম্যাগমা নামে পরিচিত। এই ম্যাগমা যখন ভূ-ত্বকের গভীর থেকে ফাঁটল বরাবর সজোরে ভূ-পৃষ্ঠে উঠে এসে প্রবাহিত হয় তখন তাকে লাভা বলে। শিলার বুনট এই ম্যাগমা বা লাভার বৈশিষ্ট্য দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। শিলার বুনট বলতে এর গঠনকারী খনিজ উপাদানের আকার, আকৃতি, বিন্যাস বুঝায়। শিলার বুনট খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ শিলার উৎপত্তির সময় কী ধরনের পরিবেশ এবং প্রক্রিয়া কাজ করেছে তা বুনটের বৈশিষ্ট্যে প্রতিফলিত হয়। যেমন- ম্যাগমা খুব দ্রুত শীতল ও কেলাসিত হলে মিহি বুনটের শিলা গঠন করে। যেমন- রায়োলাইট। ম্যাগমা ধীরে ধীরে শীতল হলে মোটা বুনটের শিলা গঠন করে। যেমন- গ্রানাইট। আগ্নেয় শিলায় প্রধানত ৫ ধরনের বুনট দেখা যায়। যথা-

ক) কাঁচের মত দানাহীন, যেমন- গ্যাস।
খ) এফানিটিক, অতি সূক্ষ্ম দানা এবং খালি চোখে দেখা যায় না। যেমন- ব্যাসল্ট, অ্যান্ডেসাইট।
গ) ফেনারেটিক, ক্ষুদ্র দানা, কিন্তু খালি চোখে দেখা যায়। যেমন- গ্রানাইট।
ঘ) পরফাইটিক, দুই ধরনের দানা বিশিষ্ট (বড় ও ছোট)। যেমন- পরফাইটিক রায়োলাইট।
ঙ) পাইরোক্লাষ্টিক, বৃহৎ আকৃতির দানা বিশিষ্ট আগ্নেয় শিলা। যেমন- টাফ ও ছাই-ধুম্র।

আগ্নেয় শিলার শ্রেণিবিভাগ : আগ্নেয় শিলাকে দুইভাবে ভাগ করা যায়। যথা-

ক. উৎপত্তি ও গঠন অনুসারে এবং
খ. গঠনকারী খনিজ উপাদান অনুসারে ।

ক. উৎপত্তি ও গঠন অনুসারে : উৎপত্তি ও গঠন অনুসারে আগ্নেয় শিলাকে পুনরায় দুইভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা-

১. বহিঃজ বা নিঃসারী আগ্নেয় শিলা এবং
২. অন্তঃজ বা উদবেধী আগ্নেয় শিলা।

১. বহিঃজ বা নিঃসারী আগ্নেয় শিলা : পৃথিবীর অভ্যন্তরে গলিত পদার্থ জ্বালামুখ বা ফাঁটল দিয়ে বাইরে নির্গত হয়ে ক্রমে ঠান্ডা হয়ে যে শিলা গঠিত হয় তাই বহিঃজ আগ্নেয় শিলা। যেমন- ব্যাসল্ট, পিউমিস। ভূ-অভ্যন্তরের গলিত পদার্থগুলোর উৎক্ষিপ্ত হওয়ার উপর ভিত্তি করে এ শিলাকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১.১। বিস্ফোরক প্রকৃতির : অগ্ন্যুৎপাতের সময় কিছু পদার্থ প্রচন্ড বেগে বাইরে উৎক্ষিপ্ত হয়ে পতিত হয় এবং পরে জমাট বেঁধে শিলায় পরিণত হয়, একে বিস্ফোরক আগ্নেয় শিলা বলে।

১.২। শান্তপ্রকৃতির আগ্নেয় শিলাঃ অগ্ন্যুৎপাতের সময় অপেক্ষাকৃত ভারী গলিত পদার্থ ধীরে ধীরে ভূ-পৃষ্ঠে পতিত হয়ে শিলায় পরিণত হয়, একে শান্তআগ্নেয়শিলা বলে।

২. অন্তঃজ বা উদ্‌বেধী আগ্নেয় শিলা : কোনো কোনো সময় তরল ম্যাগমা ভূ-পৃষ্ঠে পৌঁছাতে না পেরে পৃথিবীর অভ্যন্তরেই জমাট বেঁধে যে শিলা গঠন করে তাকে অন্তঃজ শিলা বলে। অবস্থানের উপর ভিত্তি করে এ শিলাকে আবার দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

২.১। পাতালিকঃ ভূ-পৃষ্ঠের বহু নিচে অবস্থিত এই শিলা কেলাসিত। যেমন- গ্যাব্রো।

২.২। উপ-পাতালিকঃ ভূ-গর্ভস্থ ম্যাগমা উপরে আসার সময় ভূ-পৃষ্ঠের কাছাকাছি এসে জমাট বেঁধে এই শিলা গঠন করে। যেমন- ডলোরাইট।

খ. গঠনকারী খনিজ উপাদান অনুসারে আগ্নেয় শিলা : এ শিলাকে আবার চারভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১. ফেলাপসিকঃ অধিক পরিমাণে ফেলস্‌পার, সিলিকা মিশ্রিত থাকে। এরা হালকা বর্ণের হয়ে থাকে। যেমন- গ্রানাইট, রায়োলাইট।

২. মেফিক : এতে ম্যাগনেসিয়াম ও লোহার পরিমাণ বেশি থাকে। এরা ব্যাসল্ট জাতীয়। এসব ধূসর কালো বর্ণের হয়। যেমন- ব্যাসল্ট, গ্যাব্রো।

৩. উচ্চ মাত্রার মেফিক : অধিক মাত্রায় লোহা ও ম্যাগনেসিয়াম থাকে। প্রধান খনিজ হলো অলিভিন, পাইরাক্সিন। গাঢ় সবুজ থেকে কালো বর্ণের। যেমন- পেরিডোটাইট, কমাডোটাইট।

৪. ফেলসিক ও মেফিকের মাঝামাঝি : এই জাতীয় শিলা এ্যান্ডেসাইট ধরনের। প্রধান খনিজ হলো- হর্নবোন্ড, সোডিয়াম ফেলসপার। বর্ণ গাঢ়। যেমন- ডাইয়োরাইট, অ্যান্ডেসাইট।

শিক্ষার্থীর কাজ	আগ্নেয় শিলার প্রকারভেদ শ্রেণিবদ্ধ করুন।

সারসংক্ষেপ

ভূ-অভ্যন্তরে উত্তপ্ত ম্যাগমা শীতল ও কেলাসিত হয়ে আগ্নেয় শিলা গঠিত হয়। অগ্নিময় অবস্থা থেকে এই শিলার সৃষ্টি বলে এক আগ্নেয় শিলা বলা হয়। আগ্নেয় শিলা পৃথিবীর প্রথম পর্যায়ের শিলা বলে একে প্রাথমিক শিলাও বলা হয়। এ শিলায় কোনো স্তর নেই, তাই এই শিলার অপর নাম অস্তরীভূত শিলা। এই শিলায় কোনো জীবাশ্ম নেই। এই শিলা অপেক্ষাকৃত ভারী ও সুদৃঢ়। এই শিলা বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে। যেমন- বহিঃজ বা নিঃসারী আগ্নেয় শিলা ও অন্তঃজ বা উদ্‌বেধী আগ্নেয় শিলা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৪

সঠিক উত্তরের পাশ টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। আগ্নেয় শিলার প্রধান উপাদান কী?

(ক) ম্যাগমা (খ) খনিজ (গ) লবণ (ঘ) আগুন

২। কোনটি আগ্নেয় শিলার বৈশিষ্ট্য নয়–

(ক) সুদৃঢ় (খ) ভারী (গ) স্তরীভূত (ঘ) জীবাশ্মহীন

৩। শিলার বুনট বলতে কী বোঝায়?

(ক) আকার (খ) আকৃতি (গ) বিন্যাস (ঘ) সবগুলো

৪। কোনটি আদি শিলা?

(ক) আগ্নেয় (খ) পাললিক (গ) রূপান্তরিত (ঘ) খনিজ

৫। কোন শিলার উৎস ভূ-গর্ভের এত নিচে যে সেখানে কোন জীব ও প্রাণি থাকে না?

(ক) আগ্নেয় (খ) পাললিক (গ) রূপান্তরিত (ঘ) সবগুলো

পাঠ-২.৫ পাললিক শিলা (Sedimentary Rock)

উদ্দেশ্য

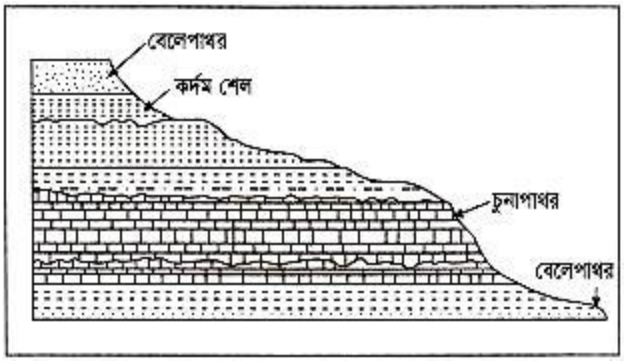
এই পাঠ শেষে আপনি–

- পাললিক শিলার সংজ্ঞা ও গুরুত্ব বলতে পারবেন এবং
- পাললিক শিলার উৎপত্তি, প্রকৃতি ও শ্রেণিবিভাগ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পাললিক শিলা

পলি সঞ্চিত হয়ে যে শিলা গঠন করে তাকে পাললিক শিলা বলে। এ শিলার পলি সাধারণত স্তরে স্তরে সঞ্চিত হয় (চিত্র ২.৫.১)। ভূ-পৃষ্ঠের প্রাথমিক শিলাগুলো যুগ যুগ ধরে রৌদ্র, বৃষ্টি, বায়ুপ্রবাহ সাগর তরঙ্গ প্রভৃতি নানা প্রকার ঘাত-প্রতিঘাত ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে এবং খন্ড-বিখন্ড ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে বালি, কাঁকর, কাঁদা প্রভৃতিতে পরিণত হয়। ক্ষয়িত শিলাকণা জলস্রোত, বায়ু এবং হিমবাহ দ্বারা পরিবাহিত হয়ে পলল বা তলানিরূপে কোনো নিম্নভূমি, হ্রদ এবং সাগরগর্ভে সঞ্চিত হতে থাকে। পরবর্তীতে ঐসব পদার্থ ভূ-গর্ভের উত্তাপে ও উপরের শিলাস্তরের চাপে জমাট বেঁধে কঠিন শিলায় পরিণত হয়। পাললিক শিলা ভূ-ত্বকের মোট আয়তনের শতকরা ৫ ভাগ। তবে মহাদেশীয় ভূ-ত্বকের উন্মুক্ত অংশের প্রায় ৭৫ ভাগই পাললিক শিলা দ্বারা গঠিত। পলল বা তলানি থেকে গঠিত হয় বলে এরূপ শিলাকে পাললিক শিলা বলে। স্তরে স্তরে সঞ্চিত হয় বলে একে স্তরীভূত শিলাও বলে। চুনাপাথর, বেলেপাথর, পাথুরিয়া কয়লা, সৈন্ধব লবণ, খড়িমাটি প্রভৃতি পাললিক শিলার উদাহরণ। ভূ-পৃষ্ঠের ক্রিয়ারত বিভিন্ন প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াই পাললিক শিলার উৎপত্তির জন্য কাজ করে। তবে, বিচূর্ণীভবন, পরিবহন, সঞ্চায়ন, সুদৃঢ়করণ ও জোড়ন ইত্যাদি প্রক্রিয়া সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রাখে।

পাললিক শিলা আমাদের শিল্প, সমাজ, সংস্কৃতির উন্নয়নে একটি নিয়ন্ত্রণকারী নিয়ামক হিসাবে কাজ করে। আদি মানব জাতি অস্তিত্বের জন্য পাললিক শিলা ব্যবহার করে বিভিন্ন ধরনের হাতিয়ার তৈরি করে। বর্তমান সভ্যতার অত্যন্তগুরুত্বপূর্ণ খনিজ পদার্থ পাললিক শিলা থেকে পাওয়া যায়। যেমন- কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস, পেট্রোলিয়াম ইত্যাদি। দালান-ইমারত, রাস্তা-ঘাট, ব্রীজ ইত্যাদি নির্মাণে ব্যবহৃত ইট, সিমেন্ট, বালু সবাই আসে শিলা থেকে। গ্যাস তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় কোয়ার্টজও এ শিলার অবদান।



চিত্র ২.৫.১: পাললিক শিলার স্তরায়ান

পাললিক শিলার বৈশিষ্ট্য

ক) স্তরীভূত : পাললিক শিলার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এরা স্তরীভূত অর্থাৎ খনিজ উপাদানসমূহ স্থুল বা সূক্ষ্ম স্তরে স্তরে বিন্যস্ত থাকে। এই স্তরগুলো সাধারণত আনুভূমিকভাবে সজ্জিত থাকে।

খ) জীবাশ্ম বিশিষ্ট : পাললিক শিলাস্তরে জীবাশ্মের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। যে সকল জীব এই শিলাঞ্চলে বাস করে তাদের মৃতদেহ কালক্রমে পলির নিচে চাপা পড়ে। এর ফলে এদের দেহের কঠিন অংশ প্রস্তরীভূত হয়ে জীবাশ্মে পরিণত হয়।

গ) অকেলাসিত : এটি কখনও উত্তপ্ত অবস্থা হতে শীতল হয়ে সৃষ্টি হয় না, বিধায় এই শিলা অকেলাসিত (Non-Crystalline) শিলা।

ঘ) তরঙ্গচিহ্ন : এটি তরঙ্গ চিহ্নযুক্ত শিলা। জলভাগের তলদেশে এই জাতীয় শিলার সৃষ্টি হয় বলে এর মধ্যে তরঙ্গচিহ্ন (Ripple Marks) বর্তমান থাকে। আবার বায়ু দ্বারা গঠিত পাললিক শিলায়ও বাতাসের দ্বারা তরঙ্গ চিহ্নের সৃষ্টি হয়।

ঙ) কোমলতা : আগ্নেয় শিলার ভগ্নাংশ সঞ্চিত হয়ে পাললিক শিলার সৃষ্টি হয় বলে এই শিলা অন্য শিলা থেকে অপেক্ষাকৃত কোমল থাকে।

পাললিক শিলার প্রকৃতি : পাললিক শিলার বিশেষ উপাদান পলি। এটি বিভিন্ন পর্যায়ের সংমিশ্রণে হতে পারে। যেমন-

১. অন্য শিলা বা খনিজের টুকরা। যেমন- নদীবাহিত নুড়ি।
২. রাসায়নিক অব:ক্ষেপন, যেমন- লবণ, চুন ইত্যাদি।
৩. জৈব পদার্থ, যেমন- প্রবাল, জলজ উদ্ভিদ ইত্যাদি।
৪. পাললিক শিলার পুরানো পলির বয়স নিম্নস্তরে বেশি এবং উপরের দিকের স্তরে কমতে থাকে।

পাললিক শিলার শ্রেণিবিভাগ : গঠনকারী উপাদানের আকৃতি, আকার এবং গঠনগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে পাললিক শিলাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। নিম্নে এগুলো বর্ণনা করা হলো।

১) **যান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় গঠিত পাললিক শিলা :** এই শিলা দুই ধরনের হতে পারে। যেমন- আগ্নেয় লাভাজাত এবং পূর্ববর্তী পাললিক বা রূপান্তরিত শিলার ক্ষয়িত চূর্ণ। এ জাতীয় পলিসমূহের আকার ও শিলা গঠনকারী খনিজে অনেক তারতম্য লক্ষ্য করা যায়। উদাহরণ- বেলেপাথর।

২) **রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় গঠিত পাললিক শিলা :** রাসায়নিক বিচূর্ণীভবন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট পলি অবেক্ষপ থেকে এ শিলার উদ্ভব হয়। এ প্রক্রিয়ায় পানিতে দ্রবীভূত অবস্থায় থাকা পদার্থসমূহ বিভিন্ন অজৈব প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সরাসরি তলায় পতিত হয় এবং অবশেষে জমাটবদ্ধ হয়। যেমন- কোথাও আটকে পড়া পানি বাষ্পীভূত হলে এর সাথে দ্রবীভূত লবণ থেকে যায়। এ ক্ষেত্রে বাষ্পায়ন একটি অজৈব প্রক্রিয়া এবং থিতানো লবণকে পলি হিসাবে ধরা হয়। উদাহরণ- চুনাপাথর।

৩) **জৈবিক উপায়ে গঠিত পাললিক শিলা :** উদ্ভিদ বা প্রাণির দেহাবশেষজাত পলি থেকে এ শিলার উৎপত্তি হয়। চুনাপাথর এ জাতীয় শিলা। জলজ পরিবেশে অতীতে যে গাছ ছিল তা ভূ-প্রাকৃতিক কারণে ভূ-অভ্যন্তরে চাপা পড়ে যায় এবং ওপরের পলির প্রচন্ড চাপে এর পরিবর্তন হয় এবং কালক্রমে কয়লায় পরিণত হয়। বাংলাদেশের জামালগঞ্জের কয়লা এবং গোপালগঞ্জের পিট কয়লা এ জাতীয় শিলার উদাহরণ।

শিক্ষার্থীর কাজ	পাললিক শিলার বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ করুন।

সারসংক্ষেপ

পলি সঞ্চিত হয়ে যে শিলা গঠন করে তাই পাললিক শিলা। পলল বা তলানি থেকে গঠিত হয় বলে এরূপ শিলাকে পাললিক শিলা বলে। এ শিলায় পলি সাধারণত স্তরে স্তরে সঞ্চিত হয়। পাললিক শিলা ভূ-ত্বকের মোট আয়তনের শতকরা ৫ ভাগ। তবে মহাদেশীয় ভূ-ত্বকের উন্মুক্ত অংশের প্রায় ৭৫ ভাগই পাললিক শিলায় গঠিত। স্তরীভূত, জীবাশ্ম বিশিষ্ট, অকেলাসিত, তরঙ্গচিহ্ন ও কোমলতা এর প্রধান বৈশিষ্ট্য। পাললিক শিলা তিন প্রকার। মানুষের দৈনন্দিন জীবনে পাললিক শিলা সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৫

সঠিক উত্তরের পাশ টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। পাললিক শিলার প্রধান বৈশিষ্ট্য কোনটি?
(ক) স্তরীভূত (খ) সুদৃঢ় (গ) জীবাশ্মহীন (ঘ) ভারী

২। পাললিক শিলা প্রধানত কত প্রকার?
(ক) ২ (খ) ৩ (গ) ৪ (ঘ) ৫

৩। পাললিক শিলা গঠনের পেছনে যে প্রক্রিয়া বেশি ভূমিকা রাখে?
(ক) বিচুর্ণীভবন (খ) পরিবহন (গ) সঞ্চায়ন (ঘ) সবগুলো

৪। কোন শিলা মানুষের দৈনন্দিন কাজে বেশি ব্যবহৃত হয়?
(ক) আগ্নেয় (খ) পাললিক (গ) রূপান্তরিত (ঘ) খনিজ

৫। কোন শিলায় জীব ও প্রাণির ধ্বংসাবশেষ থাকে ?
(ক) আগ্নেয় (খ) পাললিক (গ) রূপান্তরিত (ঘ) সবগুলো

পাঠ-২.৬ রূপান্তরিত শিলা (Metamorphic Rock)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- রূপান্তরিত শিলার সংজ্ঞা ও গুরুত্ব বলতে পারবেন এবং
- রূপান্তরিত শিলার গঠন প্রক্রিয়া ও শ্রেণিবিভাগ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

রূপান্তরিত শিলা

অনেক সময় প্রচন্ড তাপ ও চাপের জন্য রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় আগ্নেয় ও পাললিক শিলা নতুন এক ধরনের শিলায় রূপান্তরিত হয় এবং আগের তুলনায় কঠিন ও কেলাসিত হয়, এই শিলাকে রূপান্তরিত শিলা বলে (চিত্র ২.৬.১)। পূর্বের রূপ ও অবস্থার পরিবর্তন হয় বলে একে রূপান্তরিত শিলা বলে। রূপান্তরিত শিলা মূলত আগ্নেয় ও পাললিক শিলার পরিবর্তিত রূপ। যেমন- চুনাপাথর পরিবর্তিত হয়ে মার্বেল, বেলেপাথর পরিবর্তিত হয়ে কোয়ার্টজাইট, কাঁদা পরিবর্তিত হয়ে শ্লেট, গ্রানাইট পরিবর্তিত হয়ে নীসে, কয়লা পরিবর্তিত হয়ে গ্রাফাইটে পরিণত হয় ।

রূপান্তরিত শিলা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এটি আগ্নেয় শিলার সাথে একত্রে ভূ-ভাগের শতকরা প্রায় ৮৫ ভাগ গঠন করেছে। ভূ-ত্বাত্তিক সময় ব্যাপী মহাদেশের যে সঞ্চারণ এবং উত্থান-পতন হয়েছে এ শিলা থেকে তা জানা যায়। এ শিলা সূদুর অতীতকালের প্লেট সঞ্চারণের সাক্ষ্য বহন করে। রূপান্তরিত শিলা মার্বেল পাথর, শ্লেট, গার্নেট ইত্যাদির মত মূল্যবান খনিজ সম্পদ ধারণ করে।



চিত্র ২.৬.১: রূপান্তরিত শিলা

রূপান্তরিত শিলার রূপান্তর প্রক্রিয়া : শিলার রূপান্তরে তাপ, চাপ ও রাসায়নিক ক্রিয়া প্রধান ভূমিকা রাখে। নিম্নে এগুলো বর্ণনা করা হলে।

তাপ : শিলার তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে খনিজ এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পরিবর্তিত হতে শুরু করে। এ অবস্থায় শিলার ভিতর তরলের পরিমাণ বাড়তে থাকে এবং রাসায়নিক ক্রিয়াও ত্বরান্বিত হয়। এ অবস্থায় স্ফটিকের আদি গঠন কাঠামো ভেঙ্গে যায় এবং নতুন করে ভিন্নভাবে তা সংগঠিত হতে থাকে। এভাবেই নতুন শিলার সৃষ্টি হয়।

চাপ : ভূ-পৃষ্ঠস্থ শিলার ভারে এর তলদেশের শিলার চাপ বৃদ্ধি পায়। ফলে শিলার খনিজসমূহ সংকুচিত হয়। এ অবস্থায় খনিজ আবার কেলাসিত হয়ে আরো ঘন সন্নিবেসিত পরমাণু কাঠামো বিশিষ্ট নতুন শিলার সৃষ্টি করে।

রাসায়নিক ক্রিয়া : রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় নিম্ন তাপমাত্রাসম্পন্ন খনিজসমূহ গলতে থাকে। এ অবস্থায় পরমাণু সহজেই এ সমস্ত তরলের মাধ্যমে স্থানান্তরিত হতে পারে। যদিও শিলার বেশির ভাগ অংশই কঠিন অবস্থায় থাকে। অধিকতর তাপ ও চাপের কারণে খনিজের বহু পরমাণু কেলাস কাঠামো থেকে মুক্ত হয়ে খনিজ কণায় তরলের মাধ্যমে স্থানান্তরিত হয়ে পরমাণুর এ প্রক্রিয়া ক্রমাগত চলতে থাকে। এ অবস্থায় পুরানো কেলাস কাঠামো ভেঙ্গে নতুন কেলাস গঠন হয়। এভাবে রূপান্তরিত শিলা গঠিত হয়।

রূপান্তরিত শিলার বৈশিষ্ট্য

ক) **কেলাসিত :** তাপ ও চাপে আগ্নেয় ও পাললিক শিলার পরিবর্তন হয়ে রূপান্তরিত শিলায় পরিণত হয় বলে এটি সাধারণত কেলসিত।

খ) **কাঠিন্য :** তাপ ও চাপে আগ্নেয় এবং পাললিক শিলা পরিবর্তিত হয়ে রূপান্তরিত শিলায় পরিণত হয় বলে এই শিলার কাঠিন্য অন্যান্য শিলার চেয়ে বেশি। ফলে এটি অধিকতর শক্ত ও মজবুত।

গ) **জীবাশ্মহীন:** পাললিক শিলার জীবাশ্ম রূপান্তরের ফলে বিলুপ্ত হয়ে যায়। অন্যদিকে, আগ্নেয় শিলায় থেকে রূপান্তরিত হলেও জীবাশ্ম থাকে।

ঘ) **সমান্তরাল:** রূপান্তরিত শিলার উপাদানগুলো সাধারণত সমান্তরালভাবে অবস্থান করে বলে এটি সমান্তরাল শিলা। এই সমান্তরাল, আনুভূমিক, তির্যক বা বক্র যে কোনোভাবেই হতে পারে।

ঙ) **তরঙ্গচিত্র:** তাপ ও চাপে এ শিলা তৈরি হয় বলে তরঙ্গচিত্র থাকে না।

রূপান্তরিত শিলার প্রকারভেদ : রূপান্তরিত শিলাকে মূলত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

ক. উৎসের উপর ভিত্তি করে : এ শিলা আবার দুই প্রকার। যথা-

১. আগ্নেয় রূপান্তরিত শিলা : আগ্নেয় শিলা থেকে রূপান্তরিত হয়ে এই শিলায় পরিণত হলে একে আগ্নেয় রূপান্তরিত শিলা বলে। যেমন- গ্রানাইট থেকে নিস বা নাইস।

২. পাললিক রূপান্তরিত শিলা : পাললিক শিলা থেকে রূপান্তরিত হয়ে এই শিলায় পরিণত হয় বলে একে পাললিক রূপান্তরিত শিলা বলে। যেমন- বেলেপাথর থেকে কোয়ার্টজাইট।

খ. খনিজের বুনট ও গঠন উপাদানের উপর ভিত্তি করে : এ শিলা দুই প্রকার। যথা-

১. পত্রায়িত শিলা : আগ্নেয় ও পাললিক শিলা তাপ ও চাপে পরিবর্তিত হয়ে সমান্তরাল পাতার মত চ্যাপ্টা আকৃতি বিশিষ্ট হলে তাকে পত্রায়িত শিলা বলে। এ ধরনের শিলা খনিজ পাতার মত চ্যাপ্টা বুনট বিশিষ্ট। যেমন- সিস্ট, শ্লেট ইত্যাদি।

২. অপত্রায়িত শিলা : আগ্নেয় ও পাললিক শিলা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পরিবর্তিত হয়ে পাতার মত চ্যাপ্টা আকৃতি ধারণ না করলে তাকে অপত্রায়িত শিলা বলে। এ ধরনের শিলার খনিজের বিন্যাসে কোনো দল থাকে না। যেমন- মার্বেল, কোয়ার্টজাইট ইত্যাদি।

শিক্ষার্থীর কাজ	রূপান্তরিত শিলার বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করুন।

সারসংক্ষেপ

অনেক সময় প্রচন্ড তাপ ও চাপের জন্য রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় আগ্নেয় ও পাললিক শিলা নতুন এক ধরনের শিলায় রূপান্তরিত হয়, যা রূপান্তরিত শিলা নামে পরিচিত। রূপান্তরিত শিলা মূলত আগ্নেয় ও পাললিক শিলার পরিবর্তিত রূপ। যেমন- চুনাপাথর পরিবর্তিত হয়ে মার্বেল, বেলেপাথর পরিবর্তিত হয়ে কোয়ার্টজাইট ইত্যাদি। শিলার রূপান্তরে তাপ, চাপ ও রাসায়নিক ক্রিয়া প্রধান ভূমিকা রাখে। এ শিলা কঠিন ও জীবাশ্মহীন। রূপান্তরিত শিলা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এটি আগ্নেয় শিলার সাথে একত্রে ভূ-ভাগের শতকরা প্রায় ৮৫ ভাগ গঠন করেছে। ভূ-ত্বাত্তিক সময়ব্যাপী মহাদেশের যে সঞ্চারণ এবং উত্থান-পতন হয়েছে এ শিলা থেকে তা জানা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৬

সঠিক উত্তরের পাশ টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। শিলার পরিবর্তনে প্রধান ভূমিকা রাখে কোনটি?

(ক)চাপ (খ) তাপ (গ) রাসায়নিক ক্রিয়া (ঘ) সবগুলো

২। উৎস অনুসারে রূপান্তরিত শিলা কত প্রকার?

(ক) ২ (খ) ৩ (গ) ৪ (ঘ) ৫

৩। কোন শিলা থেকে রূপান্তরিত শিলা গঠিত হয়?

(ক) পাললিক (খ) আগ্নেয় (গ) কোনটিই নয় (ঘ) ক+খ

৪। কোন শিলা অতীতের প্লেট সঞ্চারণের স্বাক্ষর বহন করে?

(ক) আগ্নেয় (খ) পাললিক (গ) রূপান্তরিত (ঘ) খনিজ

পাঠ-২.৭ খনিজ ও এর শ্রেণিবিভাগ (Mineral and its Classification)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- খনিজের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- খনিজ ও শিলার পার্থক্য নির্ণয় করতে পারবেন।

খনিজ

কতগুলো মৌলিক উপাদান প্রাকৃতিক উপায়ে মিলিত হয়ে যে যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি করে তাকে খনিজ বলে। অর্থাৎ খনিজ হলো দুই বা ততোধিক মৌলের সমন্বয়। অন্যভাবে বলা যায়, ভূ-পৃষ্ঠে নানা প্রকার রাসায়নিক মৌলিক উপাদান একত্রে মিলিত হয়ে যে যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি করে, এগুলো খনিজ (চিত্র ২.৭.১)। তবে কিছু কিছু খনিজ একটি মাত্র মৌল দ্বারাও গঠিত হতে পারে। যেমন- হীরা, সোনা, তামা, রূপা, পারদ ও গন্ধক। এর মধ্যে হীরার কাঠিন্য (Hardness) সবচেয়ে বেশি এবং টেলক এর কাঠিন্য সর্বনিম্ন।



চিত্র ২.৭.১: বিভিন্ন প্রকার খনিজ

খনিজের বৈশিষ্ট্য

১। প্রত্যেকটি খনিজের রাসায়নিক সংকেত ও সংস্থিতি আছে। এটি খনিজের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য।
২। খনিজের সুনির্দিষ্ট ভৌত ধর্ম আছে।
৩। খনিজ প্রাকৃতিকভাবে গঠিত একটি অজৈব পদার্থ বিশেষ।
৪। প্রতিটি খনিজের সুনির্দিষ্ট গুণাবলী বিদ্যমান।
৫। খনিজের গায়ে দাগ বা আঁচড় প্রতিরোধক ক্ষমতা হলো কাঠিন্য। খনিজের বৈশিষ্ট্য নিরূপণে কাঠিন্যেও ভূমিকা রয়েছে।
৬। খনিজের আপেক্ষিক গুরুত্ব হলো খনিজের ওজনের তুলনায় একই আয়তনের পানির ওজনের অনুপাত। বেশিরভাগ খনিজের আপেক্ষিক গুরুত্বের মান ২.৫৬-৩.৩৭।
৭। খনিজের ফাটল খনিজ নির্ণয়ে খুবই উপযোগী। ফাটলের প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সূক্ষ্ম, অসম, দাঁতাল, বন্ধুর ইত্যাদি।
৮। খনিজের পৃষ্ঠ থেকে আলোর প্রতিফলন মাত্রার উপর ঔজ্জ্বল্য নির্ভর করে।
৯। খনিজ ভেঙ্গে সমভঙ্গুর, ভাঁজভঙ্গুর, সঙ্কাকৃতি ইত্যাদি ধরনের হয়ে থাকে।
১০। বেশিরভাগ খনিজের আকার স্ফটিকাকার।
১১। খনিজের স্বাদ ও গন্ধ আছে। সেটা লবণের মত অথবা রসুনের মত গন্ধযুক্ত হতে পারে।
১২। কেলাস রূপ হচ্ছে খনিজের বাহ্যিকরূপ, যা মূলত পরমাণুর ভিতরের সুবিন্যস্ত আয়োজন প্রকাশ করে।
১৩। খনিজ সহজেই রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে।
১৪। খনিজ সহজে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না।

খনিজের গুরুত্ব

১. মৃত্তিকার প্রাথমিক উৎস হচ্ছে খনিজ।
২. কৃষিকাজের জন্য প্রয়োজনীয় পলির উৎস।
৩. খনিজ পদার্থ মৃত্তিকার উর্বরতা ও পুষ্টির ভান্ডার হিসাবে কাজ করে।
৪. বায়ুমন্ডলের গ্যাসীয় পদার্থের প্রধান উৎস।

খনিজের প্রকারভেদঃ ভৌত অবস্থা বিবেচনা করে খনিজকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা:

১. কঠিন, ২. তরল এবং ৩. বায়বীয়।

শিলা ও খনিজের পার্থক্য : শিলা ও খনিজের পার্থক্য নিম্নে ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো-

ক্রম.	খনিজ	শিলা
১	দুই বা ততোধিত মৌলিক উপাদান প্রাকৃতিক উপায়ে একত্রিত হয়ে যে যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি হয় তাকে খনিজ বলে।	বিভিন্ন প্রকার খনিজ প্রাকৃতিক উপায়ে একত্রিত হয়ে যে পদার্থ গঠন করে তাকে শিলা বলে।
২	খনিজ বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদানে গঠিত।	বিভিন্ন খনিজের সমন্বয়ে শিলা গঠিত।
৩	অধিকাংশ খনিজ স্ফটিকাকার হয়।	শিলার নির্দিষ্ট কোনো আকার নাই।
৪	খনিজের রাসায়নিক সংকেত ও সংস্থিতি আছে।	শিলার রাসায়নিক সংকেত ও সংস্থিতি নাই
৫	খনিজ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে।	শিলা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে না।
৬	খনিজ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না।	শিলা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।
৭	খনিজের ধর্ম এর গঠনকারী মৌলের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।	শিলার ধর্ম এর গঠনকারী খনিজের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।
৮	খনিজের সুনির্দিষ্ট ভৌত গুণাবলী আছে।	শিলার গুণাবলীর মধ্যে সুনির্দিষ্টতা নাই।
৯	খনিজের অর্থনৈতিক গুরুত্ব অনেক।	শিলার অর্থনৈতিক গুরুত্ব তুলনামুলক কম।

শিক্ষার্থীর কাজ	পাঁচটি খনিজের নাম লিখুন।

সারসংক্ষেপ

ভূ-পৃষ্ঠ নানা প্রকার রাসায়নিক মৌলিক উপাদান একত্রে মিলিত হয়ে যে যৌগিক পদার্থের সৃষ্টি করে, তাকে খনিজ বলে। তবে কিছু কিছু খনিজ একটি মাত্র মৌল দ্বারাও গঠিত হতে পারে। যেমন- হীরা, সোনা , তামা, রূপা, পারদ ও গন্ধক। এর মধ্যে হীরার কাঠিন্য সবচেয়ে বেশি এবং টেলক এর কাঠিন্য সর্বনিম্ন। খনিজ তরল, কঠিন ও বায়বীয় এই তিন ধরনের হয়। শিলা ও খনিজের মূল পার্থক্য হচ্ছে খনিজ বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদানে গঠিত আর বিভিন্ন খনিজের সমন্বয়ে শিলা গঠিত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৭

সঠিক উত্তরের পাশ টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কতগুলো মৌলিক উপাদানের সমন্বিত যৌগিক রূপ হচ্ছে–

(ক) শিলা (খ) খনিজ (গ) পাথর (ঘ) সবগুলো

২। খনিজ কত প্রকার?

(ক) ২ (খ) ৩ (গ) ৪ (ঘ) ৫

৩। সবচেয়ে কঠিন খনিজ কোনটি?

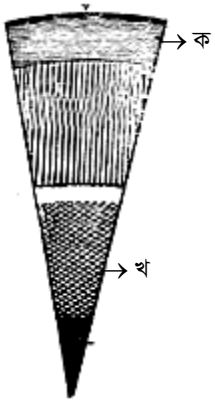
(ক) হীরা (খ) সোনা (গ) তামা (ঘ) রূপা

৪। সবচেয়ে কোমল খনিজ কোনটি?

(ক) তামা (খ) রূপা (গ) টেলক (ঘ) পারদ

চূড়ান্তমূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১



ক. উদ্দীপকে উল্লিখিত চিত্রটি দ্বারা কী প্রকাশ পায় ?
খ. পৃথিবীর ভূ-অভ্যন্তরকে কতটি স্তরে ভাগ করা যায় ও কী কী?
গ. ভূ-ত্বকের বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখুন।
ঘ. ক ও খ স্তর দুটি বর্ণনা করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-২

একদল শিক্ষার্থী বিভিন্ন প্রকার শিলা নিয়ে বৈশিষ্ট্য অনুসারে কয়েকটি ভাগে সাজিয়ে রাখলেন। তারপর তারা সেই শিলার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নাম দিলেন। এরপর নাম অনুযায়ী শিলার গঠন ও বৈশিষ্ট্য জানার জন্য তাদের টিউটরের কাছে গেলেন।

ক. শিলা কাকে বলে?
খ. শিলা প্রধানত কত প্রকার ও কী কী?
গ. বিভিন্ন প্রকার শিলার উদাহরণসহ বৈশিষ্ট্য লিখুন।
ঘ. আগ্নেয় ও পাললিক শিলার পার্থক্য নির্ণয় করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-৩

একদল শিক্ষার্থী শিলার বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করলেন। তারা দেখলেন কিছু শিলা অনেক কঠিন, কিছু শিলা কোমল ও স্তরীভূত আবার কিছু শিলা জীবাশ্মহীন। তাদের টিউটর বললেন শিলা ও খনিজ এর মধ্যে বিস্তর পার্থক্য আছে।

ক. আগ্নেয় শিলা কাকে বলে?
খ. পাললিক শিলার বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।
গ. রূপান্তরিত শিলার রূপান্তর প্রক্রিয়াগুলো আলোচনা করুন।
ঘ. শিলা ও খনিজের পার্থক্য বর্ণনা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.১ :	১. ক	২. ক			
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.২ :	১. ক	২.গ	৩. গ	৪.খ	৫.ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৩ :	১. গ	২. খ	৩. খ		
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৪ :	১. ক	২. গ	৩. ঘ	৪.ক	৫.ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৫ :	১. ক	২. খ	৩. ঘ	৪. খ	৫. খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৬ :	১. ঘ	২. ক	৩. ঘ	৪. গ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ২.৭ :	১. খ	২. খ	৩. ক	৪. গ	

ইউনিট
৩

পৃথিবীর ভূমিরূপ
(Landforms of Earth)

ভূমিকা

পৃথিবী পৃষ্ঠে সুউচ্চ পাহাড়, পর্বত, নদ-নদী, সমভূমি, মালভূমি ও মরুভূমিসহ বিভিন্ন ধরনের ভূমিরূপ দেখা যায়। কালের বিবর্তনে এসব ভূমিরূপ প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া ও মনুষ্যজনিত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে পরিবর্তিত হচ্ছে। শুধু ভূ-পৃষ্ঠে এ রূপ দেখা যায় তা নয়, সমুদ্রের তলদেশেও স্থলভাগের মতো খুবই বৈচিত্র্যময়। এই ইউনিটে আমরা পৃথিবীর প্রধান ভূমিরূপসমূহ যেমন- ভাঁজ ও চ্যুতি, সমভূমি, মালভূমি, পাহাড় ও পর্বত, মরুভূমি, বাংলাদেশের ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জানবো। এছাড়া সমোন্নতি রেখার সাহায্যে কীভাবে বিভিন্ন ভূমিরূপ প্রদর্শন করা যায় তা শিখব।



ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ ৩.১ : পৃথিবীর প্রধান ভূমিরূপসমূহ
পাঠ ৩.২ : ভাঁজ ও চ্যুতি
পাঠ ৩.৩ : সমভূমি
পাঠ ৩.৪ : মালভূমি
পাঠ ৩.৫ : পাহাড় ও পর্বত
পাঠ ৩.৬ : মরুভূমি
পাঠ ৩.৭ : বাংলাদেশের ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য
পাঠ ৩.৮ : ব্যবহারিক : সমোন্নিত রেখার সাহায্যে বিভিন্ন ভূমিরূপ প্রদর্শন

পাঠ-৩.১ পৃথিবীর প্রধান ভূমিরূপসমূহ (Main Landforms of the Earth)

উদ্দেশ্য

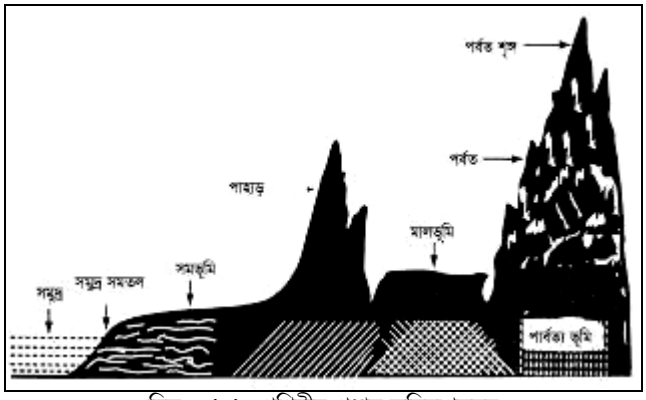
এই পাঠ শেষে আপনি–

- পৃথিবীর প্রধান ভূমিরূপসমূহ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

পৃথিবীর প্রধান ভূমিরূপসমূহ

ভূ-পৃষ্ঠের গঠন সর্বত্র একরকম নয়। স্থলভাগের কোথাও সুউচ্চ পাহাড় ও পর্বত, কোথাও মালভূমি, কোথাওবা সুবিস্তৃত সমভূমি রয়েছে (চিত্র ৩.১.১)। সময়ের সাথে সাথে বিভিন্ন প্রাকৃতিক ক্রিয়ার ফলে ভূমিরূপের পরিবর্তন হয়। ভূমিরূপের এই পরিবর্তন ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে এবং কখনো একাধিক পদ্ধতিতে সমন্বিতভাবে হয়েছে এবং পরিবর্তন ক্রিয়া চলছে দ্রুত, ধীরে ধীরে, আকস্মিকভাবে।

সাধারণভাবে বৃহত্তর ভূমিরূপ হতে পর্যায়ক্রমে ক্ষুদ্রতর ভূমিরূপ সৃষ্টি হয়েছে। পৃথিবীর ভূ-ভাগের শতকরা ৫৮ ভাগ এলাকা সমভূমি, ১৮ ভাগ পার্বত্যময় এবং অবশিষ্ট ২৪ ভাগ মালভূমি ও পাহাড় দ্বারা বিস্তৃত। ভূমিরূপের পর্যায়ক্রমিক সৃষ্টি ও আকৃতির উপর ভিত্তি করে ভূগোলবিদগণ সকল ভূমিরূপকে প্রধান তিনটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন। যথা-



চিত্র ৩.১.১: পৃথিবীর প্রধান ভূমিরূপসমূহ

ক) প্রথম পর্যায়ের ভূমিরূপ,
খ) দ্বিতীয় পর্যায়ের ভূমিরূপ এবং
গ) তৃতীয় পর্যায়ের ভূমিরূপ।

ক) প্রথম পর্যায়ের ভূমিরূপ : ভূ-ত্বক সৃষ্টির সর্বপ্রথম পর্যায়ে মহাদেশ ও মহাসাগরগুলির সৃষ্টি হয়েছে। আদি উত্তপ্ত তরল পদার্থ পৃথিবীর উপরিভাগে শীতল হয়ে সংকুচিত হলে কোনো স্থান উঁচু আবার কোনো স্থান নিচু হয়। উপরের অংশগুলি নিয়ে মহাদেশীয় ভূ-ভাগ এবং নিচু অংশগুলো নিয়ে মহাসাগরীয় অঞ্চল গঠন করে। ভূ-ত্বক সৃষ্টির শুরুতেই এ প্রধান দুইটি ভূমিরূপ সৃষ্টি হয় বলে এদেরকে প্রথম পর্যায়ের ভূমিরূপ বলা হয়। পৃথিবীর জলবায়ু তথা সার্বিকভাবে সমগ্র উদ্ভিদ ও প্রাণিজগতের জন্য মহাদেশ ও মহাসাগরের আকার, আয়তন এবং অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ।

খ) দ্বিতীয় পর্যায়ের ভূমিরূপ : মহাদেশীয় ভূ-ভাগ ও মহাসাগরের তলদেশে পরবর্তী পর্যায়ে যে প্রধান ভূমিরূপ সৃষ্টি হয়েছে তাকে দ্বিতীয় পর্যায়ের ভূমিরূপ বলে। যেমন- পর্বত, মালভূমি, সমভূমি, মহীসোপান, মহীঢাল, গভীর সমুদ্রের সমভূমি এবং গভীর সমুদ্রখাত। ভূ-পৃষ্ঠের বন্ধুরতা বলতে মূলত দ্বিতীয় পর্যায়ের ভূমিরূপকেই বুঝায়।

গ) তৃতীয় পর্যায়ের ভূমিরূপ : ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগে ক্ষয় ও রূপান্তরের ফলে যে সকল ভূমিরূপের সৃষ্টি হয় তাকে তৃতীয় পর্যায়ের ভূমিরূপ বলে। তৃতীয় পর্যায়ের যে সকল ভূমিরূপ রয়েছে সেগুলো ভূ-পৃষ্ঠে বৈচিত্র্য এনেছে। এইরূপ ভূমিরূপ বিভিন্ন ধরনের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক প্রক্রিয়া দ্বারা সৃষ্টি হয়। যেমন- নদী, হিমবাহ, বায়ুপ্রবাহ, সমুদ্রতরঙ্গ, ভূ-গর্ভস্থ জলধারা ও জৈবিক প্রক্রিয়া দ্বারা ভূ-পৃষ্ঠ অনবরত ক্ষয় সাধিত হয় এবং ক্ষয়প্রাপ্ত শিলাগুলি অন্যত্র পরিবাহিত ও অবক্ষেপিত হয়। এভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে উপত্যকা, গিরিখাত, সার্ক, ইয়ারডাং, সমুদ্রখাড়ি প্রভৃতি ভূমিরূপ সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে অবক্ষেপিত হয়ে ব-দ্বীপ, প্লাবন সমভূমি, গ্রাবরেখা, ড্রামলিন, বালিয়াড়ি, চর, প্রবালদ্বীপসহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূমিরূপের সৃষ্টি হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	পৃথিবীর প্রধান ভূমিরূপের চিত্রটি অনুশীলন করুন।

সারসংক্ষেপ

ভূ-পৃষ্ঠের গঠন সর্বত্র একরকম নয়। স্থলভাগের কোথাও সুউচ্চ পর্বত, কোথাও মালভূমি, কোথাও পাহাড়, কোথাওবা হাজার হাজার বর্গ কি.মি. বিস্তৃত সমভূমি রয়েছে। পৃথিবীর শতকরা ৫৮ ভাগ এলাকা সমভূমি, ১৮ ভাগ পার্বত্যময়, বাকি ২৪ ভাগ মালভূমি ও পাহাড় দ্বারা বিস্তৃত। স্থলভাগের ভূমিরূপের উদাহরণ হলো পর্বত, মালভূমি ও সমভূমি এবং মহাসাগরগুলির তলদেশকে ভূমিরূপের উদাহরণ হলো মহীসোপান, মহীঢাল, গভীর সমুদ্রের সমভূমি ও গভীর সমুদ্রখাত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। পৃথিবীর ভূমিরূপ প্রধানত কত প্রকার?

(ক) দুই (খ) তিন

(গ) চার (ঘ) পাঁচ

২। নিচের কোনটি দ্বিতীয় পর্যায়ের ভূমিরূপ?

(ক) মহীসোপান (খ) ড্রামলিন

(গ) ব-দ্বীপ (ঘ) গিরিখাত

৩। পৃথিবীর শতকরা কত ভাগ এলাকা পার্বত্যময়?

(ক) ১৮% (খ) ২৪%

(গ) ৫৮% (ঘ) ৫০%

পাঠ-৩.২ ভাঁজ ও চ্যুতি (Fold and Fault)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ভাঁজ ও চ্যুতি কী তা জানতে পারবেন এবং
- ভাঁজ ও চ্যুতির প্রকারভেদ বলতে পারবেন।

ভাঁজ

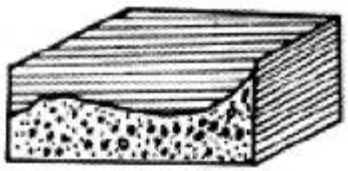
পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ অত্যন্ত উত্তপ্ত। ফলে প্রতিনিয়ত তাপ বিকিরণ করে শীতল হয়ে সঙ্কুচিত হচ্ছে। এতে বৃহত্তম ভূ-ত্বক ক্ষুদ্রতম অভ্যন্তরের সাথে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে না পেরে ফলের খোসার মতো কুঞ্চিত হয়ে যায়। এতে ভূ-ত্বকের নিচের অংশে চাপের পার্থক্য হয়ে ভূ-গর্ভে প্রবল আলোড়ন ঘটে। এ ভূ-আলোড়নের ফলে কোনো স্থান উপরে উঠে যায় আবার কোনো স্থান নিচু হয়ে আঁকাবাঁকা হয়। এরূপ আঁকাবাঁকা অংশকে ভাঁজ বলে। ভাঁজ এক ইঞ্চি থেকে কয়েক মাইল পর্যন্ত হতে পারে।

ভাঁজের প্রকারভেদ : আকৃতি ও অবস্থানের উপর ভিত্তি করে ভাঁজ কয়েক প্রকার হতে পারে। নিম্নে বিভিন্ন প্রকার ভাঁজ বর্ণনা করা হলো :

১. **খোলা বা সরল ভাঁজ (Open Fold) :** সঙ্কোচনের গতি যদি শুধুমাত্র একদিক থেকে চাপ দেয় তাহলে ভূ-ত্বক ভাঁজ হয়ে অতি সাধারণ চূড়া ও খাদের সৃষ্টি হয়। এর ফলে একটি অগ্রবর্তী কোণ ও অবনমিত ভূ–ভাগ সৃষ্টি হয়, একে খোলা বা সরল ভাঁজ বলে (চিত্র ৩.২.১)।

২. **সুষম বা প্রতিসম ভাঁজ (Systemetrical Fold) :** যে ভাঁজের দুই পার্শ্বস্থ বাহু সমান কোণে দুই দিকে হেলে থাকে, তাকে সুষম ভাঁজ বলে। একে প্রতিসম ভাঁজও বলা হয় (চিত্র : ৩.২.২)।

৩. **বিষম বা অপ্রতিসম ভাঁজ (Asymmetrical Fold) :** কোনো ভাঁজের এক পার্শ্বস্থ বাহু যদি অপর পার্শ্বস্থ বাহু অপেক্ষা অধিক খাড়া হয় তখন তাকে বিষম ভাঁজ বলে। এটি অপ্রতিসম ভাঁজ নামেও পরিচিত (চিত্র ৩.২.৩)। সুইজারল্যান্ডের জুরা পর্বতে এ ধরনের ভাঁজ দেখা যায়।



চিত্র ৩.২.১: খোলা ভাঁজ



চিত্র ৩.২.২: সুষম ভাঁজ



চিত্র ৩.২.৩: বিষম ভাঁজ

৪. **হেলান ভাঁজ (Isoclinal Fold) :** কোনো ভাঁজের চাপ অধিক হলে ভাঁজগুলো পরস্পর গায়ে গায়ে লেগে যায় এবং যে পার্শ্বে চাপের পরিমাণ কম সেদিকে ভাঁজগুলো হেলে যায়। এ ধরনের ভাঁজগুলোই হেলান ভাঁজ (চিত্র ৩.২.৪)।

৫. **শায়িত বা আনুভূমিক ভাঁজ (Recumbent Fold) :** একটি ভাঁজের উপর অন্য একটি ভাঁজ শায়িত বা আনুভূমিক অবস্থায় থাকলে তাকে শায়িত বা আনুভূমিক ভাঁজ বলে (চিত্র ৩.২.৫)। সাধারণত আনুভূমিক চাপ প্রবল হলে শিলাস্তর অধিক সংকুচিত হয়ে একটি ভাঁজের উপর আরেকটি ভাঁজ উঠে গিয়ে এ ধরনের ভাঁজ তৈরি করে।

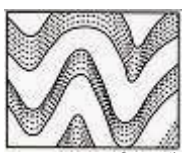
৬. **সান্নিধ্য ভাঁজ (Closed Fold) :** অনেকগুলো ঊর্ধ্ব ভাঁজ যখন পাশাপাশি অবস্থান করে তখন তাকে সান্নিধ্য ভাঁজ বলে (চিত্র : ৩.২.৬)।



চিত্র ৩.২.৪: হেলান ভাঁজ



চিত্র ৩.২.৫: শায়িত বা আনুভূমিক ভাঁজ



চিত্র ৩.২.৬: সান্নিধ্য ভাঁজ

৭. **উপভাঁজ (Fan Fold) :** যখন একটি বৃহত্তর ভাঁজের উপর অসংখ্য ক্ষুদ্রাকৃতির ভাঁজ থাকে তখন তাকে উপভাঁজ বলে। আল্পস্ পর্বতে এ ধরনের উপভাঁজ রয়েছে।

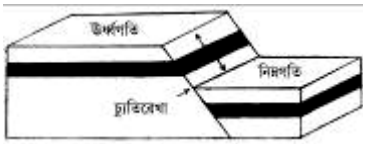
৮. **উদ্‌ঘট্র ভাঁজ (Overthrust Fold) :** কোনো শায়িত ভাঁজের উপর আনুভূমিক চাপ অধিক হলে ঐ ভাঁজটির মধ্যভাগের শিলাসমূহ ফেটে গিয়ে একটি অংশ অপর অংশ থেকে বেশ কিছু দূরে স্থানান্তরিত হয়। এ ধরনের ভাঁজকে উদ্‌ঘট্ট ভাঁজ বলে।

৯. **পেরিক্লাইন ভাঁজ (Pericline Fold):** এ ভাঁজ অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকৃতির ভাঁজ। কোনো বড় ভাঁজ যদি তার আক্ষিক রেখা বরাবর কোনো কারণে নিচে অবনমিত হয়ে যে ভাঁজের সৃষ্টি হয় তাকে পেরিক্লাইন ভাঁজ বলে।

১০. **এন্টিক্লাইনোরিয়াম ও সিনক্লাইনোরিয়াম (Anticlinorium and Synclinorium) :** বড় আকারের উর্ধ্বভাঁজ ও অধঃভাঁজের উপরও কখনো কখনো ছোট ছোট ঊর্ধ্ব ও অধঃভাঁজ থাকতে পারে। ঊর্ধ্বভাঁজের উপর অবস্থিত এই ভাঁজকে এন্টিক্লাইনোরিয়াম এবং অধঃভাঁজের উপর অবস্থিত ভাঁজকে সিনক্লাইনোরিয়াম বলে।

চ্যুতি (Fault)

ভূ-আলোড়নের ফলে ভূ-পৃষ্ঠে সৃষ্ট ফাঁটলের একদিকের অংশ স্থানচ্যুত হয়ে ভূ-গর্ভে বসে যায় আবার কিছু অংশ উপরে উত্থিত হয়। এই ধরনের ভূমিরূপকে চ্যুতি বলে (চিত্র ৩.২.৭)। চ্যুতি যে কোনো প্রকার শিলাতে সৃষ্টি হতে পারে। তবে পাললিক শিলায় চ্যুতির পরিমাণ বেশি। চ্যুতির পরিমাণ কয়েক সেন্টিমিটার থেকে কয়েকশ মিটার পর্যন্ত হতে পারে।



চিত্র ৩.২.৭: চ্যুতি (চ্যুতি রেখা বরাবর শিলা ঊর্ধ্ব বা নিম্নগতি

চ্যুতির কারণ

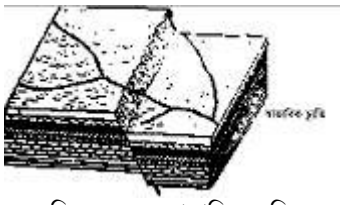
ভূ-পৃষ্ঠের যে কোনো স্থান আনুভূমিক সঙ্কোচন বা সম্প্রসারিত হলে চ্যুতির সৃষ্টি হতে পারে। আবার কোনো শিলাস্তরে অধিক সঙ্কোচনের প্রভাব পড়লে অপ্রতিসম্য ভাঁজ বা আনুভূমিক ভাঁজের সৃষ্টি হয়ে শেষ পর্যন্ত ফাটল ও চ্যুতির সৃষ্টি হতে পারে। এইভাবে একেকটি ভাঁজ একেকটি চ্যুতিতে রূপান্তরিত হতে পারে।

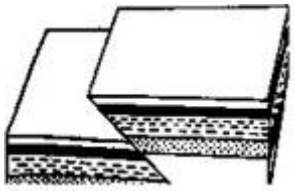
প্রত্যেক চ্যুতির দুইটি করে পার্শ্ব থাকে। যথা– উত্থিত পার্শ্ব এবং অবনত পার্শ্ব। যে সমতল হতে চ্যুতির পার্শ্ব উত্থিত বা অবনত হয় অর্থাৎ চ্যুতির সৃষ্টি হয় তাকে চ্যুতিতল (Fault Plane) বলে। চ্যুতিতল সাধারণত ঢালু হয় তবে তা খাড়াও হতে পারে। চ্যুতির উত্থিত পার্শ্বের ঢালকে চ্যুতিঢাল (Fault Scarp) বলে। উত্থিত পার্শ্বের উপরের নরম শিলাস্তর ক্ষয়সাধনের ফলে অপসারিত হলে নিম্নের কঠিন শিলা দৃষ্টিগোচর হয় এবং চ্যুতিঢালের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়। একে চ্যুতিরেখা ঢাল (Fault Line Scarp) বলে।

চ্যুতির শ্রেণিবিভাগ (Type of Faults) : গঠন, আকৃতি ও অবস্থান অনুযায়ী বিভিন্ন প্রকার চ্যুতি রয়েছে। নিম্নে উল্লেখযোগ্য কিছু চ্যুতির বর্ণনা দেয়া হলো–

১. **স্বাভাবিক চ্যুতি (Normal Fault) :** কোনো চ্যুতির নিম্ন দেয়াল উপরে উত্থিত হলে বা ঝুলন্ত দেয়ালের নিম্নে অবতরণ করলে তাকে স্বাভাবিক চ্যুতি বলে। স্বাভাবিক চ্যুতির চ্যুতিতল অবনত পার্শ্বেও ঢালু থাকে (চিত্র ৩.২.৮)।

২. **বিপরীত চ্যুতি (Reverse Fault) :** বিপরীত চ্যুতি স্বাভাবিক চ্যুতির ঠিক উল্টো। কারণ এর ক্ষেত্রে ঝুলন্ত দেয়াল উপরে উত্থিত হয় এবং নিম্ন দেয়াল নিম্নে অবতরণ করে। ঝুলন্ত দেয়াল অবনত পার্শ্বের উপর বেশি হেলে থাকে বলে তাকে বিপরীত চ্যুতি বলে (চিত্র ৩.২.৯)।


চিত্র ৩.২.৮: স্বাভাবিক চ্যুতি


চিত্র ৩.২.৯: বিপরীত চ্যুতি

৩. **শাখায়িত চ্যুতি (Branching Fault) :** একটি প্রধান চ্যুতিকে কেন্দ্র করে দুই বা ততোধিত অপ্রধান চ্যুতির সৃষ্টি হলে তাকে শাখায়িত চ্যুতি বলে।

৪. **ধাপ চ্যুতি (Step Fault) :** একই চ্যুতিতলে অবনত পার্শ্বে এর সমান্তরালে পরপর কয়েকটি চ্যুতির সৃষ্টি হলে তাতে ধাপ বিশিষ্ট ভূ-প্রকৃতির উদ্ভব হয়। এই চ্যুতি সমষ্টিকে ধাপচ্যুতি বলে(চিত্র ৩.২.১০)।

৫. **স্ট্রাইক চ্যুতি (Strike Fault) :** যে চ্যুতি কোনো ঢালুর স্ট্রাইকের সাথে সমান্তরালভাবে অবস্থান করে তাকে স্ট্রাইক চ্যুতি বলে।

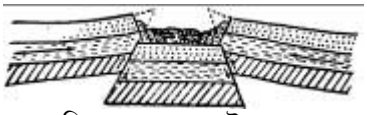

চিত্র ৩.২.১০: ধাপ চ্যুতি

৬. **ডিপ চ্যুতি (Deep Faults) :** অবস্থানের দিক থেকে ডিপ চ্যুতি স্ট্রাইক চ্যুতির বিপরীত। ডিপ চ্যুতি স্ট্রাইকের সাথে সমকোণে অবস্থান করে। কাজেই স্ট্রাইকের অবস্থানের উপর এর অবস্থান নির্ভর করে।

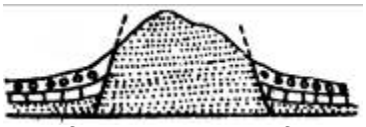
৭. **তির্যক চ্যুতি :** একই সাথে উল্লম্ব ও আনুভূমিকভাবে ভূমি স্থানান্তরিত হলে যে চ্যুতির সৃষ্টি হয়, তাকে তির্যক চ্যুতি বলে। এ চ্যুতি একই সাথে ডিপ ও স্ট্রাইককে ছেদ করে।

৮. **কবজা চ্যুতি :** ভূ-আন্দোলনের প্রভাবে কোনো ভূ-খন্ড স্ট্রাইক বরাবর একটি নির্দিষ্ট স্থান পর্যন্ত উপরে উত্থিত হয়ে আবার নিম্নে অবনমিত হয়ে থেকে গেলে কবজা চ্যুতি বলে।

৯. স্রস্ত **উপত্যকা** : দুইটি স্বাভাবিক চ্যুতির মাঝখানে কোনো ভূ-ভাগ অবনমিত হয়ে যে নিম্নভূমির সৃষ্টি করে তাকে স্রস্ত উপত্যকা বলে (চিত্র ৩.২.১১)। স্রস্তউপত্যকার উভয় দিকের চ্যুতিতল দেয়ালের মত দেখায়। এর অপর নাম গ্রাবন। জার্মানীর রাইন উপত্যকা, ইসরাইলের মরুসাগর প্রভৃতি স্রস্ত উপত্যকার উদাহরণ।


চিত্র ৩.২.১১: স্রস্ত উপত্যকা

১০. স্রস্ত **মালভূমি** : স্রস্ত উপত্যকার বিপরীত ভূ-প্রকৃতি স্রস্ত মালভূমি। কমপক্ষে দুইদিকে চ্যুতিতল বিশিষ্ট কোন ভূ-খন্ড উপরে উত্থিত হলে তাকে স্রস্ত মালভূমি বলে (চিত্র ৩.২.১২)।


চিত্র ৩.২.১২: স্রস্ত মালভূমি

শিক্ষার্থীর কাজ	ভাঁজ ও চ্যুতি কীভাবে সৃষ্টি হয় ব্যাখ্যা করুন।

সারসংক্ষেপ

শিলাস্তরের আনুভূমিক সংকোচনের ফলে ভাঁজের সৃষ্টি হয়। কোনো কারণে ভূ-পৃষ্ঠে আনুভূমিক চাপ পড়লে পাললিক শিলাস্তর অতি সহজেই প্রভাবিত হয়। উভয় দিক থেকে অথবা যে কোনো একদিক থেকে পার্শ্বচাপ পড়লে সম্মুখের শিলাস্তর আঁকাবাঁকা ভঙ্গিল আকার ধারণ করে। এইরূপ আনুভূমিক চাপের ফলে শিলাস্তরের বিভিন্ন স্থানে উঁচু-নিচু হয়ে যায়, এই উঁচু-নিচু অবস্থাকে ভাঁজ বলে। বিভিন্ন প্রকার ভূ-আন্দোলনের প্রভাবে ভূ-পৃষ্ঠের কোনো কোনো ফাটল বরাবর অথবা ফাটল হতে একটি শিলাস্তরের তুলনায় অন্য শিলাস্তরের স্থান চ্যুতি হলে তাকে চ্যুতি বলে। চাপই মূলত ভাঁজ ও চ্যুতির কারণ। ভাঁজ ও চ্যুতি বিভিন্ন প্রকার হয়ে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। শিলাস্তরের আনুভূমিক সংকোচনের ফলে সৃষ্টি হয়–
i. ভাঁজের ii. চ্যুতির iii. মালভূমি
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২। দুইটি স্বাভাবিক চ্যুতির মাঝখানে কোনো ভূ-ভাগ অবনমিত হয়ে যে নিম্ন ভূমির সৃষ্টি করে তাকে কী বলে?
(ক) স্রস্ত মালভূমি (খ) স্রস্ত উপত্যকা (গ) ভ্রষ্ট উপত্যকা (ঘ) কোনটিই নয়

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।
জনৈক ভূগোলবিদ পৃথিবী পরিভ্রমনে বের হয়ে বিভিন্ন প্রকার ভাঁজ ও চ্যুতি লক্ষ্য করলেন। ফিরে আসার পর তিনি তার শিক্ষার্থীদেরকে ভাঁজ ও চ্যুতি সম্পর্কে বিশদভাবে বুঝিয়ে বলেন।

৩। যখন সকল ভাঁজের অবনমন উভয় দিকে সমভাবে ঢালু হয়, তাকে কী ধরনের ভাঁজ বলে?
(ক) সমকাত ভাঁজ (খ) প্রতিসম ভাঁজ (গ) আনুভূমিক ভাঁজ (ঘ) কোনটিই নয়

৪। একই চ্যুতিতলে অবনত পার্শ্বে এর সমান্তরালে কয়েকটি চ্যুতির সৃষ্টি হলে, তাকে কী ধরনের চ্যুতি বলে?
(ক) ধাপ চ্যুতি (খ) স্ট্রাইক চ্যুতি (গ) ডিক চ্যুতি (ঘ) কোনটিই নয়

পাঠ-৩.৩ সমভূমি (Plain)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- সমভূমির সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য বলতে পারবেন এবং
- বিভিন্ন প্রকার সমভূমি বর্ণনা করতে পারবেন।

সমভূমি

সমুদ্র সমতল থেকে প্রায় সম উচ্চতায় সুবিস্তৃত স্থলভাগকে সমভূমি বলা হয়। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে কয়েকশ মিটার উঁচুতেও সমভূমি গঠিত হতে পারে। সমভূমি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে কয়েকশত ফুট পর্যন্ত উচ্চতায় অবস্থিত হতে পারে। সমভূমিতে মৃদু ঢাল বিশিষ্ট ভূমি, ছোট ছোট টিলা, পাহাড় এবং নদী উপত্যকার উপস্থিতিও লক্ষ্য করা যায়। পৃথিবীর মোট স্থলভাগের প্রায় অর্ধেক সমভূমি। মানুষের আবাস এবং অর্থনৈতিক কামকান্ড সমভূমিতে সংঘটিত হয়। সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে এশিয়া, ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকা মহাদেশে সমভূমির পরিমাণ সবচেয়ে বেশি আফ্রিকা মহাদেশে সমভূমির পরিমাণ সবচেয়ে কম। ইউরেশিয়ার উত্তরাংশ জুড়ে পৃথিবীর বৃহত্তম সমভূমি অবস্থিত। ভূ-তাত্ত্বিক গঠনের দিক দিয়ে সমভূমিগুলো যথেষ্ট বৈচিত্র্যপূর্ণ।

সমভূমির বৈশিষ্ট্য

সমভূমিতে সাধারণত কোনো উচ্চভূমি, নিম্নভূমি বা খাড়া ঢাল থাকে না। তবে সামান্য উঁচু-নিচু বা বন্ধুর হতে পারে। সমভূমিসমূহ সাধারণত মহাদেশের সীমান্তে, মহাসাগরের তীরে অথবা মহাদেশীয় ভূ-ভাগের অভ্যন্তরে হতে পারে।

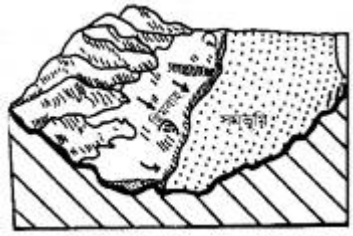
সমভূমির শ্রেণিবিভাগ (Classification of Plains) : অবস্থান ও গঠনপ্রণালির ওপর ভিত্তি করে পৃথিবীর সমভূমিকে নিম্নলিখিত ভাগে বিভক্ত করা যায়।

১) ক্ষয়জাত সমভূমি : বহু উচ্চভূমি দীর্ঘদিন ধরে নানা প্রকার প্রাকৃতিক শক্তি যেমন- বায়ুপ্রবাহ, সৌরতাপ, বৃষ্টিপাত, পানিস্রোত, হিমবাহ প্রভৃতি দ্বারা ক্ষয় হয়ে ধীরে ধীরে অপেক্ষাকৃত নিম্নভূমিতে পরিণত হয়। এ জাতীয় সমভূমিকে ক্ষয়জাত সমভূমি বলে (চিত্র ৩.৩.১)। ইউরোপের ফিনল্যান্ড ও উত্তর আমেরিকার হাডসন উপসাগর তীরবর্তী সমভূমি ক্ষয়জাত সমভূমির উদাহরণ।

২) হৈমবাহিক সমভূমি : উচ্চ পর্বতগাত্র হতে বরফের প্রবাহ বা হিমবাহ নিচের দিকে নেমে আসার সময় প্রবল ঘর্ষণে ভূমি ক্ষয় হয়ে সমভূমিতে রূপান্তরিত হয়। আবার হিমবাহের সাথে যে সকল শিলা, কাঁকর ও নানাবিধ প্রস্তরখন্ড নিচে নেমে আসে সেগুলো সঞ্চিত হতে হতে অসমান ভূমিকে সমভূমিতে পরিণত করে। এভাবে হিমবাহের মাধ্যমে এ জাতীয় সমভূমি সৃষ্টি হয় বলে একে হৈমবাহিক সমভূমি বলে (চিত্র ৩.৩.২)। এ জাতীয় সুবিস্তৃত সমভূমি উত্তর-পশ্চিম ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার উত্তরাংশ, ফিনল্যান্ড, পূর্ব কানাডা এবং সুইডেনে দেখা যায়।



চিত্র ৩.৩.১: ক্ষয়জাত সমভূমি


চিত্র ৩.৩.২: হৈমবাহিক সমভূমি

৩) কার্স্ট সমভূমি : চুনাপাথরের বৈশিষ্ট্যমন্ডিত অঞ্চলে ভূ-গর্ভস্থ জলধারার মাধ্যমে সৃষ্ট সমভূমিকে কার্স্ট সমভূমি বলে। যুগোশ্লোভিয়ার কার্স্ট অঞ্চলে এ জাতীয় সমভূমি দেখা যায়। এ কার্স্ট অঞ্চলটি আড্রিয়াটিক সাগরের পূর্ব তীরের সাথে

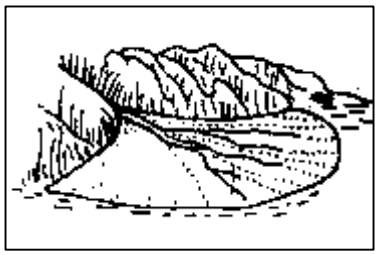
সমান্তরালভাবে প্রায় ৮০ কি. মি. দীর্ঘ এলাকা জুড়ে অবস্থিত। ভূ-গর্ভস্থ জলধারা দ্বারা খড়িমাটি বা চুনাপাথর দ্রবীভূত হয়ে কার্স্ট সমভূমি সৃষ্টি হয়।

৪) সঞ্চয়জাত সমভূমি : বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক শক্তি যেমন- নদী, বায়ুপ্রবাহ ও হিমবাহের মাধ্যমে উচ্চভূমি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে পলিমাটি, কাঁকর, বালু, কর্দম প্রভৃতি নিম্নস্থানে সঞ্চিত হয়ে যে সমভূমির সৃষ্টি হয় তাকে সঞ্চয়জাত সমভূমি বলে। এ জাতীয় সমভূমি যে কোনো ভূমির তুলনায় অধিক উর্বরতাসম্পন্ন। অবস্থান ও গঠনপ্রণালির উপর ভিত্তি করে সঞ্চয়জাত সমভূমিকে নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা-

৪.১. লাভা সমভূমি : আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে নির্গত গলিত লাভা দ্বারা ভূ-পৃষ্ঠের যে সমভূমির সৃষ্টি হয়, তাকে লাভা সমভূমি বলে। দাক্ষিণাত্যের উত্তর-পশ্চিমাংশের কৃষ্ণ মৃত্তিকাময় সমভূমিটি লাভা সমভূমির উদাহরণ।

৪.২. পলিজ সমভূমি : নদীবাহিত কাঁকর, বালি, পলি প্রভৃতি সঞ্চিত হয়ে যে সমভূমি সৃষ্টি হয় তাকে পলিজ সমভূমি বলে। পৃথিবীর সবচেয়ে বিস্তীর্ণ সমভূমিগুলো এভাবে গঠিত হয়েছে। যেমন- মিসিসিপি অববাহিকা, নীল নদের অববাহিকা, গঙ্গা অববাহিকা, হোয়াংহো অববাহিকা প্রভৃতি সমভূমি দীর্ঘদিন যাবৎ পলি সঞ্চিত হয়ে গঠিত হয়েছে। এ জাতীয় সমভূমি কৃষিকাজের জন্য বিশেষভাবে উপযোগী। পলিজ সমভূমিকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

৪.২.১. পাদদেশীয় সমভূমি : পাহাড়ী নদী দ্বারা পর্বতের ঢাল হতে ক্ষয়প্রাপ্ত নানা আকৃতির প্রস্তর ও শিলাখন্ড, কাঁকর, নুড়ি ও বালুকণা প্রভৃতি পর্বতের পাদদেশে সঞ্চিত হয়। এভাবে নদী দ্বারা অবক্ষেপণের ফলে পর্বতের পাদদেশে যে সমভূমির সৃষ্টি হয় তাকে পাদদেশীয় সমভূমি বলে (চিত্র ৩.৩.৩)। যেমন- বাংলাদেশের দিনাজপুর এবং রংপুর জেলার অধিকাংশই পাদদেশীয় সমভূমি।



চিত্র ৩.৩.৩: পাদদেশীয় সমভূমি

৪.২.২. প্লাবন সমভূমি : নদীর পরিণত অবস্থাতে বন্যার সময় পানি স্রোতের সাথে বালি, কাঁকর প্রভৃতি এর গতিপথের দু'দিকে অবস্থিত অপেক্ষাকৃত নিম্নভূমিতে জমা হয়ে যে সমভূমির সৃষ্টি হয় তাকে প্লাবন সমভূমি বলে (চিত্র ৩.৩.৪)।

৪.২.৩. ব-দ্বীপ : নদীর গতিপথের সর্বশেষ পর্যায়ে অর্থাৎ সমুদ্রে পতিত হওয়ার পূর্বে নদীর গতি সর্বাধিক মন্থর থাকে এবং পানিতে পলির পরিমাণ থাকে সর্বাধিক। ফলে নদীর মোহনাতে প্রচুর পরিমাণে পলি সঞ্চিত হয়। এ পলি সঞ্চিত হতে হতে বাংলা মাত্রাহীন 'ব' এর মতো যে সমভূমির সৃষ্টি হয় তাকে ব-দ্বীপ বলে (চিত্র ৩.৩.৫)। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ, পাকিস্তানের সিন্ধু, মিশরের নীল, ব্রহ্মদেশের ইরাবতী, চীনের ইয়াংসি, হোয়াংহো, উত্তর আমেরিকার মিসিসিপি, ইতালির পো প্রভৃতি নদীর মোহনায় বিস্তীর্ণ ব-দ্বীপ গঠিত হয়েছে।

৪.৩ . লোয়েস সমভূমি : বায়ুপ্রবাহের মাধ্যমে ধূলিকণা, বালুকা, মাটি প্রভৃতি একস্থান থেকে অন্যস্থানে সঞ্চিত হয়। ভূমির ক্ষয় ও গঠনের জন্য বায়ুপ্রবাহ শুষ্ক মরুভূমি অঞ্চলে অত্যন্ত ক্রিয়াশীল। এ বায়ুর দ্বারা দীর্ঘদিনের সঞ্চয়ক্রিয়ার ফলে ধীরে ধীরে যে সমভূমি গঠিত হয় তাকে লোয়েস সমভূমি বলে (চিত্র ৩.৩.৬)। চীনের পূর্বদিকে হোয়াংহো নদীর উপত্যকায় বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত গোবি মরুভূমির বালুরাশি সঞ্চিত হয়ে লোয়েস সমভূমি সৃষ্টি হয়েছে।

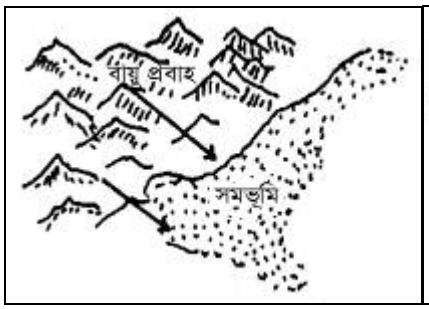


চিত্র ৩.৩.৪: প্লাবন সমভূমি

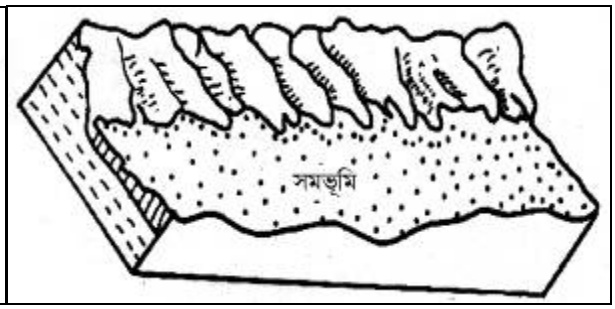


চিত্র ৩.৩.৫: ব-দ্বীপ সমভূমি

৪.৪. উপকূলীয় সমভূমি : ভূ-আন্দোলনের ফলে মহীসোপান বা মহীঢাল অঞ্চলে অর্থাৎ সমুদ্র তীরের মহাদেশগুলোর প্রান্তভাগে যে সমভূমির সৃষ্টি হয় তাকে উপকূলীয় সমভূমি বলা হয় (চিত্র ৩.৩.৭)। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাংশের উপকূলে সরু অথচ সুদীর্ঘ উপকূলীয় সমভূমির উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।



চিত্র ৩.৩.৬: বায়ুতাড়িত লোয়েস সমভূমি



চিত্র ৩.৩.৭: উপকূলীয় সমভূমি

শিক্ষার্থীর কাজ	সমভূমির শ্রেণিবিভাগ ছকবদ্ধ করুন।

সারসংক্ষেপ

সমুদ্র সমতল থেকে প্রায় সম উচ্চতায় সুবিস্তৃত ভূ-ভাগকে সমভূমি বলে। সমুদ্র সমতল থেকে সমভূমির উচ্চতা খুব বেশি হয় না। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে সমভূমি সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে কয়েকশ ফুট উঁচুতে গঠিত হতে পারে। সমভূমি যে সবসময় একেবারে সমতল হবে তা নয়। মৃদু ঢাল, ছোট ছোট টিলা বা খুব নিচু পাহাড় এবং নদী উপত্যকার সমন্বয়ে সমভূমি গঠিত হতে পারে। পৃথিবীর মোট স্থলভাগের প্রায় অর্ধেক হলো সমভূমি। অধিকাংশ মানুষ এ সমভূমিতে বসবাস করে। সমভূমি বিভিন্নভাবে গঠিত হতে পারে। এর মধ্যে সঞ্চয়জাত ও ক্ষয়জাত সমভূমি অন্যতম। সঞ্চয়জাত সমভূমির প্রকৃষ্ট উদাহরণ লাভা সমভূমি, পলিজ সমভূমি, পাদদেশীয় সমভূমি, প্লাবন সমভূমি ও ব-দ্বীপ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ স্থলভাগের কোন অংশে বসবাস করে?

(ক) মালভূমি (খ) সমভূমি (গ) মরুভূমি (ঘ) কোনটিই নয়

২। ব-দ্বীপ কোন ধরনের সমভূমি?

(ক) সঞ্চয়জাত (খ) কার্স্ট (গ) ক্ষয়জাত (ঘ) হিমবাহ

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ প্রশ্নের উত্তর দিন।

মানুষ সমতলভূমিতে বসবাস করে। কারণ মানুষের সকল অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের উপযোগী ভূমি সমভূমি। তাই সমভূমি মানব সভ্যতার জন্য অপরিহার্য।

৩। সমুদ্রের তীরে মহাদেশগুলোর প্রান্তভাগে যে সমভূমির সৃষ্টি হয় তাকে কী ধরনের সমভূমি বলা হয়?

(ক) উপকূলীয় (খ) সামুদ্রিক (গ) হিমবাহ (ঘ) হ্রদ

৪। নদীর মোহনাতে প্রচুর পরিমাণে পলি সঞ্চিত হয়ে যে সমভূমির সৃষ্টি হয় তাকে কী ধরনের সমভূমি বলা হয়?

(ক) উপকূলীয় (খ) সামুদ্রিক (গ) হিমবাহ (ঘ) ব-দ্বীপ

পাঠ-৩.৪ মালভূমি (Plateau)

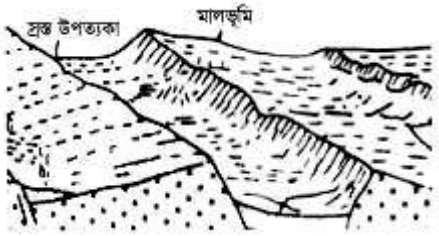
উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- মালভূমির সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য বলতে পারবেন এবং
- বিভিন্ন প্রকার মালভূমি ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মালভূমি

সমুদ্র সমতল হতে অপেক্ষাকৃত উচ্চে অবস্থিত খাড়া ঢালযুক্ত অসমতল এবং প্রশস্ত ভূমিভাগকে মালভূমি বলে (চিত্র ৩.৪.১)। তিব্বতের পামির মালভূমি একটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। মালভূমির উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে কয়েকশ মিটার থেকে কয়েক হাজার মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। ভূ-অভ্যন্তরস্থ ও ভূ-পৃষ্ঠস্থ বিভিন্ন প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার কারণে মালভূমি সৃষ্টি হতে পারে। পৃথিবীর মোট ভূমির শতকরা পাঁচভাগ মালভূমি।



চিত্র ৩.৪.১: মালভূমি

মালভূমির বৈশিষ্ট্য : মালভূমির প্রধানত তিনটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। যথা-

ক) এটি বিস্তীর্ণ উচ্চভূমি,

খ) এর উপরিভাগ তরঙ্গায়িত ও অসমতল এবং

গ) এটি চারদিক থেকে নিম্নভূমিতে নেমে যায়।

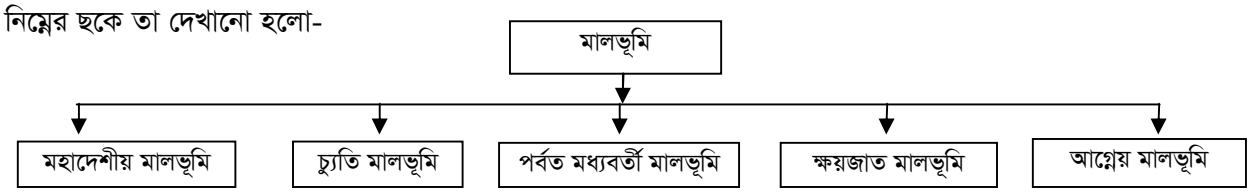
মালভূমি সৃষ্টির কারণ : ভূ-অভ্যন্তরস্থ ও ভূ-পৃষ্ঠস্থ বিভিন্ন প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার মধ্যে তিনটি প্রধান কারণ মালভূমি সৃষ্টির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। যথা-

১) ভূ-আন্দোলন ও পাত-সঞ্চালন। উদাহরণ- তিব্বতের পামীর মালভূমি।

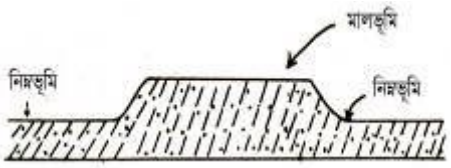
২) ভূ-পৃষ্ঠের ক্ষয়সাধন। উদাহরণ- সাইবেরিয়ার পূর্ব মালভূমি।

৩) ভূ-পৃষ্ঠে লাভা সঞ্চয়। উদাহরণ- ভারতের দাক্ষিণাত্য মালভূমি।

মালভূমির শ্রেণিবিভাগ (Classification of Plateaus): উৎপত্তির ভিত্তিতে মালভূমিকে প্রধানত পাঁচভাগে ভাগ করা যায়। নিম্নের ছকে তা দেখানো হলো-

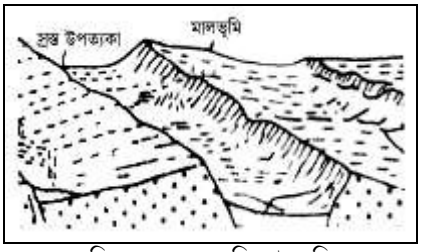


১. মহাদেশীয় মালভূমি : মহাদেশীয় প্রাচীন শিলাস্তূপ নগ্নীভবনের মাধ্যমে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে বিস্তৃত এলাকাব্যাপী যে ভূমি সৃষ্টি হয় তাকে মহাদেশীয় মালভূমি বলে (চিত্র ৩.৪.২)। এ ধরনের মালভূমিসমূহ উচ্চতা সাধারণত সমুদ্র সমতল থেকে ৫০-১০০ মিটার উচ্চতা বিশিষ্ট এবং কেলাসিত হয়। উদাহরণ : কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ার শিল্ড।



চিত্র ৩.৪.২: মহাদেশীয় মালভূমি

২. চ্যুতি মালভূমি : ভূ-অভ্যন্তরস্থ প্রাকৃতিক কারণে ভূ-পৃষ্ঠে কোনো বিস্তৃত স্থান চ্যুতির সৃষ্টি হয়ে কোনো এলাকার বিরাট অংশ অসমানভাবে উপরে উঠে গিয়ে যে ভূমির সৃষ্টি করে তাকে চ্যুতি মালভূমি বলে (চিত্র ৩.৪.৩)। মূলত ভূ-আন্দোলনজনিত এবং পাত সঞ্চালনজনিত কারণে এই ধরনের মালভূমি সৃষ্টি হয় যা চ্যুতি সৃষ্টির কারণের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। যেমন- স্পেনের মেসেটা।

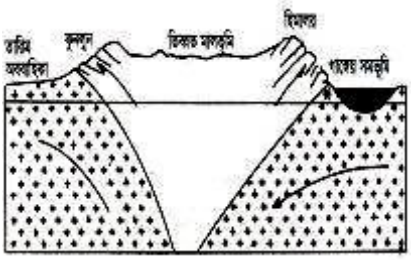


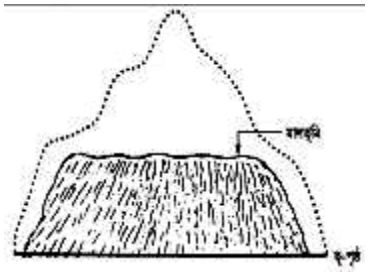
চিত্র ৩.৪.৩ : চ্যুতি মালভূমি

৩. পর্বত মধ্যবর্তী মালভূমি : সংকোচনজনিত চাপের কারণে ভঙ্গিল পর্বতের মাঝে এ ধরনের মালভূমি সৃষ্টি হয়। যেহেতু ভঙ্গিল পর্বত গঠিত হওয়ার সময় পবর্তদ্বারা বেষ্টিত নিম্নস্থানসমূহ উঁচু হয়ে এই মালভূমি সৃষ্টি করে সেহেতু এ ধরনের মালভূমিকে পর্বত মধ্যবর্তী মালভূমি বলে (চিত্র ৩.৪.৪)। এ ধরনের মালভূমির উচ্চতা সাধারণত ৩ হাজার থেকে ৫ হাজার মিটারের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। যেমন- তিব্বতের মালভূমি।

৪. ক্ষয়জাত মালভূমি : কোনো পার্বত্য অঞ্চল বা উঁচু ভূ-খন্ড নদী, হিমবাহ, বৃষ্টিপাত, বায়ুপ্রবাহ প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তি দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে ভূমির উচ্চতা হ্রাস পেয়ে প্রায় সমতল ভূমিতে পরিণত হলে তাকে ক্ষয়জাত মালভূমি বলে (চিত্র ৩.৪.৫)। মূলত এই মালভূমি পুরাতন উঁচু ভূ-ভাগ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে সৃষ্টির ফলে শিলার প্রকৃতি এর বন্ধুরতা নিয়ন্ত্রণ করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ইউরোপের ক্যালিডোনিয়ান পর্বতশ্রেণি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে ফিজেল্ড মালভূমি সৃষ্টি হয়েছে।

৫. আগ্নেয় মালভূমি : অগ্ন্যুৎপাতের ফলে ভূ-ত্বকের কোনো ফাটল বা আগ্নেয়গিরির ছিদ্র পথে ভূ-গর্ভ হতে লাভা প্রবাহ ভূ-পৃষ্ঠে ছড়িয়ে পড়ে এবং শীতলীকরণ প্রক্রিয়ায় ঠান্ডা হয়ে কঠিন অবস্থা ধারণ করে যে ভূমির সৃষ্টি হয় তাকে আগ্নেয়জাত মালভূমি বলে (চিত্র ৩.৪.৬)। যেমন- ভারতের দাক্ষিণাত্য মালভূমি।


চিত্র ৩.৪.৪ : পর্বত মধ্যবর্তী মালভূমি


চিত্র ৩.৪.৫ : ক্ষয়জাত মালভূমি


চিত্র ৩.৪.৬ : আগ্নেয় মালভূমি

শিক্ষার্থীর কাজ	উদাহরণসহ মালভূমির শ্রেণিবিভাগ করুন।

সারসংক্ষেপ

সমুদ্র সমতল থেকে উঁচু বিস্তীর্ণ সমভূমিই মালভূমি। সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে এর উচ্চতা কয়েকশ মিটার হতে কয়েক হাজার মিটার পর্যন্ত হতে পারে। কিন্তু এর উপরিভাগ প্রায় সমতল। ভূ-অভ্যন্তরস্থ এবং ভূ-পৃষ্ঠস্থ উভয় প্রক্রিয়ার ফলেই মালভূমির সৃষ্টি হয়। উৎপত্তিগত দিক দিয়ে মহাদেশীয় শিল্ডস, চ্যুতি, পর্বত মধ্যবর্তী, ক্ষয়জাত ও আগ্নেয় মালভূমি এই পাঁচ ভাগে মালভূমিকে ভাগ করা। মালভূমি পৃথিবীর অভ্যন্তরের ক্রিয়ার ফলে সৃষ্ট এক প্রকার ভূমিরূপ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। পৃথিবীর মোট ভূমির শতকরা কত অংশ মালভূমি ?

(ক) ১০% (খ) ১৩% (গ) ৫% (ঘ) ১৮%

২। ভারতের দাক্ষিণাত্যের মালভূমি কী ধরনের মালভূমি?

(ক) লাভা গঠিত (খ) সমভূমি উন্নীত গঠিত (গ) সমপ্রায় ভূমি উন্নীত (ঘ) সমভূমি গঠিত

৩। পর্বত মধ্যবর্তী মালভূমির উচ্চতা কত পর্যন্ত হতে পারে?

(ক) ৩-৫ হাজার মিটার (খ) ১৩-১৫ হাজার মিটার

(গ) ৬-৮ হাজার মিটার (ঘ) ২৩-২৫ হাজার মিটার

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ৪ ও ৫ প্রশ্নের উত্তর দিন।

মুহিন ও তার বন্ধুরা পাহাড়ি অঞ্চলে শিক্ষা সফরে গেলেন। তারা সুউচ্চ পাহাড় ও পর্বত দেখলেন। তারা নতুন এক ধরনের ভূমিরূপ দেখলেন যা সম্পর্কে তাদের আগে কোনো ধারণা ছিল না।

৪। সমুদ্র সমতল থেকে উচ্চ বিস্তীর্ণ সমভূমিকে কী বলে?

(ক) পর্বত (খ) সমভূমি (গ) মালভূমি (ঘ) পাহাড়

৫। মালভূমি সৃষ্টির প্রধান কারণ কী ?

i. ভূ-আন্দোলন ii. ভূ-পৃষ্ঠের ক্ষয়সাধন iii. লাভা সঞ্চয়

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-৩.৫ পাহাড় ও পর্বত (Hill and Mountain)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- পাহাড় বলতে কী বুঝায় তা জানতে পারবেন এবং
- পর্বতের সংজ্ঞা ও প্রকারভেদ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

পাহাড়

পাহাড় হচ্ছে ভূ-পৃষ্ঠের উচ্চ, সুবিস্তৃত এবং খাড়া ঢালবিশিষ্ট শিলাস্তূপ, যা পর্বত অপেক্ষা ছোট। পাহাড়ের উচ্চতা সাধারণত ১০০-৬০০ মিটার পর্যন্ত হয়। যেমন- ময়মনসিংহের গাড়ো পাহাড়।

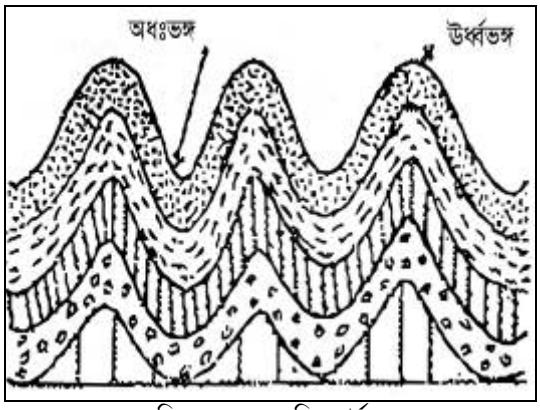
পর্বত (Mountain)

ভূ-পৃষ্ঠের অতি উচ্চ, সুবিস্তৃত এবং খাড়া ঢাল বিশিষ্ট শিলাস্তুপকে পর্বত বলে। পর্বত সাধারণত ৬০০ মিটারের বেশি উচ্চতা সম্পন্ন হয়। তবে পর্বতের উচ্চতা সমুদ্র সমতল থেকে কয়েক হাজার মিটার পর্যন্ত হতে পারে। কোনো কোনো পর্বত বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করে। যেমন- পূর্ব আফ্রিকার কিলিমানজারো। আবার কিছু পর্বত ব্যাপক এলাকা জুড়ে অবস্থান করে। এ ধরনের পর্বত সাধারণত ঢেউয়ের ন্যায় ভাঁজ বিশিষ্ট। যেমন- হিমালয় পর্বত। পর্বত গঠনের প্রক্রিয়াকে ওরোজেনেসিস (Orogenesis) বলে। গ্রীক শব্দ Oro অর্থ পর্বত এবং Genesis অর্থ সৃষ্টি হওয়া। পৃথিবীর প্রতিটি পর্বত দেখতে বাহ্যিকভাবে স্বতন্ত্র হলেও উৎপত্তিগত ও গঠন প্রকৃতির দিক দিয়ে এদের বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। উৎপত্তিগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে পর্বতকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

ক. ভঙ্গিল পর্বত
খ. আগ্নেয় পর্বত
গ. চ্যুতি-স্তূপ পর্বত এবং
ঘ. উত্থিত ক্ষয়জাত পর্বত।

ক. ভঙ্গিল পর্বত (Folded Mountain) : পাললিক শিলাস্তর আনুভূমিক আলোড়ন বা মহাদেশীয় পর্বতের সংকোচনের ফলে কুঞ্চিত হয়ে ঢেউয়ের আকারে যে পর্বত সৃষ্টি হয় তাকে ভঙ্গিল পর্বত বলে (চিত্র ৩.৫.১)। চার ধরনের পর্বতের মধ্যে ভঙ্গিল পর্বত সর্বাধিক বিস্তৃত। অভিসারী প্লেট সীমানায় সংকোচনজনিত চাপে এ ধরনের পর্বত গঠিত হয় বলে এর শিলা কাঠামো ভাঁজ ও চ্যুতিযুক্ত। ভঙ্গিল পর্বত সাধারণত পাললিক শিলা দ্বারা গঠিত।

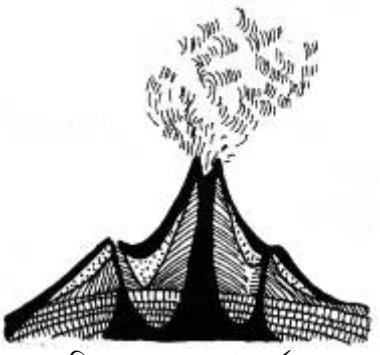
বিভিন্ন পর্যায়ে ভঙ্গিল পর্বতের উৎপত্তি : ভূ-বিজ্ঞানীগণ ভঙ্গিল পর্বত গঠনে কয়েকটি পর্যায় দেখিয়েছেন। প্রথম পর্যায়ে সমুদ্রখাতের উভয় দিক থেকে সংকোচনের ফলে নিম্নাংশ অবনমিত হয় বা নিচে নেমে যায়। দ্বিতীয় পর্যায়ে সমুদ্রখাতের অবনমিত অংশে পলি জমা হতে থাকে এবং ধীরে ধীরে পলির ভারে নিচের দিকে নেমে যায়। ফলে ভূ-অধঃভাঁজের সৃষ্টি হয়। তৃতীয় পর্যায়ে অবনমিত খাতের তলদেশ রূপান্তরিত শিলায় পরিণত হয় এবং আগ্নেয়শিলা পলির ভিতরে প্রবেশ করে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে সংকোচন হ্রাস পায় এবং সম্পূর্ণ খাত উপরে উত্থিত হয়ে পর্বতমালা গঠন করে। যেমন-এশিয়ার হিমালয়, দক্ষিণ আমেরিকার আন্দিজ, উত্তর আমেরিকার রকি এবং ইউরোপের আল্পস পর্বতমালা।



চিত্র ৩.৫.১ : ভঙ্গিল পর্বত

খ. আগ্নেয় পর্বত (Volcanic Mountain) : ভূ-অভ্যন্তরস্থ ক্রিয়াকলাপের জন্য ম্যাগমা লাভা হিসাবে উদগিরিত হয়ে চারদিকে সঞ্চিত হয়। পরবর্তীতে জমে ঠান্ডা হয়ে যে শিলাস্তূপের সৃষ্টি করে তাকে আগ্নেয় পর্বত বলে (চিত্র ৩.৫.২)। লাভার প্রকৃতির ওপর আগ্নেয় পর্বতের বিস্তৃতি ও আকৃতি নির্ভর করে। কোনো কোনো আগ্নেয় পর্বত খাড়া ঢালবিশিষ্ট এবং স্বল্প স্থান জুড়ে থাকে। আবার স্বল্প ঢাল সম্পন্ন কিন্তু বিস্তৃত এলাকা জুড়েও এ পর্বত হতে পারে।

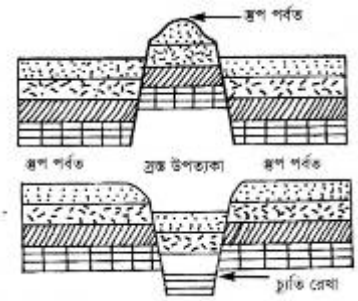
আগ্নেয় পর্বতের উৎপত্তি : কোনো কোনো ক্ষেত্রে ভূ-আলোড়নের জন্য ভূ-ত্বকের দুর্বল অংশের ফাটলের মধ্য দিয়ে ভূ-গর্ভস্থ উত্তপ্ত লাভা, নানা প্রকার গ্যাস ও বাষ্প, ছাই, ধাতু ইত্যাদি প্রবল বেগে বেরিয়ে আসে। এই উত্তপ্ত লাভা ফাটলের চতুর্দিকে সঞ্চিত হতে হতে উঁচু পর্বতের সৃষ্টি করে। যেমন- জাপানের ফুজিয়ামা, হাওয়াই দ্বীপের মওনালোয়া, ইতালির ভিসুভিয়াস, আফ্রিকার কিলিমানজারো ইত্যাদি।


চিত্র ৩.৫.২ : আগ্নেয় পর্বত

গ. চ্যুতি-স্তূপ পর্বত (Fault-block Mountain) : ভূ-আলোড়নের ফলে শিলাস্তরের সংকোচন ও প্রসারণে ভূ-ত্বক অনেক সময় খাড়াভাবে ফেঁটে যায়। যে রেখা বরাবর ফাঁটল সৃষ্টি হয় তাকে চ্যুতি রেখা বলে। দুটি ফাঁটলের মাঝের অংশ অনেক সময় উপরে ওঠে যায় বা নিচে বসে যায়। চ্যুতি বরাবর এই ধরনের পর্বতকে চ্যুতি-স্তূপ পর্বত বলে (চিত্র ৩.৫.৩)।

চ্যুতি-স্তূপ পর্বতের উৎপত্তি : তিন ধরনের পরিস্থিতিতে চ্যুতি-স্তূপ পর্বত সৃষ্টি হতে পারে।

প্রথমত : ভূ-ত্বকের শিলাস্তরে টানজনিত চাপের কারণে ফাঁটলের সৃষ্টি হয়। এ ফাঁটল বরাবর একটি শিলাস্তর পাশের স্তরের চেয়ে ওপরের দিকে উঠে গেলে বা নিচের দিকে নেমে গেলে অথবা পাশে সরে গিয়ে চ্যুতি স্তূপ পর্বতের সৃষ্টি হয়। উদাহরণ- আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের নেভাডা, নিউ মেক্সিকো, ক্যালিফোর্নিয়ায় এ ধরনের স্তূপ পর্বত দেখা যায়।



চিত্র ৩.৫.৩ : চ্যুতি-স্তূপ পর্বত

দ্বিতীয়ত : ভূ-ত্বকের কোনো অংশ ভূ-অভ্যন্তরস্থ কারণে ওপরের দিকে উঠতে থাকলে পাশ্ববর্তী শিলায় যে টানের সৃষ্টি হয়। এর ফলে ফাঁটল দেখা যায়। এই ফাঁটল বরাবর দু'পাশের শিলাস্তর নিচের দিকে নেমে যায় এবং মাঝের ঊর্ধ্বগামী শিলাস্তূপকে চ্যুতি স্তূপ পর্বতের মত দেখায়। যেমন- পূর্ব আফ্রিকার স্রস্ত উপত্যকার পাশ্ববর্তী উঁচু পার্বত্য স্তূপই এ ধরনের চ্যুতি-স্তূপ পর্বত।

তৃতীয়ত : কোনো কারণে ভূ-ত্বকের এক অংশ খাড়াভাবে পাশের সমভূমির ওপরে উঠে গেলে চ্যুতি-স্তূপ পর্বতের সৃষ্টি হয়। উদাহরণ- জার্মানির ব্লাক ফরেস্ট, ফ্রান্সের ভোঁজ এবং ভারতের বিন্ধ্যা ও ত্রিপুরা পর্বতদ্বয় চ্যুতি-স্তূপ পর্বতের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।


চিত্র ৩.৫.৪ : উত্থিত ক্ষয়জাত পর্বত

ঘ) উত্থিত ক্ষয়জাত পর্বত (Residual Mountain) : ভূ-পৃষ্ঠের নরম শিলাসমূহ বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক শক্তির দ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত ও অপসারিত হলে কঠিন শিলাসমূহ উঁচু হয়ে পর্বতের ন্যায় অবস্থান করে। একে উত্থিত ক্ষয়জাত পর্বত বলে (চিত্র ৩.৫.৪)। মূলত ভূ-আলোড়নের কারণে সুদূর অতীতকালে ভূ-অভ্যন্তরস্থ ম্যাগমা উত্থিত হওয়ায় শিলাস্তর ওপরের দিকে উঠে যায়। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে খাঁড়া চ্যুতি বরাবর শিলাস্তূপ ঊর্ধ্বগামী হয়। পরবর্তীতে এ সমস্ত উচ্চভূমির উপরিভাগ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে নিচের আগ্নেয় ও রূপান্তরিত শিলা উন্মুক্ত হয়। পার্শ্ববর্তী ভূমির চেয়ে এ সুউচ্চ ভূমিরূপকে উত্থিত ক্ষয়জাত পর্বত বলে। যেমন-আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ব্লাক হিলস্, কলোরাডোর ফ্রান্ট রেঞ্জ (কলোরাডো)।

শিক্ষার্থীর কাজ	পাহাড় ও পর্বতের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করুন।

সারসংক্ষেপ

পাহাড় হচ্ছে ভূ-পৃষ্ঠের উচ্চ, সুবিস্তৃত এবং খাড়া ঢালবিশিষ্ট শিলাস্তূপ, যা পর্বত অপেক্ষা ছোট। পাহাড়ের উচ্চতা সাধারণত ১০০-৬০০ মিটার পর্যন্ত হয়। আর ভূ-পৃষ্ঠের অতি উচ্চ, সুবিস্তৃত এবং খাড়া ঢাল বিশিষ্ট শিলাস্তূপকে পর্বত বলে। পর্বত সাধারণত ৬০০ মিটারের বেশি উচ্চতা বিশিষ্ট হয়। তবে এই উচ্চতা সমুদ্র সমতল থেকে কয়েক হাজার মিটার পর্যন্ত হতে পারে। হিমালয় পর্বত, উত্তর আমেরিকার রকি, দক্ষিণ আমেরিকার আন্দিজ, ইউরোপের আল্পস, ইউরাল, ককেশাস, জাপানের ফুজিয়ামা উল্লেখযোগ্য পর্বতের উদাহরণ। উৎপত্তিগত বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে পর্বতকে চার ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- ভঙ্গিল পর্বত, আগ্নেয়জাত পর্বত, চ্যুতি-স্তূপ পর্বত ও উত্থিত ক্ষয়জাত পর্বত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ভাঁজ বিশিষ্ট পর্বতের উদাহরণ নয় কোনটি?

(ক) কিলিমানজারো (খ) হিমালয় (গ) আল্পস (ঘ) রকি

২। উৎপত্তিগত ও গঠন প্রকৃতির দিক দিয়ে পর্বত কত ভাগে বিভক্ত?

(ক) ২ (খ) ৪ (গ) ৩ (ঘ) ৫

৩। কীসের প্রকৃতির ওপর আগ্নেয় পর্বতের বিস্তৃতি ও আকৃতি নির্ভর করে?

(ক) পাহাড়ের (খ) লাভার (গ) শিলার (ঘ) সবগুলি

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

সাথী ও তার বন্ধুরা পাহাড়ি অঞ্চলে শিক্ষা সফরে গেলেন। তারা সুউচ্চ পাহাড় ও পর্বত সম্পর্কে তাদের শিক্ষককে প্রশ্ন করে জানার চেষ্টা করলেন পাহাড় ও পর্বতের মধ্যে পার্থক্য কী।

৪। পাহাড়ের উচ্চতা কত ?

(ক) ১০-১০০ মিটার (খ) ১০০-৬০০ মিটার

(গ) ২০০-৫০০ মিটার (ঘ) ৬০০-১০০০ মিটার

৫। জাপানে অবস্থিত পর্বতের উদাহরণ কোনটি?

(ক) ইউরাল ও ককেশাস (খ) আন্দিজ

(গ) রকি (ঘ) ফুজিয়ামা

পাঠ-৩.৬ মরুভূমি (Desert)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- মরুভূমি কী তা জানতে পারবেন এবং
- মরুভূমির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলতে পারবেন।

মরুভূমি

মরুভূমি বলতে বুঝায় অত্যন্ত শুষ্ক, বৃষ্টিবিরল ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে বালি দ্বারা আবৃত অঞ্চল। কোনো একটি বৃহৎ এলাকা যে প্রক্রিয়ায় শুষ্কতায় পরিবর্তিত হয় সে প্রক্রিয়াকে মরুকরণ বলে। মরুভূমি বসবাসের জন্য অত্যন্ত অনুপযোগী। মরুভূমির দিন ও রাতের তাপমাত্রার পার্থক্য খুব বেশি। দিনে তাপমাত্রা অনেক বৃদ্ধি পায় এবং রাতে তাপমাত্রা অনেক কমে যায়। দিন ও রাতের তাপমাত্রার ব্যাপক তারতম্যের কারণে পাথর প্রতিদিন সংকুচিত ও প্রসারিত হয়ে বৃহৎ পাথর খন্ডগুলো ক্রমেই ভেঙে ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হয়ে বালুকণার আকার ধারণ করে। সাহারা মরুভূমি হলো পৃথিবীর বৃহত্তর মরু এলাকা। মরুভূমির আবহাওয়া অত্যন্তড় রুক্ষ হওয়ায় এখানে স্বাভাবিক গাছপালার অস্তিত্ব নেই। কষ্ট সহিষ্ণু কিছু কাঁটা ও ঝোপ জাতীয় গাছ এখানে জন্মায়। এসব গাছের শিকড় মাটির অনেক নিচে প্রবেশ করেও পানি সংগ্রহ করতে পারে না।

মরুভূমির বৈশিষ্ট্য

১। দিনের বেলা তাপমাত্রা প্রায় ৫০° বা এর উপরে থাকে,
২। রাতের বেলা তাপমাত্রা ০° এর নিচে নেমে যায়,
৩। গাছ-পালা খুবই কম। কাঁটা ও গুল্ম জাতীয় উদ্ভিজ্জের উপস্থিতি বেশি,
৪। বৃষ্টিপাত অনেক কম ও অনিয়মিত,
৫। গ্রীষ্মকালে খরার প্রভাব থাকে,
৬। মাটি ও বায়ু উভয়ই শুষ্ক থাকে,
৭। মাটি থেকে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ অনেক বেশি,
৮। আর্দ্রতা অনেক কম এবং
৯। ভূমিক্ষয়ের মাত্রা অনেক বেশি।

মরুভূমির শ্রেণিবিভাগ

মরুভূমি প্রধানত চার প্রকার। যথা–

১. উষ্ণ ও শুষ্ক মরুভূমি
২. শুষ্ক প্রায় মরুভূমি
৩. উপকূলীয় মরুভূমি এবং
৪. শীতল মরুভূমি।

১. উষ্ণ ও শুষ্ক মরুভূমি : আমেরিকার চিহুয়ান, সোনোরান, মোজাভি ও গ্রেট বেসিন মূলত এই প্রকারের মরুভূমি। এসব মরুভূমি সারা বছরই খুব উষ্ণ ও শুষ্ক থাকে। গ্রীষ্মকালে খুব গরম হয় এবং শীতকালে সামান্য বৃষ্টিপাত হয়। এখানে গড় তাপমাত্রা ২০-২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, সর্বোচ্চ ৪৩-৪৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং কখনো সর্বনিম্ন ১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস এ নেমে আসে। এ ধরনের মরুভূমিতে সর্বোচ্চ ২৮ সেমি বৃষ্টিপাত হয়। মাটি সাধারণত পাথুরে হয়ে থাকে। এ মরুভূমিতে গাছ-পালা খুব কম। প্রাণিকূলের মধ্যে ক্যাঙ্গারু, ইঁদুর, পোকামাকড়, সরীসৃপ জাতীয় কিছু প্রাণি দেখতে পাওয়া যায়।

২. শুষ্ক প্রায় মরুভূমি : এ ধরনের মরুভূমিতে দিনে খুব গরম হয় এবং রাতে সমান্য তাপমাত্রা হ্রাস পায়। শীতকালে সামান্য বৃষ্টিপাত হয়। এখানে গড় তাপমাত্রা ২১-২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস, তবে ৩৮ ডিগ্রির বেশি হয় না। বিকাল ও রাতে সাধারণত তাপমাত্রা থাকে ১০° সে.। এ ধরনের মরুভূমিতে বছরে গড়ে ২-৪ সেমি বৃষ্টিপাত হয়। মাটি সাধারণত পাথুরে ও বালুময় হয়ে থাকে। ভারতের রাজস্থানে এ ধরনের মরুভূমি দেখা যায়।

৩. উপকূলীয় মরুভূমি : এ মরুভূমিতে সাধারণত মাঝারি ধরনের আবহাওয়া হয়ে থাকে। গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা ১৩-২৪° সে. শীতকালে ৫° সে. হয়ে থাকে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৮° সে. আর সর্বনিম্ন -৫° সে. নেমে যায়। সর্বোচ্চ বৃষ্টিপাত ৩৭ সেমি, সর্বনিম্ন ৫ সেমি এবং বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাত ৫-১৩ সেমি। উদাহরণ: চিলির আতাকামা মরুভূমি।

৪. শীতল মরুভূমি : এ মরুভূমি সাধারণত মেরু অঞ্চলে ঠান্ডা আবহাওয়ায় দেখা যায়। গ্রীনল্যান্ড হচ্ছে এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা ২১-২৬° সে. এবং শীতকালে তাপমাত্রা হিমাঙ্কের নিচে থাকে। বাৎসরিক গড় বৃষ্টিপাত ১৫-২৬ সে.মি।

শিক্ষার্থীর কাজ	মরুভূমির আবহাওয়ার বৈশিষ্ট্যগুলো উল্লেখ করুন।

সারসংক্ষেপ

মরুভূমি বলতে বুঝায় অত্যন্ত শুষ্ক, বৃষ্টি বিরল ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে বালি দ্বারা আবৃত অঞ্চল। মরুভূমি বসবাসের জন্য অত্যন্ত অনুপযোগী। মরুভূমিতে দিন ও রাতের তাপমাত্রার মধ্যে পার্থক্য খুব বেশি হয়। মরুভূমি মূলত চার প্রকার। যথা- উষ্ণ ও শুষ্ক মরুভূমি, শুষ্ক প্রায় মরুভূমি, উপকূলীয় মরুভূমি এবং শীতল মরুভূমি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কোন অঞ্চল মানুষের বসবাসের অনুপযোগী?
(ক) সমতল খ) মরুভূমি (গ) ব-দ্বীপ (ঘ) সবগুলো

২। মরুভূমি কত প্রকার?
(ক) ২ (খ) ৪ (গ) ৩ (ঘ) ৫

৩। চিহ্নয়ান কোন ধরনের মরুভূমি?
ক) উষ্ণ ও শুষ্ক মরুভূমি (খ) শুষ্ক প্রায় মরুভূমি
গ) উপকূলীয় মরুভূমি (ঘ) শীতল মরুভূমি

৪। শীতল মরুভূমিতে গড়ে বৃষ্টিপাত কত?
(ক) ১৫-২৬ সে.মি. (খ) ১০-১৫ সে.মি.
(গ) ১৫-২০ সে.মি. (ঘ) ০৫-১০ সে.মি.

পাঠ-৩.৭ বাংলাদেশের ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য (Physiographic Characterestics of Bangladesh)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি ও তার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করতে পারবেন।

বাংলাদেশের ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য

বাংলাদেশ বিশ্বে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। এদেশ এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণাংশে অবস্থিত যা দক্ষিণ এশিয়া নামে পরিচিত। বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ২০°৩৪´ উত্তর অক্ষরেখা থেকে ২৬°৩৮´ উত্তর অক্ষরেখা এবং ৮৮°০১´ পূর্ব দ্রাঘিমারেখা থেকে ৯২°৪১ পূর্ব দ্রাঘিমারেখা পর্যন্ত। বাংলাদেশের উত্তরে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, মেঘালয় ও আসাম রাজ্য, পূর্বে আসাম, ত্রিপুরা, মিজোরাম রাজ্য ও মিয়ানমার, পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ এবং দক্ষিণে বিস্তৃত বঙ্গোপসাগর অবস্থিত। বাংলাদেশের মোট সীমারেখার দৈর্ঘ্য ৪,৭১২ কি.মি। এর মধ্যে ভারতের সাথে ৩,৭১৫ কি.মি, মিয়ানমারের সাথে ২৮১ কি. মি এবং বঙ্গোপসাগরে তটরেখার দৈর্ঘ্য ৭১৬ কি.মি।

বাংলাদেশের ভূ-তাত্ত্বিক বিশেষত্ব হচ্ছে পূর্বে নাগা, লুসাই ও আরাকান পর্বতমালা, পশ্চিমে ভারতের উপদ্বীপীয় ভূ-খন্ড ও রাজমহল মালভূমি, উত্তরে শিলং মালভূমি ও হিমালয় পর্বতমালা। ভূ-তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশ বঙ্গখাতের একটি বৃহৎ অংশ এবং পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম ব-দ্বীপ। দেশের ২০ ভাগ পাহাড়ি এলাকা ব্যতীত সমগ্র দেশ পলি দ্বারা গঠিত। পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, কর্ণফুলীসহ অসংখ্য নদী এ বিস্তৃতি প্লাবন সমভূমি গঠন করেছে। দেশের উত্তরাংশ থেকে দক্ষিণের দিকে ক্রমেই ঢালু হওয়ায় নদীগুলো দক্ষিণের দিকে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে। এ দেশের ভূ-প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য আর্থ-সামাজিকসহ সকল ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

বাংলাদেশের ভূ-প্রাকৃতিক শ্রেণিবিভাগ : অবস্থান, ভূমির গঠন ও ভূ-তাত্ত্বিক সময়কাল অনুসারে বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতিকে প্রধানত তিনটি বৃহৎ শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায় (চিত্র ৩.৭.১)। যথা-

১. টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহ

২. প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহ এবং

৩. সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি।

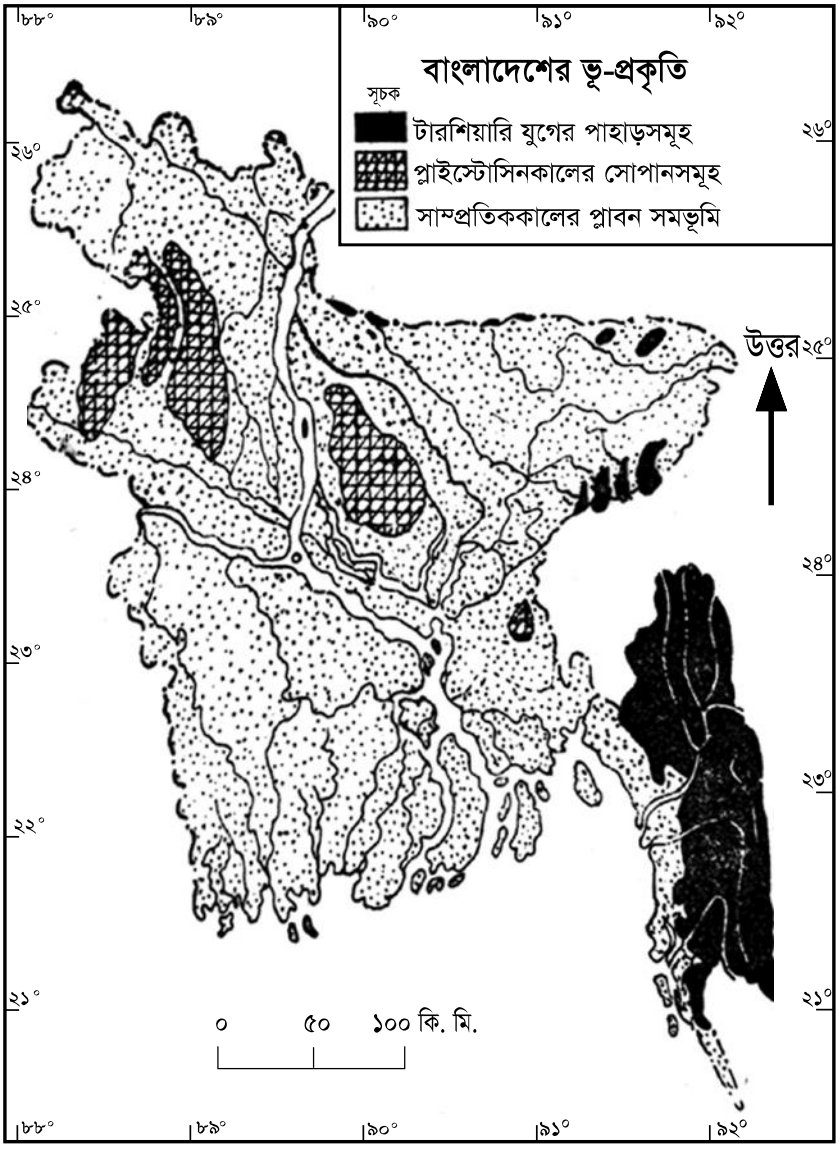
১। টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহ : প্রায় ৭০ মিলিয়ন বছর পূর্বে টারশিয়ারি যুগে হিমালয় পর্বত উত্থিত হওয়ার সময় এ পাহাড়গুলো গঠিত হয়েছে বলে এগুলোকে টারশিয়ারি যুগের পাহাড় বলা হয়। এ পাহাড়গুলো বেলেপাথর, শ্লেট জাতীয় প্রস্তর এবং কর্দম দ্বারা গঠিত। এ পাহাড়গুলোকে আসামের লুসাই এবং মিয়ানমারের আরাকান পাহাড়ের সমগোত্রীয় বলে মনে করা হয়। বাংলাদেশে অবস্থিত টারশিয়ারি যুগের পাহাড়গুলোকে আবার দুইটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

ক. দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ : বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি, বান্দরবান এবং চট্টগ্রাম জেলার অংশবিশেষে অবস্থিত পাহাড়সমূহ নিয়ে এ অঞ্চল গঠিত। এ অঞ্চলের পাহাড়গুলোর গড় উচ্চতা প্রায় ৬১০ মিটার। এখানকার পাহাড়গুলো পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে ক্রমশ বেড়েছে। বাংলাদেশের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ তাজিং ডং বান্দরবান জেলায় অবস্থিত যার বর্তমান নাম বিজয়। এর উচ্চতা ১,২৩১ মিটার। আবার এ অঞ্চলের দক্ষিণ-পূর্বপ্রান্তে বান্দরবান জেলার কিওক্রাডং পর্বত অবস্থিত যার উচ্চতা ১,২৩০ মিটার।

এ অঞ্চলে পাহাড়ের মাঝে মাঝে বহু সংকীর্ণ উপত্যকা দেখা যায়। এ উপত্যকা দিয়ে কর্ণফুলী, সাঙ্গু, মাতামুহুরী, হালদা, কাসালাং, নাফ প্রভৃতি নদী প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে। এ নদীগুলো বেশ খরস্রোতা।

খ) উত্তর-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়সমূহ : দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার জেলায় অবস্থিত ছোট-বড় পাহাড়গুলো নিয়ে এ অঞ্চল গঠিত। এ পার্বত্য ভূমির উচ্চতা সাধারণত ৬০ থেকে ৯০ মিটারের বেশি নয়। তবে মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ ও সিলেট জেলার পূর্ব ও উত্তর-পূর্বাংশের পাহাড়গুলোর উচ্চতা ২৪৪ মিটার। সিলেট জেলার পাহাড়িয়া অঞ্চল শহরের উত্তর-পূর্ব দিকে ১৮৬ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত। এ অঞ্চলের উত্তরের পাহাড়গুলো স্থানীয়ভাবে টিলা নামে পরিচিত। এগুলোর উচ্চতা ৩০ থেকে ৯০ মিটারের মধ্যে। এ অঞ্চলের সুনামগঞ্জ জেলার ছাতক শহরের উত্তরে প্রায় ৪০ বর্গকিলোমিটার স্থান নিয়ে একটি টিলা পাহাড় রয়েছে। এটিকে বলা হয় ছাতক পাহাড়। টিলাজাতীয় পাহাড়গুলো মূলত খাসিয়া, জয়ন্তিয়া, গারো ও লুসাই পাহাড়ের বিচ্ছিন্ন অংশবিশেষ। এ পাহাড়ের ঢালগুলো খাড়া এবং উপরিভাগ অসমান। আবার শেরপুর ও ময়মনসিংহ জেলার উত্তর সীমানায় ভারতের মেঘালয় রাজ্যের গারো পাহাড়ের বিচ্ছিন্ন অংশ দেখা যায়।

২। প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহ : ভূ-তাত্ত্বিক সময়পঞ্জি অনুযায়ী আনুমানিক ২৫,০০০ বছর পূর্বে এ সোপান অঞ্চল গঠিত হয়েছে বলে ভূ-বিজ্ঞানীরা মনে করেন। বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাংশের সুবিশাল বরেন্দ্রভূমি, মধ্যভাগের মধুপুর ও ভাওয়ালের গড় এবং কুমিল্লা জেলার লালমাই উচ্চভূমি নিয়ে এ অঞ্চল গঠিত। এ অঞ্চলের আয়তন ১৩,৪২৭ বর্গকিলোমিটার। মাটির রং লাল ও ধূসর। প্লাইস্টোসিনকালের সোপান এলাকাকে আলোচনার সুবিধার্থে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- ক) বরেন্দ্রভূমি, খ) মধুপুর ও ভাওয়ালের গড় এবং গ) লালমাই পাহাড়।



চিত্র ৩.৭.১: বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি

ক) বরেন্দ্রভূমি : দিনাজপুর, রাজশাহী, বগুড়া ও রংপুর অঞ্চল নিয়ে বরেন্দ্রভূমি গঠিত। এর আয়তন ৯,২৮৮ বর্গকিলোমিটার বা ৩৬,০০ বর্গমাইল। বরেন্দ্রভূমি প্লাবন সমভূমি থেকে প্রায় ৬ থেকে ১২ মিটার উঁচু। সমগ্র বরেন্দ্র অঞ্চলটি পুনর্ভবা, আত্রাই ও যমুনা নদী দ্বারা চারটি অংশে বিভক্ত। মাটির রং লালচে হলুদ। বরেন্দ্রভূমির ছোট বিনুনী আকৃতির নদীগুলো খাড়ি নামে পরিচিত।

খ) মধুপুর ও ভাওয়ালের গড় : ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল ও গাজীপুর জেলায় মধুপুর ও ভাওয়ালের গড় অবস্থিত। এ অঞ্চলের মোট আয়তন ৪,১০৩ বর্গকিলোমিটার। টাঙ্গাইল ও ময়মনসিংহ জেলায় অবস্থিত এ অঞ্চলের উত্তরাংশকে বলা হয় মধুপুর

গড় এবং গাজীপুর জেলায় অবস্থিত এ অঞ্চলের দক্ষিণাংশকে বলা হয় ভাওয়ালের গড়। এ গড়ের পূর্ব ও দক্ষিণাংশের উচ্চতা প্রায় ৬ মিটার কিন্তু পশ্চিম ও উত্তর দিকের উচ্চতা প্রায় ৩০ মিটার। এই এলাকার মাটির রং সাধারণত লাল ও কঙ্করময়। মধুপুর গড়কে আবার 'নদী সোপান' বা উত্থিত ব-দ্বীপও বলা হয়। এ এলাকার মধ্য দিয়ে বংশী, শীতলক্ষ্যা, বানার, বালু, সুতিয়া, তুরাগ, লৌহজং প্রভৃতি নদী প্রবাহিত হয়েছে।

গ) লালমাই পাহাড় : কুমিল্লা জেলা শহর থেকে ৮ কি.মি পশ্চিমে লালমাই পাহাড় অবস্থিত। এ এলাকার আয়তন ৩৪ বর্গকিলোমিটার (১৩ বর্গমাইল)। গড় উচ্চতা ২১ মিটার তবে কোনো কোনো স্থানে ৪৫ মিটার পর্যন্ত লক্ষ্য করা যায়। লালমাই এলাকার ভূমিরূপ কোনো পর্বতশ্রেণির অংশ নয়। এটি চ্যুতির মধ্যবর্তী অংশ হর্স্ট (Horst) শ্রেণিভুক্ত। এ অঞ্চলের মাটির রং লাল। পাহাড়গুলো লাল মাটি, নুড়ি, বালি ইত্যাদি দ্বারা গঠিত।

৩। সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি : টারশিয়ারি যুগের পাহাড়ি এলাকা এবং প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহ ব্যতীত সমগ্র বাংলাদেশ সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমির অন্তর্ভুক্ত। সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি অঞ্চলটি পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, যমুনা, মেঘনা প্রভৃতি নদ-নদী ও এদের উপনদী, শাখানদী বাহিত পলিমাটি দ্বারা গঠিত। এই অঞ্চলের মোট আয়তন ১,২৪,২৬৬ বর্গকিলোমিটার। বাংলাদেশের বৃহত্তম এ এলাকার নদীগুলো প্রায়ই গতি পরিবর্তনের কারণে নতুন নতুন পললভূমি গঠিত হতে দেখা যায়। এ সমভূমির গড় উচ্চতা প্রায় ৯ মিটার। প্লাবন সমভূমি পলি দ্বারা গঠিত বলে এ অঞ্চলের মাটির উর্বরতা তুলনামূলকভাবে অন্য এলাকার চেয়ে অনেক বেশি। এ এলাকাতে বিচ্ছিন্নভাবে বিল-ঝিল, হাওড়-বাঁওড় ছড়িয়ে রয়েছে যা দেশের ভূ-প্রকৃতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। দেশের সমগ্র সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি অঞ্চলটি একই ধরনের নয় বলে একে আবার নিম্নলিখিত কয়েকটি অঞ্চলে ভাগ করে আলোচনা করা যায়।

ক) কুমিল্লার বা ত্রিপুরার সমভূমি : কুমিল্লা, চাঁদপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার অধিকাংশ, লক্ষ্মীপুর, নোয়াখালী, ফেনী ও হবিগঞ্জ জেলার কিছু অংশ নিয়ে এ সমভূমি অঞ্চল গঠিত। এর আয়তন ৭,৪৩৩ বর্গকিলোমিটার। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে গড় উচ্চতা ৬ মিটার। বর্ষার সময় এ এলাকা প্লাবিত হয়। এ অঞ্চলে বেশকিছু নদী প্রবাহিত হয়েছে। নদীগুলো হলো- সালদা, বুড়ি, গোমতি, ডাকাতিয়া প্রভৃতি।

খ) পাদদেশীয় পলল সমভূমি : দেশের উত্তর-পশ্চিমাংশে অবস্থিত বৃহত্তম রংপুর, দিনাজপুর জেলার অধিকাংশ স্থান জুড়ে এ পাদদেশীয় পলল সমভূমি অঞ্চল বিস্তৃত। এই সমভূমির উচ্চতা ৩০.৫ মিটার। সর্বোচ্চ উচ্চতা ৯৩.৫ মিটার। পাদদেশীয় পলল সমভূমির মোট আয়তন ৪০০০ বর্গ কি.মি.। তিস্তা, আত্রাই, করতোয়া প্রভৃতি নদীবাহিত পলি জমা হয়ে পাদদেশীয় পলল সমভূমি অঞ্চলে ঢালু ভূমির সৃষ্টি হয়েছে।

গ) সিলেট অববাহিকা : বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভিবাজার ও হবিগঞ্জ জেলার অধিকাংশ এবং কিশোরগঞ্জ ও নেত্রকোনা জেলার পূর্বদিকের সামান্য কিছু অংশ নিয়ে সিলেট অববাহিকা অঞ্চল গঠিত। এই এলাকার দক্ষিণাঞ্চলের হ্রদগুলোকে হাওড় বলে। সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে এ অববাহিকার উচ্চতা প্রায় ৩ মিটার। বর্ষার সময় এ এলাকাটি পানিতে প্লাবিত হয়। হাকালুকি দেশের বৃহত্তম হাওড়।

ঘ) গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনার প্লাবন সমভূমি : বৃহত্তর ঢাকা, কুমিল্লা, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, পাবনা ও রাজশাহী অঞ্চলের অংশ বিশেষ নিয়ে এ প্লাবন সমভূমি গঠিত। এই অঞ্চলেও বেশ কিছু বিল ও হাওড় আছে। বাংলাদেশের বৃহত্তম বিল 'চলনবিল' এই এলাকাতে অবস্থিত। এ অঞ্চলের অধিকাংশ স্থানই বর্ষার সময় পানিতে প্লাবিত হয়।

ঙ) ব-দ্বীপ : বাংলাদেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাংশের সমভূমিকে ব-দ্বীপ বলা হয়। এ ব-দ্বীপ অঞ্চলটি বৃহত্তর কুষ্টিয়া, যশোর, ফরিদপুর, বরিশাল, পটুয়াখালীর সমস্ত অংশ এবং রাজশাহী, পাবনা, ঢাকা অঞ্চলের কিছু অংশ নিয়ে গঠিত। এ ব-দ্বীপ অঞ্চলকে আবার তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১। সক্রিয় ব-দ্বীপ : মেঘনা হতে পশ্চিমে গড়াই-মধুমতি নদী পর্যন্ত বিস্তৃত সমভূমির পূর্বাংশকে সক্রিয় ব-দ্বীপ অঞ্চল বলে।

২। মৃত প্রায় ব-দ্বীপ : গড়াই-মধুমতি নদীর পশ্চিমাংশকে মৃতপ্রায় ব-দ্বীপ বলা হয়। এটি বৃহত্তর যশোর ও কুষ্টিয়া অঞ্চলের অধিকাংশ স্থান জুড়ে বিস্তৃত।

৩। স্রোতজ সমভূমি : বাংলাদেশের ব-দ্বীপ অঞ্চলের দক্ষিণাংশ জোয়ার ভাঁটা দ্বারা প্রভাবিত হয় বলে এ অঞ্চলকে স্রোতজ সমভূমি বলে।

চ) চট্টগ্রামের উপকূলবর্তী সমভূমি : এ সমভূমি অঞ্চলটি ফেনী নদী হতে কক্সবাজারের কিছু দক্ষিণ অংশ পর্যন্ত বিস্তৃত। এ সমভূমি এলাকাটি গড়ে প্রায় ৯.৬ কিলোমিটার প্রশস্ত। এ অঞ্চলটি কর্ণফুলী, সাঙ্গু, মাতামুহুরী, বাঁশখালী প্রভৃতি নদীবাহিত পলল দ্বারা গঠিত।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশের মানচিত্র অংকন করে ভূ-প্রাকৃতিক অঞ্চল চিহ্নিত করুন।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশ এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত। তিনদিকের মূলভাগ ভারত ও মিয়ানমার দ্বারা বেষ্টিত এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর অবস্থিত। বাংলাদেশ পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ। ভূ-প্রকৃতির বিভিন্নতা অনুযায়ী বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-টারশিয়ারি যুগের পাহাড়সমূহ, প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহ এবং সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমি। দেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের পার্বত্য ভূমি এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলের কিছু পাহাড়ি এলাকা ব্যতীত সমগ্র দেশ সাম্প্রতিককালের নদী বিধৌত পলি দ্বারা গঠিত। যা এদেশের কৃষি খাতকে সমৃদ্ধ করেছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। নিচের কোনটি বাংলাদেশের দক্ষিণে অবস্থিত?
(ক) পশ্চিমবঙ্গ (খ) ত্রিপুরা (গ) মিয়ানমার (ঘ) বঙ্গোপসাগর

২। বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতিকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?
(ক) এক (খ) দুই (গ) তিন (ঘ) চার

৩। বাংলাদেশের বঙ্গোপসাগরের তটরেখার দৈর্ঘ্য কত?
(ক) ৭১২ কি.মি. (খ) ৭১৬ কি.মি. (গ) ৭২০ কি.মি. (ঘ) ৭২৫ কি.মি.

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

রহিম তাঁর বন্ধুদের নিয়ে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বেড়াতে গেলেন। তাঁরা দেখলেন অনেক উঁচু-নিচু পাহাড়, বিস্তৃত সমভূমি। পাহাড়ি অঞ্চলের সৌন্দর্য অবলোকন করলেন এবং দেশের ভূ-প্রকৃতি সম্পর্কে ধারণা পেলেন।

৪। লালমাই পাহাড় কোন জেলায় অবস্থিত?
(ক) কুমিল্লা (খ) নোয়াখালী (গ) চট্টগ্রাম (ঘ) সিলেট

৫। দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের পাহাড়গুলোর গড় উচ্চতা কত?
(ক) ৬১০ মিটার (খ) ৭১০ মিটার (গ) ৮১০ মিটার (ঘ) ৯১০ মিটার।

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১



ক. উদ্দীপকে উল্লিখিত চিত্রটি কীসের?
খ. পৃথিবীর ভূমিরূপগুলোর নাম উল্লেখ করুন।
গ. পাহাড় ও পর্বতের মধ্যে পার্থক্য লিখুন।
ঘ. ভঙ্গিল পর্বত ও আগ্নেয় পর্বত সম্পর্কে আলোকপাত করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-২

পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রকারের ভূমিরূপ দৃশ্যমান। এই ভূমিরূপগুলো উৎপত্তি ও গঠন ভিন্ন ভিন্ন। তাপ, চাপ, পানিসহ বিভিন্ন প্রকার শক্তি ভূমিরূপের ভিন্নতার জন্য দায়ী। এই সব নিয়ামক প্রকৃতিকে চলমানও রাখে।

ক. সমভূমি কাকে বলে?
খ. সঞ্চয়জাত সমভূমিগুলো আলোচনা করুন।
গ. মালভূমি কাকে বলে? মালভূমির প্রকারভেদ আলোচনা করুন।
ঘ. পৃথিবীর ভূমিরূপ সৃষ্টির বিভিন্ন পর্যায় বর্ণনা করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-৩

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি স্বাধীন ও উন্নয়নশীল দেশ। ধারণ ক্ষমতার অধিক জনশক্তি নিয়েও এ দেশ বরাবরই উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে শুধুমাত্র এর উর্বর ভূমি ও অনুকূল আবহাওয়ার কারণে।

ক. ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে বাংলাদেশকে কত ভাগে ভাগ করা যায় ও কী কী?
খ. বাংলাদেশের সাম্প্রতিককালের প্লাবন সমভূমিগুলোর নাম লিখুন।
গ. বাংলাদেশের টারশিয়ারি যুগের পাহাড় ও প্লাইস্টোসিনকালের সোপান সম্পর্কে তুলনামূলক আলোচনা কর।
ঘ. বাংলাদেশের মানচিত্র অঙ্কন করে বিভিন্ন প্রকার ভূ-প্রকৃতি দেখান।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.১ :	১. খ	২. ক	৩. ক		
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.২ :	১. ক	২. গ	৩. খ	৪.ক	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৩ :	১. খ	২. ক	৩. ক	৪. ঘ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৪ :	১. গ	২. ক	৩. ক	৪. গ	৫.ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৫ :	১. ক	২. খ	৩. খ	৪. খ	৫. ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৬ :	১. খ	২. খ	৩. ক	৪. ক	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৩.৭ :	১. ঘ	২. গ	৩. খ	৪. ক	৫. ক

পাঠ-৩.৮ ব্যবহারিক : সমোন্নিত রেখার সাহায্যে বিভিন্ন ভূমিরূপ প্রদর্শন
(Practical : Representation of Different Landforms by using Contour Lines)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- সমোন্নিত রেখার সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য জানতে পারবেন,
- সমোন্নিত রেখার সুবিধা-অসুবিধা বলতে পারবেন এবং
- সমোন্নিত রেখার সাহায্যে বিভিন্ন ভূমিরূপ প্রদর্শন করতে পারবেন।

সমোন্নতি রেখা

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে সমান উচ্চতাবিশিষ্ট স্থানগুলোকে মানচিত্রের ওপর যে রেখা দ্বারা সংযুক্ত করা হয় সে রেখাকে সমোন্নতি রেখা বা সমান উচ্চতা বিশিষ্ট রেখা বলে। আর যে মানচিত্রে ভূমিরূপের প্রকৃতি সমোন্নতি রেখার সাহায্যে দেখানো হয়, তাকে সমোন্নতি রেখা মানচিত্র বলে। যেমন- কোনো পাহাড়, মালভূমি বা দ্বীপের মানচিত্র বিভিন্ন উচ্চতার উপর দিয়ে অঙ্কিত সমোন্নতি রেখা দ্বারা উচ্চতা দেখানো হয়। এছাড়া সমোন্নতি রেখা রাস্তাঘাট, জলাধার, বসতি নির্মাণসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পরিকল্পনার রূপায়নে সাহায্য করে থাকে।

সুবিধা

১. সমোন্নতি রেখার সাহায্যে কোনো স্থানের কোন দিক ঢালু তা বুঝতে পারা যায়।
২. দুটি স্থানের উচ্চতা ও দূরত্বের পরিমাণ জানা থাকলে প্রকৃত ঢাল নির্ণয় করা যায়।
৩. ঘন সন্নিবেশিত সমোন্নতি রেখা খাড়া ঢাল এবং হালকা সন্নিবেশিত সমোন্নতি রেখা স্বাভাবিক ঢাল নির্দেশ করে।
৪. এ পদ্ধতির মাধ্যমে আপেক্ষিক ঢাল এবং ঢালের প্রকৃতি পরিমাপ করা যায়।
৫. সমোন্নতি রেখাগুলো সহজে অঙ্কন করা যায় এবং এগুলো মানচিত্রের অন্যান্য বর্ণনা বা তথ্য প্রকাশে বাধার সৃষ্টি করে না।
৬. স্বল্প কল্পনাশক্তি এবং অভ্যাসের মাধ্যমে সমোন্নতি রেখা দ্বারা যে কোনো দেশের ভূ-প্রকৃতির চিত্র অঙ্কন করা সম্ভব।

অসুবিধা

১. এ পদ্ধতির প্রধান অসুবিধা হচ্ছে যে, সমোন্নতি রেখার ব্যবধানের চেয়ে কম উচ্চতা বিশিষ্ট স্থান সমোন্নতি রেখা দ্বারা প্রকাশ করা যায় না।
২. প্রকৃত জরিপের মাধ্যমে বিভিন্ন স্থানের উচ্চতা নিরূপণ করা হয় বলে সমোন্নতি রেখার মাধ্যমে ভূমির বন্ধুরতা নির্দেশ অত্যন্ত ধীর, মন্থর ও ব্যয়বহুল পদ্ধতি।
৩. সমোন্নতি রেখা অঙ্কন করতে হলে প্রথমে বিভিন্ন স্থানের ভূমি জরিপ করে এদের উচ্চতা নির্ণয় করতে হয়।
৪. স্কেলের মধ্যে অনুপাত ঠিক না থাকলে উচ্চতা ঠিক বুঝা যায় না।
৫. অনেক সময় সমোন্নতি রেখাগুলো এত গায়ে গায়ে আঁকা থাকে যে, এদের উচ্চতার পরিমাপ লিখে রাখা সম্ভব হয় না।

সমোন্নতি রেখা থেকে ভূমির বন্ধুরতা প্রদর্শন

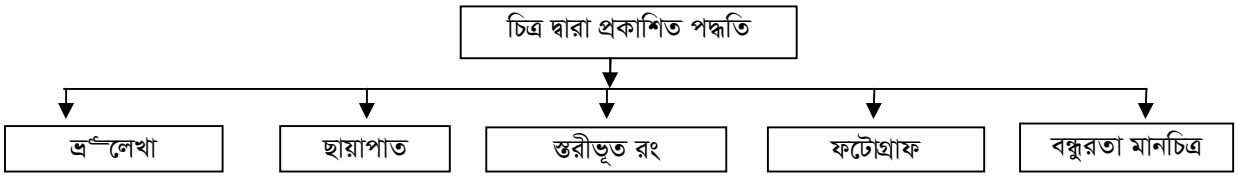
ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগের ভূ-প্রকৃতিকে সমতল কাগজের উপর দেখানো যতটা সহজ কিন্তু ভূ-অভ্যন্তর বা স্থলভাগের ভূ-প্রকৃতি ততটা সহজে সমতল কাগজের ওপর দেখানো যায় না। ভূ-প্রকৃতিকে বিশেষ কোনো কৌশল ও বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে দেখানো মানচিত্রকে বন্ধুরতা মানচিত্র (Relief Map) বা প্রাকৃতিক মানচিত্র (Physical Map) বলে।

সমরেখা অঙ্কন পদ্ধতি

মানচিত্রে উচ্চতা, গভীরতা বা ভূমির বন্ধুরতা দেখানোর জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে। এ পর্যন্ত উদ্ভাবিত উল্লেখযোগ্য পদ্ধতিগুলো হলো-

ক. চিত্র দ্বারা প্রকাশিত পদ্ধতি
খ. গাণিতিক পদ্ধতি এবং
গ. বিভিন্ন পদ্ধতির সমন্বয়ক।

ক. চিত্র দ্বারা প্রকাশিত পদ্ধতি : চিত্র দ্বারা প্রকাশিত পদ্ধতিতে নিম্নোক্ত পাঁচটি পদ্ধতিতে অঙ্কন করা যায়।



১। ভ্রংলেখা পদ্ধতি (Hachures) : ভ্রংলেখা হচ্ছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সরু রেখার সমষ্টি। এ রেখাগুলোকে পাহাড় বা পর্বতের ঢালের দিকে উপর থেকে নিচে টেনে সে স্থানের প্রকৃত বন্ধুরতা দেখানো হয়।

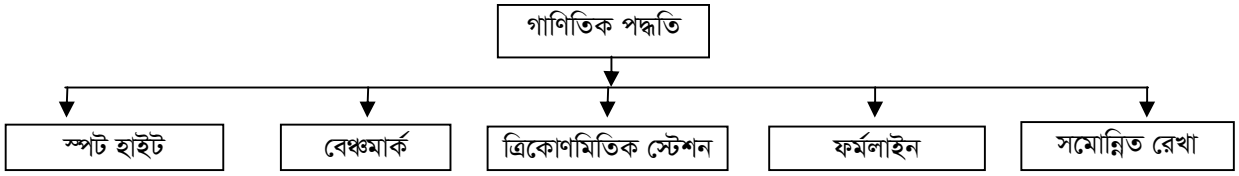
২। ছায়াপথ (Shading) : আলো ও ছায়াপাতের সাহায্যে যখন ভূ-ভাগের বন্ধুরতা নির্দেশ করা হয় তখন তাকে ছায়াপাত পদ্ধতি বলে। কোনো উঁচুভূমির একটি অংশ বেশি কালো ও অপর অংশ একটু বেশি সাদা রাখলে এর উচ্চতা সহজে বুঝা যায়। সমতল বন্ধুরতা বুঝানোর জন্য পাহাড়ের গাত্রদেশ খাড়া অংশে কালো রেখা অঙ্কন করা হয়। আবার মালভূমি, উপত্যকা তল, পাহাড়ের সমতল প্রভৃতি অংশ বুঝানোর জন্য ভিন্ন ভিন্ন হালকা বা গাঢ় রেখা অংকন করা হয়। মানচিত্রে ব্যবহৃত ছায়াপাতের একটি সূচক উল্লেখ করা হয়।

৩। স্তরীভূত রং পদ্ধতি (Layer Tint Method): কোনো স্থানের বন্ধুরতা দেখানোর জন্য যখন মানচিত্রে নানা প্রকার রঙ ব্যবহার করা হয় তখন তাকে স্তরীভূত রং পদ্ধতি বলে। এক্ষেত্রে একেকটি রং একেকটি উচ্চতা নির্দেশ করে। সাধারণত নিম্নভূমি দেখানোর জন্য সবুজ, অপেক্ষাকৃত উচ্চভূমি দেখানোর জন্য হলুদ এবং অধিক উচ্চতা দেখানোর জন্য খয়েরি রং ব্যবহার করা হয়।

৪। ফটোগ্রাফ পদ্ধতি (Photograph Method) : এরোপ্লেন থেকে ভূ-পৃষ্ঠের কোনো বিস্তীর্ণ অঞ্চলের আলোকচিত্র তুলে প্রদর্শন করাকে ফটোগ্রাফ পদ্ধতি বলে।

৫। বন্ধুরতা মানচিত্র ও মডেল পদ্ধতি (Relief Map and Model Method): কাদামাটি, পুটিং, প্লাস্টার, কাগজের মন্ড প্রভৃতি বিভিন্ন উপাদান ব্যবহার করে পৃথিবীর বিভিন্ন অংশের যে বন্ধুরতা মানচিত্রে দেখানো হয় তাকে বন্ধুরতা মানচিত্র ও মডেল বলে।

খ. গাণিতিক পদ্ধতি : গাণিতিকভাবেও নিম্নোক্ত পাঁচটি পদ্ধতিতে সমরেখা অঙ্কন করা যায়।



১। স্পট হাইট (Spot Height) : কোনো স্থানের প্রকৃত উচ্চতা সমুদ্র সমতল থেকে জরিপ করে নির্দেশ করা হয়। এ পদ্ধতিতে মানচিত্রের উপর বিন্দু ও এর পাশে সংখ্যা দ্বারা সমতল থেকে কোনো স্থানের উচ্চতা ফুট বা মিটারে প্রকাশ করা হয়। এ উচ্চতাগুলো লক্ষ্য করে কোনো স্থান কত উঁচুতে তা সহজে বুঝতে পারা যায়।

২। বেঞ্চ মার্ক (Bench Mark) : কোনো অট্টালিকা বা ইট, পাথর, সিমেন্ট প্রভৃতি দ্বারা তৈরি জমাটবদ্ধ স্তম্ভের গায়ে সমুদ্র সমতল থেকে ঐ স্থানের উচ্চতা লেখা হলে তাকে বেঞ্চ মার্ক বলে। জরিপের মাধ্যমে বা ব্যারোমিটারের সাহায্যে এরূপ উচ্চতা নির্ণয় করা হয়। মানচিত্রে এগুলো **B.M** দ্বারা চিহ্নিত করে এর পাশে সে স্থানের উচ্চতা ফুট বা মিটারে লেখা হয়।

৩। ত্রিকোণমিতিক ষ্টেশন (Trigonometrical Station) : এটি ভূ-পৃষ্ঠের উপরিস্থিত বিভিন্ন বিন্দু যা ত্রিভুজীকরণ পদ্ধতির জরিপের ষ্টেশন হিসেবে ব্যবহৃত হয়। মানচিত্রের উপর এদেরকে ক্ষুদ্র নিরেট (Solid) ত্রিভুজ দ্বারা চিত্রিত করে তার পাশে সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা লিখতে হয়।

৪। সমোন্নতি রেখা (Contour Line) : সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে সমান উচ্চতা বিশিষ্ট স্থানগুলোকে মানচিত্রের উপর যে আঁকাবাঁকা রেখা দ্বারা সংযুক্ত করা হয় সে রেখাকে সমোন্নতি রেখা বা সমোচ্চ রেখা বলে। মানচিত্রে এরূপ সমোন্নতি রেখার সাহায্যে কোনো স্থানের বন্ধুরতা দেখানো হয়।

৫। ফর্ম লাইন (Form Lines) : যন্ত্রের সাহায্যে নিরূপিত সমোন্নতি রেখাগুলোর মধ্যস্থলে যেসব স্থানে যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চতা নিরূপণ করা সম্ভব হয়না সেখানে উচ্চতা কত হতে পারে তা আনুমানিকভাবে নিরূপণ করে ভাঙ্গা রেখা দ্বারা ঐরূপ সমোন্নতি বিশিষ্ট স্থানগুলো যোগ করলে তাকে ফর্ম লাইন বলা হয়।

গ. বিভিন্ন পদ্ধতির সমন্বয় (Combination of Several Methods) : আধুনিক প্রাকৃতিক মানচিত্রের অধিকাংশেই বিভিন্ন পদ্ধতির সমন্বয়ে বন্ধুরতা দেখানো হয়। যেমন- যখন সমোন্নতি রেখাগুলোর মধ্যস্থিত ব্যবধান খুব বেশি হয় তখন অপ্রধান ভূমিরূপ দেখানোর জন্য ভ্রূলেখার সাহায্য নেওয়া হয়। অথবা অনেক সময় সমোন্নতি রেখা ও ভ্রূলেখা দ্বারা অঙ্কিত মানচিত্রে স্থানীয় উচ্চতা সংযোগ করে মানচিত্রের উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করা হয়।

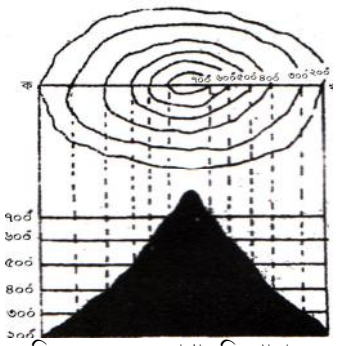
সমোন্নতি রেখার সাহায্যে কতিপয় ভূমিরূপ প্রদর্শন

ভূমিরূপের বন্ধুরতা প্রদর্শন করার জন্য উত্তম পদ্ধতি হলো সমোন্নতি রেখা। সমোন্নতি রেখা দ্বারা ভূমিরূপের চিত্র মোটামুটি সঠিকভাবে প্রদর্শন করা যায়। সমোন্নতি রেখার আকার ও আকৃতির ওপর নির্ভর করে ভূমির প্রকৃত বন্ধুরতা। যেমন- কোনো স্থানের সমোন্নতি রেখাগুলো যদি ঘন হয় তাহলে সে স্থানের ভূমিরূপ হবে খাড়া বা অধিক ঢালযুক্ত। পক্ষান্তরে, রেখাগুলো যদি অপেক্ষাকৃত দূরে দূরে অবস্থিত হয় তাহলে বুঝতে হবে সেখানকার ভূমিরূপ কম ঢালযুক্ত। নিম্নে সমোন্নতি রেখার সাহায্যে ভূমিরূপ ও তার পার্শ্বচিত্র দেখানো হলো-

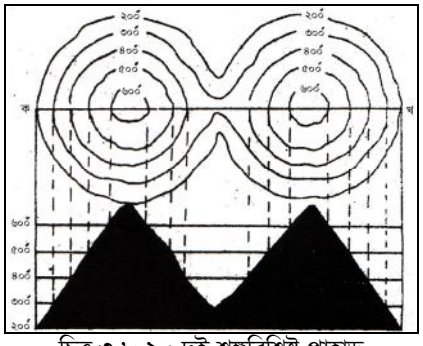
১. কোণাকৃতির পাহাড় (Conical Hill) : ভূমি চতুর্দিক থেকে প্রায় সমান হারে উঁচু হয়ে যে পাহাড়ের সৃষ্টি করে তার আকৃতি শাঙ্কব এর মতো বা কোণাকৃতির হয়। তাই এ পাহাড়কে কোণাকৃতির পাহাড় বা শাঙ্কব আকৃতির পাহাড় বলে (চিত্র ৩.৮.১)। শাঙ্কব আকৃতি বা কোণাকৃতির পাহাড়ের সমোন্নতি রেখাগুলো সাধারণত প্রায় বৃত্তাকার হয়। এদের উচ্চতা বৃত্তের বাইরের দিক থেকে ভিতরের দিকে ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে। অবশেষে পাহাড়ের চূড়ায় সবচেয়ে বেশি হয়।

২. দুই শৃঙ্গবিশিষ্ট পাহাড় (Double Peak Hill) : বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে বেশ কয়েকটি সমোন্নতি রেখা বৃত্তাকারে অবস্থিত হলে এবং তারপর এর দুই অংশে পৃথকভাবে বিভিন্ন উচ্চতাবিশিষ্ট কয়েকটি বৃত্তাকার সমোন্নতি রেখা অঙ্কিত হলে ঐ এলাকায় বিস্তৃত পাহাড়ি অঞ্চলকে দুটি শৃঙ্গের মতো দেখায়। এ জাতীয় পাহাড়ের দুটি শৃঙ্গ থাকায় একে দুই শৃঙ্গবিশিষ্ট পাহাড় বলে (চিত্র ৩.৮.২)। দুই শৃঙ্গবিশিষ্ট পাহাড়কে আবার ম্যাসিক বলা হয়।

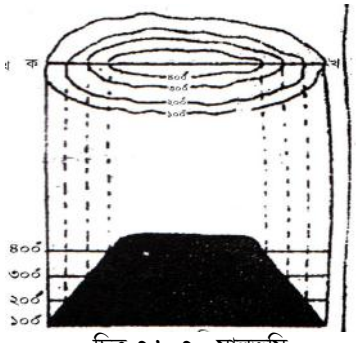
৩. মালভূমি (Plateau) : বিস্তীর্ণ স্থান জুড়ে যে উঁচু সমতল ভূমি বিদ্যমান থাকে তাকে মালভূমি বলে (চিত্র ৩.৮.৩)। এর পার্শ্বদেশ খুব খাড়া ঢালবিশিষ্ট। সমোন্নতি রেখাগুলো পরস্পরের খুব কাছাকাছি থাকে। এ ঢাল বেয়ে বিভিন্ন নদী বয়ে যেতে পারে। এসব নদী দ্বারা মালভূমি ব্যবচ্ছেদিত হয়।



চিত্র ৩.৮.১ : কোণাকৃতি পাহাড়



চিত্র ৩.৮.২ : দুই শৃঙ্গবিশিষ্ট পাহাড়

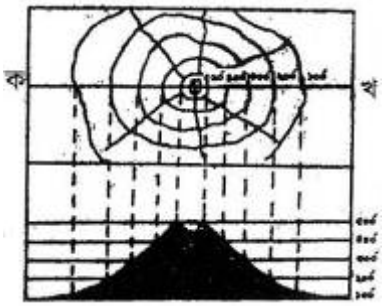


চিত্র ৩.৮.৩ : মালভূমি

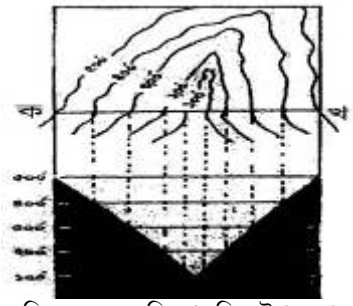
৪. আগ্নেয়গিরি (Volcano) : ভূ-পৃষ্ঠের কোনো দুর্বল অংশ বা ফাটল দিয়ে পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ উত্তপ্ত গলিত পদার্থ নির্গত হয়ে তা সঞ্চিত হলে যে পাহাড়ের সৃষ্টি হয় তাকে আগ্নেয়গিরি বলে (চিত্র ৩.৮.৪)। আগ্নেয়গিরির কেন্দ্রস্থলে একটি গহ্বর বা মুখ থাকে, এ মুখকে জ্বালামুখ বলে।

৫. 'ভি' আকৃতির উপত্যকা (V. Shaped Valley) : কোনো উপত্যকার পাশের দিকের ঢাল অধিক খাড়া ও নিচের ভূ-ভাগ সংকীর্ণ হলে যে উপত্যকার সৃষ্টি হয় তা ইংরেজি 'V' অক্ষরের মতো দেখায়। এজন্য একে 'V' আকৃতির উপত্যকা বলে (চিত্র ৩.৮.৫)। এতে ঢাল সাধারণত উত্তল হয়। যে স্থানে সমোন্নতি রেখার মান কম সেখানে ঐ রেখাগুলো ঘন সন্নিবিষ্ট ও উপত্যকার গায়ে দূরে বিন্যস্ত হয়।

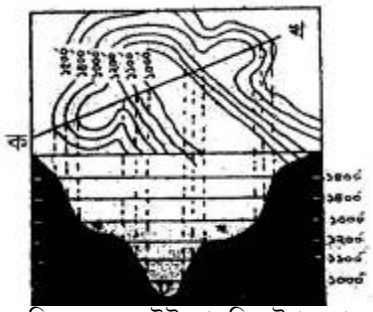
৬. 'ইউ' আকৃতির উপত্যকা (U. Shaped Valley) : হিমবাহ প্রবাহিত অঞ্চলে U- আকৃতির উপত্যকা দেখা যায়। মানচিত্রে এটি চওড়া উপত্যকার উভয় পাশে ঘন সন্নিবিষ্ট সমোন্নতি রেখার সাহায্যে দেখানো হয়। V-আকৃতির উপক্যতার ন্যায় এ ক্ষেত্রেও সমোন্নতি রেখার মান ভিতর থেকে বর্হিদেশে ক্রমশ অধিক। হিমবাহ অঞ্চলে কোন ছোট উপত্যকা প্রধান উপত্যকার মধ্যে পতিত হলে তাকে ঝুলন্ত উপত্যকা বলে। এ ক্ষেত্রে U-আকৃতির সমোন্নতি রেখার ডান বা বাম বা উভয় পাশের বহির্দেশের সমোন্নতি রেখাগুলো অনেকটা গোলাকৃতি হয়ে ঝুলন্ত উপত্যকার অবস্থান নির্দেশ করে (চিত্র: ৩.৮.৬)।



চিত্র ৩.৮.৪ : আগ্নেয়গিরি



চিত্র ৩.৮.৫ : ভি আকৃতির উপত্যকা

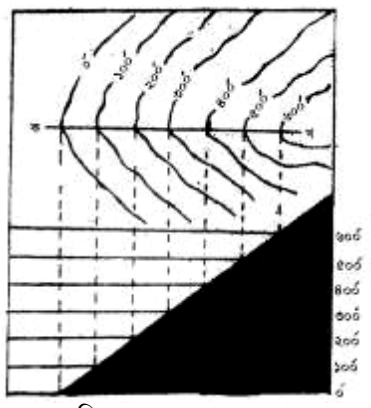


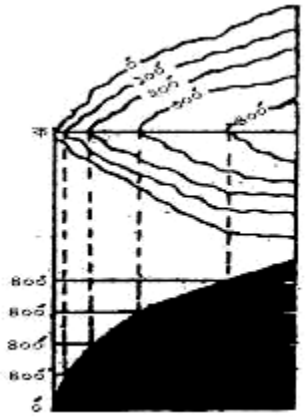
চিত্র ৩.৮.৬ : ইউ আকৃতির উপত্যকা

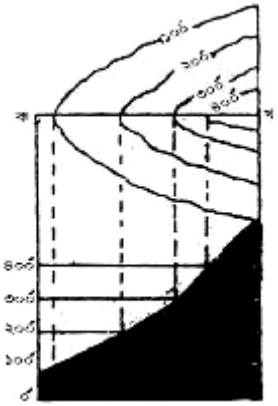
৭. সুষম ঢাল (Uniform Slope) : যে ঢাল খাড়াভাবে নেমে যায় তাকে সুষম বা সমান ঢাল বলে। সুষম ঢালের সমোন্নতি রেখাগুলো সাধারণত সমান দূরে দূরে অবস্থান করে (চিত্র ৩.৮.৭)।

৮. উত্তল ঢাল (Convex Slop) : ভূমিরূপের মধ্যভাগ উঁচু ও দুই পাশ নিচু হলে সমোন্নতি রেখার মাধ্যমে যে ঢাল সৃষ্টি হয় তাকে উত্তল ঢাল বলে (চিত্র ৩.৮.৮)। উত্তল ঢালের সমোন্নতি রেখাগুলো সাধারণত ঘন হয় এবং উপরের দিকে একটি থেকে অপরটি দূরে দূরে অবস্থান করে।

৯. অবতল ঢাল (Concave Slope) : যখন কোনো ভূ-ভাগে উঁচু থেকে নিচের দিকে নামার সময় ঢালটি আস্তে আস্তে ভেতরের দিকে বেঁকে যায় তখন যে ঢালের সৃষ্টি হয় তা অবতল ঢাল (চিত্র ৩.৮.৯)। এ ঢালের সমোন্নতি রেখাগুলো উপরের দিকে ঘন ও নিচের দিকে ক্রমশ দূরে সরে যায়।

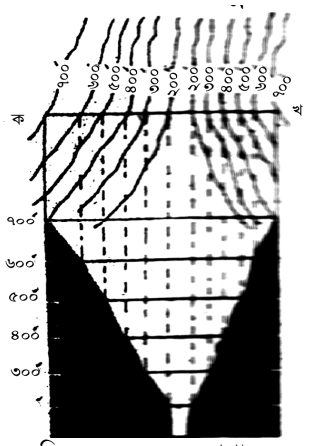

চিত্র ৩.৮.৭ : সুষম ঢাল


চিত্র ৩.৮.৮ : উত্তল ঢাল

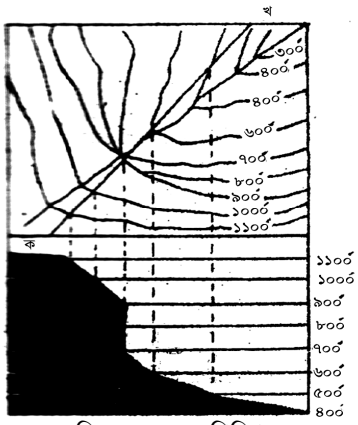

চিত্র ৩.৮.৯ : অবতল ঢাল

১০. জলপ্রপাত (Waterfall) : নদী উপত্যকায় পাশাপাশি কঠিন ও নরম শিলা থাকলে নরম শিলা অতি দ্রুত ক্ষয়প্রাপ্ত হয় ও কঠিন শিলা খাড়াভাবে দাঁড়িয়ে থাকে। এই ধরনের ঢালের জন্য জলপ্রপাত তৈরি হয় (চিত্র ৩.৮.১০)।

১১. গিরিখাত (Gorge): পার্বত্য অঞ্চলে যদি উত্তল ঢাল খুব খাড়া হয়ে পাহাড়ে প্রবেশ করে তাহলে গিরিখাতের সৃষ্টি হয়। এরূপ গিরিখাতের সমোন্নতি রেখাগুলো খুব ঘন ঘন সন্নিবেশিত হয়ে অগ্রসর হয়া অনেক সময় গিরিখাতের মধ্য দিয়ে নদী প্রবাহিত হয় (চিত্র: ৩.৮.১১)।



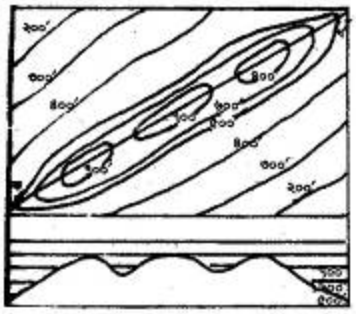
চিত্র ৩.৮.১০ : জলপ্রপাত

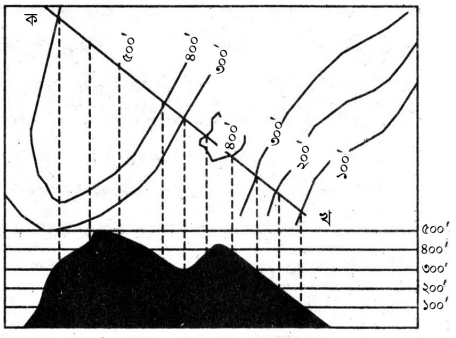


চিত্র ৩.৮.১১ : গিরিখাত

১২. শৈলশিরা (Ridge) : দূরে দূরে বিন্যস্ত সমোন্নতি রেখার মধ্যে যদি কোথাও ঘন ঘন দুই একটি সমোন্নতি রেখা থাকে তবে তা একটি উচ্চভূমির নির্দেশ করে। এরূপ উচ্চভূমিকে শৈলশিরা বলে (চিত্র ৩.৮.১২)।

১৩. নল বা ক্ষুদ্র টিলা (Knoll) : পাহাড় ও টিলা অপেক্ষা নিচু ইতস্তত বিচ্ছিন্ন নাতি উঁচু ঢিবি জাতীয় সাধারণত গোলাকৃতি স্বতন্ত্র উচ্চভূমিকে নল বা গোলাকার ক্ষুদ্র টিলা বলে। সমভূমি অঞ্চলে প্রায়ই শিলারাশি সঞ্চিত হয়ে ক্ষুদ্র টিলা আকৃতির নলের সৃষ্টি হয় (চিত্র ৩.৮.১৩)।


চিত্র ৩.৮.১২ : শৈলশিলা



চিত্র ৩.৮.১৩ : নল বা ক্ষুদ্র টিলা

শিক্ষার্থীর কাজ	কোণাকৃতির পাহাড়, দুই শৃঙ্গবিশিষ্ট পাহাড়,মালভূমি, গিরিখাত, জলপ্রপাত ভূমিরূপসমূহের সমোন্নতি রেখা ও তার পার্শ্বচিত্র অঙ্কন করুন।

ইউনিট ৪

ভূমিরূপ পরিবর্তন
(Changes of Landform)

ভূমিকা

বিভিন্ন ধরনের ভূমিরূপের মধ্যে পাহাড়-পর্বত, গভীর সমুদ্রখাত, মালভূমি, সমভূমি ও মরুভূমি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, ভূমিকম্প, বিচূর্ণীভবন ও নগ্নীভবন, সুনামি প্রভৃতি কারণে ভূমিরূপের আকস্মিক পরিবর্তন হয়। অপরদিকে সূর্যতাপ, বায়ুপ্রবাহ, বৃষ্টিপাত, নদী, হিমবাহ ইত্যাদির প্রভাবে ভূমিরূপের ধীরগতিতে পরিবর্তন হয়। ভূমিরূপের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন মূলত ভূ-আন্দোলন ও পাত সঞ্চালনের জন্য হয়ে থাকে। এই ইউনিটে ভূ-আন্দোলন, পাত সঞ্চালন, ভূমিকম্প আগ্নেয়গিরি ও সুনামি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।






ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ ৪.১ : ভূ-আন্দোলন
পাঠ ৪.২ : পাত সঞ্চালন
পাঠ ৪.৩ : ভূমিকম্পের কারণ, ফলাফল ও প্রভাব
পাঠ ৪.৪ : ভূমিকম্প তরঙ্গ ও ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চল
পাঠ ৪.৫ : আগ্নেয়গিরি, আগ্ন্যুৎপাত ও এর প্রভাব
পাঠ ৪.৬ : সুনামি ও এর প্রভাব

পাঠ-৪.১ ভূ-আন্দোলন (Diastrophism)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ভূ-আন্দোলন সম্পর্কে বলতে পারবেন এবং
- মহীভাবক ও গিরিজনি আন্দোলন ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

ভূ-আন্দোলন

ভূ-অভ্যন্তরস্থ প্রচন্ড তাপ ও চাপের ফলে ভূ-অভ্যন্তরে পরিচলন স্রোতের সৃষ্টি হয়। এই পরিচলন স্রোতের ফলে ভূ-অভ্যন্তরে প্রবল শক্তির উদ্ভব হয়। পৃথিবীর অভ্যন্তরের এই শক্তি ভূ-পৃষ্ঠে বা ভূ-ত্বকে এবং সমুদ্র তলদেশের ভূমিরূপে আঞ্চলিক বা মহাদেশীয় ভূ-গঠন কাঠামোর যে পরিবর্তন ঘটায় তাকে ভূ-আন্দোলন বলে। ভূ-আন্দোলনের ফলে গঠিত ভূমিরূপের উপর ভিত্তি করে ভূ-আন্দোলনকে প্রধান দুইটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। যথা-
১. মহীভাবক আন্দোলন এবং ২.গিরিজনি আন্দোলন।

১. মহীভাবক আন্দোলন (Epeirogenic Movement) : মহীভাবক আন্দোলন মহাদেশসমূহের ভূ-পৃষ্ঠে লম্বভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করে মালভূমি, চ্যুতি, চ্যুতি ভৃগু তট, স্রস্ত উপত্যকা, স্তূপ পর্বত প্রভৃতি ভূমিরূপ তৈরি করে। যেমন- পূর্ব আফ্রিকা ও জর্ডানের স্রস্ত উপত্যকাসমূহ, রাইন নদীর স্রস্ত উপত্যকা। এছাড়াও উত্তর আমেরিকার হাডসন উপসাগরের দ্বীপসমূহ মহীভাবক আন্দোলনের ফলে ভূ-ভাগ নিমজ্জিত হয়ে গঠিত হয়েছে।

২. গিরিজনি বা আনুভূমিক আন্দোলন (Orogenic or Horizontal Movement) : সমুদ্রগর্ভের বিশাল অঞ্চল জুড়ে আনুভূমিকভাবে গিরিজনি আন্দোলন ঘটে। গিরিজনি আন্দোলনে সংকোচনের ফলে ভূ-পৃষ্ঠের কোথাও সংকোচন এবং টানের ফলে কোথাও প্রসারণ ঘটে। ফলে সমুদ্রগর্ভে সঞ্চিত পলি সংকুচিত হয়ে ভাঁজের সৃষ্টি হয় এবং কালক্রমে ভূ-পৃষ্ঠের ওপর উত্থিত হয়ে বিশালাকার ভঙ্গিল পর্বত গঠন করে। বিশালায়তনের ভঙ্গিল পর্বত সৃষ্টি হয় বলেই একে গিরিজনি আন্দোলন বলে। যেমন- ইউরোপের আল্পস, উত্তর আমেরিকার রকি এবং দক্ষিণ আমেরিকার আন্দিজ প্রভৃতি ভঙ্গিল পর্বত। ভঙ্গিল পর্বতের প্রত্যেক ভাঁজের সর্বোচ্চ অংশকে উর্ধ্বভঙ্গ বা উর্ধ্বভাঁজ (Anticline) এবং সর্বনিম্ন অংশকে অধঃভঙ্গ বা অধঃভাঁজ (Syncline) বলে (চিত্র ৪.১.১)।

ভূ-আন্দোলনের সৃষ্ট ভূমিরূপ : ভূ-আন্দোলনের ফলে ভূ-ত্বকের শিলাসমূহের পরিবর্তনকে প্রধান চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা- ১. ভাঁজ ২. সাধারণ বক্রতা ৩. ফাঁটল ৪. চ্যুতি।

১. ভাঁজ (Fold) : পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ তাপ বিকিরণ করে শীতল হয়ে সংকুচিত হয় ফলে ভাঁজের সৃষ্টি হয়। এই ভাঁজের দৈর্ঘ্য ও বিস্তার এক ইঞ্চি হতে কয়েক মাইল পর্যন্ত হয়। গিরিজনি আন্দোলনের ফলে ভাঁজের সৃষ্টি হয়। সাধারণত পাঁচ ধরনের ভাঁজ সৃষ্টি হতে পারে। যথা: সরল ভাঁজ, সুষম ভাঁজ, বিষম ভাঁজ, হেলান ভাঁজ ও শায়িত ভাঁজ।

২. সাধারণ বক্রতা (Gentle Fold) : গিরিজনি আন্দোলনের সময় অধিকাংশ ক্ষেত্রে পৃথিবীর বিশাল অংশ বক্রভাবে উর্ধ্বদিকে ও নিম্নদিকে অবস্থান করে। এই বক্রতার দৈর্ঘ্য ও বিস্তার কয়েক কিলোমিটার হতে কয়েকশত কিলোমিটার পর্যন্ত হতে পারে। বক্রতার উর্ধ্বে উত্থিত অংশকে উর্ধ্বভঙ্গ (Anticline) এবং নিম্নে অবনত অংশকে অধঃভঙ্গ (Syncline) বলে। কিন্তু বহুদূর ব্যাপী বিস্তৃত উর্ধ্বে উত্থিত অংশকে ব্যাপ্ত উর্ধ্বভাঁজ (Geoanticline) এবং নিচে অবনমিত অংশকে ব্যাপ্ত অধঃভাঁজ (Geosyncline) বলে (চিত্র ৪.১.১)।

৩. ফাঁটল (Crack) : ভূ-আন্দোলনের ফলে ভূ-পৃষ্ঠে ফাঁটল সৃষ্টি হয়। এই ফাঁটল খাড়া বা হেলানভাবে হতে পারে। ফাঁটল বরাবর চ্যুতি গঠিত হয় (চিত্র ৪.১.২)।

৪. **চ্যুতি (Fault) :** ভূ-আলোড়নের ফলে ভূ-পৃষ্ঠের ফাঁটলের একদিকের অংশ স্থানচ্যুত হয়ে ভূ-গর্ভে বসে যায়। একে চ্যুতি বলে।



চিত্র ৪.১.১: সাধারণ বক্রতা


চিত্র:৪.১.২ ফাঁটল

শিক্ষার্থীর কাজ	''ভূ-আন্দোলনের ফলে ভূমিরূপের পরিবর্তন'' ভূ-পৃষ্ঠের স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নিয়ম। শিক্ষার্থীরা ভূ-আন্দোলনের গুরুত্ব সম্পর্কে তাদের মতামত প্রদান করবেন।

সারসংক্ষেপ

ভূ-অভ্যন্তরস্থ প্রচন্ড শক্তির ফলে ভূমিরূপের যে পরিবর্তন হয় তাকে ভূ-আন্দোলন বলে। পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ উত্তপ্ত বলে চাপ ও তাপের যে তারতম্য সৃষ্টি হয় তাতে ভূ-অভ্যন্তরে প্রচন্ড শক্তির সৃষ্টি হয় এবং ভূ-ত্বকের আকস্মিক ও ধীর পরিবর্তন হয়। ভূ-আন্দোলন প্রধানত দু'প্রকার। যথা মহীভাবক আন্দোলন ও গিরিজনি আন্দোলন। ভূ-আন্দোলনের ফলে ভূ-পৃষ্ঠে যে ভাঁজ, বক্রতা, ফাঁটল ও চ্যুতি সৃষ্টি হয় তাতে বিভিন্ন ধরনের ভূমিরূপ তৈরি হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.১

সঠিক উত্তরের পাশ টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ভূ-পৃষ্ঠে আকস্মিক পরিবর্তন হয়-
i. ভূমিকম্পের প্রভাবে ii. সুনামির প্রভাবে iii. আগ্নেয়গিরির প্রভাবে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ২ এবং ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।
ভূগোল বিষয়ের টিউটর একাদশ শ্রেণির ভূগোল ক্লাসে বললেন, ভূ-আলোড়নের ফলে ভূ-ত্বকের শিলাসমূহ নানাভাবে পরিবর্তিত হয়। এমনকি পৃথিবীর উচ্চতম ও বিস্তৃত পর্বতগুলোও ভূ-আলোড়নের ফলে সৃষ্টি হয়েছে।

২। টিউটরের ক্লাসে আলোচিত পর্বতমালাগুলো কোন ধরনের ভূ-আলোড়নের ফলে সৃষ্টি হয়েছে?
(ক) মহীভাবক (খ) গিরিজনি আন্দোলন (গ) মহীভাবক ও গিরিজনি আন্দোলন(ঘ)কোনটিই নয়

৩। গিরিজনি আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে-
i. সমুদ্রগর্ভের বিশাল অঞ্চল জুড়ে আলোড়ন ঘটে ii. গিরিজনি আন্দোলন আনুভূমিকভাবে হয়ে থাকে
iii. সমুদ্রগর্ভে সঞ্চিত পলি সংকুচিত হয়ে ভাঁজের সৃষ্টি করে
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৪। মহীভাবক আলোড়নের ফলে কী সৃষ্টি হয়?
(ক) মালভূমি (খ) পর্বত (গ) সমুদ্র (ঘ) মরুভূমি

পাঠ-৪.২ পাত সঞ্চালন (Plate Movement)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

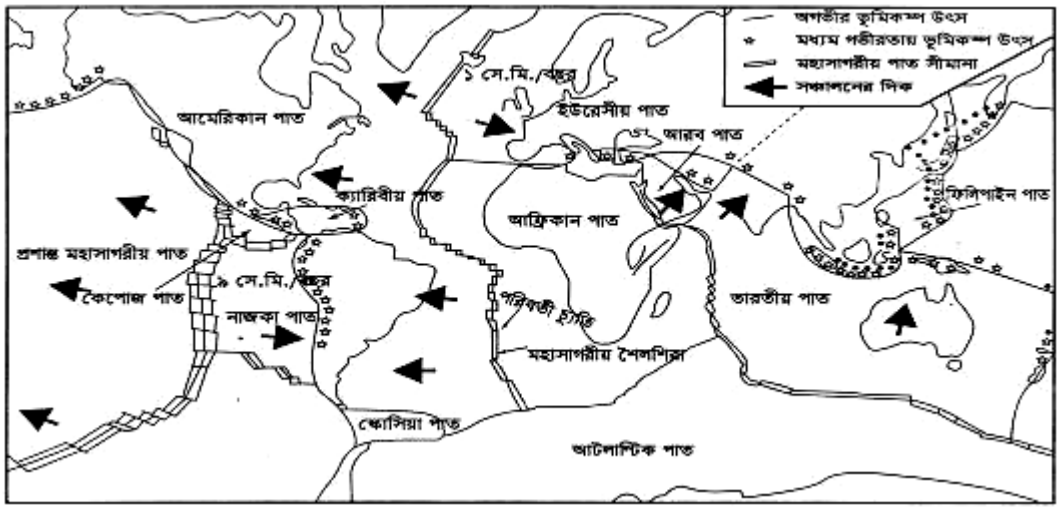
- পাত সঞ্চালন মতবাদ এবং পাত সঞ্চালন গতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পাত সঞ্চালন

সমুদ্রের তলদেশ, মহাদেশ, মালভূমি, পর্বত প্রভৃতি গঠন সংক্রান্ত বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে সর্বাধুনিক মতবাদ পাত সঞ্চালন মতবাদ (Plate Tectonic Theory)। এ মতবাদটি ১৯১২ সালে আলফ্রেড ওয়েগনার (Alfred Wegner) সর্বপ্রথম প্রবর্তন করেন যা মহাদেশীয় ভূ-ভাগ সঞ্চালন মতবাদ নামে পরিচিত ছিল। পরবর্তীতে ১৯৬৮ সালে ফরাসী ভূ-বিজ্ঞানী জেভিয়ার লি-পিনচন (Xebier-le-Pinchon) এ মতবাদ প্রদান করেন।

তত্ত্বের মূল বক্তব্য (Main Theme of the Theory) : জেভিয়ার লি-পিনচন (Xebier-le-Pinchon) এর মতে, পৃথিবীর ভূ-ত্বক, প্রধান ৭টি পাত, ৯টি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র পাত এবং ১৯টি অতি ক্ষুদ্র পাতের সমন্বয়ে গঠিত (চিত্র : ৪.২.১)। বিভিন্ন আকৃতির পাতের মধ্যে ৭টি বৃহৎ আকৃতির পাত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যথা-

১. প্রশান্ত মহাসাগরীয় পাত
২. ইউরেশিয়ান পাত
৩. উত্তর আমেরিকান পাত
৪. দক্ষিণ আমেরিকান পাত
৫. আফ্রিকান পাত
৬. অস্ট্রেলীয় পাত এবং
৭. অ্যান্টার্কটিকা পাত।



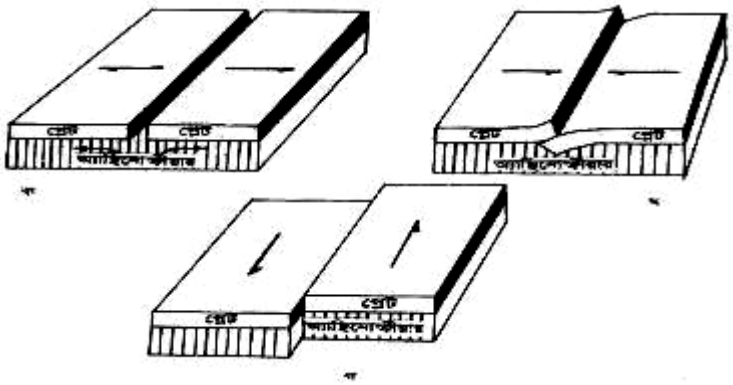
চিত্র : ৪.২.১ পৃথিবীর বিভিন্ন পাতের অবস্থান ও গতির দিক

বড় বড় পাতগুলো মহাসাগরীয় খাড়ী (Mid Oceanic Ridge) এবং ছোট ছোট পাতগুলো চ্যুতি (Fault) দ্বারা বিভক্ত। মহাদেশীয় পাতগুলো মহাসাগরীয় পাতের ওপর ভাসমান অবস্থায় রয়েছে। আবার মহাসাগরীয় পাতের নীচে রয়েছে ভূ-ত্বকের নিম্নাংশ যা স্থিতিস্থাপক হলেও চাপের তারতম্যের কারণে গতিশীল হয়। এছাড়া প্রচন্ড তাপের দরুণ ভূ-অভ্যন্তরে যে

পরিচলন স্রোতের সৃষ্টি হয় তাতে মহাসাগরীয় পাতের ফাটল দিয়ে ম্যাগমা ওপরের দিকে উঠতে থাকে এতে মহাদেশীয় পাতগুলোও গতিশীল হয়। গতিশীলতার পরিমাণ খুব কম, বছরে ১০-২০ মি.মি.। ফলশ্রুতিতে বিশাল পাতগুলো কোনো কোনো স্থানে পরস্পরকে আঘাত করে, পরস্পর হতে দূরে সরে যায়। আবার কোথাও পাশাপাশি বিপরীত দিকে গতিশীল হয়। পাতসমূহের এই ধরনের গতিশীলতার জন্য ভূমিকম্প হয় এবং সমুদ্রের তলদেশে পাললিক শিলাস্তর সংকুচিত হয়ে দুটি পাতের সংযোগ রেখা বরাবর ভঙ্গিল পর্বত সৃষ্টি হয়।

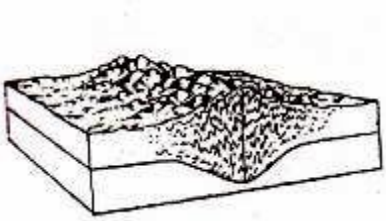
পাত সঞ্চালন গতি (Plate Movement) : বিভিন্ন ধরনের পাতগুলোর মধ্যে যেগুলো সমুদ্রতলে অবস্থান করছে তাদের মহাসাগরীয় পাত এবং যে পাতগুলো মহাদেশ গঠন করছে তাদের মহাদেশীয় পাত বলা হয়। পাতসমূহের প্রধান তিন ধরনের গতি লক্ষ্য করা যায়। যথা

ক. সংকোচন গতি
খ. সম্প্রসারণ গতি এবং
গ. পার্শ্বীয় গতি (চিত্র: ৪.২.২)।



চিত্র : ৪.২.২ পাতের বিভিন্ন গতি(ক. সংকোচন গতি, খ. সম্প্রসারণ গতি এবং গ পার্শ্বীয় গতি)

সংকোচন গতি (Compressional Movement) : দু'টো পাতের পরস্পরের দিকের গতিকে সংকোচন গতি বলে। সংকোচন গতি মহাদেশীয়-মহাদেশীয়, মহাদেশীয়-মহাসাগরীয় এবং মহাসাগরীয়-মহাসাগরীয় প্লেটের মধ্যে হতে পারে। (চিত্র : ৪.২.৩, ৪.২.৪, ৪.২.৫)



চিত্র : ৪.২.৩ মহাদেশীয়-মহাদেশীয় পাত সংঘর্ষ ও বৈশিষ্ট্যমূলক ভূ-গঠন



চিত্র : ৪.২.৪ মহাদেশীয়-মহাসাগরীয় প্লেট সংঘর্ষ ও বৈশিষ্ট্যমূলক ভূ-গঠন



চিত্র : ৪.২.৫ মহাসাগরীয়- মহাসাগরীয় পাত সংঘর্ষ ও বৈশিষ্ট্যমূলক ভূ-গঠন

সম্প্রসারণ গতি (Extensional Movement) : দুটি পাত তাদের নিজস্ব অবস্থান থেকে পরস্পর দূরে সরে গেলে যাওয়ার গতিকে সম্প্রসারণ গতি বলে। এই গতিতে পাত সীমান্তে সামুদ্রিক শৈলশিরা সৃষ্টি হয়। যেমন- দক্ষিণ আমেরিকা ও আফ্রিকার পাতসমূহের সম্প্রসারণ গতির ফলে সামুদ্রিক শৈলশিরার সৃষ্টি হয়েছে। সম্প্রসারণ গতির ফলে সমুদ্রতলেরও বিস্তৃতি ঘটে। যেমন- আফ্রিকার পাত ও আরব পাতের সম্প্রসারণ গতির ফলে লোহিত সাগর ও এডেন উপসাগর বৃদ্ধি পেয়েছে।

পার্শ্বীয় গতি (Lateral Movement) : দুটি পাশাপাশি অবস্থিত পাতের তাদের সীমানা বরাবর পরস্পর বিপরীত দিকের গতিকে পার্শ্বীয় গতি বলে। পার্শ্বীয় গতির ফলে ভাঁজ, ফাটল ও চ্যুতির সৃষ্টি হয়। যেমন- তুর্কিস্তানের আনাতোলী চ্যুতি ও নিউজিল্যান্ডের আপলাই চ্যুতি। এক্ষেত্রে চ্যুতির সীমানা বরাবর প্রচন্ড ভূমিকম্প হয়ে থাকে।

শিক্ষার্থীর কাজ	পাত সঞ্চালন মতবাদটির মূল বক্তব্য তুলে ধরুন।

সারসংক্ষেপ

সমুদ্রের তলদেশ, মহাদেশ, পর্বত, মালভূমি প্রভৃতির গঠন ব্যাখ্যা করার জন্য পাত সঞ্চালন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সম্পর্কে সর্বপ্রথম ১৯১২ সালে আলফ্রেড ওয়েগনার মহাদেশীয় ভূ-ভাগ সঞ্চালন মতবাদ প্রদান করেন। পরবর্তীতে ১৯৬৮ সালে জেভিয়ার লি-পিনচন পাত সঞ্চালন মতবাদ প্রদান করেন। মহাদেশ এবং মহাসাগরের তলদেশ বিভিন্ন পাতের সমন্বয়ে তৈরি এবং এইসব পাতসমূহ চলমান। যদিও গতিশীলতার পরিমাণ বছরে মাত্র ১০-২০মি.মি.। এই সকল পাতসমূহ পরস্পরের দিকে, বিপরীত দিকে, পার্শ্বীয় দিকে তাদের নিজ নিজ সীমানা, অবস্থান ও সীমানা অনুয়ায়ী সঞ্চালিত হয়। এই ধরনের সঞ্চালনের ফলেই মহাসাগরের তলদেশে তাদের সীমানা বরাবর ভঙ্গিল পর্বত সৃষ্টি করে ভূমিকম্প হয়। ভূ-অভ্যন্তরীণ উত্তাপই হচ্ছে পাত সঞ্চালনের প্রধান কারণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.২

সঠিক উত্তরের পাশ টিক (√) চিহ্ন দিন।

আরিন দীর্ঘদিন যাবত সিলেটে থাকছেন। একদিন হঠাৎ করে দেখলেন কয়েক সেকেন্ডের জন্য সবকিছু নড়ছে। তিনি দ্রুত বাসা থেকে বেরিয়ে সামনের মাঠে এসে দাড়ালেন।

১। হঠাৎ করে ভূমিসহ সবকিছু কেঁপে উঠল এর কারণ কী?
(ক) আগ্নেয়গিরি (খ) ভূমিকম্প (গ) সুনামি (ঘ) টর্নেডো

২। ভূমিকম্পের কারণ কী?
(ক) পাত সঞ্চালন (খ) বৃষ্টির পানি (গ) সমুদ্রের স্রোত (ঘ) কল-কারখানার বর্জ্য

৩। পাত সমূহের প্রধান কয় ধরনের গতি লক্ষ্য করা যায়?
(ক) ২ প্রকার (খ) ৩ প্রকার (গ) ৪ প্রকার (ঘ) ৫ প্রকার

পাঠ-৪.৩ ভূমিকম্পের কারণ, ফলাফল ও প্রভাব
(Causes, Results and Effects of Earthquake)

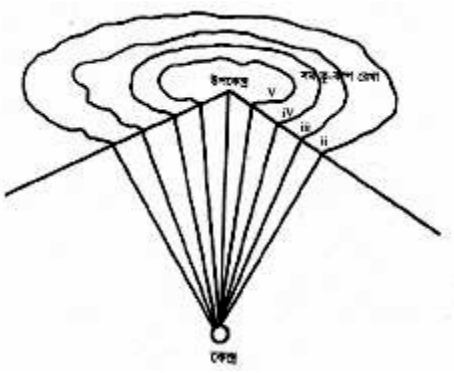
উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ভূমিকম্পের সংজ্ঞা, কারণ, ফলাফল ও প্রভাব ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

ভূমিকম্প

ভূ-অভ্যন্তরে আকস্মিক সৃষ্ট কম্পনের দরুণ আকস্মিকভাবে ভূমির যে কম্পন হয় তাকে ভূমিকম্প বলে। একটি শান্ত পুকুরে টিল ছুড়লে যেভাবে ঢেউ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে তেমনি পৃথিবীর অভ্যন্তরে যেখানে তরঙ্গ শক্তি উৎপত্তি হয় সেখানে থেকে মুক্ত শক্তি টেউয়ের মত শিলায় তরঙ্গের সৃষ্টি করে এবং চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ভূ-অভ্যন্তরের যে স্থানে ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয় তাকে কেন্দ্র (Centre বা Focus) বলে। কেন্দ্র থেকে সোজা উপরের দিকে ভূ-পৃষ্ঠস্থ বিন্দুকে উপকেন্দ্র (Epicentre) বলে (চিত্রঃ ৪.৩.১)। ভূমিকম্পের উৎপত্তির কেন্দ্র হতে দূরত্ব বৃদ্ধির সাথে ভূ-কম্পন শক্তি হ্রাস পায়। ভূমিকম্পের কেন্দ্র ভূ-অভ্যন্তরের প্রায় ১৬-২০ কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থিত হয়ে থাকে। যে যন্ত্রের সাহায্যে ভূমিকম্প পরিমাপ করা হয় তাকে বলা হয় সিসমোগ্রাফ (৪.৩.২)।





চিত্র : ৪.৩.১ ভূমিকম্পকেন্দ্র, উপকেন্দ্র ও সমভূকম্পন রেখা চিত্র : ৪.৩.২ সিসমোগ্রাফ বা ভূ-কম্পলিখন যন্ত্র

ভূমিকম্প সংঘটনের কারণ : বহু বছর ধরে ভূমিকম্পের কারণসমূহ সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে নিম্নলিখিত কারণসমূহ সনাক্ত করেছেন। যথা-

পাত সঞ্চালন (Plate Movement) : সঞ্চালনশীল মহাদেশীয় ও মহাসাগরীয় পাতসমূহের গতিশীলতার সময় যখন পরস্পরের সাথে সংঘর্ষ হয় তখন ভূমিকম্প হয়। তাই পৃথিবীর ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চলগুলো পাতসীমা বরাবর অবস্থিত। এছাড়া সঞ্চালনশীল পাত দুটি পরস্পর থেকে দূরে সরে যায় বা সামনে-পিছনে গতিশীল হয় তখন ভূ-গর্ভে চাপের তারতম্য ঘটে এবং ভূমিকম্প হয়।

ভূ-পাত (Land-Slip) : পাহাড়-পর্বত হতে বৃহৎ শিলাখন্ড ভূ-ত্বকের উপর ধ্বসে পড়লে ভূমিকম্প হয়। ভূ-পাত বা ভূমি ধ্বসের কারণ হলো নবীন ভাঁজ পর্বতের শিলাগুলো পরস্পর দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত নয়। যেমন- ১৯১১ সালে তুরস্কে ভূমিকম্প হওয়ার কারণ ছিল পামীর মালভূমিতে বিশাল ভূ-পাত।

শিলাচ্যুতি বা শিলাতে ভাঁজের সৃষ্টি : পৃথিবীর অভ্যন্তরে শিলাচ্যুতি বা শিলাতে ভাঁজের সৃষ্টি হলে ভূ-ত্বকের কোনো অংশ উপরে উত্থিত হয় বা নিচে বসে যায় এবং চ্যুতির সমতলে প্রবল ঘর্ষণ সৃষ্টি হয় ও ভূমিকম্প হয়। ১৯৫০ সালে আসামে এ কারণেই ভূমিকম্প হয়েছিল।

আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত : আগ্নেয়গিরি অগ্ন্যুৎপাতের সময় জ্বালামুখ দিয়ে প্রবলবেগে বাষ্প, লাভা প্রভৃতি বের হতে থাকে ও প্রবল ভূমিকম্প হয়।

তাপ বিকিরণ : তাপ বিকিরণের ফলে ভূ-ত্বক সংকুচিত হয়। এই সংকোচনের দরুণ ভূ-ত্বকে ফাটল ও ভাঁজ সৃষ্টির সময় ভূমিকম্প হয়।

ভূ-গর্ভস্থ বাষ্প : ভূ-গর্ভে সৃষ্ট বাষ্প ক্রমাগত বৃদ্ধি পেলে তা ভূ-ত্বকের নিম্নভাগে ধাক্কা দেয় এবং এই সময় প্রবল ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়।

ভূ-গর্ভস্থ চাপের হ্রাস : ভূ-গর্ভে হঠাৎ চাপ হ্রাস পেলে পৃথিবীর মধ্যকার পদার্থ কঠিন অবস্থা থেকে তরল অবস্থায় পরিণত হয় এবং ভূ-গর্ভের নিচের দিকে নামতে থাকে। এতে ভূ-ত্বক কেঁপে ওঠে।

ভূ-অভ্যন্তরে ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি প্রবেশ : ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানি পৃথিবীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে বাষ্পে পরিণত হয়। কারণ ভূ-অভ্যন্তর এখনও প্রচন্ড উত্তপ্ত। এই বাষ্পের পরিমাণ অধিক হলে, ভূ-ত্বকের নিচে ধাক্কা দেয় এবং ভূমিকম্পের সৃষ্টি করে।

হিমবাহের প্রভাব : পর্বতগাত্র থেকে বৃহৎ আকারের হিমবাহ হঠাৎ নিচে পতিত হলে ভূ-পৃষ্ঠ কেঁপে ওঠে এবং ভূমিকম্প হয়।

ভূমিকম্পের ফলাফল ও প্রভাব (Results and Effects of Earthquake)

ফাটল ও চ্যুতির সৃষ্টি : ভূমিকম্পের দরুন ভূ-ত্বকে অসংখ্য ফাটল ও চ্যুতির সৃষ্টি হয়। ভূ-ত্বকে চ্যুতি সৃষ্টির ফলে চ্যুতির মধ্যবর্তী ভূ-ভাগ নিচের দিকে নেমে যায়, যাকে ভ্রস্ত উপত্যকা (Rift Valley) বলে এবং যখন উপরের দিকে ওঠে যায় তখন তাকে হর্স্ট (Horst) বা স্তূপ পর্বত বলে।

সমুদ্রতলের পরিবর্তন : ভূমিকম্পের ফলে সমুদ্রতলের অনেক স্থান ওপরে উত্থিত হয় এবং স্থলভাগের অনেক স্থান সমুদ্রতলে ডুবে যায়। যেমন- ১৯২১ সালের ভূমিকম্পের ফলে টোকিও উপসাগরের তলদেশ ৬০ মিটার উঁচু হয়। এছাড়া সমুদ্রগর্ভ হতে হিমালয় পর্বত উত্থিত হয়েছে। অপরদিকে ১৮৯৯ সালে ভারতে কচ্ছ উপসাগরের ৫০০০ বর্গকিলোমিটার স্থান সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হয়।

নদীর গতিপথ পরিবর্তন : ভূমিকম্পের ফলে নদীর গতি পরিবর্তিত হয়, নদী শুঁকিয়ে যায় কখনও জলাভূমির সৃষ্টি হয়। যেমন- ১৯৫০ সালে আসামের ভূমিকম্পে দিবং নদীর গতি পথ পরিবর্তিত হয়। এছাড়া ১৭৮৭ সালে ভারতের আসাম রাজ্যে যে ভূমিকম্প হয় তার ফলে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদীর তলদেশ উঁচু হয়ে যায়। এজন্য ব্রহ্মপুত্র নদীটি তার গতিপথ পরিবর্তন করে বর্তমান যমুনা খাত দিয়ে প্রবাহিত হয়।

ভূমির উত্থান ও অবনমন : ভূমিকম্পের ফলে উচ্চভূমি সমুদ্রের পানিতে নিমজ্জিত হয় অথবা সমভূমি অঞ্চল অবনমিত হয় এবং পানি জমে হ্রদের সৃষ্টি করে। সমুদ্রের তলদেশের কোনো স্থান উঁচু হয়ে সমুদ্রের মধ্যে দ্বীপের সৃষ্টি করে।

ভাঁজের সৃষ্টি : ভূমিকম্পের ফলে ভূ-পৃষ্ঠে ভাঁজের সৃষ্টি হয়।

হিমানী সম্প্রপাত : ভূ-কম্পনের ফলে পর্বতগাত্র থেকে বৃহৎ বরফ খন্ডগুলো নিচে পতিত হয়।

ভূ-পাত : ভূমিকম্পের ফলে পার্বত্য অঞ্চলের বিশাল শিলাখন্ড নিচে পতিত হয় এবং পর্বতের পাদদেশে ব্যাপক ক্ষতি হয়।

বন্যার সৃষ্টি : ভূমিকম্পের ফলে সমুদ্রের পানির উচ্চতা কমে যায় অথবা সাথে সাথেই পানির উচ্চতা বেড়ে ১৫-২০ মিটার উঁচু হয়ে ঢেউয়ের আকারে সমুদ্র উপকূলে বন্যার সৃষ্টি করে।

মানবীয় ক্ষয়ক্ষতি : সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে জলোচ্ছ্বাস ও সুনামির জন্য প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়। পার্বত্য অঞ্চলে ভূমিধ্বসের দরুণ পাহাড়ের পাদদেশে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয় এবং অনেক সময় ভূমিতে ফাটল সৃষ্টি হলে রাস্তাঘাট অকেজো হয়ে পড়ে। নগর এবং গ্রামীন জনপদে বহু ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়ে যায়। ধ্বংসস্তুপের তলায় চাপা পড়ে মারা যায় গৃহপালিত পশু ও মানুষ। এছাড়া তড়িৎ বর্তক্ষেপ (Short Circuit) এর কারণে গ্যাস ও বিদ্যুতের লাইনে আগুন ধরে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ অনেক বেড়ে যায়। মূলত ভূমিকম্পের ফলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ব্যাপক।

শিক্ষার্থীর কাজ	ভূমিকম্পের সময় কী কী করা উচিৎ তার একটি তালিকা প্রস্তুত করুন।

সারসংক্ষেপ

আকস্মিকভাবে ভূমির যে কম্পন হয় তাকে ভূমিকম্প বলে। ভূ-অভ্যন্তরে যে স্থান থেকে ভূমিকম্পের জন্য শক্তি মুক্ত হয় তাকে কেন্দ্র বলে। কেন্দ্র থেকে লম্বালম্বিভাবে ভূ-পৃষ্ঠের উপরিস্থিত বিন্দুকে উপকেন্দ্র বলে। পাত সঞ্চালন, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, ভূ-পাত, হিমানী সম্প্রপাত, শিলাচ্যুতি, ভূ-গর্ভস্থ বাষ্প এবং ভূ-গর্ভে চাপের হ্রাস প্রভৃতি কারণে ভূমিকম্প হয়। ভূমিকম্পের ফলে ভূ-ত্বকে ফাটল ও চ্যুতির সৃষ্টি হয়। এছাড়া সমুদ্রতলের পরিবর্তন, নদীর গতিপথের পরিবর্তন, হিমানী সম্প্রপাত এবং ভূ-পাত প্রভৃতি পরিবর্তন উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও ভূমিকম্পের ফলে সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে, পার্বত্য এলাকায়, শহর এবং গ্রামীন জনপদে ব্যাপক ধবংসলীলা সাধিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√)চিহ্ন দিন ।

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং নিম্নোক্ত প্রশ্নসমূহের সঠিক উত্তর দিন।
ফয়সাল টেবিলে বসে একাদশ শ্রেণির পরীক্ষার প্রস্তুতি নেওয়ার সময় দেখল হঠাৎ বইখাতা, টেবিল অর্থাৎ সবকিছু কেঁপে ওঠল। কয়েক সেকেন্ড বিরতির পর পুনরায় কেঁপে ওঠল।

১। আকস্মিকভাবে ভূমির এই ধরনের কম্পনের কারণ কী?
(ক) ভূমিকম্প (খ) আগ্নেয়গিরি
(গ) টর্নেডো (ঘ) জলোচ্ছ্বাস

২। ভূ-অভ্যন্তরে যেখানে ভূমিকম্পের শক্তিমুক্ত হয় তাকে কী বলে?
(ক) উপকেন্দ্র (খ) কেন্দ্র
(গ) সমকেন্দ্র (ঘ) বিন্দু

৩। কেন্দ্র থেকে লম্বভাবে ভূ-পৃষ্ঠের উপরিস্থিত বিন্দুকে কী বলে?
(ক) কেন্দ্র (খ) উপকেন্দ্র
(গ) সমকেন্দ্র (ঘ) বিপরীত কেন্দ্র

৪। ভূমিকম্পের ফলে উপকূলীয় অঞ্চলে যে সকল প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়-
i. জলোচ্ছ্বাস ii. সুনামি
iii. খরা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৫। মহাদেশীয় এবং মহাসাগরীয় প্লেটসমূহের সঞ্চালনের জন্য কী হয়?
(ক) ভূমিকম্প (খ) টর্নেডো
(গ) প্রবল বৃষ্টি (ঘ) তুষারপাত

পাঠ-৪.৪ ভূমিকম্প তরঙ্গ ও ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চল (Earthquake Waves and Earthquake Zone)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ভূমিকম্পের তরঙ্গ সম্পর্কে ব্যাখ্যা প্রদান করতে পারবেন এবং
- পৃথিবীর ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চলসমূহ মানচিত্রে চিহ্নিত করতে পারবেন।

ভূমিকম্প তরঙ্গ

ভূমিকম্পের তরঙ্গগুলো ভূ-অভ্যন্তরে ভূ-কম্পন তরঙ্গের মূল উৎস যা কেন্দ্র হতে সবদিকে সমভাবে ছড়িয়ে পড়ে। ভূমিকম্পের তরঙ্গ প্রধানত তিন প্রকার। যথা-

১. প্রাথমিক তরঙ্গ
২. গৌণ তরঙ্গ বা দ্বিতীয় তরঙ্গ এবং
৩. পৃষ্ঠ তরঙ্গ (চিত্র: ৪.৪.১)।



চিত্র: ৪.৪.১ ভূমিকম্পের তরঙ্গসমূহ

প্রাথমিক তরঙ্গ (Primary Wave) : সংক্ষেপে প্রাথমিক তরঙ্গকে P Wave বা P তরঙ্গ বলে। সর্বপ্রথম P তরঙ্গ ভূমিকম্প কেন্দ্র হতে ভূ-কম্পলেখ যন্ত্রে এসে পৌঁছে বলে একে প্রাথমিক তরঙ্গ বলে। এটি মাটির মধ্য দিয়ে সোজা পথে গমন করে এবং তরঙ্গের গতিবেগ ঘনত্বের সাথে সমানুপাতিক। মহাদেশীয় ভূ-ত্বকের উপরিভাগে এর গতিবেগ ৬.১ কি.মি/সেকেন্ড, মহাদেশীয় ভূ-ত্বকের নিম্নভাগে এর গতিবেগ ৬.৯ কি.মি/সেকেন্ড এবং সামুদ্রিক ভূ-ত্বকে এর গতিবেগ ৮ কি.মি/সেকেন্ড। অপরদিকে পৃথিবীর কেন্দ্রে অর্থাৎ ম্যান্টল এ এর গতিবেগ ১১ কি.মি/সেকেন্ড। প্রাথমিক তরঙ্গ সংকোচন ও প্রসারণের মাধ্যমে বস্তুকে আন্দোলিত করে এবং শিলায় সামান্য পরিমাণে স্থান পরিবর্তন হয়।

গৌণ তরঙ্গ (Secondary Wave) : গৌণ তরঙ্গকে S Wave বা দ্বিতীয় পর্যায়ের তরঙ্গ বলে। প্রাথমিক তরঙ্গের পরে দ্বিতীয় পর্যায়ের তরঙ্গ ভূমিকম্প তরঙ্গ কেন্দ্র হতে ভূ-কম্পলেখ যন্ত্রে এসে পৌঁছে। প্রাথমিক তরঙ্গ হতে এর পার্থক্য হলো এটি প্রাথমিক তরঙ্গের তুলনায় ধীরগতি সম্পন্ন এবং এটি তরল মাধ্যমের মধ্য দিয়ে যেতে পারে না। S তরঙ্গ বস্তুকে সামনে পিছনে সমকোণে দোলাতে থাকে এবং দালানের কাঠামোর জন্য সবচেয়ে বেশি ক্ষতির কারণ হয়।

পৃষ্ঠ তরঙ্গ (Surface Wave) : পৃষ্ঠ তরঙ্গকে দীর্ঘ তরঙ্গ বা Long Wave বলে। এই তরঙ্গ সবচেয়ে কম গতিবেগ সম্পন্ন। Long Wave বা পৃষ্ঠ তরঙ্গের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে পৃষ্ঠ তরঙ্গ শুধুমাত্র পৃথিবীর উপরিভাগ বা বহিরাবরণ দিয়ে চলতে পারে। এর গতিবেগ অত্যন্ত কম মাত্র ৪.৮-৬.২ কি.মি/সেকেন্ড। এই তরঙ্গও গৌণ তরঙ্গ বা S তরঙ্গের ন্যায় তরল মাধ্যমে চলাচল করতে পারে না।

প্রাথমিক তরঙ্গ, গৌণ তরঙ্গ, পৃষ্ঠ তরঙ্গ এবং ভূমিকম্প তরঙ্গের মাধ্যমেই পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যায়।

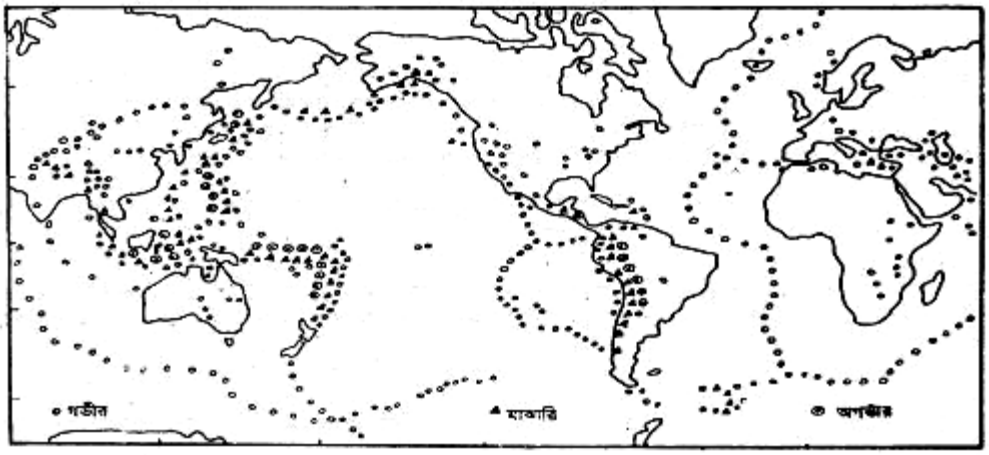
যে কোনো ভূমিকম্পের সময় ভূমিকম্প কেন্দ্র হতে যে পরিমাণ শক্তি মুক্তি পায় তাকে ভূ-কম্পন শক্তির মাত্রা বা ভূ-কম্পন তীব্রতা বলে। ভূমিকম্পের উৎস ও গতিবিধি পরিমাপ করার জন্য যে যন্ত্র ব্যবহার করা হয় তাকে ভূ-কম্পলিখন যন্ত্র (Seismograph) বলে। ভূমিকম্পের তীব্রতা পরিমাপের জন্য মার্সেলী (Merceli) ও রিকটার (Richter) নামক দুইজন বিজ্ঞানী দুটি স্কেল তৈরি করেন।

ভূ-কম্পলিখন যন্ত্র বা সীসমোগ্রাফ (Seismograph) : ভূ-কম্প লিখন যন্ত্রের ভিত্তি মাটিতে দৃঢ়ভাবে স্থাপন করা হয়। এই যন্ত্রের (চিত্র : ৪.৩.২) বেলন কাগজে মোড়ানো থাকে এবং উপরিভাগের দন্ড হতে একটি দাগ কাটার যন্ত্র ঝুলানো থাকে। ভূমিকম্পের সময় যন্ত্রের ভিত্তি কাঁপতে থাকে এবং একই সাথে যন্ত্রের ভারসাম্য রক্ষার জন্য দাগকাটার যন্ত্রটিও ঝুলতে শুরু করে ও বেলনে লাগানো কাগজে দাগ কাটতে থাকে। ভূমিকম্প যখন হয় না তখন কলমের দাগ সরল হয় অপরদিকে ভূমিকম্পের সময় দাগ আঁকাবাঁকা থাকে। এই দাগ থেকেই ভূমিকম্পের উৎস ও তরঙ্গের গতিবিধি জানা যায়।

মার্সেলীর স্কেল (Merceli Scale) : ১৯৩১ সালে বিজ্ঞানী মার্সেলী ভূমিকম্পের তীব্রতা পরিমাপের স্কেল তৈরি করেন। এই স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ২-১২ পর্যন্ত ধরা হয়। প্রথম ৩টি মৃদু কম্পন পরের ৪টি (৪-৭) সামান্য তীব্র এবং বাকী ৫টি (৮-১২) অধিকতর তীব্র কম্পন নির্দেশ করে।

রিকটার স্কেল(Richter Scale) : ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সি.এফ. রিকটার ভূমিকম্পের তীব্রতা নির্ণয়ের জন্য ১৯৩২ সালে রিকটার স্কেল প্রণয়ন করেন। এ স্কেলে ১-১০ পর্যন্ত ভূমিকম্পের তীব্রতা ধরা হয়। রিকটার স্কেলে তীব্রতা মাত্রা বেশি হলে ক্ষয়ক্ষতির মাত্রাও বেড়ে যায়।

ভূমিকম্প প্রবণ অঞ্চল (Earthquake Zone) : অধিকাংশ ভূমিকম্প (শতকরা প্রায় ৯৫ ভাগ) পৃথিবীর অল্প কিছু জায়গায় সংঘটিত হয়। যেমন- পৃথিবীর বৃত্তচাপীয় দ্বীপমালা জাপান, ফিলিপাইন, নবীন ভঙ্গিল পর্বতমালা ও সামুদ্রিক শৈলশিরাসমূহ। ভূমিকম্পের সংখ্যার দিক থেকে জাপান বিশ্বে প্রথম। বছরে প্রায় গড়ে ৭,৫০০টি ভূমিকম্প হয়। জাপানের পর সর্বাধিক ভূমিকম্প হয় ইতালিতে, গড়ে প্রায় ৫০০টি। এছাড়াও দক্ষিণ আমেরিকার পেরু ও চিলি এবং আমেরিকার গুয়েতেমালায় অধিক ভূমিকম্প হয় (চিত্র: ৪.৪.২)। এছাড়া পৃথিবীর ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চলসমূহকে নিম্নরূপে বর্ণনা করা যায়। যথা-



চিত্র : ৪.৪.২ পৃথিবীর ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চল

ভঙ্গিল পর্বত অঞ্চল : হিমালয়, আল্পস, রকি, আন্দিজ প্রভৃতি নবীন ভঙ্গিল পর্বতের নিম্নাংশে এবং পর্বতের পাদদেশে খুব বেশি ভূমিকম্প হয়।

আগ্নেয়গিরি অঞ্চল : পৃথিবীর যে সকল অঞ্চলে আগ্নেয়গিরি রয়েছে সেই সব অঞ্চল ভূমিকম্পপ্রবণ। যেমন- দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম ভাগ, প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূল, জাপান, ভূ-মধ্যসাগরের তীরবর্তী অঞ্চল, পামীর মালভূমি এবং তুরস্ক ও তৎসংলগ্ন এলাকা।

সমুদ্র হতে নতুন উত্থিত অঞ্চল : হিমালয় পর্বত টেথিস সাগর হতে উত্থিত হয়েছে এবং এর গঠন কার্য চলছে। এ কারণে উত্তর-পূর্ব ভারতে হিমালয় পর্বতের পূর্বাংশের পাহাড়িয়া এলাকায়, পশ্চিমাংশ, পাকিস্তানের উত্তরাংশের পাহাড়ি এলাকায় ভূমিকম্প হয়। এছাড়া বঙ্গোপসাগরের তলদেশে এবং আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের চারদিকে প্রায়ই ভূমিকম্প হয়।

খাড়া প্রণবভূমি অঞ্চল : পার্বত্য অঞ্চলের খাড়া প্রণবভূমিতে অধিক ভূমিকম্প হয়। এ কারণে আসামের খাসিয়া, জয়ন্তিয়া, উত্তর-পশ্চিম হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলের খাড়া প্রবণভূমিতে অধিক ভূমিকম্প হয়।

খাড়া উপকূল অঞ্চল : ভূ-ভাগ যখন সমুদ্র হতে উত্থিত হয় তখন তার উপকূলভাগ খাড়া হয় এবং এ অংশে অধিক ভূমিকম্প হয়। এ কারণে জাপান, পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, নিউজিল্যান্ড প্রভৃতি দ্বীপ ও দ্বীপপুঞ্জের দুর্বল খাড়া অংশে প্রায়ই ভূমিকম্প হয়।

পৃথিবীর অধিকাংশ ভূমিকম্প মহাসাগরসমূহের প্রান্তীয় সীমানা বরাবর অবস্থিত হওয়ায় ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকাকে প্রধান তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা-

১. প্রশান্ত মহাসাগরীয় অংশ
২. ভূ-মধ্যসাগরীয় হিমালয় অংশ এবং
৩. মধ্য আটলান্টিক ভারত মহাসাগরীয় শৈলশিরা অংশ।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় অংশ : প্রশান্ত মহাসাগরীয় প্লেটের বাইরের সীমানা বরাবর ভূমিকম্প প্রবনতা সবচেয়ে বেশি। এটি মালার মত প্রশান্ত মহাসাগরীয় প্লেটকে ঘিরে রেখেছে। এই অংশের আওতাভুক্ত দেশসমূহ হলো জাপান, ফিলিপাইন, চিলি, এ্যালুউসিয়ান দ্বীপপুঞ্জ, আলাস্কা প্রভৃতি।

ভূ-মধ্যসাগরীয় হিমালয় অংশ : এই অংশটি আল্পস পর্বত থেকে শুরু করে ভূ-মধ্যসাগরের উত্তর তীর হয়ে ককেশাস, ইরান, হিমালয়, ইন্দোচীন ও পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হয়ে নিউজিল্যান্ড পর্যন্ত বিস্তৃত।

মধ্য আটলান্টিক ভারত মহাসাগরীয় শৈলশিরা অংশ : মধ্য আটলান্টিক শৈলশিরা এবং ভারত মহাসাগরীয় শৈলশিরা একসঙ্গে মিলিত হয়ে আফ্রিকার লোহিত সাগর বরাবর ভূ-মধ্যসাগরীয় অংশের সঙ্গে মিশেছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	প্রশান্ত মহাসাগরীয় ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চলের আওতায় কোন দেশসমূহ পড়ে তার একটি তালিকা প্রস্তুত করুন এবং মানচিত্রে দেশসমূহ শনাক্ত করুন।

সারসংক্ষেপ

ভূমিকম্পের তরঙ্গগুলো মূল উৎস বা কেন্দ্র থেকে সবদিকে সমানভাবে ছড়িয়ে পড়ে। তরঙ্গের উৎস হতে মাধ্যমের ভিতর দিয়ে ভূ-পৃষ্ঠে পৌঁছাতে তরঙ্গ বিভিন্ন গতি সম্পন্ন হয়। তরঙ্গের এই গতির উপর নির্ভর করে ভূমিকম্পের তীব্রতা। ভূমিকম্পের তরঙ্গসমূহকে প্রধান তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা- প্রাথমিক তরঙ্গ, গৌণ তরঙ্গ ও পৃষ্ঠ তরঙ্গ। তরঙ্গসমূহের মধ্যে প্রাথমিক তরঙ্গ কঠিন ও তরল সকল মাধ্যমে গমন করতে পারে, গৌণ তরঙ্গ এবং পৃষ্ঠ তরঙ্গ তরল মাধ্যমে চলাচল করতে পারে না। ভূমিকম্পের তীব্রতা মাপা হয় যে যন্ত্রের মাধ্যমে তার নাম সিসমোগ্রাফ এবং তীব্রতা প্রকাশ করা হয় মার্সেলীয় ও রিকটার স্কেলের মাধ্যমে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

ফয়সালের কলেজের সামনে বড় মাঠের পাশে একটি শান্ত পুকুর। একদিন শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পুকুরের পাশে নিয়ে গেলেন এবং শান্ত পুকুরে ঢিল ছুঁড়ে শিক্ষার্থীদের দেখালেন। শিক্ষার্থীরা দেখলেন, কীভাবে ঢেউ কেন্দ্র থেকে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে।

১। দূরত্ব বৃদ্ধির সাথে সাথে ঢেউয়ের বা তরঙ্গের গতিবেগ-
(ক) বৃদ্ধি পায় (খ) হ্রাস পায় (গ) হ্রাস ও বৃদ্ধি উভয়ই (ঘ) কোনটিই নয়

২। ঢিল ছোঁড়ার পর সৃষ্ট ঢেউয়ের সাথে কোন ঢেউয়ের বৈশিষ্ট্যের মিল রয়েছে?
(ক) সমুদ্রের তরঙ্গ (খ) ভূমিকম্পের তরঙ্গ (গ) নদীর তরঙ্গ (ঘ) শব্দ তরঙ্গ

৩। ভূমিকম্পের তরঙ্গ প্রধানত কত প্রকার?
(ক) ২ প্রকার (খ) ৩ প্রকার (গ) ৪ প্রকার (ঘ) ৫ প্রকার

৪। ভূমিকম্পের তরঙ্গের ক্ষেত্রে-
i. কেন্দ্র থেকে সমভাবে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে।
ii. শুধুমাত্র প্রাথমিক তরঙ্গ সকল মাধ্যমে গমন করতে পারে।
iii. পৃষ্ঠ তরঙ্গ এর গতিবেগের উপর ভূমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতি নির্ভর করে।

নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii ও iii (গ) i, ii ও iii (ঘ) ii

৫। সর্বাধিক ভূমিকম্প হয় কোন দেশে?
(ক) জাপান (খ) চীনে (গ) অস্ট্রেলিয়ায় (ঘ) নেপালে

৬। জাপানে বার্ষিক গড়ে ভূমিকম্পের সংখ্যা কত?
(ক) ৮,৫০০টি (খ) ৭,৫০০টি (গ) ৬,৫০০টি (ঘ) ৫,৫০০টি

পাঠ-৪.৫ আগ্নেয়গিরি, অগ্ন্যুৎপাত ও এর প্রভাব
(Volcanoes, Volcanism and its Effects)

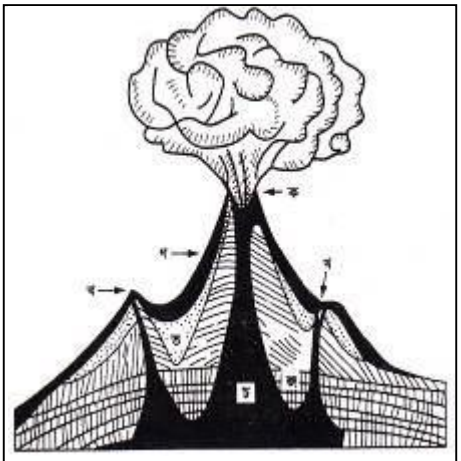
উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- আগ্নেয়গিরি ও অগ্ন্যুৎপাত সম্পর্কে বলতে পারবেন এবং
- আগ্নেয়গিরির কারণ, প্রভাব ও আগ্নেয় বলয় ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

আগ্নেয়গিরি

ভূ-ত্বকের শিলাস্তর সর্বত্র একইরকম না হওয়ায় শিলাস্তরের দুর্বল অংশ ভূ-গর্ভের চাপে ফেটে ভূ-গর্ভ হতে ভূ-পৃষ্ঠ পর্যন্ত বিশাল নলাকৃতির ছিদ্রপথের সৃষ্টি হয়। এই ছিদ্রপথে গলিত ম্যাগমা, উত্তপ্ত প্রস্তরখন্ড, কর্দম, ধুম, ভস্ম, গলিত ধাতব পদার্থ ইত্যাদি প্রবলবেগে ভূ-পৃষ্ঠে নির্গত হয়ে সুরঙ্গপথের চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে একে অগ্ন্যুৎপাত বা Volcanic Eruption বলে। অগ্ন্যুৎপাতের ফলে ফাটলের মুখের চারদিকে ক্রমশ জমাট বেঁধে যে উঁচু মোচাকৃতি পর্বতের সৃষ্টি করে তাকে আগ্নেয়গিরি বলে (চিত্র : ৪.৫.১)। আগ্নেয়গিরি থেকে যে ছিদ্রপথের মাধ্যমে অগ্ন্যুৎপাত হয় তাকে জ্বালামুখ বলে। জ্বালামুখ হতে নির্গত পদার্থকে লাভা (lava) বলে (চিত্র: ৪.৫.২)। লাভার ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হওয়াকে অগ্ন্যুৎপাত (Eruption) বলে। প্রত্যেক আগ্নেয়গিরির লাভা সঞ্চিত হয়ে থাকে যে গহ্বরে তাকে ম্যাগমা চেম্বার (Magma Chamber) বলে।

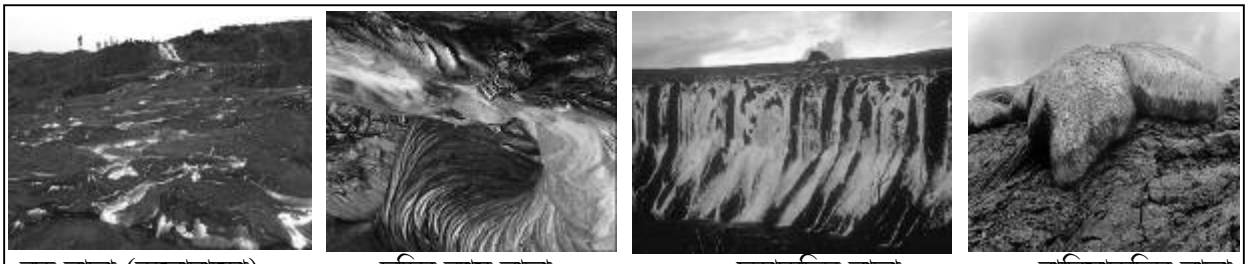


চিত্র : ৪.৫.১ আগ্নেয়গিরি (ক-প্রধান জ্বালামুখ, খ-গৌণ জ্বালামুখ, চ- ম্যাগমা চেম্বার, গ-গলিত লাভা, জ-জমাট বাঁধা লাভা এবং ভূ-ভস্মস্তর)

অগ্ন্যুৎপাতের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Eruption) : গ্যাসের চাপ, পরিমাণ ও লাভার প্রকৃতি ও তীব্রতা অনুসারে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতকে প্রধানত ৬টি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে।

১. হাওয়াই শ্রেণি (Hawaiian Type) : এই ধরনের অগ্ন্যুৎপাত প্রশান্ত মহাসাগরের তলদেশে সংঘটিত হয়। হাওয়াই দ্বীপের আগ্নেয়গিরিগুলোতে এরূপ অগ্ন্যুৎপাত অধিক দেখা যায় বলে একে হাওয়াই শ্রেণি বলা হয়। এই ধরনের অগ্ন্যুৎপাতে কোন বিস্ফোরণ ঘটে না। লাভা তরল হওয়ায় জ্বালামুখ থেকে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। লাভা অধিক তরল হলে প্রবল বাতাসে সুতার ন্যায় উড়তে থাকে। এই উড়ন্ত লাভাকে লিপির কেশ বলা হয়। হাওয়াই দ্বীপের দেবতা লিপির নাম অনুসারে এই রূপ নামকরণ করা হয়েছে [চিত্র : ৪.৫.২]।

২. স্ট্রম্বোলীয় শ্রেণি (Strombolian Type) : এই শ্রেণির অগ্ন্যুৎপাতে মাঝারী ধরনের বিস্ফোরণ ঘটে। কিছুদিন পরপর অগ্ন্যুৎপাত হয়। ম্যাগমা তরল কম হওয়ায় শীতল বায়ুর সংস্পর্শে উৎক্ষিপ্ত হওয়ার সময় দ্রুত জমাট বেঁধে প্রস্তরখন্ডের ন্যায় নিচে পতিত হয়। স্ট্রম্বোলীকে 'ভূ-মধ্যসাগরের আলোকস্তম্ভ' (Light House of the Mediterranean) বলা হয়। কারণ অগ্ন্যুপাতের সময় উজ্জ্বল প্রজ্জ্বলিত গ্যাস নির্গত হয়। সিসিলির উত্তরে লিপারী দ্বীপে স্ট্রম্বোলীয় শ্রেণির আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত হয় বলে একে স্ট্রম্বোলীয় শ্রেণি বলা হয়।


ব্লক লাভা (কলোরাডো), দড়ির ন্যায় লাভা, দন্ডাকৃতির লাভা, বালিসাকৃতির লাভা

চিত্র: ৪.৫.২ বিভিন্ন ধরনের লাভা

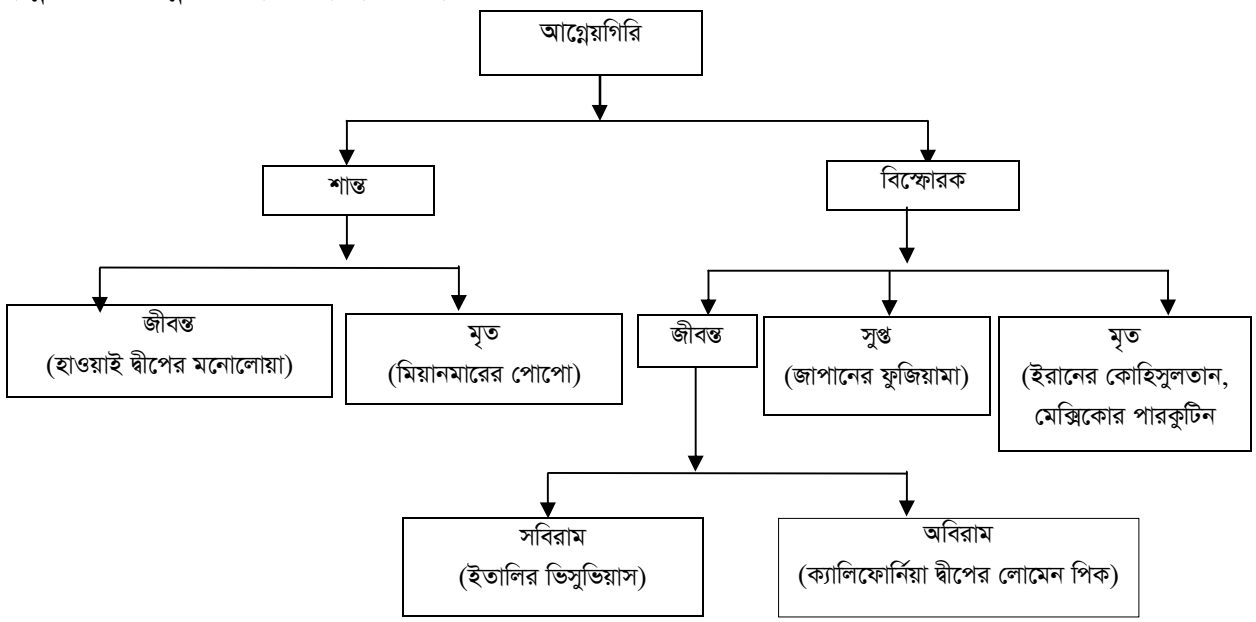
৩. ভলক্যানীয় শ্রেণি (Volcanian Type) : ভূ-মধ্যসাগরে অবস্থিত লিপারী দ্বীপের স্ট্রম্বোলীর নিকট অবস্থিত 'ভলক্যানো' আগ্নেয়গিরির নাম অনুযায়ী Volcanian Type অগ্ন্যুৎপাত নামকরণ করা হয়েছে। এই শ্রেণির অগ্ন্যুৎপাতে লাভা বেশ সান্দ্র হওয়ায় একবার অগ্ন্যুৎপাতের পর দ্বিতীয় অগ্ন্যুৎপাতের সময়ের মধ্যেই লাভা জমে যায়।

৪. ভিসুভিয়াস শ্রেণি (Vesuvias Type) : ইতালির নেপলসের নিকটবর্তী ভিসুভিয়াস আগ্নেয়গিরিতে এরূপ অগ্ন্যুৎপাত হয় বলে এই অগ্ন্যুৎপাতের নামকরণ করা হয়েছে ভিসুভিয়াস শ্রেণি। এই অগ্ন্যুৎপাতে ম্যাগমার সাথে প্রচুর গ্যাস মিশ্রিত থাকায় প্রচন্ড বিস্ফোরণের ফলে ম্যাগমা নির্গত হয় এবং গ্যাসের সাথে কঠিন পদার্থের প্রচুর ছাই ও ভস্মও মিশ্রিত থাকে।

৫. পিলীয় শ্রেণি (Pelean Type) : পিলীয় শ্রেণির স্থিতিস্থাপক আগ্নেয়গিরিটি পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের মাটি নিচে অবস্থিত। এই ধরনের অগ্ন্যুৎপাতে ম্যাগমা অধিক বলে আগ্নেয়গিরির মুখে জমে যায় এবং অভ্যন্তরস্থ গ্যাসকে উপরে উঠতে বাধা দেয়। ফলে আগ্নেয়গিরিটির পার্শ্ব দেশ দিয়ে সমান্তরালভাবে কালো গ্যাস নির্গত হয়।

৬. প্লিনীয় শ্রেণি (Pelinian Type) : প্লিনি নামক জনৈক ব্যক্তি ১৮৭৯ সালে ভিসুভিয়াসের অগ্ন্যুৎপাতে হারকিউলেনিয়াম ও পম্পেই নামক দুটো আগ্নেয়গিরির ভয়াবহতার চিত্র একটি চিঠির মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করেন। সেই সময় হতে ভয়াবহ অগ্ন্যুৎপাতকে প্লিনীয় শ্রেণি বলা হয়। নির্গত গ্যাসের সাথে প্রচুর প্রস্তরখন্ড ও কঠিন পদার্থ থাকে কিন্তু লাভার পরিমাণ খুবই কম থাকে।

আগ্নেয়গিরির শ্রেণিবিভাগ (Classification of Volcanoes) : আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের উপর নির্ভর করে আগ্নেয়গিরিকে নিম্নরূপে ভাগ করা যায়। যথা :



আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত সংঘটনের কারণ (Causes of Volcanic Eruption)

ক. **ভূ-ত্বকে দুর্বল স্থান বা ফাঁটলের অবস্থান :** ভূ-ত্বক পাতলা হলে বা ফাটল থাকলে ভূ-অভ্যন্তরের গলিত ম্যাগমা, ভস্ম, বাষ্প, ধাতু, ধুম্র প্রবল বেগে বের হয়ে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত ঘটায়।

খ. **ভূ-পৃষ্ঠের চাপের হ্রাস :** পৃথিবীর অভ্যন্তরের দিকে ক্রমান্বয়ে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। সাধারণত প্রতি ৩০ মিটার গভীরতায় ১° সেলসিয়াস তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। ভূ-অভ্যন্তরে ৯৬০ কি.মি গভীরতায় শিলাগুলো এত উত্তপ্ত হয় যে গলিত অবস্থায় থাকার পরিবেশ থাকলেও ভূ-পৃষ্ঠস্থ চাপের দরুণ স্থিতিস্থাপক অবস্থায় থাকে। আবার ভূ-গর্ভের সঞ্চিত বাষ্পরাশি সর্বদা ভূ-পৃষ্ঠে আসতে চায়। ফলে ভূ-ত্বকের তলদেশে প্রবল ঊর্ধ্বচাপ পড়ে। ঊধ্বচাপের প্রভাবে উপরিস্থিত ভূ-ত্বকের নিম্নস্থ কঠিন শিলার উপর চাপ বহুগুণে কমে যায়। ভূ-পৃষ্ঠের এই ধরনের চাপ হ্রাস অগ্ন্যুৎপাতে সহায়তা করে।

গ. **ভূ-অভ্যন্তরে পানির প্রবেশ :** কখনও কখনও ভূ-ত্বকের ফাঁটল দিয়ে ভূ-পৃষ্ঠের যে কোন উৎসের পানি ভূ-গর্ভে প্রবেশ করলে সেখানে প্রচন্ড উত্তাপে পানি বাষ্পীভূত হয় ও আয়তনে বৃদ্ধি পেয়ে প্রবল বেগে বের হয়ে আসার চেষ্টা করে এবং আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত হয়।

ঘ. **ভূ-গর্ভের চাপ বৃদ্ধি :** ভূ-গর্ভস্থ পদার্থসমূহের আয়তন বৃদ্ধির ফলে ভূ-গর্ভে প্রচন্ড চাপের সৃষ্টি হয়। চাপের দরুণ ভূ-ত্বক ফেটে গিয়ে আগ্নেয়গিরির সৃষ্টি করে।

ঙ. **রাসায়নিক ক্রিয়া :** ভূ-অভ্যন্তরে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক ক্রিয়ার দরুণ যে গ্যাস ও তাপের সৃষ্টি হয় তাতে ভূ-অভ্যন্তরের পদার্থসমূহ অধিক উত্তপ্ত হয়ে চাপের সৃষ্টি করে এবং আগ্নেয়গিরির সৃষ্টি হয়।

চ. **তেজস্ক্রিয় পদার্থের প্রভাব :** রেডিয়াম, থোরিয়াম, ইউরেনিয়াম প্রভৃতি তেজস্ক্রিয় পদার্থ ভূ-অভ্যন্তরে প্রচুর তাপের সৃষ্টি করে এবং অভ্যন্তরীণ পদার্থসমূহ গলে আয়তনে বৃদ্ধি পায় ফলে অগ্ন্যুৎপাতের সৃষ্টি হয়।

ছ. **ভূ-আন্দোলন :** ভূ-আন্দোলনের সময় মহাদেশীয় ও মহাসাগরীয় প্লেটসমূহের গতিশীলতার সময় উত্তপ্ত তরল লাভা উপরে উঠে আসে অগ্ন্যুৎপাত হয় এবং আগ্নেয়গিরির সৃষ্টি হয়।

অগ্ন্যুপাতের ফলাফল (Effect of the Volcanic Eruption)

আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে ভূ-পৃষ্ঠের ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। এতে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হলেও অগ্ন্যুৎপাতের সুফলও রয়েছে। অগ্নুৎপাতের ফলে যে ধরনের ভূমিরূপ তৈরি হয় তা নিম্নরূপ। যথা–

আগ্নেয় মালভূমি : আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে নির্গত পদার্থসমূহ বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে উঁচু মালভূমির সৃষ্টি করে। আবার নিচুভূমিতে লাভা সঞ্চিত হয়েও মালভূমির সৃষ্টি করে। যেমন- ভারতের দক্ষিণাত্যের কৃষ্ণ মৃত্তিকাময় মালভূমি।

আগ্নেয় দ্বীপ : সমুদ্র তলদেশে অগ্ন্যুৎপাতের সময় নির্গত লাভা সঞ্চিত হয়ে দ্বীপের সৃষ্টি করে। যেমন- প্রশান্ত মহাসাগরের হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ পৃথিবীর বৃহত্তম আগ্নেয় দ্বীপ।

আগ্নেয় গহ্বর : আগ্নেয়গিরির ফলে ভূ-পৃষ্ঠের কোনো অংশ ধ্বসে গভীর গহ্বরের সৃষ্টি করে। ১৮৮৩ সালে সুমাত্রা ও জাভা দ্বীপের মধ্যবর্তী একটি দ্বীপে ক্রাকাতোয়া আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে একদিনের মধ্যে দ্বীপটির প্রায় অর্ধেক অংশ উৎক্ষিপ্ত হয়ে বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং বাকী অংশে বৃহৎ একটি গহ্বর দেখা যায়।

আগ্নেয় হ্রদ : মৃত আগ্নেয়গিরির জ্বালামুখে বৃষ্টির পানি জমে হ্রদের সৃষ্টি করে। যেমন- আলাস্কার মাউন্ট আতাকামা, নিকারাগুয়ার কোসেগায়েনা, অ্যারিজোনা ও নেভাদার আগ্নেয় হ্রদ উল্লেখযোগ্য।

আগ্নেয় পর্বত : আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে নির্গত লাভা, দীর্ঘকাল ধরে একই জায়গায় সঞ্চিত হয়ে আগ্নেয় পর্বতের সৃষ্টি করে। যেমন- ইতালির ভিসুভিয়াস।

আগ্নেয় সমভূমি : লাভা ভূ-পৃষ্ঠে সঞ্চিত হয়ে সমভূমিরও সৃষ্টি করে যেমন- উত্তর আমেরিকার স্নেক নদীর লাভা সমভূমি।

উপরিউক্ত ভূমিরূপগুলো ছাড়াও আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে ভয়াবহ ধ্বংসলীলাও সাধিত হয়। ১৯৭৯ সালে ইতালির ভিসুভিয়াস আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে হারকিউলেনিয়াস (Herculeneum) ও পোম্পেই (Pompei) নামক নগর দুটি উত্তপ্ত লাভা ও ভস্মের মাঝে ডুবে গেছে। ১৯৮৬ সালে মেক্সিকোর আগ্নেয়গিরিতে কয়েক হাজার লোকের প্রাণহানি ঘটে। অগ্ন্যুৎপাতের ফলে ভূমির উর্বরতাও বৃদ্ধি পায়। যেমন- দক্ষিণাত্যের লাভা গঠিত কৃষ্ণ মৃত্তিকা কার্পাস চাষের জন্য বিশেষ উপযোগী।

অগ্ন্যুৎপাত বলয় (Location of Volcans) : পৃথিবীতে ৫১৬টি প্রধান আগ্নেয়গিরির মধ্যে ১১৫টি জীবন্ত এবং ৪০১টি মৃত বা সুপ্ত আগ্নেয়গিরি রয়েছে। আগ্নেয়গিরিগুলোর মধ্যে মধ্য আটলান্টিক শৈলশিরায় প্রায় ৭২টি, দক্ষিণ আমেরিকার আন্দিজ পার্বত্য অঞ্চলে ৪৬টি, আফ্রিকায় ১৮টি, ভূ-মধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ১০টি, আইসল্যান্ডে ২০টি, হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে ১২টি এবং বেরিং, শাখালিন, জাপান, ইন্দোনেশিয়া ও জাভা অঞ্চলে ৩০টি আগ্নেয়গিরি রয়েছে। ক্ষুদ্র আগ্নেয়গিরিসহ পৃথিবীতে মোট ৮৫০টি আগ্নেয়গিরি রয়েছে। অবস্থানের উপর নির্ভর করে আগ্নেয়গিরিকে প্রধান চারটি বলয়ে ভাগ করা হয়েছে (চিত্র ৪.৫.৩)। যথা :



চিত্র: ৪.৫.৩ আগ্নেয়গিরি বলয়

১. পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় বলয় : এই বলয়টি উত্তর আমেরিকার এ্যালুসিয়ান, কামচাটকা, জাপান, ফিলিপাইন, জাভা, সুমাত্রা, ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপপুঞ্জ থেকে আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই বলয়ে ৩০৪টি প্রধান আগ্নেয়গিরি রয়েছে যা প্রশান্ত মহাসাগরকে মালার মত ঘিরে রেখেছে বলে এই বলয়কে প্রশান্ত মহাসাগরীয় আগ্নেয় মেখলা (Fiery Ring of the Pacific) বলা হয়।

২. উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার বলয় : উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার রকি ও আন্দিজ পার্বত্য অঞ্চল, দক্ষিণ আমেরিকার ফকল্যান্ড অন্তরীপ থেকে উত্তর আলাস্কা পর্যন্ত বিস্তৃত। এই বলয়ে প্রধান ৯৫টি আগ্নেয়গিরি রয়েছে। প্রায় প্রতিটি আগ্নেয়গিরি মহাদেশের পশ্চিম প্রান্তে কেন্দ্রীভূত অবস্থায় আছে।

৩. মধ্য আটলান্টিক বলয় : এই বলয়টি উত্তর মহাসাগরের আইসল্যান্ড দ্বীপ হতে আরম্ভ হয়ে দক্ষিণে অ্যাজোরস ও কেপভার্ড দ্বীপ হয়ে গিনি উপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। আইসল্যান্ডে প্রায় ১৩টি সক্রিয় আগ্নেয়গিরি রয়েছে।

৪. আফ্রিকা ও ভূ-মধ্যসাগরীয় বলয় : আফ্রিকার স্রস্ত উপত্যকা অঞ্চল হয়ে ভূ-মধ্যসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। ভূ-মধ্যসাগর অঞ্চলে পৃথিবীর প্রায় দশটি আগ্নেয়গিরি অবস্থিত। এছাড়াও পাকিস্তানের বেলুচিস্তান, কোহিসুলতান, মিয়ানমারের মাউন্ট পোপো নামক আগ্নেয়গিরি উল্লেখযোগ্য।

শিক্ষার্থীর কাজ	পৃথিবীর মানচিত্রে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতপ্রবণ অঞ্চলসমূহ চিহ্নিত করুন।

সারসংক্ষেপ

ভূ-অভ্যন্তরস্থ তাপ ও চাপের পার্থক্য এবং অন্যান্য কারণে অভ্যন্তরীণ ম্যাগমা, ধূম্র, ভস্ম প্রভৃতি ভূ-ত্বকের দুর্বল অংশ বা ফাটলের মাধ্যমে প্রবল বেগে বের হয়ে আসে। এই প্রক্রিয়াটিকে অগ্ন্যুৎপাত বলে এবং অগ্ন্যুৎপাতের ফলে নির্গত লাভা জ্বালামুখের চারপার্শ্বে যে মোচাকৃতি পর্বতের সৃষ্টি করে তাকে আগ্নেয়গিরি বলে। অগ্ন্যুৎপাতের ফলে আগ্নেয় মালভূমি, সমভূমি, দ্বীপ, গহ্বর, পর্বত প্রভৃতি গঠন করে। অধিকাংশ আগ্নেয়গিরির অবস্থান মহাদেশসমূহের উপকূলভাগে। পৃথিবীতে মোট ৮৫০টি আগ্নেয়গিরির মধ্যে ৫১৬টি আগ্নেয়গিরি প্রধান। আগ্নেয়গিরিসমূহকে প্রধান দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা- শান্ত এবং বিস্ফোরক প্রকৃতির।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) দিন।

১। অগ্ন্যুৎপাত প্রধানত কত প্রকার?
(ক) ২ প্রকার (খ) ৪ প্রকার (গ) ৬ প্রকার (ঘ) ৮ প্রকার

২। ভূ-অভ্যন্তরের কত মিটার গভীরতায় ১° সে. তাপ বৃদ্ধি পায়?
(ক) ২০ মিটার (খ) ২৫ মিটার (গ) ৩০ মিটার (ঘ) ৩৫

৩। ক্রাকাতোয়া আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে কত সালে সুমাত্রা ও জাভা দ্বীপের মধ্যবর্তী একটি দ্বীপের অর্ধেক অংশ এক দিনের মধ্যে প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায়?
(ক) ১৮৮২ সালে (খ) ১৮৮৩ সালে
(গ) ১৮৮৪ সালে (ঘ) ১৮৮৫ সালে

৪। ভিসুভিয়াস আগ্নেয় পর্বত কোথায় অবস্থিত?
(ক) জার্মানিতে (খ) ইতালিতে
(গ) যুক্তরাষ্ট্রে (ঘ) জাপানে

৫। প্রধান আগ্নেয় এলাকাসমূহকে কয়টি বলয়ে ভাগ করা যায়?
(ক) ২টি (খ) ৩টি
(গ) ৪টি (ঘ) ৫টি

পাঠ-৪.৬ সুনামি ও এর প্রভাব (Causes and Effect of Tsunami)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সুনামির কারণ ও ফলাফল বর্ণনা করতে পারবেন।

সুনামি

সুনামি (Tsunami) জাপানি শব্দ। এর শাব্দিক অর্থ পোতাশ্রয়ের ঢেউ। এখানে 'tsu' অর্থ বন্দর বা harbour এবং 'nami' অর্থ সামুদ্রিক ঢেউ। সুনামির উৎপত্তি সমুদ্রতলে। সমুদ্র তলদেশে প্রবল ভূমিকম্প সংঘটিত হলে সমুদ্রপৃষ্ঠে বিশাল যে ঢেউয়ের সৃষ্টি হয় তাকে সুনামি বলে। সর্বপ্রথম সুনামির কথা লিপিবদ্ধ হয় খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দে।

সুনামি সৃষ্টির কারণ ও সুনামির গতিবিধি : সমুদ্রতলে জিও টেকটোনিক (Geo-techtonic) প্রক্রিয়ার দরুণ ভূ-আন্দোলনের ফলে যে কম্পন হয় তা প্রধানত দু'ভাবে হয়ে থাকে। যথা : সমান্তরালভাবে ও উলম্বভাবে। সুনামির সময় সমুদ্রতলে উলম্ব আলোড়ন হয়। এর ফলে সমুদ্রতলের ভূ-পৃষ্ঠের কোনো স্থান বিশাল অঞ্চলজুড়ে বসে যায় বা কোনো স্থান খাড়াভাবে ওপরে উঠে আসে ও সমুদ্রতলে ফাটলের সৃষ্টি করে যার ফলে তলদেশের সমতা নষ্ট হয়। দ্রুত সমুদ্রপৃষ্ঠের পানির সমতা রক্ষার জন্য পানিরাশির প্রচন্ড উলম্বচাপের সৃষ্টি হয়। ফলশ্রুতিতে উপরিভাগের পানির সমতা রক্ষার জন্য সুনামি সৃষ্টি হয়। সুনামির সৃষ্টির প্রধান কারণ সমুদ্রের তলদেশের ভূমিকম্প। আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের কারণেও সুনামি সৃষ্টি হয়ে থাকে। এছাড়া পারমানবিক বিস্ফোরণ, ভূমিধ্বস, উল্কাপিন্ডের পতন ইত্যাদি কারণেও সুনামি হতে পারে। সমুদ্র তলদেশে ভূমিকম্পের ফলে যে ঢেউয়ের সৃষ্টি করে তা প্রবলবেগে উপকূলের দিকে অগ্রসর হয়। সুনামির একেকটি ঢেউ ঘন্টায় ৬৪০-৯৬০ কি.মি বেগে প্রবাহিত হয়। সুনামির ঢেউ উপকূলের দিকে আসতে থাকলে ঢেউয়ের গতির প্রচন্ডতা কমলেও ঢেউয়ের উচ্চতা বেড়ে যায় বহুগুণে। গভীর সমুদ্রে সুনামির উৎপত্তিস্থলে সুনামির উচ্চতা মাত্র কয়েক সে.মি. উঁচু কিন্তু উপকূলে সুনামির ঢেউয়ের উচ্চতা ৩০-৫০ মিটার উঁচু আকার ধারণ করে।

ফলাফল : সুনামির ফলে সমুদ্রের বিশাল ঢেউ উপকূলের তীরবর্তী অঞ্চলে ভয়াবহ ক্ষতিসাধন করে। যেমন- ১৯৪৬ সালে ১ এপ্রিল সুনামির আঘাতে বিধ্বস্ত হয়েছিল জাপানের হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের হিলো দ্বীপ। ঐ সুনামিটি আলাস্কা উপদ্বীপ হতে ৭০ মাইল দূরে গভীর সমুদ্রে সৃষ্টি হয়েছিল। মুহূর্তের মধ্যে সুনামিটি ১০০ ফুট উঁচু হয়ে ৫ ঘন্টায় ২০০ মাইল অতিক্রম করে হিলো দ্বীপের উত্তর উপকূলে আঘাত হানে এবং ঐ জনপদ ভেসে যায়। ১৯৯৩ সালে সুনামি জাপানের উত্তরাংশে হোক্কাইডো দ্বীপ সংলগ্ন সমুদ্রে আঘাত হেনেছিল। এছাড়া ২০০৫ সালে শ্রীলংকা, ইন্দোনেশিয়া ও থাইল্যান্ডে সুনামির আঘাতে লক্ষাধিক মানুষ মারা যায়, বহু শহর ও নগর ধ্বংস হয়। এছাড়া ২০১১ সালের ১১ মার্চ জাপানের উত্তর উপকূলে ১০ মিটার উঁচু সুনামির উৎপত্তি হয় এবং প্রায় ১৬ হাজার লোকের মৃত্যু হয় এবং নিখোঁজ হয় কয়েক হাজার। প্রাণি ও সম্পদেরও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	সুনামি সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য কী কী পদক্ষেপ নেওয়া যেতে পারে। পোস্টারের মাধ্যমে প্রদর্শন করুন।

সারসংক্ষেপ

সুনামি (Tsunami) জাপানি শব্দ। জাপানি ভাষায় এর অর্থ হলো ''হারবার ওয়েভ'' বা পোতাশ্রয়ের ঢেউ। সমুদ্র তলদেশে ভূমিরূপের আকস্মিক পরিবর্তনকারী শক্তি আগ্নেয়গিরি এবং ভূমিকম্পের ফলে সমুদ্র পৃষ্ঠে বিশাল ঢেউয়ের সৃষ্টি হয়। এরূপ বিশাল ঢেউকে সুনামি বলে। সুনামির ফলে প্রাণহানি এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ব্যাপক।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৪.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। সুনামির বৈশিষ্ট্য-

i. বিশালাকৃতির সামুদ্রিক ঢেউ ii. ঢেউয়ের গতিবেগ ঘন্টায় ৬৪০-৯৬০ কি. মি.
iii. উপকূলের নিকট সুনামির ঢেউয়ের গতিবেগ কম থাকে কিন্তু উচ্চতা অনেক বেশি থাকে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) ii ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২। সুনামির কারণ-

i. আগ্নেয়গিরি ii. ভূমিকম্প iii. সমুদ্রের নিচে পারমানবিক বিস্ফোরণ

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i, ii ও iii (খ) ii ও iii (গ) iii (ঘ) i, ii

৩। সুনামি একটি-

(ক) জাপানি শব্দ (খ) চীনা শব্দ (গ) ইংরেজি শব্দ (ঘ) গ্রীক শব্দ

৪। সুনামি শব্দের শাব্দিক অর্থ?

(ক) পোতাশ্রয়ের ঢেউ (খ) নদীর ঢেউ (গ) সমুদ্রের ঢেউ (ঘ) সাময়িক ঢেউ

৫। সর্বপ্রথম সুনামির কথা লিপিবদ্ধ হয় কত খ্রিস্টপূর্বে?

(ক) খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দে (খ) খ্রিস্টপূর্ব ১৩০০ অব্দে (গ) খ্রিস্টপূর্ব ১৮০০ অব্দে (ঘ) খ্রিস্টপূর্ব ১২০০ অব্দে

সৃজনশীল প্রশ্ন : ১

পৃথিবীর অভ্যন্তরে এমন কিছু ঘটনা ঘটে যা ভূ-ত্বককে আকস্মিকভাবে আন্দোলিত করে এবং যার তীব্রতা মাপার জন্য মার্সেলীর স্কেল বা রিকটার স্কেল ব্যবহার করা হয়।

ক) ভূ-ত্বকের আকস্মিক পরিবর্তনকারী শক্তিসমূহ কী কী?
খ) আকস্মিক পরিবর্তনকারী শক্তিসমূহের সংজ্ঞা লিখুন।
গ) উদ্দীপকের ইঙ্গিতকৃত ঘটনাসমূহ যে সব অঞ্চলে ঘটে সেইসব অঞ্চলের বিন্যাস পৃথিবীর মানচিত্রে অঙ্কন করুন।
ঘ) পাঠ্য বইয়ের আলোকে উদ্দীপকের ইঙ্গিতকৃত বিষয়টির প্রভাব বিশ্লেষণ করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন : ২

মহাসাগরসমূহে বিশাল জলরাশি থাকা সত্ত্বেও মহাসাগরের তলদেশে প্রায়ই উত্তপ্ত, পাথরখন্ড, কাঁদা, ধোঁয়া, গলিত ধাতব পদার্থ প্রভৃতি ভূ-গর্ভ থেকে ভূ-পৃষ্ঠ পর্যন্ত বিশাল সুরঙ্গপথ দিয়ে প্রবলবেগে উৎক্ষিপ্ত হয়। শুনে অনেকে অবাক হয়।

ক) উদ্দীপকটির নাম কী?
খ) উদ্দীপকটির সংজ্ঞা লিখুন।
গ) উদ্দীপকটির স্বরূপ বিশ্লেষণ করুন।
ঘ) উদ্দীপকে বর্ণিত ঘটনাসমূহ ঘটার যথাযথ কারণ বিশ্লেষণ করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন : ৩

বেশ কিছুদিন আগে সাগরের পানি হঠাৎ অস্বাভাবিকভাবে আন্দোলিত হয়ে জাপানের স্থলভাগে শক্তিশালী ঢেউ আঘাত হানে। সমুদ্রজলের এই তান্ডবে মুহূর্তে ধ্বংস হয়ে যায় সকল স্থাপনা এবং প্রাণহানি ঘটে অসংখ্য মানুষের।

ক) জাপানের সমুদ্র উপকূলে যে শক্তিশালী ঢেউ আঘাত হানে তার নাম কী?
খ) অনুচ্ছেদে উল্লিখিত উদ্দীপকটির সংজ্ঞা লিখুন।
গ) যে উদ্দীপকের জন্য জাপান সেদিন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল সে ঘটনাসমূহের স্বরূপ ব্যাখ্যা করুন।
ঘ) উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত ঘটনাসমূহের যথাযথ কারণ বিশ্লেষণ করুন।

উত্তরমালা

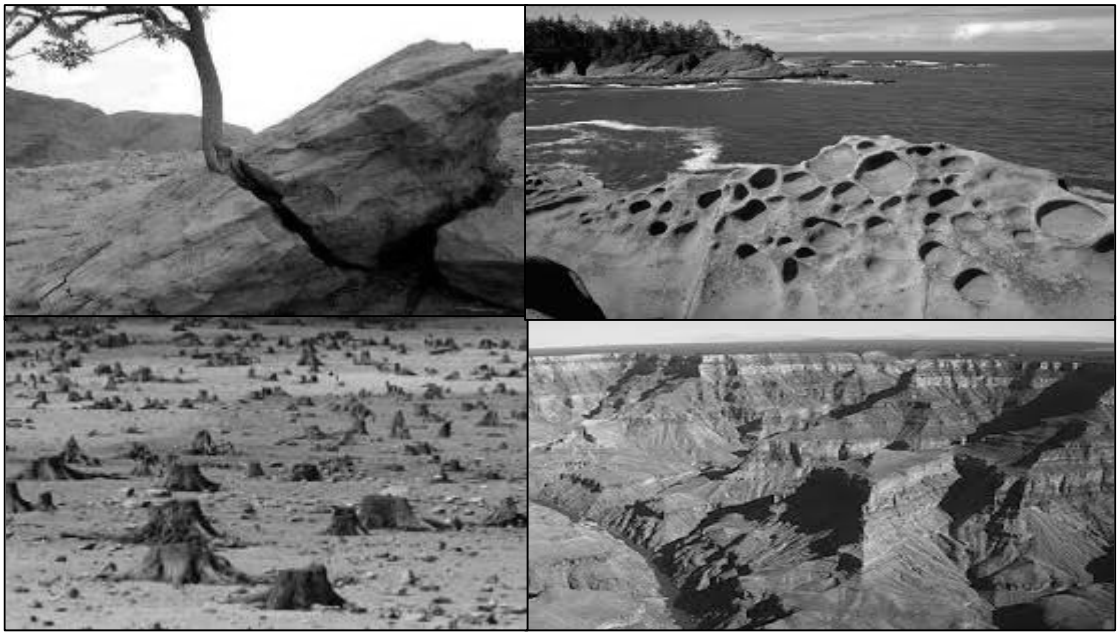
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.১ :	১. ঘ	২.খ	৩. ঘ	৪. ক		
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.২ :	১. খ	২.ক	৩. খ			
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৩ :	১. ক	২. খ	৩. খ	৪. ক	৫. ক	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৪ :	১. খ	২. খ	৩. খ	৪. গ	৫. ক	৬. খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৫ :	১. ক	২. গ.	৩. খ	৪. খ	৫. গ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৪.৬ :	১. ঘ	২. ক	৩. ক	৪. ক	৫. ক	

বিচূর্ণীভবন ও নগ্নীভবন
(Weathering and Denudation)

ইউনিট ৫

ভূমিকা

পৃথিবী সৃষ্টির শুরু থেকে ভূ-অভ্যন্তরীণ এবং ভূ-পৃষ্ঠস্থ বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় ক্রমাগত ভূ-ত্বকের পরিবর্তন হচ্ছে। ভূ-ত্বকের শিলারাশি যান্ত্রিক, রাসায়নিক এবং জৈবিক প্রক্রিয়ায় চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে নিচের কঠিন শিলা উন্মুক্ত হয়। এভাবে শিলারাশির চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়ার প্রক্রিয়াকে বিচূর্ণীভবন বলে এবং বিচূর্ণীভবনের ফলে ভূ-ত্বকের নিচের শিলা উন্মুক্ত হওয়ার প্রক্রিয়াকে নগ্নীভবন বলে। অর্থাৎ বিচূর্ণীভবন হচ্ছে নগ্নীভবন হওয়ার একটি প্রক্রিয়া। এই ইউনিটে নগ্নীভবন ও বিচূর্ণীভবনের প্রক্রিয়া, কারণ ও শ্রেণিবিভাগ আলোচনা করা হয়েছে।



ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ ৫.১ : ক্ষয়ীভবন ও নগ্নীভবনের ধারণা
পাঠ ৫.২ : বিচূর্ণীভবনের ধারণা
পাঠ ৫.৩ : বিচূর্ণীভবনের কারণ ও শ্রেণিবিভাগ
পাঠ ৫.৪ : যান্ত্রিক বিচূর্ণীভবন
পাঠ ৫.৫ : রাসায়নিক বিচূর্ণীভবন
পাঠ ৫.৬ : জৈবিক বিচূর্ণীভবন

পাঠ-৫.১ ক্ষয়ীভবন ও নগ্নীভবনের ধারণা (Concept of Erosion and Denudation)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- ক্ষয়ীভবন ও নগ্নীভবন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

ক্ষয়ীভবন

ভূ-ত্বকের উপরের শিলারাশি বায়ুপ্রবাহ, বৃষ্টিপাত, নদীপ্রবাহ, হিমবাহ ও সাগর তরঙ্গ প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে অবিরত ক্ষয়ের মাধ্যমে সৃষ্ট ক্ষয়জাত পদার্থ এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পরিবাহিত ও স্থানান্তরিত হয়। এভাবে প্রাকৃতিক শক্তির দ্বারা ভূ-ত্বকের শিলারাশির ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ার প্রক্রিয়াকে ক্ষয়ীভবন বলে। সূর্যরশ্মি, বায়ুপ্রবাহ, বৃষ্টিপাত, নদীপ্রবাহ, হিমবাহ ও সাগর তরঙ্গ প্রভৃতি ক্ষয়ীভবনের প্রাকৃতিক নিয়ামক।

ক্ষয়ীভবনের প্রক্রিয়া : প্রাকৃতিক শক্তির দ্বারা ভূ-ত্বকের শিলারাশি ক্ষয়প্রাপ্ত হওয়ার প্রক্রিয়া নিম্নে আলোচনা করা হলো–

১. **সূর্যরশ্মির তাপ :** সূর্যরশ্মির তাপের প্রভাবে দিনের বেলায় ভূ-ত্বক উত্তপ্ত ও প্রসারিত হয় এবং রাতের বেলায় তা শীতল ও সংকুচিত হয়। সূর্যরশ্মির তাপের হ্রাস-বৃদ্ধির ফলে ভূ-ত্বকের শিলারাশি এভাবে ধীরে ধীরে ভঙ্গুর হয়ে পড়ে এবং ভূ-ত্বক ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। দীর্ঘদিনের এইরূপ প্রসারণ ও সঙ্কোচনের ফলে ভূ-ত্বক চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ক্ষুদ্র মৃত্তিকার কণা ও শিলাকণায় পরিণত হয়। এর ফলে সহজেই ক্ষয়ীভবন প্রক্রিয়া কার্যকর হয়।

২. **বায়ুপ্রবাহ :** মরুএলাকায় বায়ুপ্রবাহের দ্বারা সর্বাধিক ক্ষয়ীভবন হয়। মরুভূমিতে গাছপালা না থাকায় মৃত্তিকা ও শিলারাশির দৃঢ়তা খুবই কম। যার দরুণ ভূ-ত্বকের উপরিভাগ থেকে শিলারাশি ও মৃত্তিকা বায়ুর সাথে অন্যত্র চলে যায়।

৩. **বৃষ্টিপাত :** বৃষ্টির পানিতে কঠিন শিলা নরম ও আলগা হয়ে যায়। এর ফলে মাটি ও বালির স্তূপ ভেঙে পানিতে মিশে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। ভূ-পৃষ্ঠের উপর দিয়ে বৃষ্টির পানি প্রবাহিত হওয়ার সময় যান্ত্রিক ও রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ভূ-পৃষ্ঠের ব্যাপক ক্ষয় হয়।

৪. **নদীপ্রবাহ :** নদী স্রোতের প্রভাবে নদীর তলদেশ এবং পার্শ্বদিক ঘর্ষণের ফলে ক্ষয় হয়ে ক্ষয়জাত পদার্থ স্রোতের সাথে পরিবাহিত হয়।

৫. **সমুদ্রের কাজ :** সমুদ্রের জোয়ার ভাঁটা ও প্রবল তরঙ্গ উপকূলের শিলার সাথে ঘর্ষণের ফলে শিলা ক্ষয়প্রাপ্ত হয়।

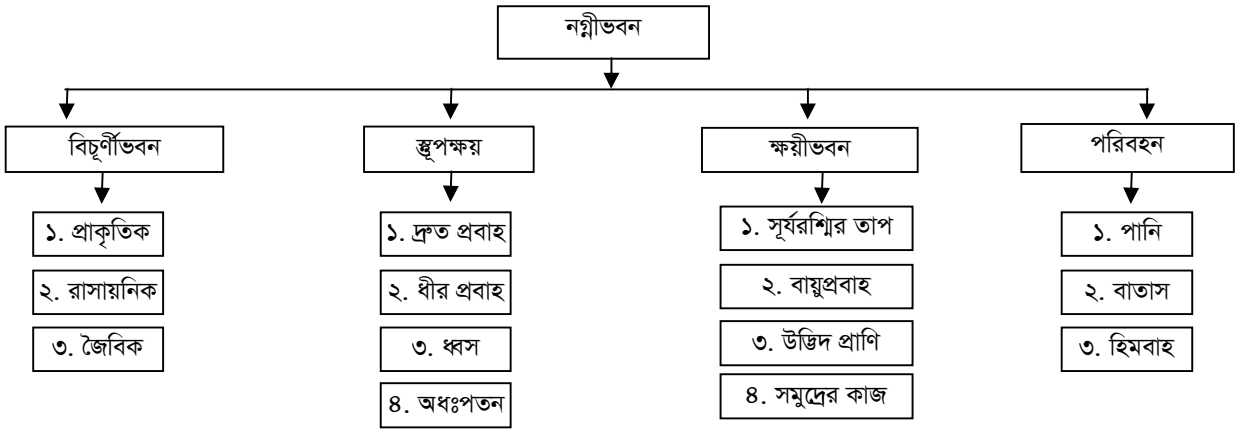
৬. **হিমবাহ :** হিমবাহ ভূমির উপর দিয়ে প্রবাহের সময় যে পথ দিয়ে বাহিত হয় সে পথের ভূমি ক্ষয় হয়।

৭. **উদ্ভিদ ও প্রাণি :** উদ্ভিদের শিকড় শিলার ফাটলের মধ্যে প্রবেশ করে শিলা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে থাকে। তাছাড়া বিভিন্ন প্রাণি যেমন-কেঁচো, ইঁদুর প্রভৃতি মাটি খুঁড়ে মাটিকে বিচূর্ণ করে থাকে।

৮. **মানুষের কাজ :** মানুষ জীবনধারণের জন্য কৃষিকাজ, কূপ খনন, খনির কাজ, রাস্তা তৈরি, বাঁধ নির্মাণ ইত্যাদি করে থাকে। যার ফলে ভূমি ক্ষয় হয়।

নগ্নীভবন (Denudation)

নগ্নীভবন অর্থ উন্মুক্ত করা। যে প্রক্রিয়ায় ভূ-পৃষ্ঠের শিলাসমূহ অনবরত চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং কালক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত শিলাগুলি সৃষ্ট নদীস্রোত, বায়ুপ্রবাহ, হিমবাহসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তি দ্বারা অন্যত্র অপসারিত হয় এবং নিচের কঠিন শিলাগুলি অপরিবর্তিত অবস্থায় উন্মুক্ত হয়, তাকে নগ্নীভবন বলে। অন্য কথায়, বিচূর্ণীভবন, ক্ষয়ীভবন ও অপসারণের সমুদয় কার্যকে একত্রে বলা হয় নগ্নীভবন (বিচূর্ণীভবন+ক্ষয়ীভবন= নগ্নীভবন)। নগ্নীভবনের প্রক্রিয়া ভূ-পৃষ্ঠের প্রায় সর্বত্র বিরামহীনভাবে কার্যকর। নগ্নীভবনে প্রক্রিয়াগুলো নিম্নের ছকে দেখানো হলো।



শিক্ষার্থীর কাজ	নগ্নীভবন এবং ক্ষয়ীভবন এর প্রক্রিয়াসমূহ কী কী?

সারসংক্ষেপ

প্রাকৃতিক বা যান্ত্রিক শক্তির প্রভাবে ভূ-ত্বকের যে অবিরত ক্ষয়সাধন হচ্ছে তাকে ক্ষয়ীভবন বলে। সূর্যরশ্মির তাপ, বায়ুপ্রবাহ, বৃষ্টিপাত, নদীপ্রবাহ, সমুদ্রের কাজ, হিমবাহ, উদ্ভিদ, প্রাণি ও মানুষ প্রভৃতির মাধ্যমে ক্ষয়ীভবন প্রক্রিয়া সংগঠিত হয়ে। কালক্রমে ক্ষয়প্রাপ্ত এই শিলাগুলির চূর্ণ-বিচূর্ণ অংশ সৃষ্ট নদীস্রোত, বায়ুপ্রবাহ, হিমবাহসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তি দ্বারা অন্যত্র অপসারিত হয়। অপরদিকে নীচের কঠিন শিলাগুলি অপরিবর্তিত অবস্থায় নগ্ন হয়ে পড়ে ও দৃষ্টিগোচর হয়। এই প্রক্রিয়াকে নগ্নীভবন বলে। বিচূর্ণীভবন, স্তূপ অপসারণ, ক্ষয়সাধন ও পরিবহন প্রক্রিয়ায় নগ্নীভবন সংগঠিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। নিচের কোনটি নগ্নীভবন?

(ক) ক্ষয়ীভবন + অবগাহন (খ) বিচূর্ণীভবন + অবগাহন

(গ) বিচূর্ণীভবন+ক্ষয়ীভবন (ঘ) কোনটিই নয়

২। নগ্নীভবনে কয় ধরনের প্রক্রিয়ার কাজ করে?

(ক) এক (খ) দুই

(গ) তিন (ঘ) চার

৩। মরুএলাকায় কীসের দ্বারা সবচেয়ে বেশি পরিমাণ ক্ষয়ীভবন হয়ে থাকে?

(ক বায়ুপ্রবাহের (খ) সূর্যরশ্মি

(গ) বৃষ্টিপাতের (ঘ) কোনটিই নয়

৪। নগ্নীভবন অর্থ শিলারাশির-

(ক) বৃষ্টিপাত সংঘটন (খ) হিমবাহ

(গ) উন্মুক্তকরণ (ঘ) সমুদ্র

পাঠ-৫.২ বিচূর্ণীভবনের ধারণা (Concept of Weathering)

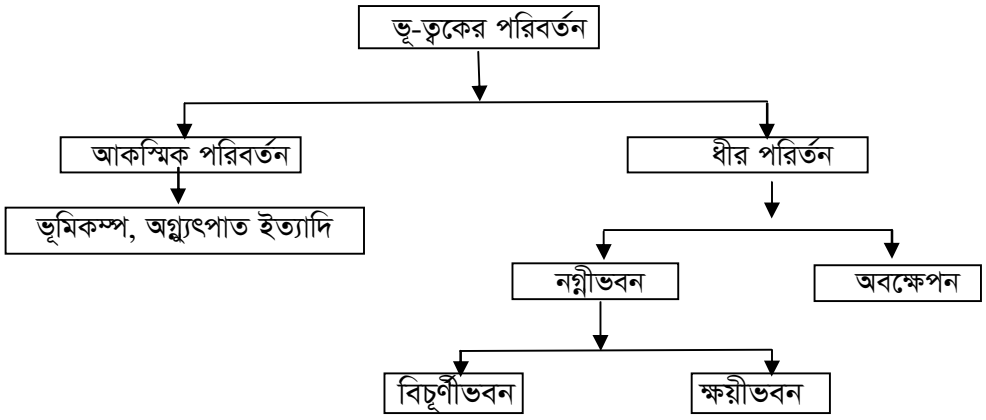
উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বিচূর্ণীভবন ও ক্ষয়ীভবন ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

ভূ-ত্বকের পরিবর্তন

বিচূর্ণীভবন পৃথিবীর ধীর পরিবর্তনকারী শক্তি। নানা প্রকার বাহ্যিক প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে ভূ-পৃষ্ঠে দীর্ঘদিন ধরে যে পরিবর্তন সাধিত হয় তাকে ধীর প্রাকৃতিক পরিবর্তন বলে। ভূ-পৃষ্ঠের অতি বিস্তৃত এলাকা জুড়ে ধীর পরিবর্তনের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। নদী, বৃষ্টি, হিমবাহ, তুহিন, উত্তাপ, সমুদ্র প্রভৃতি ধীর পরিবর্তনের সহায়ক শক্তি। এদের দ্বারা পরিবর্তন এত ধীর গতিতে সংঘটিত হয় যে, দুই চারশত বৎসরেও কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না। ধীর পরিবর্তনকারী প্রাকৃতিক শক্তিগুলি দীর্ঘ দিনের ক্ষয়সাধনের দ্বারা বৃহৎ ভূমিরূপ হতে নানা প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূমিরূপের সৃষ্টি করে। নিম্নে একটি ছকের সাহায্যে ভূ-ত্বকের পরিবর্তনের ধরণ দেখানো হলো।



বিচূর্ণীভবন (Weathering)

বিচূর্ণীভবন বা আবহবিকার বলতে নানা প্রকার প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিলাসমূহের চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়াকে বুঝায়। বিভিন্ন যান্ত্রিক, রাসায়নিক ও জৈবিক প্রক্রিয়াগুলি ভূ-পৃষ্ঠে অনবরত কার্যকর রয়েছে এবং তাদের দ্বারা সেখানকার শিলারাশি প্রতিনিয়ত চূর্ণ-বিচূর্ণ হচ্ছে। পৃথিবীর সব স্থানের আবহাওয়া সবসময় একই রূপ থাকে না। এমনকি যে কোনো স্থানের যে কোনো দিনের বিভিন্ন সময়ের আবহাওয়ার মধ্যে তারতম্য ঘটে। সময় পরিবর্তনে আবহাওয়া সংক্রান্ত বিভিন্ন উপাদানের অর্থাৎ বৃষ্টিপাত, বায়ুর উষ্ণতা, চাপ, আর্দ্রতা প্রভৃতির পরিবর্তন ঘটে। অধিক তাপে শিলাসমূহ প্রসারিত হয় আবার তাপ হ্রাসে তা সংকুচিত হয়। অতএব, যে সব স্থানে বিশেষ করে দিবা-রাত্রির উষ্ণতার পার্থক্য এবং শীত-গ্রীষ্মের উষ্ণতার পার্থক্য খুব বেশি সে সব স্থানে শিলাসমূহের প্রসারিত ও সংকুচিত হওয়ার কাজ ক্রমাগত চলতে থাকে। এভাবে সেখানকার শিলাসমূহ ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ে এবং কালক্রমে ঐ সব শিলা ধীরে ধীরে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে নরম ও আলগা হয়। এভাবেই বিচূর্ণীভবন প্রক্রিয়া চলতে থাকে। উল্লেখ্য, বিচূর্ণীভবন বা আবহবিকার বলতে কেবলমাত্র বিচূর্ণীকরণ প্রক্রিয়াকেই বুঝায় কিন্তু বিচূর্ণীত বা ক্ষয়প্রাপ্ত শিলাসমূহের স্থানান্তর বুঝায় না। সে জন্য বিচূর্ণীভবনের মাধ্যমগুলি সুনির্দিষ্ট। সুতরাং বিচূর্ণীভবন ও ক্ষয়ীভবনের মধ্যে পার্থক্য হলো এই যে, ক্ষয়ীভবন শিথিল শিলাখন্ডসমূহ দূর দেশে অপসারিত করে। আর বিচূর্ণীভবনে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির দ্বারা শিলাখন্ড সামান্য স্থানচ্যুত হয়। কিন্তু শিলাখন্ডসমূহ অপসারণ হয় না।

বিচূর্ণীভবনের প্রক্রিয়া যেভাবেই সম্পন্ন হোক না কেন নিম্নোক্ত চারটি কাজ এর দ্বারা সম্পাদন হয়ে থাকে-

ক) শিলা/ মাটির ক্ষয়সাধনে কাজ করে,
খ) ভূমির উচ্চতা কমাতে নিয়ামক হিসেবে কাজ করে,
গ) ভূমিরূপের পরিবর্তনে সরাসরি অংশগ্রহণ করে এবং
ঘ) রিগোলিথ ও মাটি গঠনে সক্রিয় ভূমিকা রাখে।

শিক্ষার্থীর কাজ	ভূ-ত্বকের বিভিন্ন প্রাকৃতিক পরিবর্তন প্রক্রিয়াগুলোর নাম লিখুন।

সারসংক্ষেপ

বিচূর্ণীভবন পৃথিবীর ধীর পরিবর্তনকারী শক্তি। বিচূর্ণীভবন বা আবহবিকার বলতে বিভিন্ন প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে শিলাসমূহের চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়াকে বুঝায়। বিভিন্ন যান্ত্রিক, রাসায়নিক ও জৈবিক প্রক্রিয়াগুলি ভূ-পৃষ্ঠে অনবরত ক্রিয়াশীল থাকায় শিলারাশি প্রতিনিয়ত চূর্ণ-বিচূর্ণ হচ্ছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৫.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। অধিক তাপে শিলাসমূহ–

(ক) প্রসারিত হয় (খ) ভাঁজ হয় (গ) ক্ষয় হয় (ঘ) কোনটিই নয়

২। বিচূর্ণীভবন প্রক্রিয়াকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?

(ক) ৩ (খ) ৪ (গ) ২ (ঘ) ৫

৩। বিচূর্ণীভবনে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির দ্বারা শিলাখন্ড কী হয়?

(ক) স্থানচ্যুত (খ) স্রস্ত উপত্যকা (গ) বিচূর্ণ (ঘ) কোনটিই নয়

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

ভূ-পৃষ্ঠ সর্বদা পরিবর্তনশীল। বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় ভূ-পৃষ্ঠ অনবরত পরিবর্তিত হচ্ছে। এই পরিবর্তনগুলোর মধ্যে কিছু পরিবর্তন সম্পর্কে মানুষ সচেতন হলেও কিছু পরিবর্তন সম্পর্কে মানুষ একেবারেই সচেতন নয়।

৪। ভূ-পৃষ্ঠ পরিবর্তনের দ্রুত মাধ্যম কোনটি?

(ক) ভূমিক্ষয় (খ) বিচূর্ণীভবন (গ) ভূ-কম্পন (ঘ) নগ্নীভবন

৫। ভূ-পৃষ্ঠ পরিবর্তনের ধীর মাধ্যম কোনটি?

(ক) ভূ-কম্পন (খ) বিচূর্ণীভবন (গ) ভূমিধ্বস (ঘ) কোনটিই নয়

পাঠ-৫.৩ বিচূর্ণীভবনের কারণ ও শ্রেণিবিভাগ
(Causes and Classification of Weathering)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বিচূর্ণীভবনের কারণ ও প্রকারভেদ বর্ণনা করতে পারবেন।

বিচূর্ণীভবনের কারণ

বিচূর্ণীভবন বিভিন্ন প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট কারণে সংঘটিত হয়ে থাকে। নিম্নে বিচূর্ণীভবনের প্রধান কারণগুলো আলোচনা করা হলো।

ক) তাপমাত্রার হ্রাস-বৃদ্ধি : তাপ ও তাপমাত্রা বিচূর্ণীভবনের অন্যতম প্রধান নিয়ামক। সূর্যের অধিক তাপমাত্রা যেমন শিলারাশি চূর্ণ-বিচূর্ণ হতে সাহায্য করে, আবার কম তাপমাত্রায় শিলা সংকুচিত হয়। ক্রমাগত তাপমাত্রা বৃদ্ধি এবং হ্রাসের ফলে শিলা এভাবে সম্প্রসারিত এবং সংকুচিত হয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়।

খ) বৃষ্টিপাতের প্রভাব : বৃষ্টিপাতের প্রভাবে শিলার ছিদ্রে পানি প্রবেশ করে শিলাস্তরকে চূর্ণ-বিচূর্ণ হতে সাহায্য করে।

গ) মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাব : উচ্চ পর্বতের খাড়া ঢালে কোনো প্রকান্ড শিলাখন্ড আলগা হলে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে ভূ-পৃষ্ঠের নিচের দিকে নামতে থাকে এবং অন্যান্য শিলাখন্ডের সাথে ঘাত প্রতিঘাতে বিচূর্ণিত হয়।

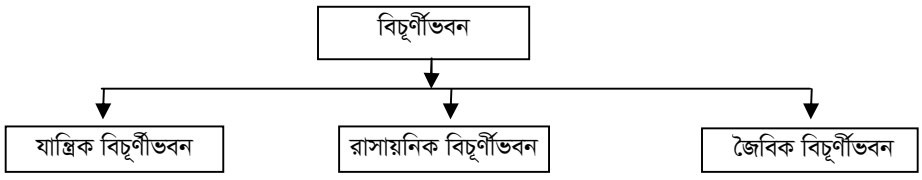
ঘ) জীবজন্তু ও কীট পতঙ্গ : জীবজন্তু এবং কীটপতঙ্গ বিচূর্ণীভবনে সাহায্য করে। নানা প্রকার জীবজন্তুর মধ্যে কেঁচো, ইঁদুর, পিঁপড়া, কুকুর প্রভৃতি সর্বদা মাটি খুড়ে ওলট-পালট করে ভূ-ত্বকের পরিবর্তন সাধন করে। এই পরিবর্তন খুব সূক্ষ্ম এবং ধীর প্রক্রিয়ায় হয়।

ঙ) নদীর প্রভাব : ভূ-ত্বকের পরিবর্তনকারী শক্তিগুলোর মধ্যে নদী সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। প্রাথমিক গতিতে নদী প্রত্যক্ষভাবে আঘাত, ঘর্ষণ ও কর্ষণ দ্বারা ক্ষয়কার্যের ফলে শিলারাশি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় এবং নদীর স্রোতের সাহায্যে বাহিত হয়ে বিভিন্ন প্রকার ভূমিরূপ সৃষ্টি করে। সমভূমি অঞ্চলে স্রোতের বেগ কম থাকায় শিলাসমূহ তুলনামূলকভাবে কম বিচূর্ণিত হয়।

চ) বায়ুপ্রবাহের কার্য : বায়ুপ্রবাহের ফলে কঠিন শিলাগুলি স্থানান্তরিত হওয়ার সময় তাদের আঘাতে অপেক্ষাকৃত কোমল শিলাগুলি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। বিশেষ করে কোয়ার্টজ জাতীয় শিলার সংস্পর্শে কোমল শিলাগুলি অতি সহজেই ভেঙে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণায় পরিণত হয়।

জ) তুষারের কার্য : শীতপ্রধান দেশে পানি জমে অত্যধিক শীতে জমাট বেঁধে তুষারে পরিণত হয় এবং আয়তনে বৃদ্ধি পায়। ফলে তুষারের প্রচন্ড চাপে ফাটলসমূহ অধিকতর প্রসারিত হয় এবং শিলাস্তর ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়।

বিচূর্ণীভবনের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Weathering) : বিচূর্ণীভবন সংঘটিত হওয়ার প্রক্রিয়ার ওপর ভিত্তি করে বিচূর্ণীভবন বা আবহবিকারকে প্রধানত তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়।



১। যান্ত্রিক বা প্রাকৃতিক বিচূর্ণীভবন (Mechanical or Physical Weathering) : যান্ত্রিক বা প্রাকৃতিক বিচূর্ণীভবনে ভূ-পৃষ্ঠের শিলাসমূহ উত্তাপের তারতম্যে, তুষারের কার্যে এবং আংশিকভাবে গাছপালা ও জীবজন্তুর ক্রিয়াকলাপে ভেঙ্গে টুকরা টুকরা হয়ে যায়।

২। রাসায়নিক বিচূর্ণীভবন (Chemiacl Weathering) : রাসায়নিক বিচূর্ণীভবনে বায়ুমন্ডলে অবস্থিত পানি, অক্সিজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং জৈব পদার্থ ও এগুলোর অবশিষ্টাংশের দ্বারা খনিজ দ্রব্যসমূহ বিয়োজিত ও দ্রবীভূত হয়ে আলগা হয়ে পড়ে।

৩। জৈবিক বিচূর্ণীভবন (Biological Weathering) : মানুষ ও জীবজন্তু দ্বারা সংঘটিত বিচূর্ণীভবনকে অনেক সময় জৈবিক বিচূর্ণীভবন নামে অভিহিত করা হয়। যান্ত্রিক এবং রাসায়নিক উভয় প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই জৈবিক বিচূর্ণীভবন কাজ করে থাকে।

পরবর্তী পাঠগুলোতে বিভিন্ন প্রকার বিচূর্ণীভবন সর্ম্পকে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	বিচূর্ণীভবনের কারণসমূহের তালিকা করুন।

সারসংক্ষেপ

বিচূর্ণীভবনের প্রভাবকসমূহ হলো তাপ ও তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, জীবজন্তু ও কীটপতঙ্গ, নদীর প্রভাব, বায়ু, হিমবাহ ও তুষারের কার্য ইত্যাদি। বিচূর্ণীভবন সংঘটিত হওয়ার প্রক্রিয়ার ওপর ভিত্তি করে বিচূর্ণীভবন বা আবহবিকারকে প্রধানত তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা- রাসায়নিক, যান্ত্রিক ও জৈবিক বিচূর্ণীভবন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। বিচূর্ণীভবনের প্রভাবক কোনটি?

(ক) তাপ ও তাপমাত্রা (খ) মাধ্যাকর্ষণ শক্তি

(গ) বৃষ্টিপাত (ঘ) সবগুলো

২। বিচূর্ণীভবনে সাহায্য করে–

(ক) জীবজন্তু (খ) ক+গ

(গ) কীটপতঙ্গ (ঘ) কোনটিই নয়

৩। নদীর প্রাথমিক গতি শেষ হবার পরেই পাহাড়ের পাদদেশে প্রচুর পরিমাণে বৃহদাকৃতির কী সঞ্চিত হয়?

(ক) শিলাখন্ড (খ) বরফ

(গ) কীটপতঙ্গ (ঘ) কোনটিই নয়

পাঠ-৫.৪ যান্ত্রিক বিচূর্ণীভবন (Physical Weathering)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- যান্ত্রিক বিচূর্ণীভবনের সংজ্ঞা ও প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

যান্ত্রিক বিচূর্ণীভবন

ভূ-পৃষ্ঠের কঠিন শিলা আবরণ যে প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় ভেঙ্গে ছোট ছোট খন্ডে বিভক্ত হয় তাকে যান্ত্রিক বিচূর্ণীভবন বলে। প্রাকৃতিক শক্তিসমূহের দ্বারা শিলা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় বলে একে প্রাকৃতিক বিচূর্ণীভবনও বলে। যান্ত্রিক বিচূর্ণীভবন সাধারণত মরুভূমি অঞ্চলে যেখানে উত্তাপের দ্রুত পরিবর্তন হয় এবং উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে যেখানে তুষারের প্রভাব খুব বেশি সেখানে অধিক হয়ে থাকে। সূর্যের তাপ, বৃষ্টি, শিলার চাপ হ্রাস-বৃদ্ধি এবং মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে যান্ত্রিক বিচূর্ণীভবন সংগঠিত হয়।

যান্ত্রিক বা প্রাকৃতিক বিচূর্ণীভবন প্রক্রিয়া : প্রাকৃতিক বিচূর্ণীভবনের প্রক্রিয়াসমূহ নিম্নরূপ। যথা-

১) তাপমাত্রার পরিবর্তনের মাধ্যমে;
২) তুষারের মাধ্যমে;
৩) পানির মাধ্যমে;
৪) চাপ হ্রাসের মাধ্যমে এবং
৫) মাধ্যাকর্ষণ শক্তির মাধ্যমে।

১. তাপমাত্রার পরিবর্তনের মাধ্যমে : সূর্যতাপের প্রভাবে ভূ-পৃষ্ঠের শিলারাশি খন্ড-বিখন্ড হয়ে যান্ত্রিক বিচূর্ণীভবনে সহায়তা করে থাকে। মরুভূমি এলাকায় দিনের প্রচন্ড সূর্যতাপে শিলার খনিজসমূহ আয়তনে বৃদ্ধি পায় এবং রাতে ঠান্ডায় সংকুচিত হয়। এভাবে ক্রমাগত সম্প্রসারণ ও সংকোচন প্রক্রিয়া কার্যকর থাকায় খনিজসমূহের বাঁধন দুর্বল হয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে খনিজসমূহ শিলা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। শিলাস্তরের উপরেই স্বাভাবিক সূর্যরশ্মি পতিত হয়। তখন শিলা উত্তপ্ত হয়ে পার্শ্ব বা নিচের দিকে প্রসারিত হতে না পেরে উপরের দিকে প্রসারিত হয়। এর ফলে শিলার উপরের স্তর থেকে পৃথক হয়ে স্তরে স্তরে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এটা অনেকটা পেঁয়াজের খোসার ন্যায় খুলে যায়। শিলার এরূপ বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রক্রিয়াকে শিলার স্তর মোচন (Exfoliation) বলা হয়। এভাবে শিলার উপরের অংশ আলগা হয়ে খন্ড-বিখন্ড হতে থাকে এবং কালক্রমে গোলাকার রূপ ধারণ করে। এ জাতীয় বিচূর্ণীভবনকে গোলাকৃতি বিচূর্ণীভবনও (Spheroidal Weathering) বলা হয়। এভাবে সৃষ্ট গোলাকার শিলাখন্ডকে অবশিষ্ট শিলা (Residual Rock) বলে। এটি গ্রানাইট শিলায় অধিক দেখা যায়।

২. তুষারের মাধ্যমে : যেসব শিলায় ফাঁটল দেখতে পাওয়া যায় সেসব ফাঁটলে বৃষ্টির পানি প্রবেশ করে থাকে। শীতল জলবায়ু অঞ্চলে বা উচ্চ অক্ষাংশে অথবা উচ্চ পর্বত গাত্রে গ্রীষ্মকালে বরফ গলে অথবা বর্ষাকালে শিলাস্তরের ফাঁটলের মধ্যে পানি প্রবেশ করে সঞ্চিত হলে তা পরে অত্যধিক ঠান্ডায় জমে বরফে পরিণত হয়। এর ফলে ফাঁটলের মধ্যস্থিত পানিও বরফে পরিণত হয়। ফাঁটলের দুই পার্শ্বের দেয়ালে প্রচন্ড চাপের সৃষ্টি করে (প্রতি বর্গ সে.মি. প্রায় ১৪ কিলোগ্রাম)। এই চাপের ফলে ফাঁটল ক্রমশ বৃদ্ধি পায় এবং শিলাস্তর ফেঁটে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর খন্ডে পরিণত হয়। এই প্রস্তর খন্ডগুলো পর্বতগাত্র বেয়ে পাদদেশে এসে জমে। এরূপে কোনো বিশিষ্ট ক্ষুদ্রাকার শিলাখন্ডের দ্বারা আবৃত অঞ্চলকে ফেলসেনমার বা ব□কস্পেড (Felsenmer or Blockspade) বলে। পর্বত গাত্রে কোণাকৃতি এরূপ প্রস্তর খন্ড সঞ্চিত হলে তাকে স্ক্রী (Screes) বা ট্যালাস (Tallus) বলে। সছিদ্র (Porous) মৃত্তিকার মধ্যে পানি বরফে পরিণত হলে মৃত্তিকা ফেটে যায়। শীতপ্রধান দেশে কৃষিজমির বড় বড় মাটির ঢেলা তুষারের ক্রিয়ায় ফেটে যায়। এতে পরবর্তীতে কৃষিকার্যের সুবিধা হয়।

৩. পানির মাধ্যমে : পানি তিন প্রক্রিয়ায় বিচূর্ণীভবনে সহায়তা করে থাকে। যথা-

(ক) বৃষ্টিবহুল অঞ্চলে পানি বছরের পর বছর ধরে শিলাখন্ডগুলোকে আঘাত করে দুর্বল করে ফেলে এবং এতে শিলাখন্ডগুলো ক্রমশ খন্ড-বিখন্ড হয়ে যায়।

(খ) কখনো কখনো পানি নরম পাললিক শিলা এবং ছিদ্রযুক্ত রূপান্তরিত শিলার মধ্যে প্রবেশ করে এবং শিলাস্তরকে আর্দ্র করে ফেলে। পরে সূর্যের তাপে ঐ পানি বাষ্পে পরিণত হয় এবং শিলাখন্ডগুলো পুনরায় শুকিয়ে যায়। শিলাস্তরের অভ্যন্তর ভাগে এরূপে ক্রমাগত আর্দ্র ও শুষ্ক হবার দরুণ তা ভেঙ্গে গিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিলাখন্ডে পরিণত হয় এবং যান্ত্রিক বিচূর্ণীভবন ঘটায়।

(গ) আবার শিলাস্তরে বৃষ্টির পানি প্রবেশ করে শিলাস্তরকে আর্দ্র করে ফেলে যান্ত্রিক বিচূর্ণীভবন। উপকূলীয় অঞ্চলে জোয়ার ভাঁটার প্রভাবে যান্ত্রিক বিচূর্ণীভবন ঘটে।

৪. **চাপ হ্রাসের মাধ্যমে :** ভূ-অভ্যন্তরে সৃষ্ট আগ্নেয় ও রূপান্তরিত শিলা ওপরের পাললিক শিলাস্তরের চাপে সংকুচিত অবস্থায় থাকে। ওপরের শিলাস্তর অপসারিত হলে ভূ-অভ্যন্তরের শিলার উপর চাপ হ্রাস পায়। ফলে এ সমস্ত শিলা কিছুটা সম্প্রসারিত হয়। এ অবস্থায় শিলার ওপরের স্তর নিচের মূল শিলা থেকে ধীরে ধীরে আলাদা হয়ে যায়। গ্রানাইট জাতীয় শিলায় এ ধরনের বিচূর্ণীভবন দেখা যায়।

৫. **মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে :** উচ্চ পর্বত গাত্রের খাড়া ঢালে প্রকান্ড শিলাখন্ড কোনো প্রকারে ভেঙ্গে আলগা হলে মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে নিচে পড়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়। পতিত শিলার আঘাতে পাদদেশের শিলাও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়। আবার চলার পথে ভূ-পতিত শিলা অন্যান্য উচ্চ স্থানের শিলাগুলো দ্বারা সদা চূর্ণ-বিচূর্ণ হচ্ছে। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে সর্বদা যান্ত্রিক বিচূর্ণীভবন ঘটছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিলা চূর্ণবিচূর্ণ হওয়ার প্রক্রিয়াগুলো ছকবদ্ধ করুন।

সারসংক্ষেপ

ভূ-পৃষ্ঠের কঠিন শিলাবরণ যে প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় ভেঙ্গে ছোট ছোট খন্ডে বিভক্ত হয় তাকে যান্ত্রিক বা প্রাকৃতিক বিচূর্ণীভবন বলে। শিলার যান্ত্রিক বিচূর্ণীভবন তাপমাত্রা, তুষার, পানি, চাপের হ্রাস এবং মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে হয়ে থাকে। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে সর্বদা যান্ত্রিক বিচূর্ণীভবন ঘটছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কোথায় যান্ত্রিক বিচূর্ণীভবনের ক্রিয়া অধিক লক্ষ্য করা যায়?

(ক) মরুঅঞ্চলে (খ) উচ্চ অক্ষাংশে

(গ) উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে (ঘ) সবগুলো

২। পর্বত গাত্রে শিলাখন্ড ভেঙ্গে কীসের প্রভাবে নিচে পড়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়?

(ক) মাধ্যাকার্ষণ (খ) তাপ

(গ) বিচূর্ণীভবন (ঘ) চাপ

৩। কোন অঞ্চলে বিচ্ছিন্নকরণ বা খন্ডীকরণ বিচূর্ণীভবন দেখা যায়?

(ক) পাললিক শিলা দ্বারা গঠিত (খ) রূপান্তরিত শিলা দ্বারা গঠিত

(গ) আগ্নেয় শিলা দ্বারা গঠিত (ঘ) খনিজ দ্বারা গঠিত

পাঠ-৫.৫ রাসায়নিক বিচূর্ণীভবন (Chemical Weathering)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- রাসায়নিক বিচূর্ণীভবন ও তার প্রক্রিয়া সম্পর্কে লিখতে পাবেন।

রাসায়নিক বিচূর্ণীভবন

যে প্রক্রিয়ায় শিলারাশি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে খনিজের গঠন কাঠামোর পরিবর্তন হয় তাকে রাসায়নিক বিচূর্ণীভবন বলে। শিলা বিভিন্ন প্রকার খনিজের সমন্বয়ে গঠিত। এসব খনিজ সংযোগ সাধক পদার্থের দ্বারা পরস্পরের সাথে সংযুক্ত থাকে। খনিজের উপর বায়ুস্থিত অক্সিজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং পানি ইত্যাদির বিক্রিয়ায় দরুণ কঠিন শিলা বিশ্লিষ্ট বা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় এবং খনিজ পদার্থগুলো নতুন গৌণ খনিজে পরিণত হয় এবং ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। যেমন- অক্সিজেন লৌহের সংস্পর্শে এলে তাতে মরিচা ধরে এবং ক্রমেই তাকে ক্ষয় করে। তাম্র, পিতল ও কাঁসা এরূপে ক্ষয় হয়। কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস বৃষ্টির পানির সাথে মিশে রাসায়নিক উপায়ে গ্রানাইট, চুনাপাথর প্রভৃতি কঠিন শিলাকে অবিরত খন্ড-বিখন্ড করছে। আবার পানি অনেক ক্ষেত্রে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় শিলারাশিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করছে। উষ্ণ ও আর্দ্র অঞ্চলে রাসায়নিক বিচূর্ণীভবন সবচেয়ে বেশি। কিন্তু হিম ও উষ্ণমন্ডলে এরূপ বিচূর্ণীভবন খুবই কম। রাসায়নিক বিচূর্ণীভবনের ফলে নিম্নলিখিত পরিবর্তনগুলো লক্ষ্য করা যায় -

ক) শিলার আয়তন বৃদ্ধি পায়।

খ) অপেক্ষাকৃত ভারী খনিজ হালকা খনিজে পরিণত হয়।

গ) পরিবর্তিত খনিজগুলোর আকার অপেক্ষাকৃত ছোট হয়। ফলে এর পৃষ্ঠদেশের ক্ষেত্রফল বৃদ্ধি পায়।

ঘ) অধিকতর পরিবহনযোগ্য পদার্থের সৃষ্টি হয়।

ঙ) খনিজের গঠন কাঠামোর পরিবর্তন হয়।

রাসায়নিক বিচূর্ণীভবন প্রধানত নিম্নলিখিত ৫টি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংঘটিত হয়। যথা-

১. জলযোজন, ২. হাইড্রোলিসিস্, ৩. জারণ, ৪. অঙ্গার-যোজন এবং ৫. দ্রবণ।

নিম্নে এ প্রক্রিয়াগুলো আলোচনা করা হলো–

১. জলযোজন (Hydration) : রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় খনিজের সঙ্গে পানি যুক্ত হয়ে খনিজের যে পরিবর্তন ঘটে, তাকে জলযোজন বা হাইড্রেশন বলা হয়। জলযোজনে শিলার মধ্যস্থিত খনিজ পদার্থ পানির সংস্পর্শে বিশেষভাবে পরিবর্তিত হয়। কোনো কোনো খনিজ বায়ু হতে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পানি গ্রহণ করে আকারে বৃদ্ধি পাওয়ায় শিলার ভিতরে টানের সৃষ্টি হয় এবং এভাবে শিলা সহজেই চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়।

২. হাইড্রোলিসিস্ (Hydrolysis) : এ প্রক্রিয়ায় পানি (H_2O) হাইড্রোজেন আয়ন (H^+) এবং হাইড্রোক্সিল আয়নে (OH) ভেঙে যায় এবং এ হাইড্রোক্সিল খনিজের মধ্যে রাসায়নিক উপায়ে পরিবর্তন ঘটায়। আগ্নেয়শিলায় প্রাপ্ত প্রধান দুটি খনিজ অভ্র ও ফেলসপারের রাসায়নিক পরিবর্তন অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংঘটিত হয়।

৩. জারণ (Oxidation) : খনিজের সঙ্গে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অক্সিজেন সংযুক্ত হলে তাকে জারণ বা অক্সিডেশন বলে। স্বাভাবিক অবস্থায় অক্সিজেন শিলারাশিকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে না পারলেও বায়ুতে অধিক জলীয়বাষ্প থাকলে তা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় শিলারাশিকে খন্ড-বিখন্ড করতে পারে। অক্সিজেনের এরূপ ক্রিয়াকে জারণ বা অক্সিডেশন বলে। বর্ষাকালে বায়ুতে প্রচুর জলীয়বাষ্প থাকে বলে ঐ সময় অক্সিজেনের রাসায়নিক বিচূর্ণীভবন সবচেয়ে বেশি হয়। এ কারণে বর্ষাকালে লৌহের

দ্রব্যে বেশি মরিচা ধরে। কারণ লৌহের সাথে অক্সিজেন যুক্ত হওয়ায় লৌহের উপরিভাগের রং হলুদ বা বাদামী হয়। লৌহ যখন ফেরাস অক্সাইড রূপে থাকে তখন তা খুব শক্ত হয়। কিন্তু অক্সিজেনের রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে এটি 'ফেরিক অক্সাইডে' পরিণত হয় এবং সহজেই খন্ড-বিখন্ড হয়। এ কারণে দেখা যায় যে, লৌহ মিশ্রিত দ্রব্যে মরিচা ধরে সহজে নষ্ট হয়ে যায়।

৪. অঙ্গার-যোজন (Carbonation) : বিভিন্ন খনিজের সঙ্গে কার্বন ডাই-অক্সাইডের রাসায়নিক সংযোজনকে অঙ্গার-যোজন বা কার্বনেশন বলে। কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস বৃষ্টির পানির সাথে বিক্রিয়া করে কার্বনিক এসিডে পরিণত হয়। কার্বন ডাই-অক্সাইডের এইরূপ রাসায়নিক সংযোগকে অঙ্গার-যোজন বা কার্বনেশন বলে। যেসব শিলা কার্বনিক এসিড দ্বারা গলে বা ভেঙে যায় সেগুলোতে সাধারণত ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, পটাসিয়াম, সোডিয়াম এবং লৌহ বিদ্যমান থাকে। এই উপাদানগুলো এসিডের সংস্পর্শে আসতে শুরুকরে। ফলে শিলাগুলি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়।

৫. দ্রবণ (Solution) : সরাসরি পানির দ্বারা খনিজ পদার্থ দ্রবীভূত হয় না বা গলে যায় না। কিন্তু শিলার মধ্যস্থিত কোনো কোনো খনিজ দ্রব্য রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে এমন এক স্থানে এসে উপস্থিত হয় তখন তা সহজেই দ্রবীভূত হয়ে পড়ে বা গলে যায়। যেমন- ক্যালসিয়াম কার্বনেট ($CaCO_3$) যখন ক্যালসিয়াম বাই কার্বনেটে পরিণত হয়, তখন তা পানিতে দ্রবীভূত হয়ে অপসারিত হয়। তাই বলা হয়ে থাকে যে, দ্রবণ প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পরোক্ষভাবে বিচূর্ণীভবন ঘটায়।

শিক্ষার্থীর কাজ	রাসায়নিক বিচূর্ণীভবনের প্রক্রিয়াগুলো কী কী?

সারসংক্ষেপ

রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় শিলার চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়াকে রাসায়নিক বিচূর্ণীভবন বলে। খনিজের উপর বায়ুস্থিত অক্সিজেন, কার্বন ডাই-অক্সাইড, পানি ইত্যাদি বিক্রিয়া করে থাকে। এর ফলে শিলা বিশ্লিষ্ট বা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় এবং মূল খনিজ পদার্থগুলো নতুন গৌণ খনিজে পরিণত হয়ে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। ভূ-পৃষ্ঠে অবিরত এই বিচূর্ণীভবন চলছে। যেহেতু পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থ বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদানে গঠিত, তাই ঐ সব পদার্থের যে কোনো পরিবর্তনে রাসায়নিক প্রক্রিয়া জড়িত থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। লৌহ কীসের সংস্পর্শে এলে মরিচা ধরে?

(ক) খনিজ (খ) অক্সিজেন (গ) আয়ন (ঘ) কোনটিই নয়

২। খনিজ পদার্থ সরাসরি কীসের দ্বারা দ্রবীভূত হয় না?

(ক) পানির (খ) লৌহের (গ) তেলের (ঘ) কাগজের

৩। রাসায়নিক বিচূর্ণীভবনের আওতাভুক্ত নয় কোন প্রক্রিয়া?

(ক) দ্রবণ (খ) অক্সিডেশন (গ) কার্বনেশন (ঘ) তাপ ও জল

৪। কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস বৃষ্টির পানিতে মিশে কী ধরনের এসিডে পরিণত হয়?

(ক) দ্রবণ এসিড (খ) অক্সিডেশন (গ) কার্বনিক (ঘ) অন্যান্য

৫। রাসায়নিক বিচূর্ণীভবন প্রক্রিয়ায় খনিজের গঠন কাঠামোর-

(ক) কোনো পরিবর্তন হয় না (খ) পরিবর্তন হয়

(গ) পরিবর্তনের সুযোগ নেই (ঘ) শক্ত অবস্থায় থাকে

পাঠ-৫.৬ জৈবিক বিচূর্ণীভবন (Biotic Weathering)

উদ্দেশ্য

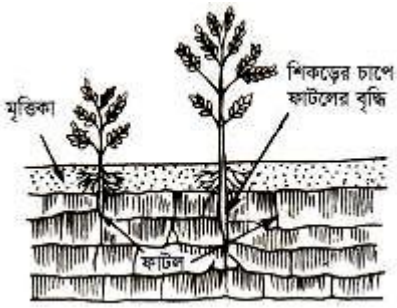
এই পাঠ শেষে আপনি–

- জৈবিক বিচূর্ণীভবন ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

জৈবিক বিচূর্ণীভবন

যে প্রক্রিয়ায় মানুষ ও জীবজন্তু শিলা ও খনিজের বিচূর্ণীভবন ঘটায় তাকে জৈবিক বিচূর্ণীভবন বলে। যেমন- বৃক্ষের শিকড় মাটিতে প্রবেশের ফলে মাটি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়। নিম্নে বিচূর্ণীভবন প্রক্রিয়া বর্ণনা করা হলো:

১। উদ্ভিদের কার্য (Work of Plant) : শিলার বিচূর্ণন কাজে গাছের শিকড় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখে। শিলার সংযোগ স্থল বা ফাটল বরাবর গাছের শিকড়ের আয়তন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ফাটলে চাপ বাড়তে থাকে। ফলে এক সময়ে শিলা ফাটল বরাবর ভেঙ্গে যায়। এভাবে উদ্ভিদ প্রতিনিয়ত শিলাকে বিশ্লিষ্ট এবং চূর্ণ-বিচূর্ণ করছে (চিত্র ৫.৬.১)। তাছাড়া মস্, শৈবাল, লাইকেন প্রভৃতি নানা প্রকার উদ্ভিদের দ্বারা শিলার উপরিভাগে পানি আবদ্ধ হয়ে যায় এবং উদ্ভিদের দেহ পচে হিউমাস (Humas) তৈরি করে। হিউমাস বৃষ্টির পানির সংস্পর্শে আসলে জৈব এসিড উৎপন্ন করে যা শিলার সাথে বিক্রিয়ায় শিলাকে ক্ষয় করে। এছাড়া জীবাণু ও কীটপতঙ্গের দেহ নিঃসৃত রস দ্বারা জৈবিক বিচূর্ণীভবন ঘটে।



চিত্র ৫.৬.১: জৈবিক **সমভূমি**

২। জীবজন্তুর কার্য (Works of Animal) : জীবজন্তু সর্বদা শিলাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করছে। বিভিন্ন প্রকার জীবজন্তুর মধ্যে কেঁচো, ইঁদুর, ছুঁচো, পিঁপড়া প্রভৃতি সর্বদা মাটি খুঁটে উলট-পালট করে। এছাড়া উঁইপোকা, ইঁদুর, সজারুগর্ত করে মাটির অভ্যন্তর হতে পৃথিবীর উপরে মাটি তোলে। এভাবে জীবজন্তু ও কীটপতঙ্গের দ্বারাও ভূ-ত্বক চূর্ণ-বিচূর্ণ হচ্ছে। ভূ-ত্বকের এরূপ পরিবর্তন সূক্ষ্ম বলে এই বিচূর্ণীভবন সহজে দৃষ্টিগোচর হয় না।

৩। মানুষের কার্য (Works of Man) : মানুষ বিভিন্ন উপায়ে ভূ-ত্বকের পরিবর্তন সাধন করছে। যেমন রাস্তাঘাট, খাল, গৃহ, শহর, বন্দর প্রভৃতি নির্মাণ করার জন্য মানুষ সর্বদা ভূ-ত্বককে খন্ড-বিখন্ড করছে। এভাবে মানুষও জৈবিক বিচূর্ণীভবনে সহায়তা করে থাকে।

শিক্ষার্থীর কাজ	জৈবিক বিচূর্ণীভবনের প্রক্রিয়াসমূহ কী কী?

সারসংক্ষেপ

উদ্ভিদ ও প্রাণিকূল এবং মানুষ কর্তৃক শিলার চূর্ণ-বিচূর্ণ হওয়াকে জৈবিক বিচূর্ণীভবন বলে। গাছের শিকড় শিলার খন্ড-বিখন্ড হওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। শিলার ফাঁটল বরাবর গাছের শিকড়ের আয়তন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চাপ বাড়তে থাকে এবং এক সময়ে শিলার ফাঁটল বরাবর ভেঙ্গে যায়। এভাবে উদ্ভিদ সর্বদা শিলাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করছে। নানা প্রকার জীবজন্তুর মধ্যে কেঁচো, পিঁপড়া, কুকুর প্রভৃতি মাটি খুঁড়ে সর্বদা ওলট-পালট করে বিচূর্ণীভবন ঘটাচ্ছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। নিচের কোনটি জৈবিক বিচূর্ণীভবন প্রক্রিয়ার অংশ নয়?

(ক) উদ্ভিদের কার্য (খ) জীবজন্তুর কার্য (গ) মানুষের কার্য (ঘ) দ্রবণ

২। জৈবিক বিচূর্ণীভবনের ক্ষেত্রে গাছের কোন অংশ বেশি কাজ করে?

(ক) পাতা (খ) শিকড় (গ) কান্ড (ঘ) ডালপালা

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১



ক. উদ্দীপকের উল্লিখিত চিত্রটি কী উপস্থাপন করে?

খ. বিচূর্ণীভবন কী কী প্রক্রিয়ায় সংগঠিত হয়?

গ. জারণের মাধ্যমে কীভাবে বিচূর্ণীভবন ঘটে?

ঘ. জৈবিক বিচূর্ণীভবনের প্রক্রিয়াগুলো ব্যাখ্যা করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-২

পৃথিবীর ভূ-পৃষ্ট বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় পরিবর্তনশীল। এই পরিবর্তনে বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদান নিয়ামক হিসাবে কাজ করে। কোনো কোনো সময় একাধিক নিয়ামক একসাথে কাজ করে। এই পরিবর্তন প্রক্রিয়ার ফলে ভূ-পৃষ্ঠে নতুন নতুন ভূমিরূপ সৃষ্টি হচ্ছে।

ক. বিচূর্ণীভবন কী?

খ. বিচূর্ণীভবন প্রধানত কত প্রকার ও কী কী?

গ. বিচূর্ণীভবন ও ন্যূগ্নীভবনের পার্থক্য বর্ণনা করুন।

ঘ. ক্ষয়ীভবন প্রক্রিয়াগুলো আলোচনা করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-৩

ভূ-পৃষ্ঠের পরিবর্তন হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে। এই প্রক্রিয়ায় ভূ-অভ্যন্তর ও ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন প্রাকৃতিক উপাদান সবসময় সক্রিয় থাকে। তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে তাপ, চাপ, পানি, বাতাস, মাধ্যাকার্ষণ শক্তি ইত্যাদি।

ক. যান্ত্রিক বিচূর্ণীভবন কী?

খ. যান্ত্রিক বিচূর্ণীভবনের প্রক্রিয়াগুলোর নাম লিখুন।

গ. তুষারের মাধ্যমে কীভাবে বিচূর্ণীভবন সংঘটিত হয়?

ঘ. রাসায়নিক বিচূর্ণীভবনের প্রক্রিয়াগুলো বর্ণনা করুন ।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.১ :	১. গ	২. ঘ	৩. ক	৪.গ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.২ :	১. ক	২. ক	৩. ক	৪.গ	৫.খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৩ :	১. ঘ	২. খ	৩. ক		
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৪ :	১. ঘ	২. ক	৩. খ	৪.খ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৫ :	১. খ	২. ক	৩. ঘ	৪.গ	৫. খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৫.৬ :	১. ঘ	২. খ			

নদী ও ভূমিক্ষয়
(River and Erosion)

ইউনিট ৬

ভূমিকা

প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট নির্দিষ্ট খাতের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত জলধারাকে নদী বলে। উৎস থেকে মোহনা পর্যন্তবিভিন্ন পর্যায়ে নদী ক্ষয়, ক্ষয়িত পদার্থ বহন এবং সঞ্চয় কার্য করে থাকে। নদীর গতি ও কাজের ফলে গতিপথে বিভিন্ন ধরনের ভূমিরূপ সৃষ্টি হয়। নদীমাতৃক বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য নদী ব্যবস্থাপনা বা নদীশাসন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ ইউনিটে আমরা নদীর উৎপত্তি, বৃদ্ধি, উন্নয়ন, নদী সৃষ্ট ভূমিরূপ ও বাংলাদেশের নদী ব্যবস্থা, নদীভাঙ্গন ও তার প্রভাব এবং নদীশাসন সম্পর্কে আলোচনা করবো।






ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ ৬.১ : নদীর উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও উন্নয়ন
পাঠ ৬.২ : নদীর ক্ষয়কার্য ও সৃষ্ট ভূমিরূপ
পাঠ ৬.৩ : নদীর বহনকার্য
পাঠ ৬.৪ : নদীর সঞ্চয়জাত ভূমিরূপ
পাঠ ৬.৫ : বাংলাদেশের নদী ব্যবস্থা
পাঠ ৬.৬ : বাংলাদেশের নদীভাঙ্গন ও এর প্রভাব
পাঠ ৬.৭ : নদীশাসন

পাঠ-৬.১ নদীর উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও উন্নয়ন
(Origin, Growth and Development of River)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- নদীর উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও উন্নয়ন সম্পর্কে বলতে ও লিখতে পারবেন।

নদীর উৎপত্তি, বৃদ্ধি ও উন্নয়ন

পানির ধর্ম নিচের দিকে গড়িয়ে চলা। পাহাড়, পর্বত বা কোনো উঁচুভূমি হতে বৃষ্টির পানি, প্রস্রবণ, হিমবাহ, তুষারগলা পানি এবং হ্রদের পানি ছোট ছোট ধারায় নিচের দিকে প্রবাহিত হয়। এ ছোট ছোট প্রাকৃতিক জলধারা একত্রে মিলিত হয়ে যখন একটি নির্দিষ্ট পথে প্রবাহিত হয়ে কোনো বিশাল জলাশয় বা হ্রদে অথবা সমুদ্রে পতিত হয় তখন তাকে নদী বলে। অর্থাৎ প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট নির্দিষ্ট খাতের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত জলধারাকে নদী বলে। পৃথিবীর বিভিন্ন ভূমিরূপ গঠনে যেসব প্রাকৃতিক শক্তি সরাসরি অংশগ্রহণ করে তাদের মধ্যে নদী বিশেষ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশের প্রধান প্রধান নদীগুলো হলো পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, কর্ণফুলী, সুরমা, কুশিয়ারা, করতোয়া, মহানন্দা, মধুমতি ইত্যাদি। পৃথিবীর দীর্ঘতম নদী নীলনদ। এর দৈর্ঘ্য ৬,৬৬৯ কি.মি.। এটি আফ্রিকা মহাদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে।

নদীর উৎপত্তি (Origin of Rivers)

পৃথিবীর অধিকাংশ নদীই পার্বত্য অঞ্চল থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। পাহাড়ি অঞ্চল থেকে বৃষ্টির পানি, বরফ গলা পানি, হিমবাহের পানি, পাহাড়ের ঢাল বেয়ে সমভূমিতে প্রবাহিত হয়ে সাগর বা মহাসাগর বা হ্রদে মিলিত হয়। নদীর আকার, আকৃতি এবং নদীর কার্যাবলী নির্ভর করে উৎসস্থলের পানি সরবরাহের পরিমাণের ওপর। উৎসস্থলের পানি সরবরাহ বেশি হলে নদীর আকার, নদীর চলার গতিবেগ সাধারণত বেশি হয়ে থাকে। নিম্নে বাংলাদেশ এবং বিশ্বের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নদীর নাম ও উৎপত্তিস্থল উল্লেখ করা হলো।

বাংলাদেশের কয়েকটি প্রধান নদীর উৎপত্তি স্থল		বিশ্বের কয়েকটি প্রধান নদীর উৎপত্তি স্থল	
নদী	**উৎপত্তি স্থল**	**নদী**	**উৎপত্তি স্থল**
পদ্মা	গঙ্গা নামে হিমালয় পর্বতের গাঙ্গোত্রী হিমবাহ	হোয়াংহো	কুনকুন পর্বত, চিন দেশ
মেঘনা	আসামের লুসাই পাহাড়	মিসিসিপি	মিনোসোটার হ্রদ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র
যমুনা	ব্রহ্মপুত্র নামে কৈলাশ শৃঙ্গের মানস সরোবর হ্রদ	দানিয়ুব	ব্ল্যাক ফরেস্ট, ইউরোপ
কর্ণফুলী	মিজোরামের লুসাই পাহাড়	মারে ডার্লিং	কোমিয়াস্কে, অষ্ট্রেলিয়া
করতোয়া	সিকিমের পার্বত্য অঞ্চল	তিস্তা	সিকিমের পর্বত অঞ্চল
সাঙ্গু	মিয়ানমার-বাংলাদেশ সীমানার আরাকান পাহাড়	নীলনদ	ভিক্টোরিয়া হ্রদ, আফ্রিকা মহাদেশ
হালদা	খাগড়াছড়ির বাদানাতলী পর্বতশৃঙ্গ।	আমাজান	আন্দিজ পর্বতমালা, দক্ষিণ আমেরিকা
মহানন্দা	মহালড্রীম, দার্জিলিং		

নদীর বৃদ্ধি ও উন্নয়ন বা পর্যায় (Stage of River)

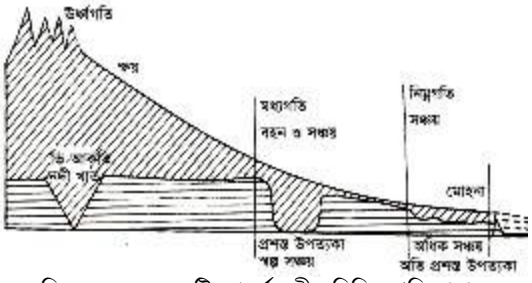
উৎপত্তি স্থল হতে মোহনা পর্যন্তনদীর আয়তন, গভীরতা, স্রোত ও নগ্নীভবন প্রভৃতি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে একটি আদর্শ নদীর গতিকে চারটি পর্যায়ে বা অবস্থায় (Stage) ভাগ করা যায়। যেমন- ১. প্রাথমিক অবস্থা, ২.যৌবন অবস্থা, ৩.প্রবীণ অবস্থা এবং ৪. বার্ধক্য অবস্থা (চিত্র ৬.১.১)।

১। প্রাথমিক অবস্থা (Initial Stage) : পার্বত্য অঞ্চলে বৃষ্টি ও বরফ গলা পানি সরবরাহ খুব বেশি। পার্বত্য অঞ্চল থেকে ছোট ছোট স্রোতধারাগুলো পরস্পর মিলিত হয়ে একটি প্রবল স্রোতধারার সৃষ্টি করে। ভূমির ঢাল খাড়া হওয়ায় প্রবল

স্রোতধারাটি ক্ষয়সাধন করতে করতে অগ্রসর হয়। এ সময় নদী উপত্যকা গভীর হয়। প্রবল স্রোতের বেগ বড় বড় পাথর, নুড়ি প্রভৃতি স্রোতের সাথে বহন করে। এটি নদী সৃষ্টির প্রথম অবস্থা বলে একে প্রাথমিক অবস্থা বলে। এ সময় নদীর উদ্যম বেশি থাকে বলে যান্ত্রিক ও রাসায়নিক উভয় প্রকার ক্ষয় সাধিত হয়।

২। যৌবন অবস্থা (Youth Stage) : এ সময় নদী পরিপূর্ণতা লাভ করে। সাধারণত পার্বত্য অঞ্চলে প্রবাহিত নদীর স্রোতের বেগ প্রবল থাকে। এই অবস্থায় ক্ষয় ও বহন উভয় প্রক্রিয়া কার্যকর থাকলেও ক্ষয় কার্যের প্রাধান্য থাকে এবং নদী খাত 'V' অক্ষরের ন্যায় হয়। নদীখাতের কোথাও বর্তুলাকার গর্ত দেখা যায়। নদী প্রবাহের মধ্যবর্তী এই অবস্থাকে যৌবন অবস্থা বলে।

৩। প্রবীণ অবস্থা (Mature Stage) : নদীর তৃতীয় পর্যায় হচ্ছে প্রবীণ অবস্থা। এ সময় নদীর স্রোতের বেগ হ্রাস পাওয়ায় ক্ষয়সাধন ও পরিবহন ক্ষমতাও হ্রাস পায়। নদীবাহিত পলি নদীর তলদেশে সঞ্চিত হয়ে তলদেশের গভীরতাও কমে যায়। ক্ষয়কার্য সামান্য হয় বলে নদীর পার্শ্বীয় ক্ষয় অর্ধেক হয় এবং নদী খাত ইংরেজি ইউ অক্ষরের ন্যায় খাত সৃষ্টি করে। তখন নদী সমভূমির উপর দিয়ে আঁকাবাঁকা গতিতে (Meanderning flow) প্রবাহিত হয়। কোথাও কোথাও অশ্বখুরাকৃতির হ্রদের সৃষ্টি হয়। সর্বোপরি নদীর জীবনকালের এটি তৃতীয় পর্যায় বলে একে প্রবীণ অবস্থা বলে।



চিত্র ৬.১.১ : একটি আদর্শ নদীর বিভিন্ন গতি প্রবাহ

৪। বার্ধক্য অবস্থা (Old Stage) : নদীর বার্ধক্য অবস্থায় নদী উপত্যকা সর্বাপেক্ষা অধিক প্রশস্ত হয় এবং গভীরতা একেবারে কমে যায়। স্রোতের বেগ তুলনামূলকভাবে কম থাকে। বর্ষা ঋতুতে নদীর দুইকূল উপচিয়ে পানি সমভূমিতে প্রবাহিত হয় এবং ক্রমান্বয়ে নদীবাহিত পলি সঞ্চিত হয়ে প্লাবন সমভূমি (Flood Plain) সৃষ্টি করে। নদী মোহনায় পলি সঞ্চিত হয়ে ব-দ্বীপ (Delta) গঠিত হয়। মূলত এ অবস্থায় নদী সাগরের সাথে মিশে মোহনার সৃষ্টি করে।

নদী সম্পর্কিত বিভিন্ন পারিভাষিক শব্দ ও সংজ্ঞা।

নদীর উৎস (Source) : নদীর উৎপত্তিস্থলকে নদীর উৎস বলে।

নদীর মোহনা (Mouth) : নদী উৎপত্তি লাভ করে সাগর বা হ্রদের সাথে যে স্থানে মিলিত হয় সেই মিলিত স্থানকে নদীর মোহনা বলে।

দোয়াব অঞ্চল : দুটি নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলকে দোয়াব অঞ্চল বলে।

উপনদী (Tributary): বিভিন্ন উৎস হতে যখন ছোট ছোট নদী উৎপত্তি লাভ করে কোনো বড় নদীতে মিলিত হয় তখন এ ছোট নদীগুলোকে সে বড় নদীর উপনদী বলে। যেমন- যমুনার উপনদী করতোয়া, তিস্তা এবং মেঘনার উপনদী সুরমা ও কুশিয়ারা।

শাখানদী (Distributory) : কখনো কখনো বড় কোনো নদী হতে স্রোতধারা বের হয়ে অন্য কোনো নদী, সাগর, হ্রদ বা পুনরায় মূল নদীর সাথে মিলিত হয়। এরূপ মূল নদী হতে যে সকল নদী বের হয় তাকে শাখানদী বলে। যেমন- ইছামতি, গড়াই, আড়িয়াল খাঁ প্রভৃতি পদ্মার শাখানদী।

নদীসঙ্গম (Confluence) : পার্বত্য অঞ্চলে প্রাথমিক অবস্থায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীগুলো নিজ নিজ পথে প্রবাহিত হয়। এক সময় ঐ নদীগুলো একটি অপরটির সাথে মিলিত হয়। ফলে মিলিত স্রোতধারা ক্রমশ অধিকতর বড় হয়। এভাবে দুই বা ততোধিক নদীর মিলন স্থলকে নদীসঙ্গম বলে।

নদী অববাহিকা (River Basin) : মূল নদী, বিভিন্ন শাখানদী ও উপনদী প্রভৃতির মধ্য দিয়ে যে সকল স্থানের বা অঞ্চলের পানিরাশি প্রবাহিত হয় তখন এ অঞ্চলকে ঐ নদীর অববাহিকা বলে। যেমন- পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশে সিন্ধু নদের অববাহিকা।

নদী উপত্যকা (River Valley): নদীর উৎস হতে মোহনা পর্যন্তগতিপথে যে স্থানের মধ্য দিয়ে পানিরাশি প্রবাহিত হয় সেই খাতকে উক্ত নদীর উপত্যকা বলে।

নদীগর্ভ বা নদীতট : নদী উপত্যকার তলদেশকে বলা হয় নদীগর্ভ ।

জলবিভাজিকা : যে উচ্চভূমি বিভিন্ন নদীজ এলাকাকে আলাদা করে থাকে তাকে জলবিভাজিকা বলে।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশ ও বিশ্বের কয়েকটি নদী ও তার উৎপত্তি স্থলের নাম লিখুন।

সারসংক্ষেপ

ছোট ছোট প্রাকৃতিক জলধারা একত্রে মিলিত হয়ে যখন একটি নির্দিষ্ট পথে প্রবাহিত হয়ে কোনো বিশাল জলাশয় বা হ্রদে অথবা সমুদ্রে পতিত হয় তখন তাকে নদী বলে। বাংলাদেশের প্রধান প্রধান নদীগুলো হলো পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, কর্ণফুলী, সুরমা কুশিয়ারা, করতোয়া, মহানন্দা, মধুমতি প্রভৃতি। পৃথিবীর দীর্ঘতম নদী নীলনদ। উৎপত্তি স্থল হতে মোহনা পর্যন্তনদীর আয়তন, গভীরতা, স্রোত ও নগ্নীভবন প্রভৃতি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে একটি আদর্শ নদীর গতিকে চারটি পর্যায়ে বা অবস্থায় ভাগ করা যায়। যথা- ১. প্রাথমিক অবস্থা ২.যৌবন অবস্থা ৩.প্রবীণ অবস্থা এবং ৪. বার্ধক্য অবস্থা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। নদী উপত্যকার তলদেশকে কী বলা হয়?
(ক) নদীগর্ভ (খ) উপনদী (গ) মোহনা (ঘ) শাখানদী

২। নদী উৎপত্তি লাভ করে সাগর বা হ্রদের সাথে যে স্থানে মিলিত হয় সেই মিলিত স্থানকে কী বলে?
(ক) নদীগর্ভ (খ) উপনদী (গ) মোহনা (ঘ) শাখানদী

৩। একটি আদর্শ নদীর গতিকে কতটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়?
(ক) ৪ (খ) ৫ (গ) ৩ (ঘ) ৬

৪। নদীর যৌবন অবস্থা কোথায় দেখা যায়?
(ক) মরু অঞ্চলে (খ) সমভূমিতে (গ) পার্বত্য অঞ্চলে (ঘ) মালভূমিতে

৫। তিব্বতের কৈলাশ শৃঙ্গের মানস সরোবর হ্রদ থেকে উৎপত্তি হয়েছে কোন নদীর?
(ক) গঙ্গা (খ) ব্রহ্মপুত্র (গ) পদ্মা (ঘ) মেঘনা

পাঠ-৬.২ নদীর ক্ষয়কার্য ও সৃষ্ট ভূমিরূপ
(Erosion and Erosional Featuers of River)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- নদীর কার্য সম্পর্কে বলতে পারবেন এবং
- নদীর ক্ষয়কার্যের প্রক্রিয়া ও সৃষ্ট ভূমিরূপসমূহের নাম বলতে পারবেন।

নদীর কার্য

নদী পার্বত্য অঞ্চলে উৎপত্তি লাভ করার পর মালভূমি, সমভূমি, প্লাবনভূমি, ব-দ্বীপ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে প্রবাহিতকালে যে কার্য সমাধা করে সে কার্যাবলীকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১. ক্ষয়কার্য ২. পরিবহন এবং ৩. সঞ্চয়কার্য।

নদীর ক্ষয়কার্য (Erosion of the River)

নদী তার ক্ষয়কার্যের মাধ্যমে নানা ধরনের ভূমিরূপ গঠন করে। নদীর এ ক্ষয়কার্য রাসায়নিক ও যান্ত্রিক উপায়ে সংঘটিত হয়। ক্ষয়কার্য সাধারণত চারটি প্রক্রিয়ার দ্বারা হয়ে থাকে। যথা- ১. পানি প্রবাহ ক্ষয়, ২. কর্ষণ, ৩.ঘর্ষণ এবং ৪. দ্রবণ।

১। পানি প্রবাহ ক্ষয় (Hydraulic Action) : পানি প্রবাহের মাধ্যমে নদীর ক্ষয়ক্রিয়া সংঘটিত হয়। নদীতে প্রবল স্রোতের ফলে নদীগর্ভে ও নদীর উভয় পার্শ্বে ক্ষয়সাধিত হয়ে থাকে। পানি প্রবাহের ফলে এ ক্ষয়কার্য হয় বলে একে পানিপ্রবাহ ক্ষয় বলে।

২। কর্ষণ (Corrosion) : নদীবাহিত নুড়ি, পাথর প্রভৃতির ঘর্ষণের ফলে নদী খাতে ক্ষয় হয়। নদীবাহিত নুড়ি বা পাথর খন্ডগুলো নদীর স্রোতের সাথে ঘুরতে ঘুরতে অগ্রসর হয় এবং নদীখাতের ভিতর ছোট ছোট গর্তের সৃষ্টি করে। ফলে নদীখাত দ্রুত ক্ষয় হয়। এ জাতীয় ক্ষয়কার্যকে কর্ষণ বলা হয়।

৩। ঘর্ষণ (Attrition) : নদীর স্রোতের সাথে যে সমস্ত নুড়ি, পাথর, শিলারাশি বাহিত হয় সেগুলো পরস্পরের সাথে আঘাতে খন্ড-বিখন্ড ও ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে বালুকা ও কর্দমে পরিণত হয়। ফলে নদীর স্রোত খুব সহজে এগুলো বহন করতে পারে। এরূপ ক্রিয়াকে ঘর্ষণ ক্ষয় বলে।

৪। দ্রবণ (Solution) : ভূ-ত্বকের রাসায়নিক দ্রব্যসমূহ নদীর পানির সাথে দ্রবীভূত হয়ে নদীর প্রস্তর খন্ডগুলোকে দ্রবীভূত করে। ফলে প্রস্তর খন্ডসমূহ সহজে ক্ষয় হয়। এ জাতীয় ক্ষয় চুনাপাথর অঞ্চলে বেশি লক্ষ্য করা যায়।

নদীর ক্ষয়জাত ভূমিরূপ (Erosional Features of River)

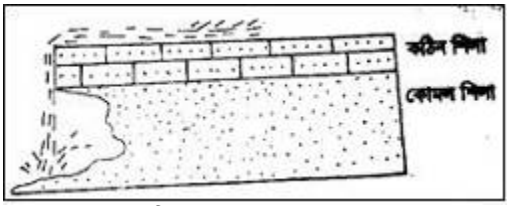
নদীর ক্ষয়কার্যের ফলে ভূ-পৃষ্ঠের ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয় এবং নতুন নতুন ভূমিরূপের সৃষ্টি হয়। পার্বত্য অবস্থায় নদীর ক্ষয়কার্য অত্যন্তবেশি হয়। নিচে ক্ষয়জাত ভূমিরূপের বিবরণ দেওয়া হলো-

১। 'ভি' আকৃতি উপত্যকা ('V' shaped Valley) : পার্বত্য অঞ্চলের শিলা তুলনামূলকভাবে কঠিন থাকে। সেখানে নদীর স্রোতের গতিবেগ বেশি থাকায় নদী পার্শ্বক্ষয়ের তুলনায় তলদেশের ক্ষয়সাধন অধিক হয়। এ সময় পার্বত্য অঞ্চলে নদী উপত্যকার মধ্যভাগ অধিক ক্ষয় হতে হতে কালক্রমে ইংরেজি 'V' অক্ষরের ন্যায় রূপধারণ করে। এজন্য এ ধরনের উপত্যকাকে 'V' আকৃতির উপত্যকা বলে (চিত্র ৬.২.১)। পরবর্তীতে ধীরে ধীরে পার্শ্বদিকে ক্ষয়ের পরিমাণ বেশি হলে উপত্যকা ক্রমান্বয়ে প্রশস্ত হতে থাকে।



চিত্র ৬.২.১ : ভি আকৃতির উপত্যকা

২। জলপ্রপাত (Waterfall) : যখন কোনো নদী একটি কঠিন শিলাস্তর অতিক্রম করে অন্য একটি কোমল শিলাস্তরের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় তখন শিলাস্তরটি কঠিন শিলাস্তরের তুলনায় দ্রুত ক্ষয় হয়। এভাবে কোমল শিলাস্তরটি দ্রুত ক্ষয় হয়ে কঠিন শিলাস্তরের চেয়ে অনেক নিচুতে নেমে যায়। নদীর এরূপ

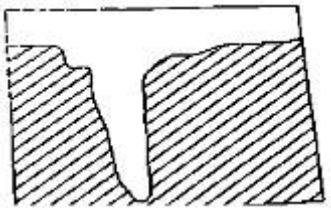


চিত্র ৬.২.২ : জলপ্রপাত

উচ্চস্থান হতে উল্লম্বভাবে সরাসরি নিচে পতিত হলে তাকে জলপ্রপাত বলে (চিত্র ৬.২.২)। আবার চ্যুতির ফলে কোনো কোনো নদী উপত্যকার কোনো স্থান নিচে বসে গেলে অথবা উপরে উত্থিত হলে সেখানেও জলপ্রপাতের সৃষ্টি হতে পারে। যেমন- উত্তর আমেরিকার সেন্ট লরেন্স নদীর জলপ্রপাত, আফ্রিকার জাম্বেসী নদীর ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত প্রভৃতি। আবার কোথাও মালভূমির প্রান্তভাগ খাড়াভাবে নিচে নেমে সমভূমিতে মিলিত হয়ে জলপ্রপাতের সৃষ্টি করে। যেমন-বিহারের রাচি জেলার হুনড্রু (Hundru) জলপ্রপাত এবং দাক্ষিণাত্য মালভূমি অঞ্চলের জলপ্রপাত।

৩। গিরিসংকট (Ravine) : অত্যন্তগভীর ও খাড়া পাড়বিশিষ্ট নদী উপত্যকাকে গিরিসংকট বলে। যদি নদীর উভয়পার্শ্ব অপেক্ষা নদীর তলদেশ ক্ষয় অধিক হারে হয় তাহলে নদীখাত ক্রমশ গভীর হয়ে দীর্ঘদিন পর গিরিসংকটের সৃষ্টি হয়। যেমন- কাশ্মীরের উত্তর-পশ্চিমের সিন্ধু নদের গিরিসংকটটি প্রায় ১৭০০ ফুট গভীর। তাছাড়াও ব্রহ্মপুত্র, কাবুল, ইয়াংসিকিয়াং, রাইন, দানিয়ুব প্রভৃতি নদীর গিরিসংকটগুলো বিখ্যাত।

৪। গিরিখাত (Gorge) : গিরিখাত দেখতে অনেকটা গিরিসংকটের মতো। গিরিখাত সাধারণত গিরিসংকটের চেয়ে সুদীর্ঘ এবং অধিক গভীরতাবিশিষ্ট। গিরিখাতগুলো এত দীর্ঘ এবং গভীর হয় যে দেখলে মনে হবে সুদীর্ঘ পার্বত্য সুড়ঙ্গ (চিত্র ৬.২.৩)। উত্তর আমেরিকার কলোরাডো নদীর গিরিখাত গ্র্যান্ড ক্যানিয়ন (Grand Canyon) পৃথিবীর গভীরতম এবং দীর্ঘতম গিরিখাত। এটি প্রায় ১.৫ মাইল গভীর এবং তিনশত মাইল দীর্ঘ।

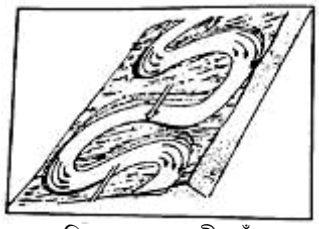

চিত্র ৬.২.৩ : গিরিখাত

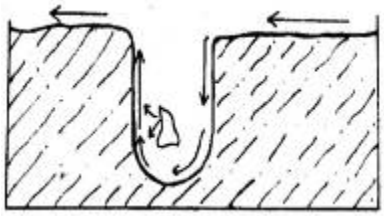
৫। নদীপ্রপাত (Rapid) : প্রবাহমান নদীর গতিপথে কঠিন ও কোমল শিলাস্তর থাকলে কঠিন শিলাস্তর অপেক্ষা কোমল শিলাস্তড়র অধিক ক্ষয় হয়। কোমল শিলাস্তর অধিক ক্ষয় হওয়ার কারণে কখনো কখনো সেখানকার ভূ-প্রকৃতি সিঁড়ির ন্যায় রূপলাভ করে। তখন নদীর পানিপ্রবাহ সিঁড়ির মতো ভূমির উপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে নিচের দিকে প্রবলবেগে চলতে থাকে। এরূপ অবস্থাকে নদীপ্রপাত বলে (চিত্র ৬.২.৪)। অত্যন্তপ্রবলবেগে প্রবাহিত হয় বলে একে আবার খরস্রোতও বলে।

৬। নদীর বাঁক (Meanders) : নদী যখন সমভূমি অঞ্চলের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় তখন নদীর স্রোত ও ক্ষয়কার্য কমে যায়। সে সময় নদীর গতিপথে কঠিন শিলা থাকলে নদী বেঁকে প্রবাহিত হয়। এ ধরনের নদীর বাঁকা অঞ্চলকে নদীর বাঁক বলে (চিত্র ৬.২.৫)।

৭। বর্তুলাকার গর্ত (Pot Holes) : দ্রুতবেগে নদী স্রোত প্রবাহিত হওয়ার সময় নদী উপত্যকার কোনো কোনো স্থানে ঘূর্ণিস্রোতের সৃষ্টি হয়। তখন নদীর তলদেশের কোনো কোনো স্থানে কোমল শিলাস্তর দ্রুত ক্ষয় হয়ে বড় বড় গর্তের সৃষ্টি হয়। এ জাতীয় গর্তকে বর্তুলাকার গর্ত বলে (চিত্র ৬.২.৬)। পদ্মা এবং যমুনা নদীগর্ভে এ ধরনের গর্ত দেখা যায়।


চিত্র ৬.২.৪ : নদী প্রপাত


চিত্র ৬.২.৫ : নদীর বাঁক


চিত্র ৬.২.৬ : বর্তুলাকার গর্ত

শিক্ষার্থীর কাজ	নদীর ক্ষয়কার্যের প্রক্রিয়াগুলি কী কী? বর্ণনা করুন।

সারসংক্ষেপ

নদী পার্বত্য অঞ্চলে উৎপত্তি লাভ করার পর মালভূমি, সমভূমি, প্লাবনভূমি, ব-দ্বীপ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে যে কার্য সমাধা করে সে কার্যাবলীকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- (১) ক্ষয়কার্য (২) পরিবহন (৩) সঞ্চয়কার্য। নদীর ক্ষয়কার্য

রাসায়নিক ও যান্ত্রিক উপায়ে সংঘটিত হয়। ক্ষয়কার্য সাধারণত চারটি প্রক্রিয়ার দ্বারা হয়ে থাকে। যথা- ১. পানি প্রবাহ, ২. কর্ষণ, ৩.ঘর্ষণ ক্ষয় এবং ৪. দ্রবণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। নদীর ক্ষয়কার্য সাধারণত কতটি পদ্ধতিতে হয়ে থাকে?

(ক) ৩ (খ) ৪
(গ) ২ (ঘ) ৫

২। নদীর উচ্চস্থান হতে উল্লম্বভাবে সরাসরি নিচে পতিত হলে তাকে কী বলে?

(ক) উপনদী (খ) জলপ্রপাত
(গ) মোহনা (ঘ) উৎস

৩। পার্বত্য অঞ্চলে নদীর আকৃতি কেমন থাকে?

(ক) ভি আকৃতি (খ) ইউ আকৃতি
(গ) এ আকৃতি (ঘ) কোনটিই নয়

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।
নদী উৎপত্তি থেকে সাগরে বা জলাধারে পতিত হওয়ার আগ পর্যন্তবিভিন্ন পর্যায়ে আঁকাবাঁকা হয়ে চলে। নদীর এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় নদীর দুই ধারে ও নদীতলদেশে ক্ষয়সাধন করে থাকে।

৪। নদীর বাঁক তৈরি হয় কোথায়?

(ক) সমভূমিতে (খ) মোহনায়
(গ) নদীর উৎসে (ঘ) মালভূমিতে

৫। দ্রবণ কোন অঞ্চলে বেশি দেখা যায়?

(ক) পাহাড়ি অঞ্চলে (খ) সমতলে
(গ) চুনাপাথর অঞ্চলে (ঘ) মোহনায়

পাঠ-৬.৩ নদীর বহনকার্য (River Transportation)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- নদীর বহনকার্য ব্যাখ্যা ও বিশে- ষণ করতে পারবেন।

নদীর বহনকার্য

নদীর মোট শক্তির শতকরা ৯৫ থেকে ৯৭ ভাগই ঘূর্ণী ও ঘর্ষণজনিত কারণে ব্যয় হয়। বাকী অংশ শুধু পরিবহন কাজে ব্যয় হয়। যে কোনো বৃহৎ নদী প্রস্তরখন্ড, বালুকা, কর্দম প্রভৃতি তার বোঝা রূপে বহন করে থাকে। নদী তার এই বোঝা চারটি প্রক্রিয়ায় বহন করে। যথা- ১. দ্রবণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বহন, ২. ভাসমান অবস্থায় বহন, ৩. লম্ফ প্রক্রিয়ায় বহন এবং ৪. আকর্ষণ বা টানের মাধ্যমে বহন।

১. দ্রবণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বহন (Solution) : নদী তার গতিপথে অনেক সময় কোনো কোনো প্রস্তরখন্ডকে পানির সাথে দ্রবীভূত করে তা পানি স্রোতের সঙ্গে বহন করে। চুনাপাথরযুক্ত অঞ্চলে নদী এ দ্রবণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভার বহন করে। নদীর দ্রবীভূত বোঝার **(Dissolved load)** পরিমাণে খুব তারতম্য হয়। নদীতে পানির পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে এর ঘনত্ব হ্রাস পায়। পৃথিবীর প্রধান নদীসমূহের গড় দ্রবীভূত বোঝার পরিমাণ ১১৫ থেকে ১২০ পি.পি.এস.। প্রতি বছর এ সমস্ত নদী থেকে প্রায় ৪ বিলিয়ন (৪০০ কোটি) মেট্রিক টন দ্রবীভূত পদার্থ সমুদ্রে পতিত হয়।

২. ভাসমান অবস্থায় বহন (Suspension) : নদীর ঘোলা পানি থেকে সহজেই ভাসমান বোঝার ঘনত্ব সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। ভাসমান বোঝার প্রধান অংশ মূলত বালি, পলি ও কর্দম আকৃতির পদার্থে গঠিত। অনেক সময় ক্ষুদ্রাকার প্রস্তরখন্ড নদীর স্রোতে চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে ভেসে যায়, একে ভাসমান বোঝা বলে।

৩. লম্ফ প্রক্রিয়ায় বহন (Saltation) : তুলনামূলকভাবে বৃহদাকার স্রোতের বেগে নদীর তলদেশের ক্রিয়ায় লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে থাকে। একে লম্ফ প্রক্রিয়া বহন বলে।

৪. আকর্ষণ বা টানের মাধ্যমে বহন (Traction) : নদীজ লোড বা বোঝার বড় আকৃতির পদার্থ যেমন- বোল্ডার থাকতে পারে যা ভাসমান অবস্থায় রাখা সম্ভব হয় না। এ ধরনের ভারী ও বড় পদার্থসমূহ হচ্ছে নদীর তলদেশীয় ভার (Bed Load)। নদীবাহিত বিভিন্ন দ্রব্যসমূহ নদীর তলদেশ দিয়ে স্রোতের টানে বাহিত হয় বলে একে নদীগর্ভ বোঝা (Bed load) বা টান বা আকর্ষণ ভার বলা **(Traction Load)** হয়। এই টান বা আকর্ষণের দ্বারাও নদী বহন করে থাকে। ধারণা করা হয়, নদীর তলদেশীয় ভার মোট ভারের শতকরা ১০ ভাগের বেশি হয় না।

নদীর বহন করার ক্ষমতার কারণঃ নিম্নলিখিত কারণে নদীর বহন করার ক্ষমতা পরিবর্তিত হতে পারে। যেমন- (ক) নদীতে পানি কমে গেলে,(খ) নদী-ঢালেরপরিবর্তন হলে, (গ) নদীর শক্তির তুলনায় অধিক পরিমাণ প্রস্তরখন্ড (Load) নদীতে আসলে এবং (ঘ) নদী কোনো হ্রদের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হলে। এরূপ অবস্থায় নদীর তলদেশে কিছু কিছু প্রস্তরখন্ড জমা হতে থাকে। বৃহদাকার প্রস্তরগুলো নদীর উচ্চ প্রবাহে এবং ক্ষুদ্রাকার প্রস্তরখন্ড, বালুকা, কর্দম প্রভৃতি নদীর নিম্নপ্রবাহে অর্থাৎ মোহনার নিকট জমা হয়। একে নদীর অবক্ষেপন (Deposition) বলে।

শিক্ষার্থীর কাজ	নদীর ক্ষয়কার্যের নিয়ামকসমূহ আলোচনা করুন।

সারসংক্ষেপ

যে কোনো বৃহৎ নদী প্রস্তরখন্ড, বালুকা, কর্দম প্রভৃতি তার বোঝা রূপে বহন করে থাকে। নদী তার এই বোঝা চারটি প্রক্রিয়ায় বহন করে। যথা- (১) দ্রবণ প্রক্রিয়ায়, (২) ভাসমান অবস্থায় বহন, (৩) লম্ফদান প্রক্রিয়ায় বহন ও (৪) আকর্ষণ বা টানের মাধ্যমে বহন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। নদীর মোট শক্তির কত ভাগ বহন কার্যে ব্যবহৃত হয় ?

(ক) ৯৫% (খ) ৫০% (গ) ৫% (ঘ) ২৫%

২। নদীর বড় বোঝা বা বোল্ডার কোন প্রক্রিয়ায় বহন করে থাকে?

(ক) দ্রবণ প্রক্রিয়ায় (খ) আকর্ষণ বা টানের মাধ্যমে বহন

(গ) লম্ফদান প্রক্রিয়ায় বহন (ঘ) ভাসমান অবস্থায় বহন

৩। নদী কয়টি প্রক্রিয়ায় বোঝা বহন করে থাকে?

(ক) ২ (খ) ৩ (গ) ৪ (ঘ) ৫

৪। দ্রবণ প্রক্রিয়ায় বহন হয় কোনটি?

(ক) পলি ও কর্দম (খ) কর্দম (গ) বালু (ঘ) নুড়ি

পাঠ-৬.৪ নদীর সঞ্চয়কার্য ও সৃষ্ট ভূমিরূপ
(Deposition & Depositional Featuers of River)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- নদীর সঞ্চয়কার্যের ফলে সৃষ্ট ভূমিরূপসমূহের নাম বলতে পারবেন এবং
- বিভিন্ন সঞ্চয়জাত ভূমিরূপ উদ্ভবের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

নদীর সঞ্চয়কার্য ও সৃষ্ট ভূমিরূপ

সমুদ্রের নিকটবর্তী অঞ্চলে নদীর নিম্নগতি থাকে। এ সময় নদী উপত্যকা সর্বাপেক্ষা অধিক প্রশস্ত হয় এবং গভীরতা একেবারে কমে যায়। ফলে নদীবাহিত শিলাচূর্ণ নদীস্রোতের সাথে বাহিত হয়ে অত্যন্তবিস্তৃত প্লাবন ভূমি গড়ে উঠে। নদী বিস্তৃত প্লাবন ভূমিতে তার গতিপথ পরিবর্তন করে থাকে। এ অংশের প্রধান বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভূমিরূপের মধ্যে মৃদু ঢাল বিশিষ্ট প্লাবন ভূমি, নদী বাঁক, নদী ধাপ, নদীতীর জলাভূমি, বিনুনী নদী, ব-দ্বীপ অন্যতম। নিম্নে নদীর সঞ্চয়জাত ভূমিরূপসমূহের বিবরণ দেয়া হলো-

১. পলল পাখা ও পলল কোণ (Alluvial Fan and Alluvial Cone): পাহাড়, পর্বত বা উচ্চ অঞ্চল থেকে নদী সমতল ভূমিতে নেমে আসার ফলে ঢাল দ্রুত কমে যায়। এ অবস্থায় নদীর পানিতে বাহিত বিভিন্ন ধরনের পদার্থের বোঝা বহন করা সম্ভব হয় না। ফলে তা পাদদেশের নদী খাতেই সঞ্চয় করে। এক পর্যায়ে নদী তার এ বোঝা এড়িয়ে নতুন পথে নিম্ন অঞ্চলে অগ্রসর হয়। এভাবেই নদী পাহাড়ের পাদদেশের এক পাশ থেকে অন্য পাশে স্থান পরিবর্তন করে এবং অবশেষে তা পাখার ন্যায় ঢালু ভূমিরূপ সৃষ্টি করে যা পলল পাখা নামে পরিচিত (চিত্র ৬.৪.১)। পলল পাখা শুষ্ক এলাকায় গঠিত হয় এবং উর্ধ্বমুখী ভাগের সম্প্রসারণ পানি তল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। পলল পাখার পলি মোটা, বড় বড় শিলা টুকরো এবং বালি ও নুড়ি পাথরই এর প্রধান বৈশিষ্ট্য। আর যে সকল অঞ্চলে মাটি অধিক পরিমাণ পানি শোষণ করতে পারে, সে সকল অঞ্চলের সঞ্চয় প্রশস্ত না হয়ে কোণাকৃতি হয়। একে পলল কোণ (Alluvial Cone) বলে (চিত্র ৬.৪.২)।

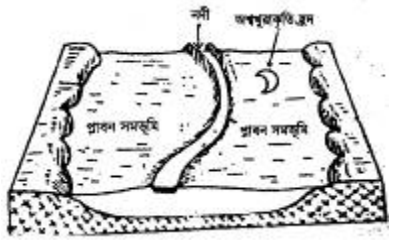

চিত্র ৬.৪.১ : পলল পাখা



চিত্র ৬.৪.২ : পলল কোণ

২. পাদদেশীয় পলল সমভূমি (Peidmont Alluvial Plain): পাহাড়ের পাদদেশে নদীবাহিত পানি সঞ্চিত হয়ে যে সমভূমি গড়ে ওঠে তাকে পাদদেশীয় পলল সমভূমি বলে। বাংলাদেশের রংপুর ও দিনাজপুর জেলার অধিকাংশ স্থানই পাদদেশীয় পলল সমভূমি নামে পরিচিত। তিস্তা, আত্রাই, যমুনেশ্বরী প্রভৃতি নদী দ্বারা এ অঞ্চল বিধৌত। এসব নদী হিমালায় পর্বত হতে উৎপন্ন হয়েছে। ফলে নদীগুলো সহজেই পাহাড় হতে পলল বহন করে এ অঞ্চলে সঞ্চয় করে পাদদেশীয় পললভূমি গঠন করেছে। পাহাড়ের পাদদেশে দুই বা ততোধিক পলল পাখা বা কোণ মিলিত হয়েও পাদদেশীয় পলল সমভূমি গঠন করতে পারে।

৩. প্লাবন সমভূমি (Flood Plain): অধিকাংশ নদী তার নিম্ন প্রবাহে সূক্ষ্ম কর্দম, পলি প্রভৃতি সঞ্চিত করে থাকে। বন্যা বা প্লাবনে নদী দু'কূল ভাসিয়ে পানিতে ডুবে যায় এবং তাতে নতুন পলি সঞ্চিত হয়। এরূপ নদীর নিম্নাংশে বা মোহনায় পলি সঞ্চিত হয়ে প্লাবন সমভূমির (Flood Plain) সৃষ্টি করে (চিত্র ৬.৪.৩)। গঙ্গা, পদ্মা, নীল, ইয়াংসিকিয়াং প্রভৃতি নদীর মোহনায় এরূপ প্লাবন সমভূমি রয়েছে। প্লাবন সমভূমিতে স্বাভাবিক বাঁধ, পশ্চাৎ জলাভূমি, নদীর বাঁক, অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ, কর্দম ছিপি, বালুচর প্রভৃতি ভূমিরূপ দেখা যায়।



চিত্র ৬.৪.৩ : প্লাবন সমভূমি

৪. প্রাকৃতিক বাঁধ (Natural Levee): প্লাবন ভূমিতে নদীর তীরবর্তী এলাকায় প্রাকৃতিক বাঁধ লক্ষ্য করা যায়। নদীর নিকটবর্তী এলাকায় এর উচ্চতা সবচেয়ে বেশি হয় এবং পিছনের দিকে ক্রমশ ঢালু হয়ে নেমে যায়। প্লাবনের সময় নদীর পরিবহন ক্ষমতা বৃদ্ধি এই বাঁধের উৎপত্তির প্রধান কারণ। প্লাবনের সময় নদীর দু'কূল ছাপিয়ে যখন পানি পার্শ্ব দিকে প্রবাহিত হয় তখন উর্ধ্ব ঢালের দিকে পানি প্রবাহ থাকে বলে পানি মধ্যস্থিত পলি নদীর

তীরবর্তী এলাকায় সবচেয়ে বেশি জমা হয় এবং যতদূরে যাওয়া যায় ততই পলি কম সঞ্চিত হয়। প্লাবনের ফলে এরূপ সঞ্চয় বৃদ্ধি পেয়ে বাঁধের আকার ধারণ করে, এরূপ বাঁধকে প্রাকৃতিক বাঁধ বলে।

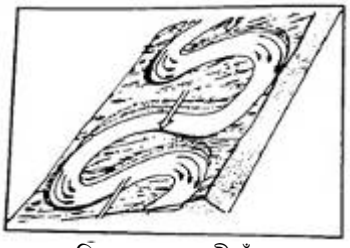
নদী গতিপথ পরিবর্তনের ফলে পূর্ববর্তী নদী প্রাকৃতিক বাঁধ প্লাবন সমভূমির ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। ক্ষয়ের ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এটি বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থান করে। প্লাবন অধিক হলে নদী স্বাভাবিকভাবে কতগুলো অগভীর খাত বরাবর প্রবাহিত হয়। এগুলোকে প্লাবন ভূমি কর্তিত পথ (Flood Plain Scour Route) বলে। এগুলো পুরাতন নদীখাতকে বা নদীখাত সৃষ্টির সূচনাকে উপস্থাপিত করে।

৫. পশ্চাৎ জলাভূমি সঞ্চয় (Back Swamp): প্রাকৃতিক বাঁধের পশ্চাৎ দিকে নদীর পলি সঞ্চয় ক্রমশ কম হওয়ায় তা নিম্নভূমিরূপে অবস্থান করে। বর্ষার পরে বন্যার পানি সরে গেলে এ নিম্নভূমিতে জল আবদ্ধ অবস্থায় থেকে যায়। প্রাকৃতিক বাঁধের পশ্চাতে অবস্থিত এরূপ জলাভূমিকে পশ্চাৎ জলাভূমি (Back Swamp) বলা হয়। বাংলাদেশের অধিকাংশ নদীর স্বাভাবিক বাঁধের পশ্চাতে জলাভূমি রয়েছে। এগুলো অনেক সময় 'বিল' হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। নদী প্রাকৃতিক বাঁধের পশ্চাতে এই জলাভূমি সৃষ্টি করে। পলি ও কাঁদা দিয়ে এই সুবিস্তৃত ভূমি গঠিত হয়। পশ্চাৎ জলাভূমি এলাকার বন্ধুরতা দুই মিটারেরও কম থাকে।

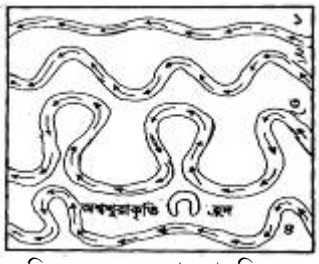
৬.পশ্চাৎ ঢাল (Back Slope): স্বাভাবিক বাঁধের পশ্চাতে অপেক্ষাকৃত মৃদু ঢাল বিশিষ্ট ভূমিকে পশ্চাৎ ঢাল বলা হয়। এ পশ্চাৎ ঢাল জলাভূমি পর্যন্তবিস্তৃত থাকতে পারে। বাংলাদেশের অধিকাংশ নদীর পশ্চাতে এরূপ পশ্চাৎ ঢাল রয়েছে।

৭. জলাভূমি (Marshes or Beel): নদী গতি পরিবর্তন করলে প্লাবন ভূমির মধ্যস্থ পরিত্যক্ত গতিপথ ধীরে ধীরে ভরাট হয়ে উঠে। কিন্তু যে সব স্থান ভরাট হয় না সেখানে পানি জমে জলাভূমির সৃষ্টি করে। আবার প্লাবন ভূমির অভ্যন্তরের নিচু অঞ্চলে পানি জমেও জলাভূমির সৃষ্টি হয়। এরূপ জলাভূমিকে বিল (Bill) বলা হয়। যেমন- রাজশাহী চলনবিল, গোপালগঞ্জ জেলার বিল ও সিলেটের বিল এ জাতীয় জলাভূমির প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

৮. নদী বাঁক (Meander): নদী বাঁক একটি গুরুত্বপূর্ণ নদীজ বৈশিষ্ট্য যা প্রায়ই চোখে পড়ে। নদী বাঁকের ক্ষয় ক্রিয়ার কারণে নদী খাতের অবস্থানে ক্রমাগত পরিবর্তন হয়, কিন্তু খাতের আয়তন অপরিবর্তিত থাকে। নদীর গতিপথে উঁচু-নিচু স্থান বা কঠিন শিলা থাকলে নদীর গতি বেঁকে যায়। একে সর্পিল বা আঁকাবাঁকা নদী (Meandering River) বলে। বাঁকের মুখে নদী তীরের যে স্থানটি স্রোতের ঠিক সম্মুখে থাকে, স্রোতের আঘাতে সেখানে খুব বেশি ক্ষয় হয়। ফলে ঐ স্থানে নদী প্রতি বছর ভাঙ্গতে থাকে এবং তার বিপরীত দিকে স্রোতের বেগ হ্রাস পাওয়ায় সেখানে পলি মাটি ও বালুকা সঞ্চিত হয়ে চর পড়তে থাকে। বাংলাদেশের প্লাবন সমভূমিতে এরূপ ভূ-প্রকৃতি দেখা যায়। নদী আঁকাবাঁকা হয়ে উত্তল ও অবতল পাড়ের সৃষ্টি করে। উত্তল পাড়ে সঞ্চয় এবং অবতল পাড়ে ক্ষয়সাধন করে। উত্তল পাড়ের পলি সঞ্চয় করে যে সংলগ্ন চরের সৃষ্টি করে তাকে বিন্দু বার (Point Bar) বলে (চিত্র ৬.৪.৪)।

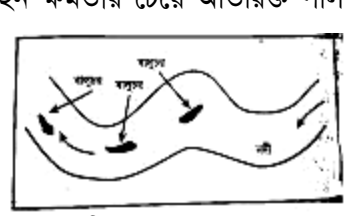

চিত্র ৬.৪.৪ : নদী বাঁক

৯. অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ (Ox Bow Lake): সমভূমিতে প্রবাহিত কোনো কোনো নদীতে অসংখ্য বাঁক দেখা যায়। কোনো কোনো সময় এ বাঁক এত বেশি বৃদ্ধি পায় যে, দুটি বাঁক নিজেদের খুব কাছাকাছি এসে পড়ে। এক পর্যায় উভয় অংশ মিলে যায় এবং নদী সোজাভাবে চলতে থাকে। আর ক্ষয়প্রাপ্ত বাঁকা অংশটি নদীখাত হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে হ্রদের আকার ধারণ করে। এরূপ হ্রদগুলো দেখতে অনেকটা অশ্বের ক্ষুরের ন্যায় বলে এদের অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ বলা হয় (চিত্র ৬.৪.৫)। বাংলাদেশের পদ্মা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র প্রভৃতি নদীতে বহু অশ্বক্ষুরাকৃতির হ্রদ দেখা যায়। এসব হ্রদে পলিমাটি সঞ্চিত হলে সেগুলো ভরাট হয়ে সমভূমিতে পরিণত হয়। এরূপ সমভূমিকে কর্দম ছিপি বলে। এরূপ ভূমিরূপ বাংলাদেশের প্লাবন সমভূমি অঞ্চলে ব্যাপকভাবে দৃষ্ট হয়।



চিত্র ৬.৪.৫ : অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ

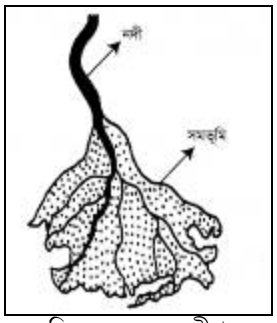
১০. বালুচর ও বিনুনী নদী (Sand Bar and Braided River): কোনো নদীর পরিবহন ক্ষমতার চেয়ে অতিরিক্ত পলি উৎস অঞ্চল থেকে নদীতে সরবরাহ হলে তা নদী খাতেই জমা হয়। নদীর ভিতর বালি, নুড়ি, কাঁকর, কর্দম ইত্যাদি সঞ্চিত হয়ে যে নতুন ভূমির সৃষ্টি হয়, তাকে বালুচর বলে (চিত্র ৬.৪.৬)। বালুচর প্রধানত দুটি কারণে সৃষ্টি হয়। প্রথমত, নদীর পানিতে যখন অতিরিক্ত বালু, কর্দম, নুড়ি ইত্যাদি মিশ্রিত থাকে তখন স্রোতের বেগ কমে যায় এবং বাহিত পদার্থসমূহ দ্রুত সঞ্চিত হয়ে বালুচরের সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয়ত নদীখাতে অতিরিক্ত



চিত্র ৬.৪.৬ : বালুচর

পলি সঞ্চয়নের কারণে বহুভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। এরূপ বহু শাখা বিশিষ্ট পানির ধারা অনেকটা চুলের বিনুনীর মতো দেখতে। একে বিনুনী নদী বা চর উৎপাদী নদীও বলা হয়। যে সকল নদীতে পানির প্রবাহে ঋতুভিত্তিক পরিবর্তন ব্যাপক হয় সেখানে এ ধরনের নদী বিন্যাস দেখা যায়। বাংলাদেশের যমুনা নদীতে এ ধরনের বিনুনী বিন্যাস দেখা যায়। এজন্য যমুনা নদীকে চর উৎপাদী নদী বলা হয়।

১১. ব-দ্বীপ (Delta): নদীর নিম্ন গতিতে স্রোতের বেগ খুব কমে যায় এবং নদীর পানির সঙ্গে মিশ্রিত শিলাচূর্ণ, বালি, কাঁদা প্রভৃতি তলানিরূপে সঞ্চিত হতে থাকে। নদীর মোহনায় সমুদ্রের লবণ মিশ্রিত পানি এ তলানি পড়তে বিশেষভাবে সাহায্য করে। নদী যদি কোনো কম স্রোত বিশিষ্ট বা স্রোতহীন সমুদ্রে পড়ে, তাহলে ঐ সমস্ত নদীর মুখে জমতে জমতে নদী মুখ প্রায় বন্ধ হয়ে যায় এবং কালক্রমে ঐ চরাভূমি সমুদ্রের পানির ওপর উঁচু হয়ে ওঠে। তখন নদী বিভিন্ন শাখায় ঐ চরাভূমিকে বেষ্টন করে সমুদ্রে পতিত হয়। নদী মোহনাস্থিত ত্রিকোণাকার এ নতুন ভূমিকে ব-দ্বীপ বলে (চিত্র ৬.৪.৭)। যখন নদী কোনো সাগর, হ্রদে বা অন্য কোনো জলাশয়ে শেষ পর্যায়ে এসে মিলিত হয়, তখন নদী পরিবাহিত পলি ঐ অংশে মাত্রাহীন 'Δ'- এর (ল্যাটিন Δ ডেল্টা) আকারে সঞ্চিত হয়। ব-দ্বীপের আকার বিশেষভাবে নির্ভর করে নদীবাহিত পললের পরিমাণ, গঠন ও যেখানে পলি সঞ্চিত হয় সেই স্থানের প্রাকৃতিক পরিবেশের ওপর।



চিত্র ৬.৪.৭ : ব-দ্বীপ

নদীর প্রধান ধারা অনেকগুলো শাখায় বিভক্ত (Distributaries)। এ সমস্ত শাখা নদীর মাধ্যমে প্রবাহ সমুদ্রে পৌঁছে। শাখা নদীসমূহ দ্রুত স্থান বদল করে ধীরে ধীরে একটি আদর্শ ব-দ্বীপের সৃষ্টি করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	নদীর সঞ্চয়জাত ভূমিরূপসমূহের নাম ছকবদ্ধ লিখুন।

সারসংক্ষেপ

নদী সমুদ্রের নিকট এসে উপনীত হলে নদীর ঢাল ও গভীরতা একেবারে কমে যায়। নদীর উপত্যকা সর্বাপেক্ষা অধিক প্রশস্ত হয়। নদীবাহিত শিলাচূর্ণ নদী স্রোতের দ্বারা বাহিত হয়ে নদী গর্ভে ও নদীর উভয় পার্শ্বে সঞ্চিত হয়। নদীর এ অংশে পলি সঞ্চয়নই প্রধান বৈশিষ্ট্য। নদী তার বিস্তৃত প্লাবন ভূমিতে গতিপথ পরিবর্তন করে থাকে। এই অংশের প্রধান বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভূমিরূপের মধ্যে মৃদু ঢাল বিশিষ্ট প্লাবন সমভূমি, নদী বাঁক, প্রাকৃতিক বাঁধ, অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ, কর্দম ছিপি, নদী ধাপ, নদীতীর জলাভূমি, বিনুনী নদী ও ব-দ্বীপ অন্যতম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। নদী সমুদ্রে এসে পতিত হলে নদীর মোহনায় যে মাত্রাহীন 'ব' এর মত পলি সঞ্চিত স্থানকে কী বলে।

(ক) উপনদী (খ) ব-দ্বীপ (গ) প্লাবন সমভূমি (ঘ) অন্যান্য

২। নদীর বাঁক বৃদ্ধি পেয়ে এক সময় অংশটি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে, একে কী বলে?

(ক) অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ (খ) গিরিখাত (গ) প্লাবন সমভূমি (ঘ) অন্যান্য

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ প্রশ্নের উত্তর দিন।

বাংলাদেশের নদীসমূহে প্রচুর পরিমাণ চর দেখা যায়। কারণ নদীর ভাটি অঞ্চলে স্রোত কমে গিয়ে নদী প্রশস্ত হয়ে যায়। বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে গেলে এর বাস্তবরূপ দেখা যায়।

৩। নদীর সঞ্চয়কার্য কোথায় বেশি হয়?

(ক) উৎসে (খ) মরুভূমিতে (গ) মোহনায় (ঘ) পাহাড়ে

৪। নদীর সঞ্চয়জাত ভূমিরূপ নয় কোনটি?

(ক) ব-দ্বীপ (খ) জলপ্রপাত (গ) নদী বাঁক (ঘ) প্লাবন সমভূমি

পাঠ-৬.৫ বাংলাদেশের নদী ব্যবস্থা (River System in Bangladesh)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- বাংলাদেশের প্রধান নদ-নদীগুলোর নাম জানতে পারবেন এবং
- বাংলাদেশের নদী ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা পারবেন।

বাংলাদেশের নদী ব্যবস্থা

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। ফলে এদেশের অধিবাসীদের জীবনযাত্রার ওপর নদী ব্যবস্থার প্রভাব অধিক। নদী ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠেছে দেশের বহু শিল্প, কল-কারখানা ও কৃষিব্যবস্থা।

বাংলাদেশের নদী ব্যবস্থার প্রধান প্রধান নদ-নদী সম্পর্কে নিচে আলোচনা করা হলো-

পদ্মা : হিমালয় পর্বতের গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে উৎপত্তি লাভ করে ভারতের উপর দিয়ে গঙ্গা নামে প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশের চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সীমান্তদিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। বাংলাদেশে প্রবেশ করার পর এর নাম হয়েছে পদ্মা। এর সর্বমোট দৈর্ঘ্য ২,৬০০ কি.মি.। পদ্মা চাঁপাইনবাবগঞ্জ ও রাজশাহী জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তদিয়ে কুষ্টিয়া জেলার উত্তর-পশ্চিম প্রান্তপর্যন্তপ্রায় ১৪৪ কি.মি. ভারত ও বাংলাদেশের সীমা নির্দেশ করছে। তারপর এটি দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে রাজবাড়ি জেলায় গোয়ালন্দের কাছে যমুনার সাথে মিলিত হয়েছে। এ মিলিত স্রোত পদ্মা নামে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে চাঁদপুরের নিকট মেঘনা নদীর সাথে মিলিত হয়ে মেঘনা নামে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। পদ্মার শাখা নদীগুলো হলো- মধুমতি, আড়িয়াল খাঁ, ভৈরব, মাথাভাঙ্গা, কুমার, কপোতাক্ষ, শিবসাত, পশুর, বড়াল, গড়াই, ইছামতি, নবগঙ্গা, কালীগঙ্গা, চিত্রা, তেঁতুলিয়া, বিষখালী, কীর্তনখোলা, কাউখালী, আগুন মুকা। পদ্মার উপনদী মহানন্দা, টাঙ্গন, নাগর, পুনর্ভবা, কুলিক।

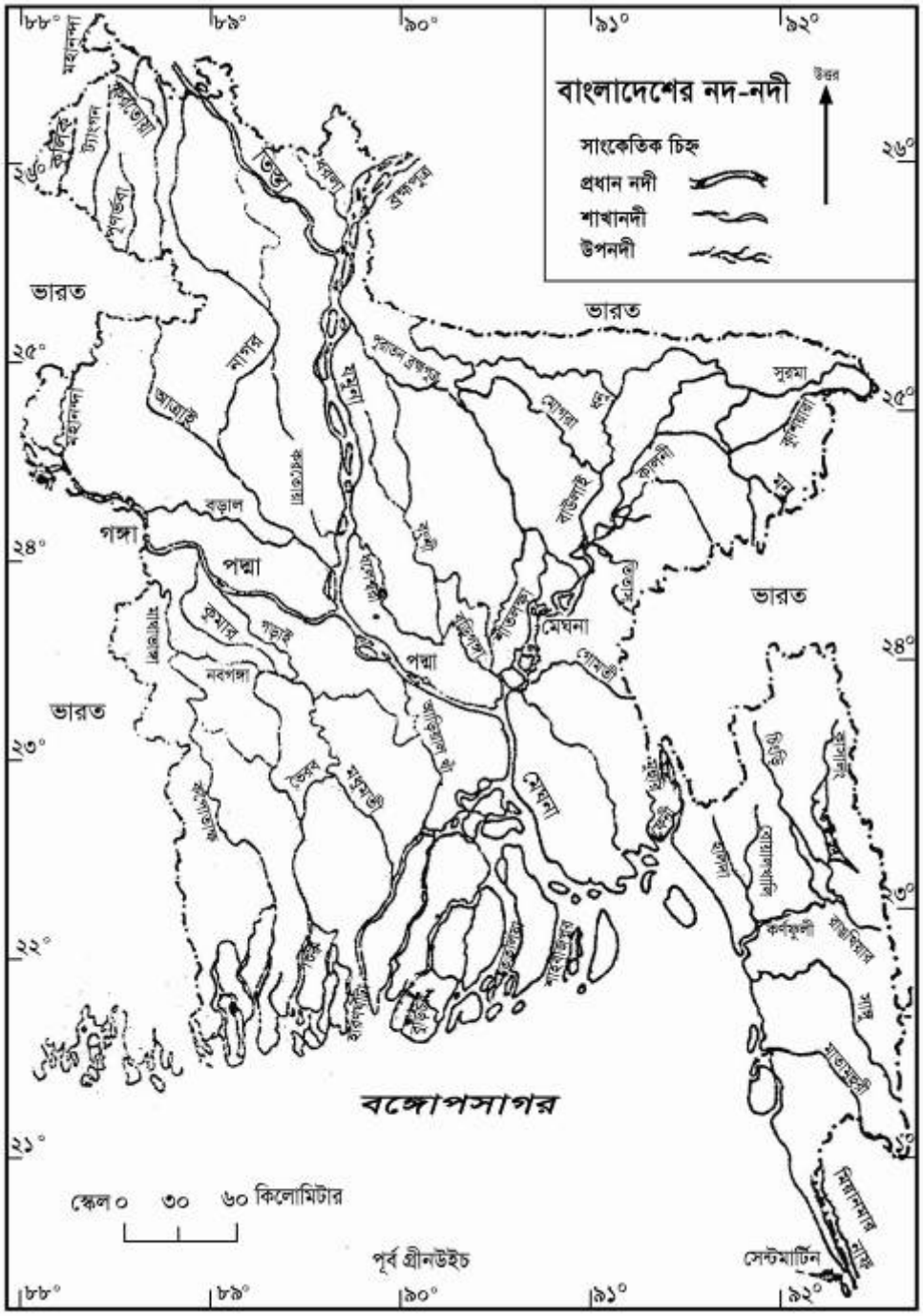
ব্রহ্মপুত্র : ব্রহ্মপুত্র তিব্বতের কৈলাস শৃঙ্গের মানস সরোবর হ্রদ থেকে উৎপত্তি লাভ করে তিব্বতের 'সাংপো' এবং আসামের ডিহং এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে কুড়িগ্রাম জেলার মাজহিয়ালী নামক স্থান দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। ব্রহ্মপুত্র বাংলাদেশে প্রবেশ করার পর তিস্তা নদী এর সাথে মিলিত হয়েছে। দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়ে এটি দুটি শাখায় বিভক্ত হয়েছে। একটি শাখা জামালপুর ও ময়মনসিংহ জেলার মধ্য দিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে ভৈরব বাজারের নিকট মেঘনার সাথে মিলিত হয়েছে। এটি পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নামে পরিচিত। ব্রহ্মপুত্রের শাখানদী যমুনা। বাংলাদেশের দীর্ঘতম নদী হিসেবে পরিচিত যমুনা।

যমুনা : যমুনা নদী মূলত ব্রহ্মপুত্রের শাখা। তিস্তা ব্রহ্মপুত্রের মিলিত স্রোতধারাটি যমুনা নামে দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে গোয়ালন্দের কাছে এসে পদ্মার সাথে মিলিত হয়েছে। যমুনা বাংলাদেশের প্রশস্ততম নদী। যমুনা নদীর পূর্ব নাম ছিল জোনাই নদী। যমুনার শাখানদী হলো- ধলেশ্বরী, বুড়িগঙ্গা এবং উপনদীগুলো হলো- তিস্তা, ধরলা, করতোয়া, আত্রাই, বাঙ্গালী, কালজানি, ডোরসা, যমুনেশ্বরী, দুধকুমারত, গঙ্গা, তুলসী গঙ্গা, বড়াল, নারদ ইত্যাদি।

মেঘনা : আসামের 'বরাক' নদী নাগা-মনিপুর পাহাড়ের দক্ষিণ থেকে উৎপত্তি লাভ করে দুইটি শাখায় বিভক্ত হয়ে সিলেট জেলায় প্রবেশ করেছে। শাখা দুইটি সুরমা ও কুশিয়ারা নামে বিভক্ত হয়েছে। মূলত সুরমা ও কুশিয়ারার মিলিত স্রোতধারাই মেঘনা নদী। সুরমা নামক শাখাটি প্রথমে খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া পাহাড়ের নিকট দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ছাতক ও সুনামগঞ্জের নিকট দিয়ে অগ্রসর হয়ে দক্ষিণে হবিগঞ্জ জেলার উত্তর সীমানায় পৌঁছে কুশিয়ারার সাথে মিলিত হয়েছে। মেঘনা ভৈরববাজারের নিকট এসে পুরাতন ব্রহ্মপুত্র নদের সাথে যুক্ত হয়েছে। মেঘনা নদীর উপনদীগুলো হলো- শীতলক্ষ্যা, গোমতি, ডাকাতিয়া, ধলেশ্বরী, ব্রহ্মপুত্র।

কর্ণফুলী : কর্ণফুলী নদী আসামের লুসাই পাহাড় থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। পাহাড়ি এ নদী চট্টগ্রাম ও রাঙামাটির প্রধান নদী। এটি বাংলাদেশের খরস্রোতা নদী। উৎস থেকে কর্ণফুলীর মোহনা পতেঙ্গা পর্যন্তদৈর্ঘ্য ২৭২ কি.মি.। কাপ্তাই নামক

স্থানে কর্ণফুলী নদীর উপর বাঁধ নির্মাণ করে পানিবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। এ নদী কাপ্তাই হ্রদের দক্ষিণ-পশ্চিম দিক হতে বের হয় পতেঙ্গার কাছে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। কর্ণফুলী নদীর উপনদীগুলো হলো- হালদা, চেঙ্গী, কাসালং, সাইনী, কাপ্তাই, রাখিয়াং, ইছামতি, শিলক, গোয়ালখালী ইত্যাদি।



চিত্র ৬.৫.১: বাংলাদেশের নদ-নদী

করতোয়া : করতোয়া নদীর মূলধারা ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের জলপাইগুড়ি জেলার বৈকুণ্ঠপুর জলাভূমিতে উৎপন্ন হয়েছে। এটি পঞ্চগড় জেলার ভিটগড়ের নিকট বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। এরপর দিনাজপুর জেলার খানসামার নিকট এটি আত্রাই নামে পরিচিত। সেখান থেকে দক্ষিণ দিকে সমাধিঘাট পর্যন্তঅগ্রসর হয়ে আবার ভারতে প্রবেশ করেছে। এ নদী পুনরায় রাজশাহী জেলার দেওয়ানপুরে বাংলাদেশে প্রবেশ করে বড়াল নদীর মধ্য দিয়ে পাবনার বেড়ার নিকট যমুনায় পতিত হয়েছে। এটি যমুনার দীর্ঘতম উপনদী।

মহানন্দা : হিমালয়ের পাদদেশে দার্জিলিং এর নিকটবর্তী মহালড্রীম পর্বত হতে মহানন্দা নদী উৎপত্তি হয়েছে। ভারতের জলপাইগুড়ি জেলার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পঞ্চগড় জেলার তেঁতুলিয়ার উপজেলা সীমান্তএলাকা দিয়ে প্রবাহিত হয়ে পুনরায় ভারতে প্রবেশ করে। অত:পর ভারতের পূর্ণিয়া ও মালদহ জেলার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চাপাইনবাবগঞ্জের নিকট বাংলাদেশে পুনরায় প্রবেশ করে গোদাগাড়ির কাছে পদ্মার মিলিত হয়েছে। নাগর, ট্যাংগন ও পুণর্ভবা এর উপনদী।

গোমতি : গোমতি নদীর উৎপত্তিস্থল ভারতের ত্রিপুরা পাহাড়ে। বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার উপর দিয়ে এ নদী প্রবাহিত হয়েছে। এ নদী দাউদকান্দির কাছে এসে মেঘনা নদীর সাথে মিলিত হয়েছে।

সাঙ্গু : সাঙ্গু নদীর উৎপত্তিস্থল মিয়ানমার-বাংলাদেশ সীমানার আরাকান পাহাড়ে। এ নদী চট্রগাম ও রাঙামাটি জেলার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। নদীটির দৈর্ঘ্য ২৪৪ কিলোমিটার।

হালদা : হালদা নদীর উৎপত্তিস্থল খাগড়াছড়ি বাদনাতলী পর্বতশৃঙ্গ। এটি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে উৎপত্তি লাভ করে বাংলাদেশের জলসীমায় সমাপ্তি ঘটেছে। হালদা নদী উৎপত্তি লাভ করার পর দক্ষিণে অগ্রসর হয়ে কালুঘাটের নিকট কর্ণফুলী নদীতে মিলিত হয়েছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশের নদী ব্যবস্থার প্রধান নদীগুলো মানচিত্রে প্রদর্শন করুন।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশ নদীমাতৃক হওয়ার এখনকার অধিবাসীদের জীবনযাত্রার ওপর নদীব্যবস্থা প্রভাব অধিক। এদেশের নদী ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করে গড়ে ওঠেছে দেশের বহুশিল্প, কল-কারখানা ও কৃষিব্যবস্থা। বাংলাদেশের নদী ব্যবস্থার প্রধান নদীগুলো হলো পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, ব্রহ্মপুত্র, সুরমা, কুশিয়ারা, কর্ণফুলি, তিস্তা, মহানন্দা, করতোয়া, নাফ প্রভৃতি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কর্ণফুলি নদী কোথায় অবস্থিত?

(ক) ঢাকা (খ) চট্টগাম (গ) রংপুর (ঘ) সিলেট

২। পদ্মা নদী ভারত ও বাংলাদেশের কত কি.মি. সীমানা নির্দেশ করেছে?

(ক) ১৪০ কি.মি. (খ) ১৩০ কি.মি. (গ) ১৪৪ কি.মি. (ঘ) ১৩৪ কি.মি

৩। ব্রহ্মপুত্র নদী কোন জেলা দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে?

(ক) চাপাইনবাবগঞ্জ (খ) সিলেট (গ) ফেনী (ঘ) কুড়িগ্রাম

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

মানুষের শরীরের শিরা-উপশিরার মত বাংলাদেশের নদীসমূহ পরস্পরের সাথে সংযুক্ত হয়ে সাগরের অভিমুখে ছুটে চলে। এই নদীগুলো পরস্পরকে বাঁচিয়ে রাখে।

৪। যমুনার শাখা নদী কোনটি ?

(ক) বুড়িগঙ্গা (খ) বাঙ্গালী (গ) তিস্তা (ঘ) করতোয়া

৫। পদ্মা যমুনা কোথায় মিলিত হয়েছে?

(ক) মানিকগঞ্জে (খ) পাটুরিয়ায় (গ) গোয়ালন্দে (ঘ) আরিচায়

পাঠ-৬.৬ বাংলাদেশের নদীভাঙ্গন ও এর প্রভাব
(River Erosion of Bangladesh and its Effects)

উদ্দেশ্য

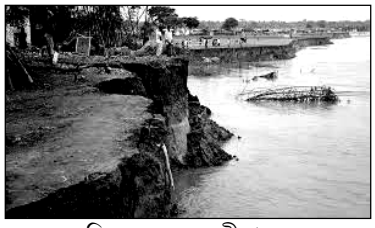
এই পাঠ শেষে আপনি–

- বাংলাদেশের নদীভাঙ্গন প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা পাবেন এবং
- বাংলাদেশে নদীভাঙ্গনের প্রভাব সম্পর্কে জানতে পারবেন।

বাংলাদেশের নদীভাঙ্গন প্রক্রিয়া

বাংলাদেশে নদীমাতৃক দেশ হওয়ায় নদ-নদীগুলো সর্বত্র জালের মতো ছড়িয়ে রয়েছে। শাখা-প্রশাখাসহ নদ-নদীর সংখ্যা প্রায় ৭০০টি। দৈর্ঘ্য প্রায় ২২,১৫৫ কি.মি.। নদীমাতৃক দেশ হওয়াতে এসব নদীতে ভাঙ্গন সমস্যা বহুদিনের। তাছাড়া এদেশের প্রায় নদীগুলোই সর্পিল বা বিনুনি ধরনের। নদীভাঙ্গনের কারণে নদী তীরবর্তী পাকা ঘরবাড়ি, স্কুল-কলেজসহ বিভিন্ন স্থাপনা নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়।

নদীভাঙ্গন : যখন নদীর প্রবল স্রোতের আঘাতে তীরবর্তী অঞ্চলের জমি ভেঙ্গে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়, তখন তাকে নদীভাঙ্গন বলে (চিত্র ৬.৬.১)।



চিত্র ৬.৬.১ : নদীভাঙ্গন

নদীভাঙ্গনের প্রভাবক : নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বাংলাদেশের নদীভাঙ্গনের প্রভাবক হিসেবে কাজ করে।

- নদীখাত যখন পলি সঞ্চিত হয়ে পরিপূর্ণ হয়ে যায়, তখন নদীর খাড়া পাড় মাধ্যাকর্ষণজনিত কারণে এবং খাতের ক্ষেত্রে স্রোতের তোড়ে ভাঙ্গন সৃষ্টি হয়।
- বর্ষাকালে প্রবল বৃষ্টিপাত হলে নদীর পানি বৃদ্ধি পায় এবং প্রবল স্রোতের সৃষ্টি করে। ফলে সামান্য আঘাতে নদী তীরে ব্যাপকভাবে ভাঙ্গন শুরু হয়।
- নদীর তীরে মৃত্তিকার বুনটে যদি বালুর পরিমাণ বেশি থাকে তাহলে নদীভাঙ্গনের হার বেশি হয়।
- নদী উপত্যকা থেকে অপরিকল্পিতভাবে অতিমাত্রায় বালু, পাথর উত্তোলন করলে নদীভাঙ্গনের হার বেড়ে যায়।
- বর্ষাকালে প্রচুর বৃষ্টির পানি সমভূমির উপর দিয়ে প্রবাহিত হতে হতে প্রবল স্রোতের আকার ধারণ করে নদীতে পতিত হলে নদীভাঙ্গন প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়।
- নদী যখন আঁকাবাঁকা পথে চলে তখন নদী মোহনায় অশ্বখুরাকৃতি হ্রদের সৃষ্টি হয়। ফলে নদীর বাঁকের ভিতরের দিকে পলি জমতে থাকে এবং বাইরের দিকে নদীভাঙ্গন প্রক্রিয়া শুরু হয়।
- পাহাড়ি ঢলে নদী তীরের মৃত্তিকা আলগা হয়ে ভাঙ্গনের সৃষ্টি হয়।
- নদীতে বড় বড় নৌকা, কার্গো, জাহাজ দ্রুত চলাচলের কারণে বড় বড় ঢেউয়ের সৃষ্টি হয় যা নদীর পাড় ভাঙ্গনে সহায়তা করে।

নদীভাঙ্গনের প্রভাব

১. **কৃষি জমি বিলীন :** নদী ভাঙ্গনের ফলে কৃষি জমি বিলীন হয়ে যায়। ফলে কৃষি পণ্য ও খাদ্যে ঘাটতি দেখা যায়।
২. **বসতবাড়ি নদীগর্ভে বিলীন :** নদীভাঙ্গনের ফলে নদী অববাহিকায় অবস্থিত বাড়ি-ঘর ভেঙ্গে নদীতে বিলীন হয়ে যায়। ফলে অনেক মানুষ গৃহহীন হয়ে পড়ে।
৩. **নদীর চর বৃদ্ধি :** এক জায়গায় নদী ভেঙে অন্য জায়গায় পলি জমা হয়। ফলে নদীর নিচু স্তরে চরের সৃষ্টি হয়।
৪. **অবকাঠামো ধ্বংস :** নদীর পাড়ে অবস্থিত অবকাঠামোগত উন্নয়নমূলক কাজ নদীভাঙ্গনের সাথে ভেঙে পড়ে। ফলে অবকাঠামোগত দিক থেকে দেশ ক্ষতির সম্মুখীন হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	আপনার এলাকায় নদীভাঙ্গনের কারণ এবং প্রভাব সম্পর্কে লিখুন।

সারসংক্ষেপ

নদী স্রোতের ফলে নদীর দুই তীরের মাটি ধীরে ধীরে ক্ষয়ে যাওয়া স্বাভাবিক প্রক্রিয়া কিন্তু যখন এই ক্ষয়ে যাওয়ার পরিমাণ অনেক বেশি হয় তখন সেই প্রক্রিয়াকে নদীভাঙ্গন বলা হয়। পাহাড়ি ঢল, প্রচুর বৃষ্টিপাত, বন্যা, নদীর বালু উত্তোলন প্রভৃতি কারণে নদীভাঙ্গন হয়ে থাকে। নদীভাঙ্গনের ফলে নদী তীরবর্তী বসতবাড়ি, কৃষি জমি, রাস্তাসহ অন্যান্য স্থাপনা নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। নদীভাঙ্গনের মনুষ্য সৃষ্ট কারণ কোনটি?

(ক) অধিক বৃষ্টিপাত (খ) পাহাড়ি ঢল

(গ) নদীর বালু উত্তোলন (ঘ) সবগুলো

২। নদীভাঙ্গনের ফলে কী হয়?

(ক) নদী বড় হয় (খ) নদীর স্রোত বৃদ্ধি পায়

(গ) কৃষি জমি কমে যায় (ঘ) সবগুলো

৩। নদীভাঙ্গন কোথায় বেশি?

(ক) পাহাড়ে (খ) সমতলে

(গ) মোহনায় (ঘ) কোনটিই নয়

৪। বাংলাদেশে নদ-নদীর সংখ্যা কত?

(ক) প্রায় ৫০০ (খ) প্রায় ৬০০

(গ) প্রায় ৭০০ (ঘ) প্রায় ৮০০

পাঠ-৬.৭ নদীশাসন (River Training or Control)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি–

- নদীশাসন ও প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং
- নদীশাসনের ফলে সৃষ্ট ভূমিরূপ বর্ণনা করতে পারবেন।

নদীশাসন

নদ-নদীর প্রভাব মানবজীবনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। প্রতিবছর নানাবিধ কারণে নদীভাঙ্গন দেখা যায় যা অতি পরিচিত একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। নদীর এ ভাঙ্গন প্রক্রিয়া প্রতিরোধ ও নদীর পানি বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করার জন্য বাঁধ বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করাই হলো নদীশাসন। যেমন:- তিস্তা ব্যারেজ।



চিত্র ৬.৭.১ : নদীশাসন

বাংলাদেশের প্রায় সব নদ-নদীই সর্পিল। নদীভাঙ্গনের জন্য বিশেষভাবে অনুকূল ভূমিকা পালন করে সর্পিল নদী। বাংলাদেশের প্রায় সব অঞ্চলে কমবেশি নদীভাঙ্গন দেখা যায়। তবে নদীভাঙ্গনের ফলে সর্বোচ্চ ভূমিক্ষয় ঘটে ব্রহ্মপুত্র-যমুনা অববাহিকায়। নদীভাঙ্গনের ফলে নদীর পাড়ে বসবাসকারী মানুষের পালিত পশুসম্পদ, ফসলি জমি, জানমালের ব্যাপক ক্ষতি হয়। এ মহাবিপর্যয় থেকে রক্ষার জন্য নদীভাঙ্গন রোধ করা একান্তপ্রয়োজন।

নদীশাসনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ : নদীভাঙ্গন প্রাকৃতিক দুর্যোগগুলোর মধ্যে একটি ভয়াবহ দুর্যোগ। নদীভাঙ্গনের ফলে মানুষের যে ক্ষয়ক্ষতি হয় তা পুষিয়ে উঠা খুব কঠিন। নদীভাঙ্গন হাজার হাজার পরিবারকে করে গৃহহারা ও ভূমিহীন। নদীভাঙ্গনের ফলে মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হয়। তাই নদীশাসনের জন ইতোমধ্যে সরকার অনেক নদীর তীরে বাঁধ দিয়ে নদীভাঙ্গন রোধের চেষ্টা করছে। নদীশাসনের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো-

- উপকূলীয় অঞ্চলে বনায়নের মাধ্যমে সবুজ বেষ্টনী তৈরি করে এবং ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে নদী খনন করে নদীশাসন করা ।
- নদীশাসনের জন্য নদীর পাড় থেকে অপরিকল্পিতভাবে মাটি কাটা ও পাথর তোলা বন্ধ করে নদীভাঙ্গন রোধ করা সম্ভব।
- সমভূমি থেকে অতিরিক্ত বৃষ্টির পানি একই পথে নদীতে পতিত হওয়া রোধ করে পরিকল্পিতভাবে নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করলে নদীভাঙ্গন রোধ করে নদীশাসন করা যায়।
- প্রতিবছর নদীর পাড় ও বাঁধ সংস্করণ, নদী খনন, নদীর নাব্যতা ধরে রাখা ইত্যাদির মাধ্যমে নদীভাঙ্গন রোধ করা যায়।

নদীশাসনের ফলে সৃষ্ট ভূমিরূপ

১। বালুচর : নদীর গর্ভে বালি, নুড়ি, কাঁকর, কর্দম প্রভৃতি সঞ্চিত হয়ে যে নতুন ভূমির সৃষ্টি হয় তাকে বালুচর বলে। বাংলাদেশের প্রায় সব নদীতে এ ধরনের বালুচর দেখা যায়।

২। পশ্চাৎ জলাভূমি : প্রাকৃতিক বাঁধের পিছনে নদীর পলি সঞ্চয় ধীরে ধীরে কমে যায়। ফলে এ ভূমি নিম্নভূমিরূপে অবস্থান করে। বর্ষার পর বন্যার পানি সরে গেলে নিম্নভূমিতে পানি আবদ্ধ অবস্থায় থাকে। প্রাকৃতিক বাঁধের পশ্চাতে অবস্থিত এরূপ জলাবদ্ধ ভূমিকে পশ্চাৎ জলাভূমি বলে। যেমন- ঢাকা জেলার ধলেশ্বরী নদীর পশ্চিমে প্রাকৃতিক বাঁধের পশ্চাতে এক বৃহৎ জলাভূমি রয়েছে।

৩। জলাভূমি বা বিল : নদীর গতিপথ পরিবর্তন করলে প্লাবন ভূমির মধ্যস্থ পরিত্যক্ত গতিপথ ধীরে ধীরে ভরাট হয়ে যায়। কিন্তু যেসব স্থান ভরাট হয়না সেখানে পানি জমে জলাভূমি সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে প্লাবন ভূমির অভ্যন্তরে নিচু অঞ্চলে পানি জমে জলাভূমি সৃষ্টি হয়। এ ধরনের জলাভূমিকে বলা হয় বিল। যা নদীশাসনের ফলে সৃষ্টি হয়। রাজশাহীর চলনবিল, গোপালগঞ্জের বিল, সিলেটের বিল এর উদাহরণ।

শিক্ষার্থীর কাজ	কীভাবে আমরা নদীশাসন করতে পারি বর্ণনা করুন।

সারসংক্ষেপ

নদীশাসন বলতে বুঝায় নদীভাঙ্গন রোধে গৃহিত পদক্ষেপ যা নদীর গতিপথকে নিয়ন্ত্রণ করে। এছাড়াও নদীর পানি ভিন্ন জায়গায় নিয়ে কৃষি বা অন্যান্য কাজে ব্যবহার করার জন্য ব্যারেজ তৈরি করাকেও নদীশাসন বলা হয়। নদীশাসনের ফলে বালুচর, প্লাবন সমভূমি, পশ্চাৎ জলাভূমি প্রভৃতি ভূমিরূপের সৃষ্টি হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। নদীশাসনের উদাহরণ কোনটি?

(ক) তিস্তা ব্যারেজ (খ) তিস্তা ব্রিজ (গ) কামরাঙ্গীর চর (ঘ) সেচ প্রকল্প

২। বাংলাদেশে নদীভাঙ্গন কখন বেশি দেখা যায়?

(ক) গ্রীষ্মকালে (খ) শীতকালে (গ) বর্ষাকালে (ঘ) সারা বছর

চূড়ান্তমূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১



ক. উদ্দীপকে উল্লিখিত চিত্রটি কীসের?

খ. নদীর ক্ষয়জাত ভূমিরূপগুলোর নাম লিখুন।

গ. নদীর ক্ষয়কার্যের প্রক্রিয়া কী কী? বর্ণনা করুন।

ঘ. জলপ্রপাত কীভাবে গঠিত হয়? ব্যাখ্যা করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-২

'নদীর একুল ভাঙ্গিয়া গেলে, কী আর এমন যায় আসে, হাসিতে হাসিতে নদীর আরেক কুল যে জাগে' বাংলাদেশে একটি প্রচলিত গানটিতে নদীর বৈশিষ্ট্য ও কার্য প্রতীয়মান হচ্ছে।

ক. নদীর সঞ্চয়জাত ভূমিরূপগুলো কী কী?

খ. নদীশাসন কী?

গ. বাংলাদেশের নদী ব্যবস্থাগুলোর নাম লিখুন।

ঘ. নদীভাঙ্গনের কারণ ও প্রভাব আলোচনা করুন।

উত্তরমালা

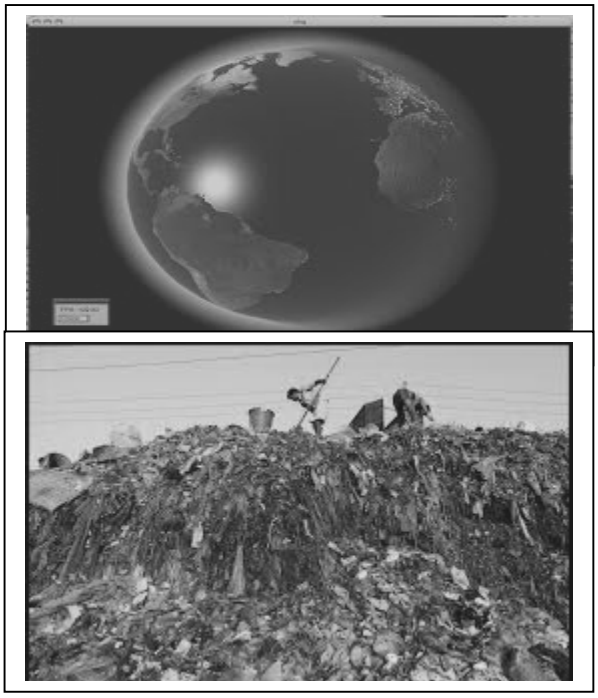
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.১ :	১.ক	২.গ	৩.ক	৪.গ	৫.খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.২ :	১.খ	২.খ	৩.ক	৪. ক	৫.ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৩ :	১. গ	২.খ	৩.গ	৪. ক	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৪ :	১.খ	২.ক	৩. গ	৪. খ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৫ :	১.খ	২.গ	৩. ঘ	৪. ক	৫.গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৬ :	১. গ	২.ঘ	৩.খ	৪. গ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৬.৭ :	১.ক	২.গ			

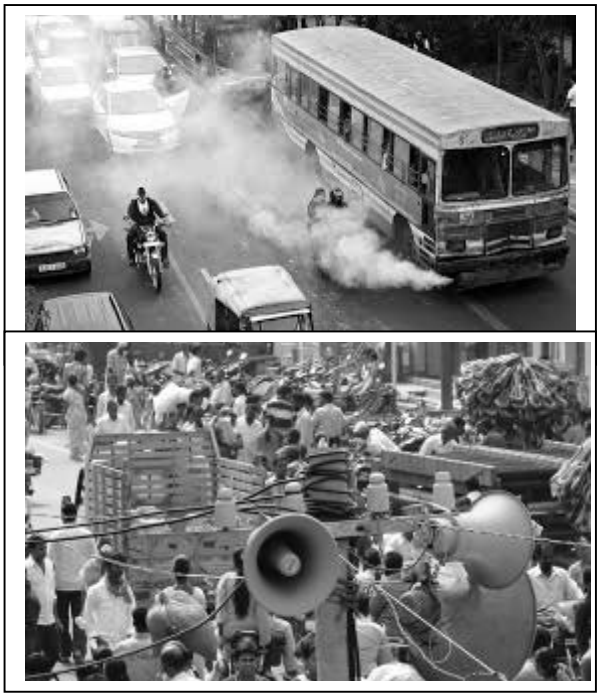
বায়ুমন্ডল এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ দূষণ
(Atmosphere & Natural Environment Pollution)

ইউনিট ৭

ভূমিকা

পৃথিবী পৃষ্ঠের চারপাশে বেষ্টন করে যে অদৃশ্য বায়বীয় আবরণ রয়েছে তাকে বায়ুমন্ডল বলে। এটি ভূ-পৃষ্ঠ হতে উপরের দিকে স্তরে স্তরে সজ্জিত রয়েছে এবং বায়ুমন্ডলের উপাদানগুলো সর্বত্র সমান নয়। বায়ু অদৃশ্য হলেও প্রাণি ও উদ্ভিদের অস্তিত্বের জন্য অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। বায়ুমন্ডলসহ প্রাকৃতিক পরিবেশের আরো কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান মানুষের বহুমুখী কর্মকান্ডের ফলে দূষিত হচ্ছে। ফলে বিনষ্ট হচ্ছে পরিবেশের ভারসাম্য। এই ইউনিটে আমরা বায়ুমন্ডলসহ পানি দূষণ, শব্দ দূষণ, মৃত্তিকা দূষণ প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করব।





ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ ৭.১ : বায়ুমন্ডল এবং গঠনকারী উপাদান
পাঠ ৭.২ : বায়ুমন্ডলের স্তর বিন্যাস
পাঠ ৭.৩ : প্রাকৃতিক পরিবেশ দূষণের কারণ ও ফলাফল
পাঠ ৭.৪ : বায়ু দূষণ
পাঠ ৭.৫ : জীবজগতের উপর বায়ু দূষণের প্রভাব
পাঠ ৭.৬ : বায়ু দূষণ প্রতিরোধের উপায়
পাঠ ৭.৭ : পানি দূষণ
পাঠ ৭.৮ : শব্দ দূষণ
পাঠ ৭.৯ : মৃত্তিকা দূষণ

পাঠ-৭.১ বায়ুমন্ডল এবং গঠনকারী উপাদান (Atmosphere & its Elements)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বায়ুমন্ডল বলতে কী বুঝায় তা বলতে পারবেন এবং
- বায়ুমন্ডলের উপাদানগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।

বায়ুমন্ডল

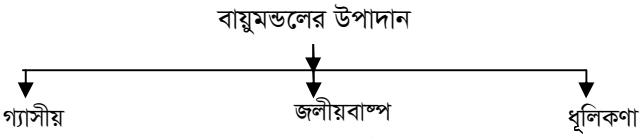
পৃথিবী পৃষ্ঠের চারপাশে বেষ্টন করে যে অদৃশ্য বায়বীয় আবরণ রয়েছে তাই হলো বায়ুমন্ডল। বায়ুমন্ডলের ইংরেজি প্রতিশব্দ Atmosphere। বায়ুমন্ডল পৃথিবীর অপরিহার্য অংশ। এটি আমরা দেখতে পাইনা কিন্তু অনুভব করতে পারি। বায়ুমন্ডল মাধ্যাকর্ষণ শক্তির ফলে পৃথিবীর গায়ের সাথে লেগে থাকে এবং আবর্তন করে। তবে বায়ু কঠিন ভূমির সাথে সমানভাবে চলতে না পারায় সামান্য পশ্চাতে পড়ে থাকে। বিজ্ঞানীগণের ধারণা, বায়ুমন্ডলের বয়স প্রায় ৩৫০ কোটি বছর। বায়ুমন্ডল ভূ-অভ্যন্তরের নির্গত গ্যাস থেকে উৎপত্তি লাভ করেছে। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে উপরের দিকে মাত্র ৩০ কিলোমিটারের মধ্যে বায়ুমন্ডলের ৯০ শতাংশ অবস্থান করছে। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে উপরের দিকে প্রায় ১০,০০০ কিলোমিটার পর্যন্ত বায়ুমন্ডল বিস্তৃত।

বায়ুমন্ডলের উপাদান (Elements of Atmosphere) : বায়ুমন্ডল বিভিন্ন প্রকার গ্যাসীয় পদার্থ ও জলীয়বাষ্পের সংমিশ্রনে গঠিত। বায়ুমন্ডলের প্রধান দুটি উপাদান হলো নাইট্রোজেন (৭৮.০২%) এবং অক্সিজেন (২০.৭১%), যা মোট উপাদানগুলোর প্রায় ৯৯%। অবশিষ্ট ১% অন্যান্য উপাদান। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে উপরের দিকে প্রায় ৯০ কিলোমিটার পর্যন্ত বায়ুমন্ডলের উপাদানগুলো প্রায় একই রকম থাকে যা সমমন্ডল (Homosphere) নামে পরিচিত। আর ভূ-পৃষ্ঠ সংলগ্ন এই ৯০ কিলোমিটারের ঊর্ধ্বে বায়ুমন্ডলের যে অংশ রয়েছে সেখানে বিভিন্ন গ্যাসের অনুপাত সমান থাকে না বলে তাকে বিষমমন্ডল (Heterosphere) বলে। সারণি ৭.১.১ এ বায়ুমন্ডলের উপাদানগুলো দেখানো হলো।

সারণি-৭.১.১: এ বায়ুমণ্ডলের উপাদানের পরিমাণ

উপাদানের নাম	শতকরা অংশ
নাইট্রোজেন (N_2)	৭৮.০২
অক্সিজেন (O_2)	২০.৭১
আরগণ (Ar)	০.৮০
কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2)	০.০৩
ওজোন (O_3)	০.০০০১
অন্যান্য গ্যাস (যেমন- নিয়ন, হিলিয়াম, ক্রিপটন, জেনন, নাইট্রাস অক্সাইড)	০.০১৯৯
জলীয়বাষ্প	০.৪১
ধূলিকণা ও কনিক্স	০.০১
মোট	১০০.০০

বায়ুমন্ডল গঠনকারী উপাদানগুলোকে তিনটি ভাগে ভাগ করা করা যায়। যথা-



ক. গ্যাসীয় উপাদান (Composition of Gases) : বায়ুমন্ডলের গ্যাসীয় উপাদানগুলো নিম্নরূপ :

১. নাইট্রোজেন (Nitrogen) : নাইট্রোজেন বায়ুমন্ডলে নিষ্ক্রিয় গ্যাস হিসেবে অবস্থান করে। এটি ধ্রুব (Constant) গ্যাস যা অপরিবর্তনীয়। বায়ুমন্ডলের নাইট্রোজেন অক্সিজেনের দ্রাবক হিসেবে কাজ করে। এর দ্বারা বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়ার ক্রিয়া পরিবর্তিত এবং যৌগ গঠিত হয়, যা খাদ্য উৎপাদন ও অঙ্গজ গঠনে উদ্ভিদজগতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এছাড়া জীবজগতের প্রোটিন জাতীয় খাদ্য প্রস্তুত করতে সাহায্য করে। নাইট্রোজেন সরাসরি কোনো প্রাণি কিংবা উদ্ভিদকে বাঁচিয়ে রাখে না। তবে নাইট্রোজেন ছাড়া কোনো প্রাণি কিংবা উদ্ভিদ বাঁচতে পারে না।

২. অক্সিজেন (Oxygen) : অক্সিজেন একটি সক্রিয় গ্যাস। কারণ এটি অন্য মৌলের সাথে সহজেই যৌগ গঠন করে। প্রাণির জীবনধারণের জন্য অক্সিজেন অপরিহার্য। এটি প্রাণির শ্বাস গ্রহণ এবং শক্তি ও উত্তাপ বৃদ্ধির কাজে ব্যবহৃত হয়। অক্সিজেনের ব্যাপক ব্যবহারের পরও বায়ুমন্ডলে এর পরিমাণ প্রায় একই রকম থাকে।

৩. কার্বন ডাই-অক্সাইড (Carbon di-Oxide) : বায়ুমন্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ মাত্র ০.০৩% হলেও এর গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ উদ্ভিদের সালোকসংশে□ষণ (Photosynthesis) প্রক্রিয়ায় খাদ্য উৎপাদনের জন্য আবশ্যকীয় উপাদান কার্বন ডাই-অক্সাইড। এছাড়া তাপ শোষণ ও জলবায়ু নিয়ন্ত্রণেও এটি ভূমিকা রাখে। ভূ-পৃষ্ঠের সর্বত্র কার্বন ডাই-অক্সাইড এর পরিমাণ সমান থাকে না। মানুষের বিভিন্নমুখী কর্মকান্ড যেমন- কাঠ, কয়লা, খনিজ তেল প্রভৃতি জ্বালানি হিসেবে ব্যবহারের ফলে এর পরিমাণ স্থির না থেকে হ্রাস-বৃদ্ধি হয়।

৪. ওজোন (Ozone) : ওজোন বায়ুমন্ডলের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এটি অক্সিজেনের তিনটি পরমাণু দ্বারা গঠিত। পৃথিবীতে বসবাসকারী জীবজগতের জন্য ওজোন স্তর গুরুত্বপূর্ণ। এ গ্যাসটি সূর্যরশ্মির অতি বেগুনি রশ্মি বা Ultra Violet Rays শোষণ করে পৃথিবীকে প্রাণির বসবাসের উপযোগী করে রাখে। সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মি ক্ষতিকর ক্যান্সার ও বিভিন্ন রোগ সৃষ্টি করতে পারে যা জীবজগতের জন্য ক্ষতির কারণ।

৫. অন্যান্য গ্যাসসমূহ (Other Gases) : অন্যান্য গ্যাসের মধ্যে আর্গন, নিয়ন, হিলিয়াম, ক্রিপটন, জেনন, হাইড্রোজেন, রেডন, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড হলো নিষ্ক্রিয়। এসব গ্যাস কোনো রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে না।

খ. জলীয়বাষ্প (Water Vapour) : বায়ুমন্ডলের গুরুত্বপূর্ণ এ উপাদানটি সাধারণত নিম্নস্তরে থাকে। তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে বাতাসের জলীয়বাষ্প ধারণ ক্ষমতা বাড়ে এবং তাপমাত্রা কমে গেলে জলীয়বাষ্প ধারণ ক্ষমতা কমে যায়। এছাড়া অঞ্চল বা ঋতুভেদেও জলীয়বাষ্পের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। জলীয়বাষ্পের অণুগুলো নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন অণুগুলোর অনুরূপ বাতাসে ঘুরে বেড়ায়। জলীয়বাষ্পের প্রভাবে মেঘ, বৃষ্টি, তুষার, শিশির, কুয়াশা, ঝড় ইত্যাদি সৃষ্টি হয় যা পৃথিবী পৃষ্ঠে জলবায়ুগতভাবে বিশেষ প্রভাব ফেলে।

গ. ধূলিকণা (Dust) : বায়ুমন্ডলের নিম্নস্তরে অতি সূক্ষ্ম ধূলিকণা রয়েছে। এগুলো অন্যান্য গ্যাসের অণুর ন্যায় ভেসে বেড়ায়। ধূলিকণা, সাধারণত আগ্নেয়গিরির শিলাচূর্ণ ও ছাই, কল-কারখানার পোড়া ছাই, কয়লার গুড়া ও ধোঁয়া ইত্যাদি থেকে সৃষ্টি হয়ে বায়ুমন্ডলে মিশে যায়। বায়ুমন্ডলের ধূলিকণা জলীয়বাষ্পকে জলকণায় রূপান্তরিত হতে সাহায্য করে। এছাড়া ধূলিকণা বায়ুমন্ডলকে উত্তপ্ত হতে সাহায্য করে এবং সূর্যরশ্মির তাপ শোষণ করে সৌরতাপ বন্টনে সহায়তা করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	বায়ুমন্ডলে কীভাবে ধূলিকণা যুক্ত হয় তা লিখুন।

সারসংক্ষেপ

পৃথিবীর চারপাশে বেষ্টন করে যে অদৃশ্য বায়বীয় আবরণ রয়েছে তাকে বায়ুমন্ডল বলে। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির ফলে বায়ুমন্ডল পৃথিবীর সাথে লেগে থাকে। বায়ুমন্ডল বিভিন্ন উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত। এসব উপাদানকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- ক. গ্যাসীয়, খ. জলীয়বাষ্প এবং গ. ধূলিকণা। বায়ুমন্ডলের উপাদানগুলোর পরিমাণগত পার্থক্যের উপর পৃথিবীর তাপমাত্রা হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। বায়ুমন্ডল অদৃশ্য হলেও প্রাণির অস্তিত্বের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। বায়ুমন্ডলের আনুমানিক বয়স কত বছর?
(ক) ৩৫০ কোটি (খ) ৪০০ কোটি (গ) ৪৫০ কোটি (ঘ) ৫০০ কোটি

২। কোনটি নিষ্ক্রিয় গ্যাস?
(ক) নিয়ন (খ) মিথেন (গ) হিলিয়াম (ঘ) সবগুলো

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

আমাদের চারপাশে একটি অদৃশ্য প্রাকৃতিক উপাদান বিদ্যমান। জীবজগতের শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য যে উপাদান প্রয়োজন হয় তা এখান থেকেই পাওয়া যায়। অদৃশ্য এই প্রাকৃতিক সম্পদটি বিভিন্ন উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত যার পরিমাণ ভিন্ন ভিন্ন।

৩। উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রাকৃতিক সম্পদটি কী?
(ক) পানি (খ) বায়ু (গ) ওজোন (ঘ) কার্বন মনোঅক্সাইড

৪। বায়ুমন্ডলে কোন উপাদানটির পরিমাণ সবচেয়ে বেশি?
(ক) কার্বন ডাই-অক্সাইড (খ) অক্সিজেন (গ) মিথেন (ঘ) নাইট্রোজেন

পাঠ-৭.২ বায়ুমন্ডলের স্তর বিন্যাস (Layers of the Atmosphere)

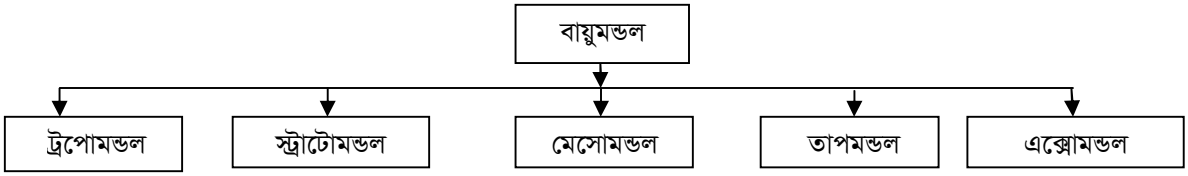
উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বায়ুমন্ডলের স্তরসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- ওজোন স্তর সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বায়ুমন্ডলের স্তর বিন্যাস

বায়ুমন্ডল বিভিন্ন স্তরে স্তরে সজ্জিত। বায়ুমন্ডলের স্তরসমূহের মধ্যে সর্বনিম্ন স্তর থেকে উপরের দিকে ক্রমশ লঘু হয়। উলম্বভাবে (Vertically) বায়ুর তাপমাত্রার বিন্যাসের ভিত্তিতে বায়ুমন্ডলকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-



বায়ুমন্ডলের উপরিউক্ত স্তরগুলোর মধ্যে প্রথম তিনটি (ট্রপোমন্ডল, স্ট্রাটোমন্ডল ও মেসোমন্ডল) সমমন্ডলের অন্তর্ভুক্ত এবং শেষের দুইটি (তাপমন্ডল ও এক্সোমন্ডল) বিষমমন্ডলের অন্তর্ভুক্ত। নিম্নে বায়ুমন্ডলের স্তরগুলো বর্ণনা করা হলো।

১. ট্রপোমন্ডল (Troposphere) : ট্রপোমন্ডল বায়ুমন্ডলের সর্বনিম্ন অর্থাৎ ভূ-পৃষ্ঠ সংলগ্ন স্তর। ভূ-পৃষ্ঠ সংলগ্ন হওয়ায় এ স্তর জীবজগতের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। মেরু এলাকায় এ স্তরের গভীরতা প্রায় ৮ কিলোমিটার এবং নিরক্ষীয় এলাকায় ১৬ থেকে ১৯ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। ট্রপোমন্ডলে বায়ুর গড় গভীরতা প্রায় ১৫ কিলোমিটার। এ স্তরের জলীয়বাষ্প এবং ধূলিকণা অশান্ত বায়ুর সাথে মিশ্রিত হয়ে মেঘ, ঝড়, বৃষ্টি, বজ্রবিদ্যুৎ প্রভৃতি সৃষ্টি করে। ফলে আবহাওয়ার বিভিন্ন পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয় এবং এই স্তরেই আবহাওয়া ও জলবায়ুর সব রকমের বৈচিত্র্য দেখা যায়। এ মন্ডলটিকে ক্ষুদ্রমন্ডলও বলা হয়ে থাকে। এ স্তরে উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে সাথে উপরের দিকে তাপমাত্রা ক্রমাগত হ্রাস পেতে থাকে। উষ্ণতা হ্রাসের এ হার প্রতি কিলোমিটারে ৬.৫° সেলসিয়াস যা স্বাভাবিক তাপ হ্রাস হার (Normal Lapse Rate বা Environmental Lapse) নামে পরিচিত। ট্রপোমন্ডলে বায়ুর ঘনত্ব সবচেয়ে বেশি। এ স্তরের শেষ সীমাকে ট্রপোবিরতি (Tropopause) বলে।

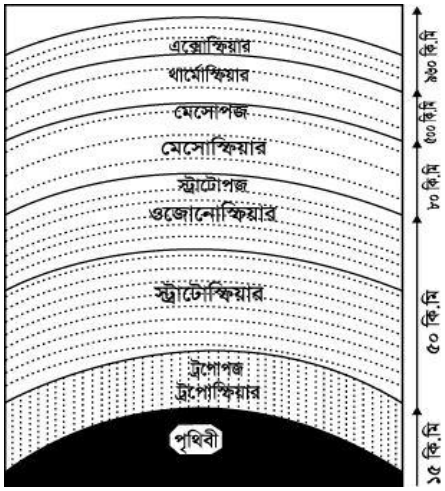
২. স্ট্রাটোমন্ডল (Stratosphere) : বায়ুমন্ডলের দ্বিতীয় স্তরটি হলো স্ট্রাটোমন্ডল। যা ভূ-পৃষ্ঠ থেকে উপরের দিকে প্রায় ৫০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। এ স্তরের শেষ সীমা স্ট্রাটোবিরতি (Stratopause)। এ স্তরে ২০ কিলোমিটার উচ্চতা পর্যন্ত তাপমাত্রার কোনো পরিবর্তন হয় না। এরপর ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে এবং পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে। স্ট্রাটোবিরতিতে তাপমাত্রা ০° সেলসিয়াস বা এর কাছাকাছি হয়। এ স্তরে বায়ুর ঘনত্ব ও চাপ উভয়ই কম।

স্ট্রাটোমন্ডলে জলীয়বাষ্প ও ধূলিকণার পরিমাণ খুব নগন্য এবং প্রায় মেঘশূন্য থাকে। এ স্তরে বাতাস অত্যন্ত হালকা। বাতাসের ঊর্ধ্ব বা নিম্ন গতি নেই, তবে সমান্তরাল গতি দেখা যায়। স্ট্রাটোমন্ডলে ঝড়-বৃষ্টি থাকে না বলে এ স্তরের মধ্য দিয়েই সাধারণত বিমান চলাচল করে থাকে। স্ট্রাটোমন্ডলের উপরের দিকে ওজোন (ozone) গ্যাসের স্তর রয়েছে যা ওজোন মন্ডল বা Ozonesphere নামে পরিচিত। এ স্তরটির গভীরতা ১২-১৬ কিলোমিটার। ওজোন স্তর সূর্যরশ্মির অতি বেগুনি রশ্মি (Ultral Violet Rays) শোষণ করে। জীবজগতের জন্য সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি খুবই ক্ষতিকর। তবে এটি ওজোন স্তর ভেদ করে পৃথিবীতে পৌঁছাতে পারে না। এ স্তর সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মি শোষণ করায় তাপমাত্রা (প্রায় ৭৬° সেলসিয়াস) অনেক বেশি।

৩. মেসোমন্ডল (Mesosphere) : স্ট্রাটোবিরতির পর থেকে অর্থাৎ ভূ-পৃষ্ঠের উপরের ৫০ কিলোমিটার থেকে ৮০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত স্তরটি মেসোমন্ডল। এ স্তরে বায়ুর চাপ অত্যন্ত কম এবং মেঘ ও জলীয়বাষ্পহীন। এ স্তরে ৫০ কিলোমিটার উচ্চতায় বায়ুর চাপ ১ মিলিবার থেকে কমে ৯০ কিলোমিটার উচ্চতায় এর মান দাঁড়ায় ০.০১ মিলিবার। এ স্তরের শুরু থেকেই উষ্ণতা হ্রাস পেতে থাকে এবং শেষ সীমা অর্থাৎ মেসোবিরতিতে (Mesopause) প্রায় ৯০° সেলসিয়াসে নেমে আসে।

৪.তাপমণ্ডল (Thermosphere) : ভূ-পৃষ্ঠ থেকে উপরের দিকে ৮০ কিলোমিটার ঊর্ধ্বসীমা থেকে অর্থাৎ মেসোবিরতি থেকে তাপমন্ডলের শুরু।এ স্তরের উপরের সীমা ৫০০ কি.মি পর্যন্ত। এখানে বায়ুমন্ডল অত্যন্ত হালকা এবং বায়ুচাপ ক্ষীণ। তাপমন্ডলের ১০০ থেকে ৩০০ কি.মি উচ্চতায় অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন পরমাণু অত্যন্ত ছোট তরঙ্গমাপের সৌরশক্তি শোষণ করায় উষ্ণতা প্রায় ১০০০° সেলসিয়াস পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে। তাপমন্ডলে আয়নিত এ অংশ আয়নমন্ডল (Ionosphere) নামে পরিচিত। আয়নমন্ডল মূলত মেসোমন্ডলের ঊর্ধ্বাংশ থেকে তাপমন্ডলের নিম্নাংশ (৫০ থেকে ১০০ কিলোমিটার) পর্যন্ত সম্প্রসারিত। আয়নমন্ডলে বেতার তরঙ্গ প্রতিফলিত হয়ে ভূ-পৃষ্ঠে ফিরে আসে।

৫. এক্সোমন্ডল (Exosphere) : তাপমন্ডলের উপরে ৯৬০ কিলোমিটার পর্যন্ত যে বায়ুস্তর রয়েছে তাকে এক্সোমন্ডল বলে। এই স্তরে হিলিয়াম এবং হাইড্রোজেন গ্যাসের পরিমাণ সর্বাধিক। এ মন্ডলে তাপমাত্রা ৩০০° থেকে ১৬৫০° সেলসিয়াস পর্যন্ত হয়। এ স্তরে সামান্য পরিমাণে আর্গন, হিলিয়াম,অক্সিজেন প্রভৃতি রয়েছে।



চিত্র-৭.২.১: বায়ুমন্ডলের বিভিন্ন স্তর

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মিগুলো বায়ুমন্ডল ভেদ করে পৃথিবী পৃষ্ঠে পৌঁছাতে পৌঁছাতে দুর্বল হয়ে পড়ে। যদি বায়ুমন্ডল না থাকতো তাহলে সূর্যের ক্ষতিকর রশ্মিগুলো পৃথিবীতে সরাসরি পৌঁছাতো এবং সেক্ষেত্রে ভূ-পৃষ্ঠের তাপমাত্রা দিনের বেলায় হতো প্রায় ৭০° সে. এবং রাতের বেলায় ১৪৫° সে.। ফলে পৃথিবীতে জীবের অস্তিত্ব কল্পনাও করা যেতো না।

শিক্ষার্থীর কাজ	বায়ুমন্ডলের স্তরগুলো একটি চিত্র অঙ্কন করে চিহ্নিত করুন এবং গভীরতা দেখান।

সারসংক্ষেপ

বায়ুমন্ডল যেসব উপাদানগুলো দ্বারা গঠিত সেগুলোর পরিমাণগত ভিন্নতার কারণে বায়ুর চাপ ও ঘনত্বে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এই উপাদানগুলো নিম্নস্তরে অপেক্ষাকৃত বেশি এবং যতই উপরের দিকে উঠা যায় ততই চাপ ও ঘনত্ব কমতে থাকে। ফলে তাপমাত্রার তারতম্য ঘটে। তাপমাত্রার তারতম্যের ভিত্তিতে বায়ুমন্ডলকে প্রধানত পাঁচটি স্তরে ভাগ করা যায়। এগুলো হলো- ট্রপোমন্ডল, স্ট্রাটোমন্ডল, মেসোমন্ডল, তাপমন্ডল এবং এক্সোমন্ডল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ট্রপোমন্ডলে বায়ুর তাপ হ্রাস হার প্রতি কিলোমিটারে কত?
(ক) ৬.৫° সে. (খ) ৫.৫° সে. (গ) ৪.৫° সে. (ঘ) ৩.৫° সে.

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২ ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।
সালমা ও সুমন তাদের পরিবারের সাথে সমুদ্র সৈকত দেখার জন্য বিমানে কক্সবাজার ভ্রমণ করলেন। বিমানটি আকাশে উড়ার পরে তারা বাইরে তাঁকিয়ে সাদা মেঘ দেখে অভিভূত হলেন।

২। কোন স্তরে মেঘ, ঝড়, বৃষ্টি সংঘটিত হয়?
(ক) ট্রপোমন্ডল (খ) স্ট্রাটোমন্ডল (গ) মেসোমন্ডল (ঘ) তাপমন্ডল

৩। কোন স্তর দিয়ে বিমান চলাচল করে থাকে?
(ক) ট্রাপোমন্ডল (খ) স্ট্রাটোমন্ডল (গ) মেসোমন্ডল (ঘ) তাপমন্ডল

৪। বেতার তরঙ্গ প্রতিফলিত হয়-
(ক) ট্রপোবিরতিতে (খ) স্ট্রাটোবিরতিতে (গ) মেসোবিরতিতে (ঘ) আয়নমন্ডলে

পাঠ-৭.৩ প্রাকৃতিক পরিবেশ দূষণের কারণ ও ফলাফল (Causes & Effects of Natural Environment Pollution)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- পরিবেশ বলতে কী বুঝায় তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং
- প্রাকৃতিক পরিবেশ দূষণ ও দূষণের ফলাফল বর্ণনা করতে পারবেন।

প্রাকৃতিক পরিবেশ

আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে তা নিয়েই পরিবেশ এবং প্রকৃতি নিয়ে যে পরিবেশ তাই হলো প্রাকৃতিক পরিবেশ। বর্তমান বিশ্বে প্রকৃতিকে মানুষ যেভাবে ব্যবহার করছে তার প্রভাবে পরিবেশে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হচ্ছে। মানব সভ্যতার ইতিহাসে বর্তমানকালে পরিবেশ যেভাবে বিপন্ন হওয়ার মুখে তা পূর্বে এতটা আলোচিত হয়নি। অবশ্য এই আলোচনার পিছনে মানুষের সচেতনতাও কাজ করছে।

পরিবেশ দূষণ (Environment Pollution)

পরিবেশে জীবের স্বাভাবিক অবস্থা বা জীবনযাত্রায় বিঘ্ন সৃষ্টিতে সক্ষম ক্ষতিকর অবস্থার নাম দূষণ। অন্যদিকে পানি, বাতাস, মৃত্তিকা বা পরিবেশের কোনো উপাদানের ভৌত, রাসায়নিক বা জৈবিক যে কোনো ধরনের অনাকাঙ্খিত পরিবর্তনই প্রাকৃতিক পরিবেশ দূষণ। মানুষের বহুমুখী কর্মকান্ডই পরিবেশ দূষণের সবচেয়ে বড় কারণ।

প্রাকৃতিক পরিবেশ দূষণের কারণ (Causes of Natural Environment Pollution) : প্রাকৃতিক পরিবেশ দূষণের কারণসমূহকে দুইটি ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারে। যথা-

ক. প্রাকৃতিক কারণ এবং খ. মানবসৃষ্ট কারণ।

ক. প্রাকৃতিক কারণ (Natural Causes) : প্রাকৃতিক পরিবেশ দূষণের উল্লেখযোগ্য প্রাকৃতিক কারণসমূহ নিম্নরূপ :

১. বন্যা ও খরা : বন্যার ফলে বিস্তীর্ণ এলাকায় মলমূত্র ও মৃত জীবজন্তু মিশে একাকার হয়ে যায়। ফলে পরিবেশ দূষিত হয় এবং ডায়রিয়া, কলেরা, আমাশয় প্রভৃতি রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। আবার খরা হলে জলজ প্রাণি এবং জীবজন্তু মরে দূষণ ঘটে।

২. ভূমিকম্প : ভূমিকম্পের কারণে মানুষ, জীবজন্তু, গাছপালা ও মাটি চাপা পড়ে পরিবেশ দূষণ ঘটায়।

৩. ঘূর্ণিঝড় : কোনো এলাকায় ঘূর্ণিঝড় বা সাইক্লোন হলে উক্ত এলাকায় জীবন ও সম্পদের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। জীবজন্তুর দেহাবশেষে পচন ধরে পরিবেশ দূষিত হয়।

৪. আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত : আগ্নেয়গিরির উদ্গীরণের ফলে বিস্তীর্ণ এলাকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আগ্নেয়গিরির চারপাশে পুড়ে যায়, ভূমিধ্বস হয় এবং মানুষ ও পশুপাখি প্রভৃতি মারা যায়। এতেও পরিবেশ দূষিত হয়।

উপরিউক্ত কারণগুলো ছাড়াও মহামারি, জলোচ্ছ্বাস প্রভৃতি কারণেও প্রাকৃতিক পরিবেশ দূষিত হয়।

খ. মানবসৃষ্ট কারণ (Man-made Causes) : প্রাকৃতিক পরিবেশ দূষণের মানবসৃষ্ট কারণগুলো নিম্নরূপ :

১. গাছপালা নিধন : পরিবেশের ভারসাম্যে রক্ষার জন্য গাছপালা আবশ্যকীয় উপাদান। কিন্তু মানুষ তার প্রয়োজনের তাগিদে বা অনেক সময় অপ্রয়োজনে গাছপালা নিধন করে পরিবেশের ক্ষতি করছে।

২. পাহাড় কর্তন : পাহাড় কর্তন বর্তমান সময়ে একটি বড় সমস্যা। অনেকেই অবৈধভাবে পাহাড় কর্তন করে। ফলে পাহাড়ি এলাকায় পরিবেশ নষ্ট হয়।

৩. অপরিকল্পিত নগরায়ন : প্রাকৃতিক পরিবেশ দূষণের অন্যতম কারণ অপরিকল্পিত নগরায়ন। গ্রামীন এলাকা থেকে মানুষ কর্মের সন্ধানে নগরে ছুটে আসে। ফলে অত্যধিক মানুষের চাপে নগরীয় পরিবেশ দূষিত হয়।

৪. কীটনাশক ব্যবহার : কৃষিকাজে অধিক হারে কীটনাশক ব্যবহারের ফলে পানির সাথে কীটনাশক মিশে পানি দূষণ ঘটায়।

৫. **ভূ-গর্ভস্থ পানি আহরণ :** ভূ-গর্ভস্থ পানি অধিক হারে উত্তোলনের কারণে পানিতে আর্সেনিকের মাত্রা বেড়ে যেতে পারে এবং উক্ত এলাকা মরুময় হয়ে যেতে পারে। ফলে পরিবেশ দূষণ ঘটে।

৬. **শিল্প বর্জ্য :** শিল্প প্রতিষ্ঠানের অপরিশোধিত বর্জ্য যত্রতত্র নিষ্কাষণের ফলে পরিবেশ দূষণ ঘটে। এছাড়া কল-কারখানা থেকে নির্গত কালো ধোঁয়া পরিবেশ দূষিত করে।

৭. **জ্বালানি দহনের নির্গত ধোঁয়া :** যানবাহন, ইটভাটা, বিদ্যুৎ উৎপাদন প্রভৃতিতে ব্যবহৃত কয়লা, পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন, পারমানবিক জ্বালানি, কাঠ প্রভৃতি থেকে নির্গত ক্ষতিকর ধোঁয়া ও গ্যাসের মাধ্যমে পরিবেশ দূষিত হয়।

উপরিউক্ত কারণগুলো ছাড়াও ত্রুটিপূর্ণ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, যত্রতত্র মলমূত্র ত্যাগ, জলাভূমি ভরাট প্রভৃতি মানব সৃষ্ট কারণে প্রাকৃতিক পরিবেশ দূষিত হয়ে থাকে।

পরিবেশ দূষণের ফলাফল : পরিবেশ দূষিত হলে সার্বিকভাবে প্রাণি ও উদ্ভিদজগতের উপর প্রভাব পড়বে। ইতোমধ্যে প্রাকৃতিক পরিবেশের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান যেমন- বায়ু, পানি, মৃত্তিকা দূষণমাত্রা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

আমাদের চারপাশের দূষিত পরিবেশ জনজীবনকে দুর্বিষহ করে তুলছে এবং বিভিন্ন ধরনের রোগ-ব্যাধি ছড়াচ্ছে। প্রাকৃতিক পরিবেশ দূষণের ফলাফল দুইটি উদাহরণের মাধ্যমে জানার চেষ্টা করব। যেমন- কল-কারখানা, যানবাহন বা ইটভাটার কালো ধোঁয়া বায়ুকে দূষিত করে। আর উক্ত বায়ু শ্বাস গ্রহণের সময় শরীরে প্রবেশ করে রক্ত চলাচল বিঘ্ন ঘটায়। সর্দি-কাশির প্রকোপ বৃদ্ধি পায়, শ্বাস গ্রহণে বিঘ্ন ঘটে এবং বিভিন্ন রকম শারীরিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। আবার চামড়া শিল্পে কাঁচা চামড়া পচন রোধ করার জন্য চামড়ার ভিতরে ভাঁজে ভাঁজে লবণ দেয়া হয়। যখন এই চামড়া ধোঁয়া হয় তখন দুর্গন্ধযুক্ত ক্ষারকীয় পানি বের হয়। এগুলো বাতাস ও পানির সাথে মিশ্রিত হয়ে পরিবেশ দূষণ ঘটায়। যা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর।

সুতরাং বলা যায় যে, প্রাকৃতিক পরিবেশ দূষণের ফলে প্রাণি ও উদ্ভিদজগতের স্বাভাবিক প্রক্রিয়া ব্যাহত হচ্ছে। এই ইউনিটের পরবর্তী পাঠগুলোতে প্রাকৃতিক পরিবেশের উল্লেখযোগ্য উপাদানসমূহের দূষণ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	আপনার এলাকায় প্রাকৃতিক পরিবেশ কীভাবে দূষিত হচ্ছে তা একটি ছকের মাধ্যমে তুলে ধরুন।

সারসংক্ষেপ

আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে তা নিয়েই আমাদের পরিবেশ। পরিবেশের উপাদানগুলো পরিবর্তিত হলে মানুষের উপর বিরূপ প্রভাব পড়ে। মানুষের বহুমুখী কর্মকান্ডের ফলে পরিবেশের উপাদানগুলো ক্রমাগতভাবে দূষিত হচ্ছে। পরিবেশ দূষিত হলে বিভিন্ন প্রকার রোগ-ব্যাধির প্রাদুর্ভাব ঘটে এবং প্রাণি ও উদ্ভিদজগতের স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় বিঘ্ন ঘটে। তাই বর্তমানে পরিবেশ দূষণ এবং এর ক্ষতিকর প্রভাব বৈশ্বিক সমস্যা হিসেবে দেখা দিয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। প্রাকৃতিক পরিবেশ দূষণের প্রধান কারণগুলোকে কতটি ভাগে ভাগ করা যায়?

(ক) ২ (খ) ৩ (গ) ৪ (ঘ) ৫

২। প্রাকৃতিক পরিবেশ দূষণের উদাহরণ হলো-

i. বায়ু ii. পানি iii. ভবন

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩। পরিবেশ দূষণের কৃত্রিম কারণ কোনটি?

(ক) বন্যা (খ) খরা (গ) পাহাড় কর্তন (ঘ) ঘূর্ণিঝড়

পাঠ-৭.৪ বায়ু দূষণ (Air Pollution)

উদ্দেশ্য

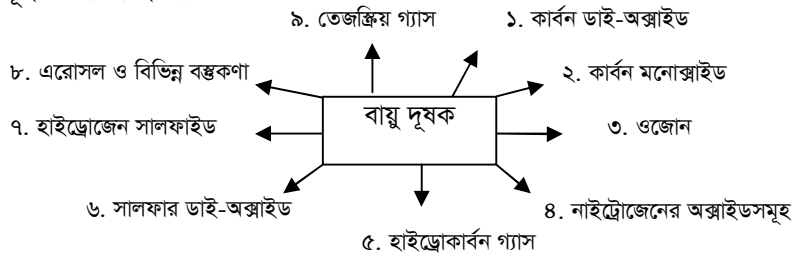
এ পাঠ শেষে আপনি-

- বায়ু দূষণ ও বায়ুর দূষকসমূহের নাম বলতে পারবেন;
- বায়ু দূষণের কারণ বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- বাংলাদেশে বায়ু দূষণ মাত্রা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বায়ু দূষণ

প্রাকৃতিক পরিবেশের উপাদানগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো বায়ু বা বাতাস। প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট কারণে বাতাস তার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য থেকে পরিবর্তিত হচ্ছে। অথচ জীবনধারণের জন্য বায়ু অত্যাবশ্যক। বায়ু না থাকলে পৃথিবী শূন্যতায় পর্যবসিত হতো। World Health Organization (WHO) বা বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মতে, ''পৃথিবীর বায়ুমন্ডলের মধ্যে অনিষ্টকর পদার্থের সমাবেশ যখন মানুষ ও তার পরিবেশের ক্ষতি করে সেই অবস্থাকে বায়ু দূষণ বলে''। অন্যান্য দূষণের চেয়ে বায়ু দূষণের পরিধি এবং ব্যাপকতা সবচেয়ে বেশি। কারণ বাতাস স্বল্প সময়ে দূষিত পদার্থকে চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিতে পারে।

বায়ুর দূষকসমূহ (Pollutants of Air) : বায়ুর দূষক হিসেবে কতিপয় গ্যাস ও পদার্থ শনাক্ত করা হয়েছে। নিম্নের ছকে বায়ুর প্রধান দূষকসমূহ দেখানো হলো।



বায়ু দূষণের কারণ (Causes of Air Pollution) : বায়ু দূষণের কারণসমূহকে দুইটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা- ক. মানব সৃষ্ট কারণ এবং খ. প্রাকৃতিক কারণ।

ক. মানব সৃষ্ট কারণ (Man-made Causes)

১. **জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানো :** ভূ-অভ্যন্তর হতে উত্তোলিত জ্বালানি যেমন-ডিজেল, পেট্রোল, কেরোসিন তেল ইত্যাদি পোড়ানোর কারণে ছোট-বড় বিভিন্ন ধরনের কণা বাতাসে মিশে বায়ু দূষণ ঘটায়। যানবাহন থেকে নির্গত কালো ধোঁয়ায় থাকে কার্বন মনোক্সাইড, কার্বন ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেনের অক্সাইডসমূহ প্রভৃতি গ্যাস যা মানুষের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর।

২. **শিল্প-কারখানার নির্গত ধোঁয়া :** শিল্প-কারখানার নির্গত ধোঁয়ার বিভিন্ন প্রকার গ্যাস ও ধাতব কণা যেমন- কার্বন মনোক্সাইড, কার্বন ডাই-অক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড ইত্যাদি দুর্গন্ধময় বিষাক্ত পদার্থ যা বাতাসের সাথে মিশে বাতাসকে দূষিত করে।

৩. **পরিত্যক্ত বর্জ্য পদার্থের দহন :** বিশেষ করে শহরাঞ্চলে পরিত্যক্ত বর্জ্য পদার্থসমূহ আবর্জনামুক্ত করার জন্য পোড়ানো হয়। এ থেকে নির্গত ধোঁয়াতেও কার্বন মনোক্সাইড, কার্বন ডাই-অক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড ইত্যাদি গ্যাস থাকে যা বাতাসকে দূষিত করে।

৪. **বন উজার :** অপরিকল্পিতভাবে গাছপালা কর্তনের ফলে বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইড এর মাত্রা বেড়ে গিয়ে বাতাসকে দূষিত করে। এতে প্রাণি ও উদ্ভিদের শ্বাসকার্যে ব্যবহৃত অক্সিজেন ও কার্বন ডাই-অক্সাইড এর ভারসাম্য বিনষ্ট হয়।

৫. **তেজস্ক্রিয় পদার্থ :** যুদ্ধক্ষেত্র অথবা পারমানবিক চুল্লিতে দুর্ঘটনার ফলে তেজস্ক্রিয় পদার্থের বিকিরণ হলে বায়ু দূষিত হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ১৯৪৫ সালে হিরোশিমা ও নাগাসাকিতে পারমানবিক বোমার বিস্ফোরণ।

৬. **ইটভাটা :** ইটভাটায় কাঠ ও কয়লা পোড়ানোর ফলে প্রচুর ধোঁয়া নির্গত হয় যা বায়ুর সাথে মিশে দূষণ ঘটায়।

৭. **কৃষিক্ষেত্রে :** কৃষিক্ষেত্রে আগাছা, কীটনাশক, জৈব ফসফেট এবং ক্লোরিনযুক্ত হাইড্রোকার্বন বায়ু দূষণ ঘটায়।

বায়ু দূষণের উপরিউক্ত মানব সৃষ্ট কারণ ছাড়াও ভবন নির্মাণ, খোলা স্থানে আবর্জনা, ধূমপান, লোহা, টায়ার ইত্যাদির দহনে বায়ু দূষিত হয়।

খ. প্রাকৃতিক কারণ (Natural Causes)

১. **আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত :** আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে নির্গত সালফার ডাই-অক্সাইড, কার্বন মনোঅক্সাইড, হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস প্রভৃতি বায়ুর সাথে মিশে বায়ুকে দূষিত করে।

২. **জৈব ও অজৈব পদার্থ :** বিভিন্ন প্রকার জৈব ও অজৈব পদার্থের স্বাভাবিক পচনের ফলে যে গ্যাস সৃষ্টি হয় তা বায়ুকে দূষিত করে।

৩. **দাবানল ও ধূলিঝড় :** বিস্তৃত বনাঞ্চলে দাবানল হলে তা ব্যাপক এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে বায়ুকে দূষিত করে। এছাড়া মরু এলাকায় ধূলিঝড়ও বায়ু দূষণ ঘটায়।

৪. **গ্যাসক্ষেত্রের বিস্ফোরণ :** গ্যাসক্ষেত্র বিস্ফোরণ বা দুর্ঘটনাজনিত কারণে যে গ্যাস ছড়িয়ে পড়ে তা বায়ুকে দূষিত করে।

বাংলাদেশে বায়ু দূষণ মাত্রা

বাংলাদেশের সর্বত্র বায়ু দূষণের মাত্রা একই রকম নয়। গ্রাম্য পরিবেশের তুলনায় শহরের পরিবেশে বায়ু দূষণ মাত্রা বেশি। আবার অন্যান্য শহরের তুলনায় ঢাকা শহরের দূষণের মাত্রা বেশি। শহরাঞ্চলে যানবাহন থেকে নির্গত ধোঁয়া এবং বিভিন্ন প্রকার বর্জ্য থেকে সৃষ্ট গ্যাস মিলিতভাবে বায়ুকে দূষিত করে। ঢাকার বায়ুতে নন-মিথেন হাইড্রোকার্বন, সাসপেনডেড পার্টিকুলেট ম্যাটার (SPM), পার্টিকুলেট ম্যাটার (PM10) এর মাত্রা আদর্শ মানের চেয়ে অনেক বেশি।

ঢাকা শহরের বায়ু দূষণের প্রধান উৎসগুলো হলো যানবাহন থেকে নির্গত দূষিত পদার্থ, রাস্তাঘাট খননের ফলে সৃষ্ট ধূলাবালি, বিভিন্ন ধরনের আবর্জনা ও বর্জ্য, শিল্প প্রতিষ্ঠান থেকে নির্গত দূষিত বর্জ্য ইত্যাদি। ঢাকা শহরের বায়ু দূষণের আরেকটি অন্যতম কারণ যানজট। তবে গ্যাসচালিত যানবাহনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় এর মাত্রা কিছুটা কমেছে। কারণ পেট্রোল বা ডিজেল চালিত গাড়ির চেয়ে সিএনজি চালিত গাড়ির দূষিত পদার্থ নির্গমনের মাত্রা কম। ঢাকা, চট্টগ্রাম, নারায়নগঞ্জ, গাজীপুর প্রভৃতি শহর ব্যতীত অন্যান্য শহরে তুলনামূলক বায়ু দূষণের মাত্রা কম অর্থাৎ শিল্পাঞ্চলগুলোতে বায়ু দূষণের মাত্রা অধিক।

শিক্ষার্থীর কাজ	আপনার শহরের বায়ু দূষণ চিত্র বর্ণনা করুন।

সারসংক্ষেপ

প্রাণি এবং উদ্ভিদজগতের জন্য বায়ুর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। কিন্তু বায়ু বিভিন্নভাবে দূষিত হচ্ছে। বায়ুর দূষকগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো কার্বন ডাই-অক্সাইড, কার্বন মনোঅক্সাইড, ওজোন, নাইট্রোজেনের অক্সাইডসমূহ, এরোসল প্রভৃতি। বায়ু দূষণের অন্যতম কারণ হলো- জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানো, যানবাহন ও কল-কারখানার ধোঁয়া, তেজস্ক্রিয় পদার্থ, ইটভাটা, অগ্ন্যুৎপাত প্রভৃতি। দেশের বিভিন্ন স্থানে বিশেষ করে শহরাঞ্চলে বায়ু দূষণ মাত্রা অধিক।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। বায়ুর দূষক হলো-

i. কার্বন মনোঅক্সাইড ii. ওজোন iii. এরোসল

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, iiও iii.

২। কোনটি বায়ু দূষণ ঘটায়?

(ক) ইটভাটা (খ) বনভূমি (গ) মৃত্তিকা (ঘ) নদী

৩। বায়ু দূষণের প্রাকৃতিক কারণ কোনটি?

(ক) দাবানল (খ) ঘূর্ণিঝড় (গ) অগ্ন্যুৎপাত (ঘ) সবগুলো

পাঠ-৭.৫ জীবজগতের উপর বায়ু দূষণের প্রভাব
(Effects of Air Pollution on Living World)

উদ্দেশ্য

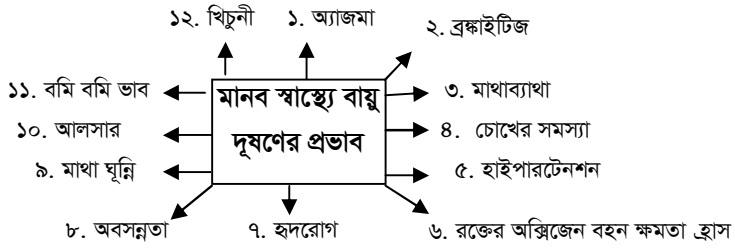
এ পাঠ শেষে আপনি-

- বায়ু দূষণের ফলে প্রাণি ও উদ্ভিদের উপর প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং
- বাস্তুসংস্থানের উপর কী ধরনের প্রভাব পড়ে তা বলতে পারবেন।

জীবজগতের উপর বায়ু দূষণের প্রভাব

জগতের প্রতিটি প্রাণের অস্তিত্বের জন্য অত্যাবশ্যকীয় উপাদান বায়ু। বায়ু দূষণের ফলে জীবজগতের উপর যে প্রভাব পড়ে তা নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

১. মানব স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব : বায়ু দূষণের ফলে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয় মানব স্বাস্থ্য। দূষিত বায়ু গ্রহণের মাধ্যমে শুধুমাত্র শ্বাস-প্রশ্বাসই নয় এর মাধ্যমে জীবনও বিপন্ন হতে পারে। বায়ু দূষণের ফলে শ্বাসনালীতে জ্বালা, কাশি ও দম বন্ধ হয়ে যেতে পারে। বিশেষ করে সালফারের অক্সাইডগুলো ফুসফুসে নানা ধরনের রোগ সৃষ্টির প্রধান কারণ। নাইট্রোজেনের অক্সাইডগুলোর বিষাক্ত প্রতিক্রিয়ায় ফুসফুস ফুলে যায় এবং ফুসফুসে পানি জমে রোগীর মৃত্যুও হতে পারে। অতিমাত্রায় বায়ু দূষণ দীর্ঘস্থায়ী হাঁপানি, শ্বাসনালীর প্রদাহ ও কণ্ঠস্বর ভঙ্গের কারণ হতে পারে। নিম্নের ছকে বায়ু দূষণের ফলে মানব স্বাস্থ্যের আরো যেসব ক্ষতি হতে পারে তা দেখানো হলো।



২. পশুপাখির উপর প্রভাব : দূষিত বায়ু পশুপাখির খাদ্যকে দূষিত করে। পশুপাখি এসব দূষিত খাবার গ্রহণ করলে বিভিন্ন জীবাণু দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং অসুস্থ হয়ে পড়ে।

৩. উদ্ভিদের উপর প্রভাব : দীর্ঘ সময় ধরে বায়ু দূষণ হলে উদ্ভিদের ক্ষতি করে। সালফার ডাই-অক্সাইড (So_2) গাছের ক্লোরোফিলের ক্ষতি করে। ফলে খাদ্য উৎপাদন ক্ষমতা কমে গিয়ে উদ্ভিদের জীবনীশক্তি কমে যায়। বায়ুতে অতিমাত্রায় এ গ্যাস থাকলে পাতার কোষ মরে যায় এবং পাতা শুকিয়ে যায়।

৪. বাস্তুসংস্থানের উপর প্রভাব : দূষিত বায়ু বাস্তুসংস্থানের উপরও প্রভাব ফেলে। বায়ু দূষণ স্থলজ এবং জলজ উভয় প্রকার বাস্তুসংস্থানকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। বায়ু দূষণের আরেকটি উল্লেখযোগ্য প্রভাব হলো এসিড বৃষ্টি (Acid Rain)। এসিড বৃষ্টির ফলে প্রাণি, উদ্ভিদ এবং দালানকোঠার ক্ষতি হয়। এছাড়া বায়ু দূষণ গ্রিন হাউজ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টিরও একটি কারণ।

এই পাঠে জীবজগতের উপর বায়ু দূষণের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা হলো। পরবর্তী পাঠে বায়ু দূষণ প্রতিরোধ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	বায়ু দূষণের ফলে মানব স্বাস্থ্যে যেসব প্রভাব পড়ে তা আপনার এলাকার উদাহরণ দিয়ে বর্ণনা করুন।

সারসংক্ষেপ

জীবজগতের অস্তিত্বের জন্য বায়ু আবশ্যকীয় প্রাকৃতিক উপাদান। এ কারণে বায়ু দূষিত হলে স্বাভাবিকভাবেই জীবজগতের উপর বিরূপ প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন রোগ যেমন- শ্বাসকষ্ট, হৃদরোগ, ফুসফুসে পানি জমা, হাঁপানি, অ্যাজমা, হাইপারটেনশন প্রভৃতি দেখা দেয়। এছাড়া দূষিত বায়ু পশুপাখি, উদ্ভিদ এবং বাস্তুসংস্থানকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। বায়ু দূষণের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ হয়-

i. মানুষ ii. উদ্ভিদ iii. পশুপাখি

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii

(গ) i ও iii (ঘ) i, iiও iii

২। বায়ু দূষণের ফলে কোন রোগটি হয়?

(ক) শ্বাসকষ্ট (খ) আমাশয়

(গ) ডায়রিয়া (ঘ) টাইফয়েড

৩। বায়ু দূষণের উল্লেখযোগ্য প্রভাব হলো-

i. রোগ-ব্যাধি ii. কম বৃষ্টি iii. এসিড বৃষ্টি

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii

(গ) i ও iii (ঘ) i, iiও iii

৪। বায়ুতে অধিক মাত্রায় সালফার থাকলে উদ্ভিদের কী হয়?

(ক) পাতার কোষ মরে যায় (খ) পাতা হলদে হয়ে যায়

(গ) পাতা সবুজ হয় (ঘ) কোনটিই নয়

পাঠ-৭.৬ বায়ু দূষণ প্রতিরোধের উপায়
(Prevention of Air Pollution)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বায়ু দূষণ প্রতিরোধের উপায় বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- বায়ু দূষণ রোধে গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে বলতে পারবেন।

বায়ু দূষণ প্রতিরোধের উপায়

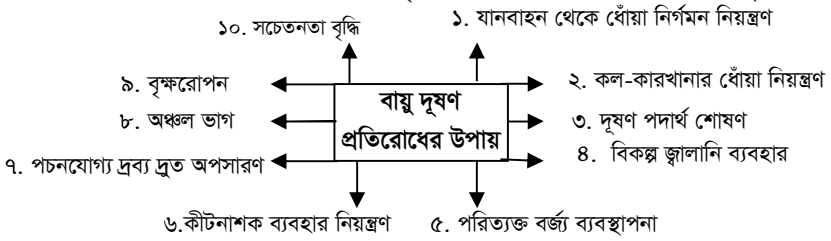
বায়ু আমাদের বেঁচে থাকার জন্য আবশ্যকীয় উপাদান তা পূর্বের পাঠে জেনেছি। বায়ুর গুণগত মান বজায় থাকলে মানব স্বাস্থ্য ভালো থাকে, গাছের বর্ধন যথাযথভাবে হয়, কৃষি ফলন বৃদ্ধি পায়। তাই বায়ু দূষণ প্রতিরোধ করা জরুরি। বায়ু দূষণ প্রতিরোধের প্রথম পদক্ষেপ হলো বায়ুমন্ডলে নির্গমনের পূর্বেই বায়ু দূষক উৎসের নির্গমন নিয়ন্ত্রণ করা। বায়ু দূষণ বিভিন্নভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির প্রয়োগ, জ্বালানি পরিশোধন, মোটরগাড়ি চালনায় জনসচেতনতা প্রভৃতি প্রয়োগ করা যেতে পারে। বায়ু দূষণ প্রতিরোধের উপায়সমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলো।

১. যানবাহন থেকে ধোঁয়া নির্গমন নিয়ন্ত্রণ : যানবাহন থেকে নির্গত বায়ু দূষকগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো কার্বন মনোঅক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড, অদাহ্য হাইড্রোকার্বন। এগুলো নির্গমন নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। এক্ষেত্রে ডিজেল বা পেট্রোল চালিত যানের তুলনায় সিএনজি চালিত যানের দূষণমাত্রা অনেক কম।

২. কল-কারখানার ধোঁয়া নিয়ন্ত্রণ : কল-কারখানার ধোঁয়া নির্গমন নল ও চিমনি থেকে নির্গত বস্তুকণা পৃথক করার জন্য ছাকনি বা অন্য কোনো প্রযুক্তি ব্যবহার করতে হবে। এর ফলে দূষকগুলো বায়ুতে মিশে যাওয়ার পূর্বেই আলাদা হয়ে যাবে।

৩. দূষণ পদার্থ শোষণ : বায়ু দূষণ প্রতিরোধের একটি আধুনিক পদ্ধতি দূষণ পদার্থের শোষণ। এই পদ্ধতিতে দূষক পদার্থগুলো মুক্ত বায়ুতে ছড়িয়ে পড়ার পূর্বেই বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দূষক পদার্থ আলাদা করে নেওয়া যায়।

৪. বিকল্প জ্বালানি প্রয়োগ : বিকল্প জ্বালানি অর্থাৎ প্রচলিত জীবাশ্ম জ্বালানির পরিমাণ ক্রমান্বয়ে হ্রাস করে অপ্রচলিত শক্তি যেমন- সৌরশক্তি, বায়োগ্যাস ইত্যাদির ব্যবহার বৃদ্ধি করতে হবে। এর ফলে বায়ু দূষণ অনেক কমে যাবে।



৫. পরিত্যক্ত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা : বিভিন্ন পরিত্যক্ত বর্জ্য যেগুলো কোনো কাজে লাগেনা সেগুলো না পুড়িয়ে মাটির নিচে পুঁতে ফেলা যেতে পারে।

৬. কীটনাশকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ : যথেচ্ছ মাত্রায় কীটনাশক ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। পরিমিত পরিমাণে কীটনাশকের পাশাপাশি বিকল্প উপায়ে রোগ-ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

৭. পচনযোগ্য দ্রব্য দ্রুত অপসারণ : হাটবাজার, দোকানপাট, বসতবাড়ি প্রভৃতি থেকে পচা বা পচনশীল দ্রব্য দ্রুত অপসারণ করতে হবে। এছাড়া শহরের ডাস্টবিনের ময়লা দীর্ঘ সময় ধরে না রেখে যতদূর সম্ভব তা দ্রুত শোধনাগারে পাঠাতে হবে অথবা মাটিতে পুতে ফেলে বাতাস দূষণ রোধ করতে হবে।

৮. অঞ্চল ভাগ : বড় বড় শহরের আবাসিক, শিল্প, বাণিজ্যিক, অফিস-আদালত প্রভৃতি পরিকল্পিতভাবে স্থাপন করতে হবে। এতে শিল্প-কারখানার দূষিত বাতাস মানব জীবন ও অন্যান্য প্রাণির ক্ষতি করতে পারবে না।

৯. বৃক্ষরোপন : উদ্ভিদ প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করে। উদ্ভিদ জীবজগতের জন্য অক্সিজেন ত্যাগ করে এবং জীবজগতের ত্যাগকৃত কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে ভারসাম্য বজায় রাখে। তাই প্রচুর পরিমাণে বৃক্ষরোপন করতে হবে এবং অন্যদেরও উৎসাহিত করতে হবে।

১০. সচেতনতা বৃদ্ধি : বায়ু দূষণের কুফল সম্পর্কে জনগণকে সচেতন হতে হবে। এক্ষেত্রে জনসচেতনামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে।

বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণে সরকারের গৃহীত কার্যক্রম

সরকার বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণে কাজ করে যাচ্ছে। পরিবেশ অধিদপ্তর বায়ু দূষণ মনিটরিং এর জন্য রাজধানী ঢাকায় ৩টি, চট্টগ্রামে ২টি এবং গাজীপুর, নারায়নগঞ্জ, রাজশাহী, খুলনা, সিলেট ও বরিশালে একটি করে মোট ১১টি সার্বক্ষণিক বায়ুমান পরিবীক্ষণ স্টেশন (Continuous Air Monitoring Station বা CAMS) চালু করেছে। এ সকল CAMS-এ প্রাপ্ত তথ্য বিশে□ষণ করে মাসিক প্রতিবেদন ও বায়ুমান সূচক (Air Quality Index বা AQI) প্রকাশ করা হচ্ছে। এছাড়াও দক্ষিণাঞ্চলের সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগর উপজেলায় একটি আন্ত:দেশীয় বায়ু মনিটরিং কেন্দ্রের মাধ্যমে আন্ত:দেশীয় বায়ু দূষণ চলাচল পরিমাপ করা হয়। এছাড়া ইটভাটার মাধ্যমে দূষণ হ্রাসের লক্ষ্যে 'ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থান (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩' প্রণয়ন করা হয়েছে। শিল্প দূষণ রোধে পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ প্রণয়ন করা হয়েছে। অর্থাৎ বিভিন্ন উপায়ে বায়ু দূষণ রোধে প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এ লক্ষ্যে আমাদেরকেও সচেতন হতে হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	আপনার এলাকার বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণে সুপারিশ তুলে ধরুন।

সারসংক্ষেপ

বায়ু যেমন দূষিত হয় ঠিক তেমনি দূষণও নিয়ন্ত্রণ করা যায়। বায়ু দূষণ প্রতিরোধের প্রথম উপায় হলো বায়ুমন্ডলে দূষিত বায়ু মিশ্রিত হওয়ার পূর্বেই তা নিয়ন্ত্রণ করা। এছাড়া যানবাহন ও কল-কারখানার ধোঁয়া নিয়ন্ত্রণ, সিএনজি ব্যবহার, কীটনাশকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, অঞ্চলভিত্তিক ভূমি ব্যবহার, বৃক্ষরোপন প্রভৃতির মাধ্যমে বায়ু দূষণ প্রতিরোধ করা যায়। আমাদের নিজেদের অস্তিত্বের স্বার্থেই বায়ু দূষণ প্রতিরোধে সবাইকে সজাগ থাকতে হবে এবং আইন মেনে চলতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। বায়ুদূষণ প্রতিরোধ করা যায়-

i. জীবাশ্ম জ্বালানি নিয়ন্ত্রণ করে ii. কল-কারখানার ধোঁয়া নিয়ন্ত্রণ করে iii. বনায়নের মাধ্যমে

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২। নিচের কোন জ্বালানিটি ব্যবহার করে বায়ু দূষণ কমানো যায়?

(ক) পেট্রোল (খ) সিএনজি (গ) ডিজেল (ঘ) কেরোসিন

৩। বিকল্প জ্বালানির উৎস কোনটি?

(ক) কাঠ (খ) কয়লা (গ) সৌরশক্তি (ঘ) সবগুলো

৪। বায়ু দূষণ মনিটরিং-এর জন্য কতটি CAMS রয়েছে?

(ক) ৮টি (খ) ১১টি (গ) ১৪টি (ঘ) ১৭টি

পাঠ-৭.৭ পানি দূষণ (Water Pollution)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- পানি দূষণের সংজ্ঞা, প্রকারভেদ ও কারণ বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- পানি দূষণের ফলাফল ও দূষণ নিয়ন্ত্রণের উপায় ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

পানি দূষণ

পানি দূষণ বলতে পানির সঙ্গে কোনো অবাঞ্ছিত পদার্থ মিশে যাওয়ার ফলে যদি পানির ভৌত রাসায়নিক ও জৈব বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন হয় এবং জলজ উদ্ভিদ, প্রাণি, মানুষ তথা জীবজগতের ক্ষতির আশঙ্কাকে বুঝায়। আমরা জানি পানির অপর নাম জীবন। বিশ্বের মোট পানির ৯৭% সাগর এবং মহাসাগরে অবস্থিত যা মানুষের ব্যবহারের উপযোগী নয়। অবশিষ্ট মাত্র ৩% স্বাদু পানি যা নদী, হ্রদ, পুকুর, ভূ-অভ্যন্তর উদ্ভিদ প্রভৃতিতে রয়েছে। অর্থাৎ বিশুদ্ধ পানির পরিমাণ সীমিত এবং বিশুদ্ধ পানির উৎসগুলো মানবীয় বিভিন্ন কর্মকান্ড ও অতিমাত্রায় ব্যবহারের ফলে দূষিত হচ্ছে।

পানি দূষণের প্রকারভেদ : পানি দূষণকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১. ভূ-গর্ভস্থ পানি দূষণ,
২.হ্রদের পানি দূষণ,
৩. সামুদ্রিক পানি দূষণ,
৪. নদীর পানি দূষণ এবং
৫. জলাশয়ের পানি দূষণ।

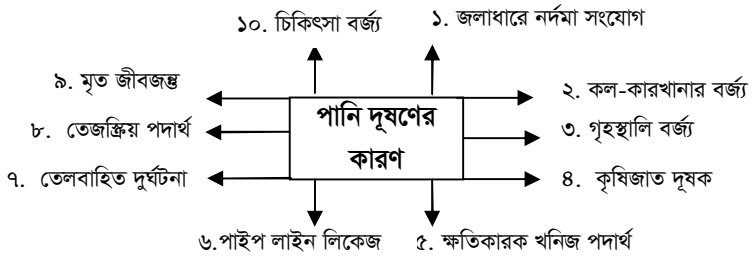
পানি দূষণের কারণ (Causes of Water Pollution) : প্রতিনিয়ত নানা কারণে পানি দূষিত হচ্ছে। বায়ু দূষণের ন্যায় পানি দূষণেরও প্রধান কারণ মানুষের বহুমুখী কর্মকান্ড। পানি দূষণের প্রধান কারণগুলো নিম্নে তুলে ধরা হলো-

১. জলাধারের সাথে নর্দমার সংযোগ : বিভিন্ন জলাধার যেমন- নদী, পুকুর, খাল, বিল প্রভৃতির সাথে ময়লা পানিবাহিত নর্দমার সংযোগ থাকলে পানি দূষিত হয়।

২. কল-কারখানার বর্জ্য : কল-কারখানা থেকে নির্গত বিভিন্ন প্রকার গ্যাসীয় পদার্থ, ক্ষারীয় পদার্থ, তেলজাতীয় পদার্থ প্রভৃতি জলাধারে পতিত হলে পানি দূষিত হয়।

৩. গৃহস্থালি বর্জ্য সংমিশ্রণ : গৃহস্থালির আবর্জনা থেকে নির্গত বিভিন্ন ধরনের পদার্থ যেমন- ভাসমান কঠিন কণা, সালফেট, ক্লোরাইড, অ্যামোনিয়া প্রভৃতি পানিকে দূষিত করে। গৃহস্থালি বর্জ্যের মধ্যে রয়েছে রান্নার ধৌত কাজে ব্যবহৃত পানি, উচ্ছিষ্ট খাবার, ডিটারজেন্ট, মলমূত্র ইত্যাদি।

৪. কৃষিজাত দূষক : কৃষিতে ব্যবহৃত অতিরিক্ত সার, কীটনাশক, আগাছানাশক প্রভৃতি থেকে উৎপন্ন বিভিন্ন রাসায়নিক গ্যাস পানিকে দূষিত করে। এছাড়া শস্যক্ষেতের পরিত্যক্ত গাছপালার অবশিষ্টাংশ, পাতা প্রভৃতি পানির সংস্পর্শে পচে পানিকে দূষিত করে।



৫. ক্ষতিকারক খনিজ পদার্থ : পানিতে আর্সেনিক (AS), সীসা (Pb), ক্রোমিয়াম (Cr), ক্যাডমিয়াম (Cd) প্রভৃতি মিশে পানি দূষিত করে।

৬. পাইপ লাইন লিকেজ : নর্দমা ও স্যুয়ারেজ লাইনের পাশ দিয়ে পানির পাইপ গেলে দুর্ঘটনাজনিত কারণে পানি দূষিত হতে পারে। কারণ নর্দমা বা স্যুয়ারেজের লাইন কোনোভাবে লিকেজ হয়ে পানির লাইনে সংযুক্ত হয়ে গেলে পানি দূষিত হয়।

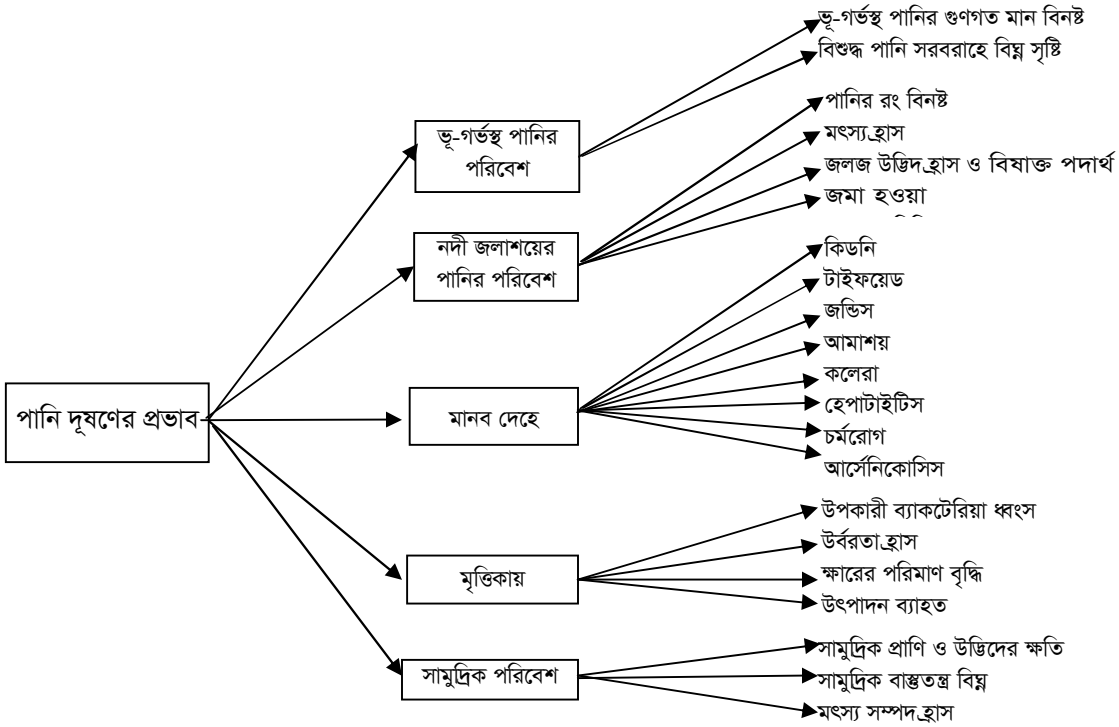
৭. তেলবাহিত দূষণ : তেলবাহী জাহাজ দুর্ঘটনা কবলিত হলে তেল পানিতে ছড়িয়ে পড়ে পানি দূষিত করতে পারে।

৮. তেজস্ক্রিয় বর্জ্য : পারমানবিক চুল্লী, তেজস্ক্রিয় পদার্থের প্রক্রিয়াকেন্দ্র বা চিকিৎসা কেন্দ্রে ব্যবহৃত তেজস্ক্রিয় পদার্থের বর্জ্যসমূহ পানিতে মিশ্রিত হলে পানি দূষিত হয়। এছাড়া রাসায়নিক ও বিস্ফোরক দ্রব্য ব্যবহারের ফলেও পানি দূষিত হয়।

৯. মৃত জীবজন্তু : পানিতে মৃত জীবজন্তু ভাসিয়ে দিলে পানি দূষিত হয়। এছাড়া বন্যার সময় অনেক জীবজন্তু মরে গিয়ে পানিতে ভেসে যায় যা পানি দূষণ ঘটায়।

১০. চিকিৎসা বর্জ্য : পানি দূষণের অন্যতম আরেকটি কারণ চিকিৎসা বর্জ্য। হাসপাতালেই চিকিৎসা বর্জ্য পরিশোধন না করে সরাসরি পানিতে ফেললে পানি দূষিত হয়। ফলে বিভিন্ন রোগের জীবাণু পানিতে ছড়িয়ে পড়ে পানি দূষিত করে।

পানি দূষণের প্রভাব (Effects of Water Pollution) : পানি দূষণের ফলে যেসব প্রভাব পড়ে তা নিম্নের ছকে দেখানো হলো।



পানি দূষণ নিয়ন্ত্রণের উপায় (Ways to Control Water Pollution) : পানি দূষণ জীবজগতের জন্য মারাত্মক হুমকির কারণ। তাই পানি যেন দূষিত না হয় সেদিকে সচেতন থাকতে হবে এবং দূষিত পানিকে নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। নিম্নে পানি দূষণ নিয়ন্ত্রণের উপায়গুলো তুলে ধরা হলো।

১. নদী, খাল, বিল, পুকুর, হ্রদসহ বিভিন্ন জলাশয়ের পানিতে সরাসরি আবর্জনা না ফেলা।
২. শিল্প-কারখানার পানি শোধন করে জলাশয়ে স্থানান্তর করা।
৩. পয়:নিষ্কাশনের নালা জলাশয়ে সরাসরি সংযুক্ত না করে পরিশোধন করা।
৪. কৃষিক্ষেত্রে পরিমিত মাত্রায় সার এবং কীটনাশক ব্যবহার করা।
৫. জীবজন্তুর মৃতদেহ পানিতে না ফেলা।

৬. রোগাক্রান্ত ব্যক্তির কাপড়-চোপড় জীবাণুনাশক ব্যবহার করে ধৌত করা।
৭. তেলবাহী জাহাজ যাতে দুর্ঘটনা কবলিত না হয় সেদিকে সতর্ক থাকা।
৮. কল-কারখানা স্থাপনের পূর্বে বর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।
৯. পারমানবিক বর্জ্য সরাসরি পানিতে না ফেলা।

উপরিউক্ত পদক্ষেপগুলো ছাড়াও জনগণকে সচেতন করা, আইনের যথাযথ প্রয়োগ এবং পাঠ্যপুস্তকে পানি দূষণ সম্পর্কে সচেতনতামূলক পাঠ্যসূচি অর্ন্তভুক্ত করে দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।

শিক্ষার্থীর কাজ	আপনার এলাকায় একটি পুকুর কীভাবে দূষিত হয় তা চিত্রসহ বর্ণনা করুন।

সারসংক্ষেপ

পানির অপর নাম জীবন। বিশ্বব্যাপী যে পানি রয়েছে তার ৯৭% ব্যবহারের অনুপযোগী। অবশিষ্ট ৩% পানি বিভিন্ন আধার যেমন- পুকুর, নদী, জলাধার, ভূ-গর্ভ প্রভৃতিতে রয়েছে। কিন্তু মানুষের বহুমুখী কর্মকান্ডের ফলে পানি দূষিত হচ্ছে। কল-কারখানার বর্জ্য ও দূষিত পানি, কীটনাশক, কৃষিজাত দূষক, ক্ষতিকারক খনিজ পদার্থ প্রভৃতি পানিকে দূষিত করছে। ফলে পানিবাহিত বিভিন্ন রোগ ছড়িয়ে পড়ছে মানবদেহে। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে মৃত্তিকা, সামুদ্রিক পরিবেশ প্রভৃতি। তাই পানি দূষণ রোধে আমাদের সচেতন হতে হবে এবং যেসব কাজ করলে পানি যাতে দূষিত হয় সে ধরনের কাজ করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। পানি দূষণকে কত ভাগে ভাগ করা যায়?
(ক) ৩ (খ) ৪
(গ) ৫ (ঘ) ৬

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২, ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

বুড়িগঙ্গা নদীকে ঢাকা শহরের প্রাণ বলে মনে করা হয়। কিন্তু মানুষের বহুমুখী কর্মকান্ডের ফলে এখানকার পানির ভৌত গুণাবলী বিনষ্ট হচ্ছে। বিঘ্নিত হচ্ছে জলজ জীববৈচিত্র্য।

২। উদ্দীপকে উল্লিখিত নদীটিতে কোন ধরনের দূষণ হচ্ছে?
(ক) বায়ু (খ) পানি
(গ) মৃত্তিকা (ঘ) কোনটিই নয়

৩। উল্লিখিত নদীটি দূষণের কারণ-
i. শিল্পজাত বর্জ্য
ii. গৃহস্থালি বর্জ্য
iii. রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রন
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i (খ) ii ও iii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৪। পানি দূষণ রোধের উপায় কোনটি?
(ক) শিল্প-কারখানার পানি পরিশোধন (খ) পরিমিত সার ব্যবহার
(গ) বর্জ্য সরাসরি পানিতে না ফেলা (ঘ) সবগুলো

পাঠ-৭.৮ শব্দ দূষণ (Sound Pollution)



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- শব্দ দূষণ বলতে কী বুঝায় তা বলতে পারবেন;
- শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের শব্দের তীব্রতা ধারণ ক্ষমতা বলতে পারবেন এবং
- শব্দ দূষণের কারণ, প্রভাব এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণের উপায় ব্যাখ্যা ও বিশে- ষণ করতে পারবেন।



শব্দ দূষণ

শব্দ হলো এক প্রকার শক্তি। এই শক্তি আমাদের কানে প্রবেশ করে শ্রবণ অনুভূতি সৃষ্টি করে, এই শক্তিকে শব্দ বলা হয়। যেমন- কোনো বস্তুতে ঘর্ষণের ফলে বায়ুতে এক ধরনের তরঙ্গ ধ্বনি সৃষ্টি হয় যা শব্দ নামে পরিচিত। পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের একটি হলো কান, যা দিয়ে আমরা শব্দ শুনি। মানুষের এই শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের তীব্রতা ধারণ ক্ষমতার একটি নির্দিষ্ট সীমা আছে। সারণি ৭.৮.১ এ তীব্রতা অনুসারে শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের ধারণ ক্ষমতা দেখানো হয়েছে।

সারণি : ৭.৮.১ : তীব্রতা অনুসারে শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের ধারণ ক্ষমতা

শব্দের মাত্রা (ডেসিবল)	শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের ধারণ ক্ষমতা
১-১০	সামান্য আওয়াজ
১০-৩০	খুব শান্ত পরিবেশ
৩০-৫০	মোটামুটি শান্ত পরিবেশ
৫০-৭৫	বিরক্তিকর নয় এমন সাধারণ আওয়াজ
৭৫-১০০	বিরক্তিকর তীব্র আওয়াজ
১০০-১৩০	অসহ্য আওয়াজ
১৩০-১৫০	শ্রবণ যন্ত্রে ব্যথা অনুভূত হয়
১৫০ এর উপরে	শ্রবণযন্ত্রের অনুভূতি ক্ষমতা নষ্ট হয়।

সারণি-৭.৮.১ অনুযায়ী আমাদের শ্রবণযন্ত্রের স্বাভাবিক ধারণ ক্ষমতা ১-৭৫ ডেসিবল এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। উক্ত মাত্রার উপরের শব্দ মানুষের জন্য ক্ষতিকর। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, মানুষের স্বাভাবিক শ্রবণ ক্ষমতায় উর্ধ্বে সৃষ্ট যে কোনো শব্দ যা স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় ব্যাঘাত ঘটায় তাই হলো শব্দ দূষণ।

শব্দ দূষণের কারণ (Causes of Sound Pollution) : শব্দ দূষণের উল্লেখযোগ্য কারণগুলো নিম্নরূপ :

১. কল-কারখানা : কল-কারখানার নির্গত বিকট শব্দ দূষণের অন্যতম কারণ। যেমন- ছাপাখানা, পাথরভাঙ্গা মেশিন, সার কারখানা ও শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রের মেশিনের আওয়াজ।

২. দালান-কোঠা : বিশেষ করে শহরাঞ্চলে বড় বড় দালান-কোঠা নির্মাণের সময় নির্মাণ সামগ্রী প্রস্তুত, পাইলিং প্রভৃতি করার সময় বিকট আওয়াজ হয়, যা আশেপাশে ব্যাপক শব্দ দূষণ ঘটায়।

৩. যানবাহন : ট্রেন, বাস, ট্রাক, লঞ্চ, স্টিমার, জাহাজ ইত্যাদি যানবাহনের ইঞ্জিনের শব্দে দূষণ হয়। যানবাহনের হর্ণও শব্দ দূষণের অন্যতম কারণ। এছাড়া সাধারণ বিমান, জেট বিমান, যুদ্ধ বিমান প্রভৃতি তীব্র গতিতে চলার সময় যে আওয়াজ হয় তা শব্দ দূষণ ঘটায়।

৪. সাইরেন ও যুদ্ধ সামগ্রীর শব্দ : ফায়ার সার্ভিস, এম্বুলেন্স বা যুদ্ধের সময় যে সাইরেন বাজানো হয় তাও শব্দ দূষণ ঘটায়। এছাড়া গোলাবারুদ, বোমা বিস্ফোরণ, গ্রেনেড বিস্ফোরনে বিকট আওয়াজ হয়, যা শব্দ দূষণের উৎস হিসেবে কাজ করে।

৫. গান বাজনা ও বাদ্যযন্ত্র : মাইক, ক্যাসেট বা রেডিওতে উচ্চ শব্দে গান বাজানো হলে শব্দ দূষিত হয়। বাদ্যযন্ত্রের ড্রামের আওয়াজেও শব্দ দূষণ ঘটে।

৬. মেঘের গর্জন : বর্ষাকালে বৃষ্টিপাতের সাথে মেঘের গর্জন ও বজ্রপাতের ফলে বিকট আওয়াজ হয় যা শব্দ দূষণ ঘটায়।

৭. ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত : ভূমিকম্পের ফলে সৃষ্ট কম্পন এবং আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে যে শব্দের সৃষ্টি হয় তার ফলে শব্দ দূষণ ঘটে।

৮. পশুপাখির শব্দ : কুকুরের ঘেউ ঘেউ, কাকের কা কা, বাঘ বা সিংহের গর্জনের ফলেও শব্দ দূষণ হয়।

৯. জনসমাগম : রাজনৈতিক সভা, সমাবেশ, মিছিল, মিটিং, হাটবাজারসহ বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে অনেক মানুষের সমাগম হলে সেখানে শব্দ দূষণ ঘটে।

শব্দ দূষণের প্রভাব (Effects of Sound Pollution) : শব্দ দূষণের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ উভয় প্রকার প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এটি বিরক্তিকর হওয়ার পাশাপাশি শারীরিক ও মানসিক দিক থেকে ক্ষতি করে থাকে। নিম্নে শব্দ দূষণের অন্যতম ক্ষতিকর দিকগুলো তুলে ধরা হলো।

১. বধিরতা : কানের স্বাভাবিক ধারণ ক্ষমতা ১-৭৫ ডেসিবল। এর অধিক শব্দ হলে কানের শ্রবণশক্তি ধীরে ধীরে হ্রাস পায়। দীর্ঘদিন ধরে এ ধরনের উচ্চ শব্দ শ্রবণ করলে বধির হয়ে যেতে পারে।

২. স্নায়ুযন্ত্র : শব্দ দূষণের ফলে স্নায়ুযন্ত্রের উপর চাপ পড়ে যা পরবর্তীতে দেহের বিভিন্ন অঙ্গ যেমন- রক্তসংবহন তন্ত্র, শ্বসনতন্ত্র এবং বিভিন্ন গ্রন্থির উপর প্রভাব ফেলে।

৩. রক্তনালীর সংকোচন বৃদ্ধি : অনেক সময় তীব্র শব্দের প্রভাবে রক্তনালীর সংকোচন বৃদ্ধি পায়। ফলে হৃদপিন্ড থেকে নির্গত রক্তের পরিমাণও কমে যায়। এতে হৃদ প্রসারণের চাপ বৃদ্ধি পায় এবং হৃদযন্ত্রের কার্যকলাপও বন্ধ হতে পারে।

৪. শিশুর দৈহিক বৃদ্ধি : অধিক শব্দ দূষণযুক্ত এলাকায় বসবাস করলে শিশুদের দৈহিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। ফলে শিশু বধির হয়ে যেতে পারে এবং মানসিক বিকাশ বিঘ্ন হতে পারে।

৫. শ্বাস-প্রশ্বাস : শব্দ দূষণের ফলে শ্বাস-প্রশ্বাসের উপর প্রভাব পড়ে এবং শ্বাস-প্রশ্বাসের হার অস্বাভাবিক হয়ে যেতে পারে।

৬. স্মৃতিশক্তি হ্রাস ও খিটখিটে মেজাজ : শব্দ দূষণের ফলে মানুষের স্মৃতিশক্তি হ্রাস পেতে পারে এবং মেজাজ খিটখিটে হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

উপরিউক্ত প্রভাবগুলো ছাড়াও অধিক মাত্রায় শব্দ দূষণের ফলে ঘুম কমে যাওয়া, মাথা ঝিমঝিম করা, বমিভাব হওয়া, দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়া, পড়ালেখা বিঘ্নিত হওয়া, অস্বস্তিবোধসহ স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বিঘ্নিত হতে পারে।

শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণের উপায় (Ways to Control Sound Pollution) : শব্দ দূষণ যেহেতু মানুষকে শারীরিক এবং মানসিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করে তাই এ দূষণ রোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। নিম্নোক্ত উপায়গুলির মাধ্যমে শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে।

১. যানবাহনের শব্দ নিয়ন্ত্রণ : সকল প্রকার যানবাহনের শব্দ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। মোটরগাড়ির সাইলেন্সার পাইপ ঠিক রাখতে হবে এবং অযথা হর্ন বাজানো যাবে না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অফিস, আদালত, হাসপাতাল প্রভৃতি এলাকায় হর্ণ বাজানো যাবে না। বায়ু দূষণ (প্রতিরোধ এবং নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৮১ অনুসারে এসব এলাকাকে নিঃশব্দ অঞ্চল বা Silence Region বলে। চিত্র-৭.৮.১ এ হর্ণ না বাজানোর সংকেত দেখানো হলো।



চিত্র-৭.৮.১ : হর্ণ না বাজানোর সংকেত

২. অযথা শব্দ না করা : হাটার সময় জুতার খট খট শব্দ না করা। অধিক কথা উচ্চস্বরে না বলা, কথা-বার্তায় নম্রতা বজায় রেখে শ্রুতিমধুর করার মাধ্যমে শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

৩. রেডিও, টিভি, মাইকের ব্যবহার : উচ্চ শব্দে রেডিও, টিভি বা মাইক ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকলে কানের পর্দা দীর্ঘকাল স্বাভাবিক থাকে।

৪. বাসস্ট্যান্ড দূরে রাখা : যেসব এলাকায় অধিক লোকের বসবাস অর্থাৎ লোকালয় থেকে বাসস্ট্যান্ড দূরে রাখতে হবে। এতে শব্দ দূষণ হ্রাস পাবে।

৫. শিল্প-কারখানার শব্দ নিয়ন্ত্রণ : শিল্প-কারখানায় তীব্র শব্দ উৎপাদনকারী যন্ত্রপাতির প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ঘটিয়ে শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এতে শব্দ দূষণ উৎসস্থলেই নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হবে। এছাড়া অবাঞ্ছিত শব্দ তৈরিকারী যন্ত্রপাতির উপর আচ্ছাদন ব্যবহার করেও শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

৬. আতশবাজি নিয়ন্ত্রণ : অনেক সময় বিভিন্ন উৎসবে আতশবাজি ব্যবহার করা হয়। আতশবাজির তীব্র শব্দ নিয়ন্ত্রণের জন্য লোকালয়ে আতশবাজি ব্যবহার নিষিদ্ধ করা।

সর্বোপরি আমাদেরকে সচেতন হতে হবে। সচেতনতাই শব্দ দূষণ অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। একই সাথে আইনের যথাযথ প্রয়োগও নিশ্চিত করতে হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	কীভাবে যানবাহনের দ্বারা শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা যায় তা ছকবদ্ধ করুন।

সারসংক্ষেপ

শব্দ হলো এক প্রকার শক্তি। এই শক্তি অর্থাৎ শব্দের তীব্রতার একটি নির্দিষ্ট ধারণ ক্ষমতা মানুষের শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের রয়েছে। যা অতিক্রম করলে শব্দ দূষণ হয়। শব্দ বিভিন্নভাবে দূষিত হয়। যেমন- কল-কারখানার শব্দ, দালানকোঠা নির্মাণের শব্দ, যানবাহনের শব্দ, উচ্চ শব্দের গান-বাজনা প্রভৃতি। শব্দ দূষণের ফলে মানুষের বিভিন্ন ধরনের ক্ষতি যেমন- বধিরতা) হয়ে থাকে। তাই সুস্থ ও সুন্দর জীবনযাপনের জন্য শব্দ দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। এজন্য আমাদের সবাইকে সচেতন হতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। মানুষের শ্রবণ যন্ত্রের স্বাভাবিক ধারণ ক্ষমতা কত?

(ক) ১-৭৫ ডেসিবল (খ) ৭৫-১০০ ডেসিবল

(গ) ১০০-১৩০ ডেসিবল (ঘ) ১৩০-১৫০ ডেসিবল

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ২, ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

বাংলাদেশে দ্রুত নগরায়নের ফলে নির্মিত হচ্ছে নতুন নতুন বহুতল ভবন। এ সকল ভবন নির্মাণে বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়। এর মধ্যে ইট, পাথর প্রভৃতি ভাঙ্গা ও মিশ্রনের কাজও করতে হয়।

২। উদ্দীপকে উল্লিখিত কারণে কোন ধরনের দূষণ হচ্ছে?

(ক) বায়ু (খ) পানি (গ) শব্দ (ঘ) ভবন

৩। উল্লিখিত দূষণ রোধের উপায় কী?

i. যানবাহনের শব্দ নিয়ন্ত্রণ ii. বাসস্ট্যান্ড দূরে রাখা

iii. ইট, পাথর প্রভৃতি ভাঙ্গা নিয়ন্ত্রণ

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৪। আলোচ্য দূষণের ফলে মানব শরীরে কোন রোগ হতে পারে?

(ক) বধিরতা (খ) ডায়রিয়া (গ) আমাশয় (ঘ) কলেরা

পাঠ-৭.৯ মৃত্তিকা দূষণ (Soil Pollution)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মৃত্তিকা দূষণের সংজ্ঞা ও কারণ বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- মৃত্তিকা দূষণের প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণের উপায়সমূহ সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করতে পারবেন।

মৃত্তিকা দূষণ

রোদ, বৃষ্টি, বায়ুপ্রবাহ, পানিস্রোত, হিমবাহ, অগ্ন্যুৎপাত, ভূমিকম্প প্রভৃতি প্রাকৃতিক শক্তির প্রভাবে শিলারাশি চূর্ন-বিচূর্ণ হয়ে পৃথিবী পৃষ্ঠের উপরিভাগে যে নরম আবরণ সৃষ্টি হয়েছে তাকে মৃত্তিকা বলে। মৃত্তিকার উপরই আমরা বসবাস করি এবং গাছপালাসহ নানা ধরনের ফসল উৎপাদন করে জীবনধারণ করি। শিল্প বর্জ্য, কৃষি বর্জ্য, তেজস্ক্রিয় বর্জ্য, জমাকৃত আবর্জনা এবং বিভিন্ন জৈব উপাদান মৃত্তিকার যে ক্ষতিসাধন করে তাই হলো মৃত্তিকা দূষণ।

মৃত্তিকা দূষণের কারণ (Causes of Soil Pollution) : পূর্বের পাঠগুলোতে বায়ু ও পানি দূষণের যেসব কারণ আলোচনা করা হয়েছে সাধারণত মৃত্তিকা দূষণের ক্ষেত্রেও সে সকল কারণগুলো কাজ করে থাকে। নিম্নে মৃত্তিকা দূষণের প্রধান কারণগুলো বর্ণনা করা হলো।

১. শিল্প-কারখানার বর্জ্য : শিল্প-কারখানার বর্জ্য পদার্থ মৃত্তিকার সাথে মিশে দূষণ ঘটায়। শিল্প-কারখানার কঠিন বর্জ্য, রাসায়নিক উপাদান প্রভৃতি দীর্ঘদিন মৃত্তিকায় মিশলে মৃত্তিকা তার স্বাভাবিক গুণাগুণ হারিয়ে ফেলে।

২. কৃষি ও গৃহস্থালি বর্জ্য : ফসলের পরিত্যক্ত অংশ জমানো এবং পোড়ানো, গবাদি পশুর মলমূত্র, কৃষি যন্ত্রপাতির অবশিষ্টাংশ দীর্ঘদিন ধরে মাটিতে ফেলে রাখলে মাটির গুণাগুণের উপর প্রভাব পড়ে। এছাড়া গৃহস্থালি কাজে ব্যবহৃত জিনিসপত্রের অবশিষ্টাংশ, প্রাণি বর্জ্য, খাদ্যের আঁশ, মিউনিসিপ্যালের বর্জ্য, পলিথিন ইত্যাদি মাটিতে পড়ে থাকলে মাটি দূষিত হয়।

৩. রাসায়নিক সার ও কীটনাশক : মৃত্তিকা দূষণের অন্যতম কারণ রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার। ক্রমবর্ধিষ্ণু জনসংখ্যার খাদ্য চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে জমিতে অধিক হারে ফসল ফলানোর জন্য অধিক হারে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার করা হয়। অনেক সময় কীটনাশকের বিষক্রিয়া দীর্ঘদিন যাবৎ থাকে যা মৃত্তিকার উর্বরতা হ্রাস, কেঁচোসহ, উপকারী কীটপতঙ্গ এবং বিভিন্ন অনুজীব ধ্বংস করে থাকে। এছাড়া রাসায়নিক সার ব্যবহারের পুনরাবৃত্তির ফলে মৃত্তিকায় অপ্রয়োজনীয় রাসায়নিক যৌগের পরিমাণ বাড়ে, অন্যদিকে হিউমাস ও নাইট্রোজেনের মাত্রা কমে যায়। এভাবে মৃত্তিকা দূষিত হতে থাকে।

৪. মাটি পোড়ানো : সাধারণত ইটভাটার স্থানে মাটি পোড়ানো, ক্ষেতের অবশিষ্টাংশ পোড়ানোর ফলে মাটি পুড়ে গেলে উৎপাদন ক্ষমতা কমে যায় এবং দূষণ ঘটে।

৫. এসিড বৃষ্টি : বৃষ্টির পানির সাথে সালফিউরিক এসিড, নাইট্রিক এসিড, হাইড্রোজেন ক্লোরাইড ইত্যাদি রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রিত অবস্থায় ভূ-পৃষ্ঠে পতিত হয়। এই ধরনের বৃষ্টিপাতকে বলে এসিড বৃষ্টি। সাধারণত শিল্পাঞ্চলে অধিক হারে জীবাশ্ম জ্বালানি ও সালফাইড আকরিক পোড়ানোর ফলে এ ধরনের বৃষ্টি হতে পারে। এতে মৃত্তিকা দূষিত হয়।

৬. মৃত্তিকার লবণাক্ততা : মৃত্তিকার লবণাক্ততা উর্বরতা হ্রাসের একটি উল্লেখযোগ্য কারণ। সামুদ্রিক পানি জলোচ্ছ্বাসের মাধ্যমে ভূ-অভ্যন্তরে প্রবেশ করে মৃত্তিকাকে লবণাক্ত করে।

৭. বন উজাড় : ব্যাপকহারে বন উজাড় করলে গাছপালার অভাবে মাটির আর্দ্রতা এবং হিউমাস কমে গিয়ে উর্বরতা শক্তি হ্রাস পায় এবং দূষণ ঘটে।

৮. প্রাকৃতিক উৎস : বিভিন্ন প্রকার প্রাকৃতিক দুর্যোগ যেমন- আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, ভূমিধ্বস, ভূমিক্ষয়, প্রবল বায়ুপ্রবাহ, অতিবৃষ্টি প্রভৃতি মৃত্তিকা দূষণের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

৯. চিকিৎসা বর্জ্য : চিকিৎসা ক্ষেত্রে ব্যবহৃত বিভিন্ন সরঞ্জাম যেমন- সিরিঞ্জ, ব্যান্ডেজ ইত্যাদি দীর্ঘদিন মাটিতে ফেলে রাখলে মাটির গুণগতমান বিনষ্ট হয়। মাটির উপকারী কীটপতঙ্গগুলো আক্রান্ত হয় এবং দূষণ ঘটে।
এছাড়া পারমানবিক পরীক্ষা, মানুষের মলমূত্র, জলাবদ্ধতা প্রভৃতি কারণেও মৃত্তিকা দূষিত হয়।

মৃত্তিকা দূষণের প্রভাব (Effects of Soil Pollution) : নিম্নে মৃত্তিকা দূষণের প্রভাবসমূহ উল্লেখ করা হলো-

১. উৎপাদন হ্রাস : মৃত্তিকা দূষণের প্রধান প্রভাব পড়ে কৃষি উৎপাদনে। অধিক পরিমাণে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহারের ফলে সাময়িকভাবে অধিক উৎপাদন হলেও দীর্ঘমেয়াদে মৃত্তিকা গুণাগুণ হারিয়ে ফেলে উৎপাদন হ্রাস পায়।

২. মৃত্তিকার ভৌত রাসায়নিক অবক্ষয় : মৃত্তিকা দূষণের ফলে যেসব ভৌত রাসায়নিক অবক্ষয় ঘটে তার মধ্যে রয়েছে- ধারণ ক্ষমতা হ্রাস, অনুজৈবিক কার্যাবলি হ্রাস, কণার ঘনত্ব বৃদ্ধি, দৃঢ়তা ও চাপ বৃদ্ধি, কীটপতঙ্গের কার্যাবলি এবং বৈচিত্র্যতা হ্রাস পাওয়া। এছাড়া মৃত্তিকার লবণাক্ততা বৃদ্ধি পেতে পারে।

৩. জীববৈচিত্র্য হ্রাস : মৃত্তিকা দূষিত হলে জীববৈচিত্র্য হ্রাস পায়। কারণ মৃত্তিকা দূষণের ফলে প্রাণির খাদ্য চক্র বিঘ্নিত হয়, জৈব পদার্থ হ্রাস পায়, ভূমিধ্বস হয় এবং বায়োমাস হ্রাস পায়। ফলে জীববৈচিত্র্য তার স্বাভাবিকতা বজায় রাখতে পারে না।

৪. মানবদেহে প্রভাব : মৃত্তিকায় স্তুপ হয়ে থাকা আবর্জনা জনজীবনে স্বাস্থ্যহানি ঘটায়। মাটিতে মিশে যাওয়া রাসায়নিক দূষকসমূহ মানুষসহ অন্যান্য জীবের মৃত্যুও ঘটাতে পারে। এছাড়া ভারী ধাতুকণা মানবদেহে প্রবেশ করে হাঁপানি, ক্যান্সার, চর্মরোগ ইত্যাদি সৃষ্টিতে সহায়তা করে।

মৃত্তিকা দূষণ নিয়ন্ত্রণের উপায় (Ways to Control Soil Pollution) : মৃত্তিকা দূষণের ফলে পরিবেশে মারাত্মক ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে। মাটির সাথে যেহেতু আমাদের সম্পর্ক নিবিড় তাই এটি দূষণরোধে আমাদের সজাগ থাকতে হবে। নিম্নোক্ত উপায়ে মৃত্তিকা দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে-

১. যত্রতত্র মলমূত্র ত্যাগ না করা।
২. পরিমিত পরিমাণে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার করা।
৩. জমিতে জৈব সারের ব্যবহার বাড়ানো।
৪. গবাদি পশুসহ অন্যান্য প্রাণির মৃতদেহ মাটির গভীরে গর্ত করে পুতে ফেলা।
৫. পরিত্যক্ত যন্ত্রপাতির ভাঙ্গা অংশ মাটিতে ফেলে না রেখে পুন:ব্যবহার করা।
৬. শিল্প-কারখানার বর্জ্য পরিশোধনের ব্যবস্থা করা এবং পুন: ব্যবহারের উপায় বের করা।
৭. মাটিতে ইট না পুড়িয়ে যান্ত্রিক উপায়ে পোড়ানোর উপায় বের করা।
৮. পারমানবিক পরীক্ষা এবং বোমার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা।
৯. পাঠ্যসূচিতে দূষণ সম্পর্কে পাঠদান ও সচেতনতা সৃষ্টি করা এবং
১০. আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করা প্রভৃতি।

শিক্ষার্থীর কাজ	আপনার এলাকার মৃত্তিকা দূষণের পাঁচটি কারণ চিহ্নিত করে লিখুন।

সারসংক্ষেপ

মৃত্তিকা একটি অমূল্য প্রাকৃতিক সম্পদ। মৃত্তিকাকে কেন্দ্র করে যাবতীয় কার্যাদি সম্পাদিত হয়। কিন্তু মৃত্তিকা বিভিন্নভাবে দূষিত হচ্ছে। শিল্প বর্জ্য, তেজস্ক্রিয় বর্জ্য, গৃহস্থালি বর্জ্য প্রভৃতি মৃত্তিকা দূষিত করছে। মৃত্তিকা দূষণের ফলে জমির উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পায়, ভৌত গুণাবলীর অবক্ষয় হয়, জীববৈচিত্র্য হ্রাস পায়, মানব দেহে ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। যেসব কারণে মৃত্তিকা দূষিত হয় সেসব কাজ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। এজন্য সবাইকে সচেতন হতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৭.৯

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগের নরম আবরণকে কী বলে?

(ক) পানি (খ) জৈব পদার্থ (গ) মৃত্তিকা (ঘ) কোনটিই নয়

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ২, ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

মানুষের আবাসস্থলসহ যাবতীয় কর্মকান্ড প্রকৃতির একটি বিশেষ উপাদানের উপর ভিত্তি করে সম্পাদিত হয়। এই উপাদানটির উপরই গাছপালা, নদী, সাগরসহ সবকিছু অবস্থান করে। কিন্তু প্রকৃতি প্রদত্ত এই উপাদানটি আজ বিভিন্নভাবে কলুষিত হচ্ছে।

২। উদ্দীপকে উল্লিখিত উপাদানটির নাম কী?

(ক) পানি (খ) বাতাস (গ) পাহাড় (ঘ) মৃত্তিকা

৩। উল্লিখিত দূষণের কারণ-

i. এসিড বৃষ্টি ii. শিল্প-কারখানার বর্জ্য iii. রাসায়নিক সার ও কীটনাশক

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i, ii ও iii (ঘ) কোনটিই নয়

৪। উল্লিখিত দূষণ রোধের উপায় কোনটি?

(ক) জৈব সার ব্যবহার (খ) যত্রতত্র মলমূত্র ত্যাগ না করা

(গ) বর্জ্য পরিশোধন (ঘ) সবগুলো

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

পৃথিবীর চারপাশে বেষ্টন করে একটি বায়বীয় আবরণ রয়েছে। এই বায়বীয় আবরণটি কতিপয় উপাদান দ্বারা গঠিত। এর মধ্যে নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেন প্রধান। এই আবরণটি ভূ-পৃষ্ঠ থেকে উপরের দিকে স্তরে স্তরে সাজানো রয়েছে। মানুষের বহুমুখী কর্মকান্ডের ফলে প্রতিনিয়ত প্রকৃতির এই উপাদানটির ভারসাম্যতা বিঘ্নিত হচ্ছে ।

ক. উদ্দীপকের উপাদানটির নাম কী?

খ. বায়ুমন্ডল গঠনকারী উপাদানসমূহের নাম লিখুন।

গ. ওজোন স্তর জীবনধারণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কেন?

ঘ. আপনার এলাকায় বায়ু কীভাবে দূষিত হয় তা বর্ণনা করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-২

চামড়া প্রক্রিয়াকরণের ট্যানারী শিল্পাঞ্চলটি ঢাকায় অদূরে অবস্থিত। এখানে সারা দেশ থেকে চামড়া নিয়ে এসে প্রক্রিয়াজাত করা হয়। চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণে বিভিন্ন প্রকার রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হয় যা পানির সাথে সরাসরি মিশলে পানির গুণগতমানকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। যা মানবস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

ক. পানি দূষণ কী?

খ. পানি দূষণজনিত ৫টি রোগের নাম লিখুন।

গ. ''পানি দূষণে মানব কর্মকান্ডই দায়ী''- ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত এলাকায় পানি দূষণ প্রতিরোধে কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত বলে আপনি মনে করেন?

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.১ : ১. ক ২. ঘ ৩. খ ৪. ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.২ : ১. ক ২. ক ৩. খ ৪. ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৩ : ১. ক ২. ক ৩. গ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৪ : ১. ঘ ২. ক ৩. ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৫ : ১. ঘ ২. ক. ৩. গ ৪. ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৬ : ১. ঘ ২. খ ৩. গ ৪. খ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৭ : ১. গ ২. খ ৩. ঘ ৪. ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৮ : ১. ক ২. গ ৩. ঘ ৪. ক

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৭.৯ : ১. গ ২. ঘ ৩. গ ৪. ঘ

আবহাওয়া এবং জলবায়ু
(Weather and Climate)

ইউনিট ৮

ভূমিকা

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। বায়ুমন্ডল ও তার গঠনকারী উপাদানভেদেও বায়ুমন্ডলের বৈশিষ্ট্য ও ভূ-প্রাকৃতিক অঞ্চল বৈচিত্র্যময় হয়। বায়ুমন্ডলের নিম্নস্তরে চাপ, তাপ, আর্দ্রতা ও বায়ুপ্রবাহের পার্থক্য তৈরি হলেই প্রতিদিনের বায়ুপ্রবাহ, বায়ুতাপ ও চাপের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। আবহাওয়া হলো কোনো স্থানের দৈনন্দিন বায়ুর তাপ, চাপ, বায়ুপ্রবাহের বৈশিষ্ট্য, বায়ুর আর্দ্রতা, বারিপাত ইত্যাদি উপাদানের গড় অবস্থা অর্থাৎ কোনো নির্দিষ্ট স্থানের স্বল্পকালীন সময়ের বায়ুমন্ডলের উপাদানসমূহের গড় অবস্থাকে বলা হয় আবহাওয়া। জলবায়ু হলো কোনো একটি অঞ্চলের অনেক বছরের আবহাওয়ার সামগ্রিক গড় অবস্থা। সাধারণত ৩০ থেকে ৪০ বছরের আবহাওয়ার গড়কে জলবায়ু বলে।





ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ ৮.১ : আবহাওয়া এবং জলবায়ুর উপাদান ও নিয়ামক
পাঠ ৮.২ : তাপবলয়
পাঠ ৮.৩ : চাপবলয়
পাঠ ৮.৪ : বায়ুপ্রবাহ
পাঠ ৮.৫ : বায়ুর আর্দ্রতা
পাঠ ৮.৬ : কুয়াশা ও মেঘ
পাঠ ৮.৭ : বৃষ্টিপাত
পাঠ ৮.৮ : কালবৈশাখী
পাঠ ৮.৯ : ঘূর্ণিঝড়
পাঠ ৮.১০ : টর্নেডো

পাঠ-৮.১ আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপাদান ও নিয়ামক
(Elements and Factors of Weather and Climate)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- আবহাওয়া ও জলবায়ু বলতে কী বুঝায় তা বলতে পারবেন এবং
- আবহাওয়া এবং জলবায়ুর উপাদান ও নিয়ামকগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

আবহাওয়া

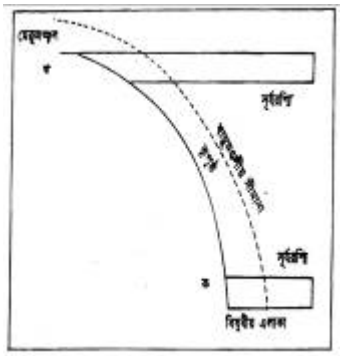
কোনো নির্দিষ্ট স্থানের নিদিষ্ট সময়ের বায়ুর তাপ, চাপ, আর্দ্রতা, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ, তুষারপাত, মেঘাচ্ছন্নতা ইত্যাদি উপাদানের গড় অবস্থাকে আবহাওয়া বলে। আবহাওয়া সবসময়ই পরিবর্তনশীল।

জলবায়ু (Climate) : কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলের কয়েক বছরের গড় আবহাওয়াকে জলবায়ু বলে। পরিবর্তনশীল আবহাওয়ায় কোনো স্থানের বায়ুর তাপ, চাপ, বায়ুপ্রবাহ, আর্দ্রতা, মেঘাচ্ছন্নতা, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ইত্যাদির ৩০-৪০ বছরের গড় অবস্থাকে সে স্থানের জলবায়ু বলা হয়। অক্ষাংশ, সমুদ্র হতে দূরত্ব, বায়ুপ্রবাহের দিক, ভূ-পৃষ্ঠের উচ্চতা, সমুদ্রস্রোত ইত্যাদি নিয়ামকের উপর ভিত্তি করে বিভিন্ন অঞ্চলে জলবায়ুর পার্থক্য দেখা যায়।

আবহাওয়া ও জলবায়ুর নিয়ামক : আবহাওয়া ও জলবায়ুর নিয়ামকসমূহ সর্বত্র সমানভাবে কাজ করে না। নিম্নে আবহাওয়া ও জলবায়ুর নিয়ামকসমূহ আলোচনা করা হলো-

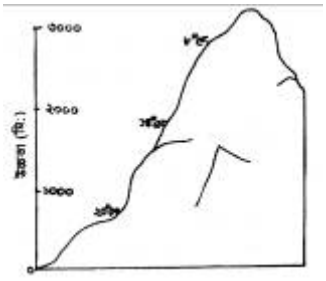
১। অক্ষাংশ	২। উচ্চতা	৩। সমুদ্র থেকে দূরত্ব	৪। স্থলভাগ ও জলভাগের অবস্থান
৫। সমুদ্রস্রোত	৬। ভূমির ঢাল	৭। ভূ-প্রকৃতি	৮। বায়ুপ্রবাহ
৯। বায়ুর চাপ এবং	১০। বনভূমির অবস্থান।		

১. অক্ষাংশ : পৃথিবীর একেক অক্ষাংশে একেকভাবে সূর্যরশ্মি পতিত হয়। তাই এটি জলবায়ুর একটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক। নিরক্ষীয় অঞ্চলে সূর্য লম্বভাবে কিরণ দেয় বলে এই অঞ্চলে বায়ুর তাপ বেশি হয়। আবার উচ্চ অক্ষাংশে সূর্য তির্যকভাবে কিরণ দেয় ফলে বায়ুর তাপ কম হয়। নিরক্ষরেখা থেকে উত্তর মেরুর দিকে বায়ুমন্ডলের তাপমাত্রা হ্রাস পেতে থাকে এবং দক্ষিণ মেরুর দিকেও একই অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। তাপ বেশি হলে বায়ু উত্তপ্ত হওয়ায় হালকা হয়ে নিম্নচাপের সৃষ্টি করে এবং তাপ কম হলে বায়ু ঘণীভূত হয়ে উচ্চ চাপের সৃষ্টি করে। ৮.১.১ নং চিত্রে অক্ষাংশ ভেদে সূর্যরশ্মি পতনের বৈশিষ্ট্য দেখানো হলো। চিত্রে দেখা যাচ্ছে যে, মেরু এলাকায় সূর্যরশ্মি কৌণিকভাবে পতিত হওয়ায় আলোকরশ্মি বিস্তৃত এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। ফলে কম বায়ুস্তর ভেদ করে সূর্যরশ্মি পতিত হয়। তুলনামূলকভাবে নিরক্ষীয় অঞ্চলে সূর্যালোক খাড়াভাবে পতিত হওয়ায় কম স্থান জুড়ে কিরণ দেয় এবং দূরত্বও কম হয়।



চিত্র-৮.১.১:অক্ষাংশভেদে সূর্যরশ্মি পতন

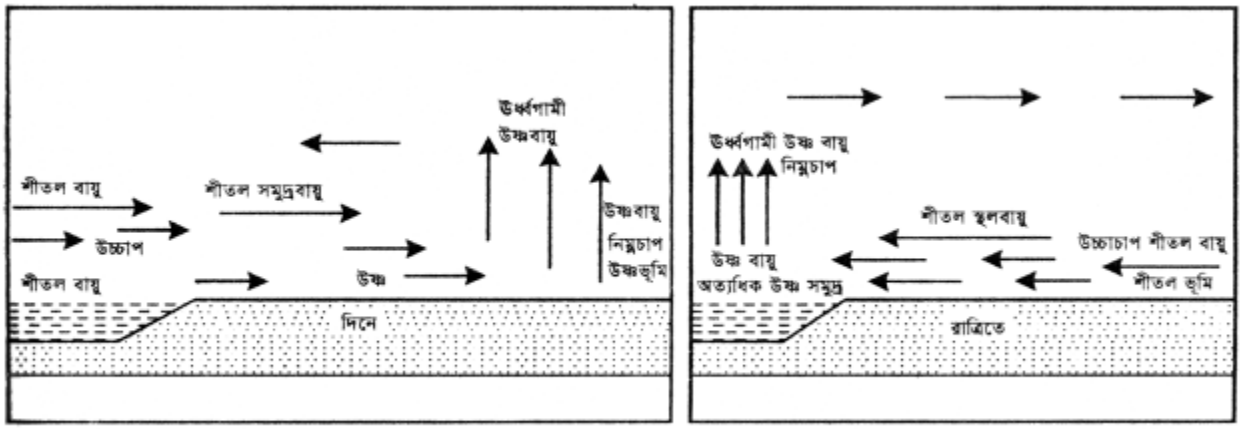
২. উচ্চতা : উচ্চতা যত বৃদ্ধি পায় বায়ুমন্ডলীয় তাপমাত্রা তত বেশি হ্রাস পায়। সাধারণত প্রতি ১০০০ মিটার উচ্চতায় ৬° সেলসিয়াস তাপমাত্রা হ্রাস পায়। উচ্চতার জন্যই একই অক্ষাংশে অবস্থিত দুই জায়গার জলবায়ুতে পার্থক্য দেখা যায়। যেমন- দিনাজপুর ও শিলং একই অক্ষাংশে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও শুধু উচ্চতা ভিন্নতার জন্য এদের জলবায়ু ভিন্নরকম হয়। দিনাজপুরের চেয়ে শিলং এর তাপমাত্রা অনেক কম। ৮.১.২ নং চিত্রে উষ্ণতার সাথে উচ্চতা বৃদ্ধির প্রভাব দেখানো হলো।



চিত্র-৮.১.২: উচ্চতা

৩. সমুদ্র থেকে দূরত্ব : সমুদ্র হতে দূরত্ব জলবায়ুতে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। জলভাগের অবস্থান কোনো এলাকার জলবায়ুকে মৃদুভাবাপন্ন করে। যেমন- কক্সবাজার, চট্টগ্রাম, পটুয়াখালী সমুদ্র উপকূলে অবস্থিত হওয়ায় এসব স্থানের জলবায়ু মৃদুভাবাপন্ন।

সমুদ্রের নিকটবর্তী এলাকায় শীত-গ্রীষ্ম তেমন পার্থক্য না হলেও সমুদ্র উপকূল থেকে দূরের এলাকায় শীত ও গ্রীষ্ম উভয়ই বেশি হয়। এ কারণে সমুদ্র নিকটবর্তী জলবায়ুকে সমভাবাপন্ন ও দূরবর্তী জলবায়ুকে মহাদেশীয় চরমভাবাপন্ন জলবায়ু বলা হয়। চিত্র ৮.১.৩ এ সমুদ্র ও ভূমির উষ্ণতার পার্থক্যের প্রভাব দেখানো হয়েছে।



চিত্র ৮.১.৩ : আবহাওয়া ও জলবায়ুতে সমুদ্রের অবস্থানের প্রভাব

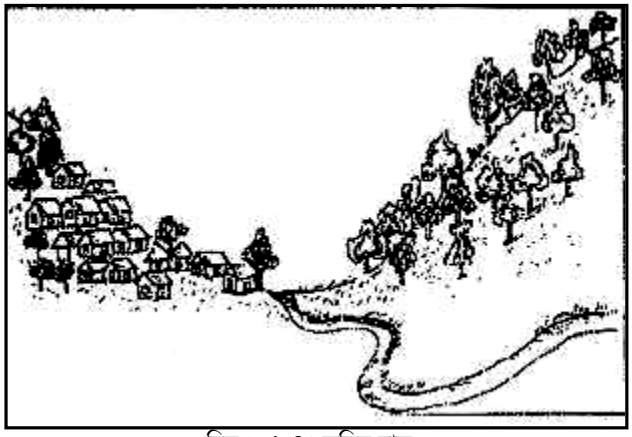
স্থলভাগের চেয়ে জলভাগ অনেক ধীরে ধীরে উত্তপ্ত হয়। কারণ পানির আপেক্ষিক তাপ ধারণ ক্ষমতা বেশি। অর্থাৎ একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সমুদ্রের পানি উত্তপ্ত হতে যে পরিমাণ তাপের দরকার হয় তার সমপরিমাণ মাটি উত্তপ্ত হতে তার থেকে কম তাপ দরকার হয়। তবে সৌরতাপ ভূমি অপেক্ষা সমুদ্রের অনেক গভীরে প্রবেশ করে তাপ বিস্তার করে। এ কারণেই অনেক দীর্ঘ সময়ে সমুদ্র উত্তপ্ত হয়। আবার তাপ বিকিরণের ক্ষেত্রে সমুদ্র পুনরায় ধীরে ধীরে তাপ হারায় যা ভূমির ক্ষেত্রে আরও দ্রুত হয়। ফলে সমুদ্র ঠান্ডা হতেও দীর্ঘ সময় লাগে। মূলত এ কারণেই গ্রীষ্মকালে উপকূলীয় এলাকা ভূ-ভাগের অভ্যন্তরের তুলনায় শীতল হয় এবং শীতকালে তুলনামূলকভাবে উষ্ণ থাকে।

৪. স্থলভাগ ও জলভাগের অবস্থান : স্থল ও জলভাগের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে আবহাওয়া ও জলবায়ুর ধরনের মধ্যে তারতম্য দেখা যায়। ভূ-পৃষ্ঠের প্রায় ৭১% জলভাগ ও অবশিষ্ট ২৯% স্থলভাগে আবহাওয়া ও জলবায়ুর পার্থক্য দেখা যায়। মূলত জল ও স্থলভাগের অসম বন্টনের জন্যই এদের ভৌত গুণাবলির বিভিন্নতা দেখা যায় যা আবহাওয়া ও জলবায়ুকে প্রভাবিত করে। সমুদ্র হলো জলভাগের সবচেয়ে বড় উৎস। সমুদ্রের পানির স্রোতের স্থানান্তর ঘটে জোয়ার ভাঁটার দ্বারা এবং এর মাধ্যমেই সমুদ্রপৃষ্ঠের বায়ু উত্তপ্ত ও পুনঃবন্টন হয়। আবার স্থলভাগ জলভাগের তুলনায় তাড়াতাড়ি উত্তপ্ত ও ঠান্ডা হয়। কারণ স্থলভাগের আপেক্ষিক তাপ জলভাগের থেকে কম।

স্থলভাগ জলভাগ থেকে তুলনামূলকভাবে বেশি তাড়াতাড়ি উত্তপ্ত হয়। কারণ জলভাগের ওপর আপতিত সূর্যরশ্মির ৭০-৯০% বাষ্পীভবনে ব্যবহৃত হয় এবং এক্ষেত্রে স্থলভাগের ওপর আপতিত সূর্যরশ্মির মাত্র ৫.৫% বাষ্পীভবনে কাজে লাগে। বাকী অংশটুকু ভূমি ও এর উপরের বায়ুমন্ডল উত্তপ্ত করার কাজে ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও স্থলভাগে জলভাগের তুলনায় উচ্চহারে সূর্যরশ্মি প্রতিফলনও একটি বড় কারণ। জলভাগ ও স্থলভাগের এ সকল ভৌত গুণাবলীর তারতম্যের কারণে জলভাগের আবহাওয়া স্থলভাগ অপেক্ষা মৃদুভাবাপন্ন। শীতকালে জলভাগের চেয়ে স্থলভাগ বেশি শীতল থাকে এবং গ্রীষ্মকালে স্থলভাগ বেশি গরম থাকে।

৫. সমুদ্রস্রোত : শীতল বা উষ্ণ সমুদ্রস্রোতের প্রভাবে উপকূল সংলগ্ন এলাকার বায়ু ঠান্ডা বা উষ্ণ হয়। যেমন- উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোতের প্রভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূলবর্তী এলাকার উষ্ণতা বেড়ে যায়। অর্থাৎ সমুদ্রস্রোত বায়ুর তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় উত্তর আমেরিকার উত্তর-পূর্ব উপকূলকে শীতল রাখে শীতল ল্যাব্রাডার স্রোত, এ কারণে শীতল ইউরোপীয় স্রোত ও উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোতের প্রভাবে একই অক্ষাংশে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও উত্তর আমেরিকার পূর্ব উপকূল ও পশ্চিম ইউরোপীয় উপকূলের তাপমাত্রার ব্যাপক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

৬. ভূমির ঢাল : ভূমির ঢালের কারণে সূর্যকিরণ পতিত হবার ধরণে পার্থক্য হয়। তাই ভূমির ঢালের অবস্থান জলবায়ু পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। যেসব এলাকায় ভূমির ঢালের জন্য সূর্যকিরণ উচুভূমির ঢাল বরাবর লম্বভাবে পতিত হয় সেখানের বায়ু বেশি উত্তপ্ত হয়।



চিত্র-৮.১.৪ঃ ভূমির ঢাল

যেমন- উত্তর গোলার্ধে কর্কটক্রান্তির উত্তরে দক্ষিণমুখী ঢাল সব সময় দ্বি-প্রহরের সূর্যের আলো পায়, অন্যদিকে দক্ষিণ গোলার্ধে মকরক্রান্তির দক্ষিণে উত্তরমুখী ঢাল সবর্দাই দ্বি-প্রহরের সূর্যালোক পায়। তবে নিরক্ষরেখা এবং কর্কটক্রান্তির মাঝে দক্ষিণমুখী ঢাল বিশিষ্ট যেসব এলাকা রয়েছে সেখানে উত্তরমুখী এলাকার থেকে দীর্ঘ সময় ধরে সূর্যের আলো পায় (চিত্র-৮.১.৪)।

৭. ভূ-প্রকৃতি : পবর্তের অবস্থান, ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থা ইত্যাদির উপর ভিত্তি করে জলবায়ুর প্রকৃতিতে পার্থক্য দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, উত্তরে পার্বত্য অঞ্চলে বায়ুপ্রবাহ বাধাপ্রাপ্ত হয়ে জলবায়ুতে প্রভাব বিস্তার করে। যেমন- গ্রীষ্মকালে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু যখন হিমালয়ে বাধাপ্রাপ্ত হয় তখন নেপাল, বাংলাদেশ, ভারতে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অধিক হয়। তবে এই বায়ুপ্রবাহ হিমালয় অতিক্রম করতে না পারায় উত্তর পাহাড়ের ঢালে এ সময় বৃষ্টিপাত হয় না। একইভাবে শীতকালে শীতল সাইবেরীয় বায়ু উচ্চ হিমালয় পবর্তে বাধাপ্রাপ্ত হয়। ফলে উত্তর ঢালে এ সময় বৃষ্টিপাত হয় না। এ সময়ে দক্ষিণে শীতের তীব্রতা ইউরোপের থেকে কম হয়।



চিত্র-৮.১.৫: ভূ-প্রকৃতি

হিমালয় পবর্তের অবস্থানের জন্য শীতল সাইবেরীয় বায়ুর প্রভাবে হিমালয়ের উত্তরাংশের চীন ভূ-খন্ডে উষ্ণতা -১০° সেলসিয়াস থেকে -৫° সেলসিয়াস এবং দক্ষিণে ভারতীয় উপমহাদেশে ২০° সেলসিয়াস থেকে ২৫° সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রা সৃষ্টি হয় (চিত্র-৮.১.৫)। অতএব বলা যায় যে, ভূ-প্রকৃতির উপর আবহাওয়া ও জলবায়ু নির্ভরশীল।

৮. বায়ুপ্রবাহ : বায়ুপ্রবাহের জন্য কোনো এলাকার জলবায়ুতে বিশেষ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন- কোনো এলাকায় যদি জলীয়বাষ্পপূর্ণ বায়ু প্রবাহিত হয় তবে ঐ এলাকায় প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। যেমন- বাংলাদেশে বর্ষাকালে মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হয়। এই বায়ু জলীয়বাষ্পপূর্ণ হওয়ায় এ সময় প্রচুর বৃষ্টি হয় কিন্তু শীতকালে শুষ্ক মহাদেশীয় বায়ুর প্রভাবে বৃষ্টিপাত প্রায় হয় না বললেই চলে।

৯. বায়ুর চাপ : বায়ুর চাপ আবহাওয়া ও জলবায়ুর অন্যতম নিয়ন্ত্রক। নিম্নচাপ বলয়ের উত্তপ্ত বায়ুপ্রবাহ উচ্চচাপ বলয়ের দিকে প্রবাহিত হওয়ায় উচ্চচাপ বিশিষ্ট শীতল অঞ্চলের তাপমাত্রা বেড়ে যায়। অন্যদিকে শীতল অঞ্চলের বায়ুপ্রবাহের কারণে নিম্নচাপ বিশিষ্ট উষ্ণ অঞ্চলের তাপমাত্রা হ্রাস পায়।

১০. বনভূমির অবস্থান : বনভূমির অবস্থান বায়ুর উষ্ণতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রকোপ ইত্যাদির হারকে কমিয়ে দিতে সাহায্য করে। বনভূমির অবস্থান বৃষ্টিপাত ঘটানোসহ আবহাওয়া ও জলবায়ুতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। গাছপালা প্রস্বেদনের সাহায্যে জলীয়বাষ্প গ্রহণ করে এবং পরিবেশে ভারসাম্য বজায় রাখে। ফলে যে কোনো স্থানের আবহাওয়া ঠান্ডা থাকে।

শিক্ষার্থীর কাজ	আবহাওয়া ও জলবায়ুর নিয়ামকগুলো কীভাবে প্রভাব বিস্তার করে ব্যাখ্যা করুন।

সারসংক্ষেপ

আবহাওয়া ও জলবায়ুর মূল নিয়ামকগুলো প্রধানত আবহাওয়া ও জলবায়ুর ধরনের মধ্যে পার্থক্য তৈরি করে। আবহাওয়া ও জলবায়ুর উপাদানসমূহ যথা-বায়ুর চাপ, বায়ুপ্রবাহ, সমুদ্রস্রোত, সমুদ্র থেকে দূরত্ব, বনভূমির অবস্থান, ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থা, উচ্চতা, অক্ষাংশ, স্থলভাগ ও জলভাগের অবস্থান, ভূমির ঢাল ইত্যাদির প্রভাবে বিশ্বের একেক অঞ্চলে একেক ধরনের আবহাওয়া ও জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

১। আবহাওয়া ও জলবায়ুর নিয়ন্ত্রক-

i. বায়ুপ্রবাহ ii. বায়ুর বাষ্পীয় প্রস্বেদন iii. ভূমির ঢাল

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i , ii ও iii

২। বাংলাদেশ, নেপাল ও ভারতে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়, কারণ-

(ক) সমুদ্র পৃষ্ঠ উত্তপ্ত হওয়ায় (খ) বায়ুপ্রবাহ হিমালয়ে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে

(গ) বায়ুর চাপ নিম্নাঞ্চলে বেশি হওয়ায় (ঘ) ভূমির ঢাল নেই বলে

৩। কক্সবাজারের জলবায়ুকে কেমন জলবায়ু বলা হয়?

(ক) চরমভাবাপন্ন (খ) মৃদুভাবাপন্ন

(গ) সমভাবাপন্ন (ঘ) নিয়তভাবাপন্ন

পাঠ-৮.২ তাপবলয় (Temperature Belt)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি -

- বায়ুর তাপ ও তাপবলয় কী তা বলতে পারবেন এবং
- বায়ুর তাপের উৎস ও তারতম্যের কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

তাপবলয়

সূর্যালোক বা সৌরশক্তি থেকে আগত যে তাপ বায়ুমন্ডলকে উত্তপ্ত করে, তাকেই বায়ুর তাপ বলা হয়। বর্তুলাকার পৃথিবীর উষ্ণতার তাপ অঞ্চলসমূহ সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠে বলয়ের ন্যায় অবস্থান করে। এরূপ বলয়কে তাপবলয় বা তাপমন্ডল বলে। সমতাপবিশিষ্ট অঞ্চলগুলোকে একই রেখা দিয়ে দেখানো যায়। এরূপ রেখার ক্ষেত্রে সমুদ্র সমতল থেকে ঊর্ধ্বদিকে সমতাপ বিশিষ্ট স্থানকে একটি কাল্পনিক রেখা দ্বারা অংকন করা হয়, যাকে সমোষ্ণরেখা বলে। এই রেখা দ্বারা কোনো স্থানের তাপের বিন্যাস ও বৈশিষ্ট্য দেখানো হয়।

বায়ুর তাপের উৎস : সূর্যরশ্মি সকল তাপের উৎস। সূর্য থেকে আগত সৌরশক্তি বায়ুমন্ডলকে উত্তপ্ত করে এবং বায়ুমন্ডলের জলীয়বাষ্প, কৃত্রিম উপাদান ও ধূলিকণার সাথে মিশে যায়। এই সকল উপাদান সৌরশক্তিকে আংশিকভাবে শোষণ করে এবং বায়ুমন্ডলকে উত্তপ্ত করে। পৃথিবীর স্থলভাগ ও জলভাগ যে তাপ গ্রহণ করে তা রাতের বেলায় তাপ বিকিরণ পদ্ধতিতে বায়ুমন্ডলে তাপ বৃদ্ধি করে। এ জন্যই পৃথিবীর সর্বত্র তাপ একই রকম হয় না।

তাপের তারতম্য : বায়ু তাপের প্রধান উৎস সূর্য। দিনের দৈর্ঘ্য বেশি হলে বায়ুমন্ডল সূর্যরশ্মি থেকে বেশি তাপ গ্রহণ করে এবং উত্তপ্ত হয়। নিরক্ষীয় অঞ্চলে সূর্যরশ্মি লম্বভাবে পতিত হওয়ায় সেখানে তাপমাত্রা বেশি হয়। এসব স্থানে সূর্যালোক কম স্থান জুড়ে বিস্তৃত হয় এবং অপেক্ষাকৃত কম বায়ুস্তর ভেদ করে। আবার বিপরীত রূপটি দেখা যায় যেসব স্থানে সূর্যালোক তিযর্কভাবে পড়ে সেখানে। এছাড়া যে বায়ুতে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ বেশি তাতে বায়ুর তাপমাত্রাও বেশি। সমুদ্রতল থেকে উপরের দিকে বায়ুর তাপ ক্রমান্বয়ে কমতে থাকে। প্রতি ৩০০ ফুট উপরে উঠলে ১° ফারেনহাইট কমে যায় অর্থাৎ ১০০০ ফুট উঠলে ৩.৩° ফারেনহাইট কমে যায়। কখনও কখনও উপরে উঠলে তাপ বৃদ্ধি পায়। একে তাপ উৎক্রম (Inversion of Temperature) বলে। অর্থাৎ স্বাভাবিক তাপ হ্রাসের হারের ঠিক বিপরীত হচ্ছে তাপমাত্রার ব্যতিক্রম বা উৎক্রম। তাপের এ উৎক্রম কখনও বায়ুপ্রাচীরজনিত কারণে সংঘঠিত হয়।

তাপমন্ডল : বায়ুমন্ডলের তাপবলয়কে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায় (চিত্র ৮.২.১)। যথা-

১। উষ্ণমন্ডল
২। উত্তর নাতিশীতোষ্ণ মন্ডল
৩। দক্ষিণ নাতিশীতোষ্ণ মন্ডল
৪। উত্তর হিমমন্ডল এবং
৫। দক্ষিণ হিমমন্ডল।

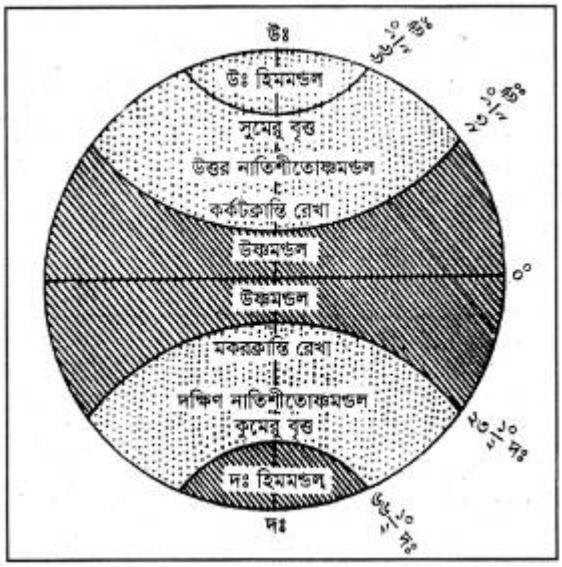
১. উষ্ণমন্ডল : নিরক্ষরেখা থেকে উভয় দিকে ক্রান্তীয় অঞ্চল পর্যন্ত তাপমাত্রা বেশি থাকায় একে উষ্ণমন্ডল বা গ্রীষ্মমন্ডল বলে। কারণ সূর্য বছরে মোট দু'বার নিরক্ষরেখার উপর লম্বভাবে কিরণ দেয়। কর্কটক্রান্তি ও মকরক্রান্তিতে সূর্য লম্বভাবে কিরণ দেয় বলে এই অঞ্চলে তাপ বেশি থাকে। এ অঞ্চলে বছরের অধিকাংশ সময় সূর্যরশ্মি খাড়াভাবে পতিত হয় এবং কোনো সময়ই দিন-রাত্রির দৈর্ঘ্যের ব্যবধান খুব বেশি হয় না।

২. উত্তর নাতিশীতোষ্ণ মন্ডল : কর্কটক্রান্তি হতে সুমেরুবৃত্ত ও মকরক্রান্তি থেকে কুমেরু বৃত্ত পর্যন্ত ২৩$^{১/২°}$ উত্তর অক্ষাংশ হতে ৬৬$^{১/২°}$ উত্তর পর্যন্ত সূর্যরশ্মি কখনো সরাসরি কখনোবা তির্যকভাবে পতিত হয়। এই দুই অঞ্চলে তখন শীত ও গ্রীষ্মের তাপের পার্থক্য হয় না। উত্তর গোলার্ধে এই মন্ডলকে বলা হয় উত্তর নাতিশীতোষ্ণ মন্ডল।

৩. দক্ষিণ নাতিশীতোষ্ণমন্ডল : দক্ষিণে **২৩**$^{১}/_{২}^{\circ}$ হতে **৬৬**$^{১}/_{২}^{\circ}$ দক্ষিণ অক্ষাংশ পর্যন্ত এলাকাটি দক্ষিণ নাতিশীতোষ্ণমন্ডল বলে পরিচিত। এখানে সারা বছরই মধ্যম উষ্ণতা থাকে। এখানকার গড় তাপমাত্রা ০-২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে থাকে।

৪. উত্তর হিমমন্ডল : সুমেরুবৃত্ত থেকে সুমেরু পর্যন্ত এবং কুমেরুবৃত্ত থেকে কৃমেরু পর্যন্ত ৬৬$^{১}/_{২}^{\circ}$ উত্তর অক্ষাংশ হতে ৯০$^{\circ}$ উত্তর অক্ষাংশ পর্যন্ত সূর্যলোক তির্যকভাবে পতিত হয়। এই এলাকায় বছরে প্রায় ছয় মাস সূর্যালোক পৌছাঁয় না বলেই প্রচন্ড শীত অনুভূত হয় এবং সারা বছরই বরফে আবৃত থাকে। উত্তর গোলার্ধের এই অংশকে বলা হয় উত্তর হিমমন্ডল।

৫. দক্ষিণ হিমমন্ডল : উত্তর গোলার্ধে যখন প্রচন্ড শীতকাল বিরাজ করে তখন দক্ষিণ গোলার্ধে অনুরূপ অবস্থা বিরাজ করে যাকে দক্ষিণ হিমমন্ডল বলে। এখানেও সারা বছর বরফে আবৃত থাকে। দক্ষিণ হিমমন্ডলের অবস্থান ৬৬$^{১}/_{২}^{\circ}$ দক্ষিণ অক্ষাংশ থেকে ৯০$^{\circ}$ দক্ষিণ অক্ষাংশ পর্যন্ত।



৮.২.১ চিত্র : পৃথিবীর তাপবলয়

শিক্ষার্থীর কাজ	বায়ুর তাপের উৎস ও তাপের তারতম্যের কারণ ব্যাখ্যা করুন।

সারসংক্ষেপ

সূর্য থেকে আসা সৌররশ্মিই তাপের প্রধান উৎস। তাপবলয় বা তাপমন্ডল মূলত ৫ টি ভাগে বিভক্ত। সমোষ্ণরেখা দ্বারা কোনো স্থানের তাপের বিন্যাস ও বৈশিষ্ট্য জানা যায়। এগুলো হলো- উষ্ণমন্ডল, উত্তর নাতিশীতোষ্ণমন্ডল, দক্ষিণ নাতিশীতোষ্ণ মন্ডল, উত্তর হিমমন্ডল এবং দক্ষিণ হিমমন্ডল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কোনটি তাপের উৎস?

(ক) বায়ুপ্রবাহ (খ) বায়ুর চাপ (গ) সূর্যের অতি বেগুনি রশ্মি (ঘ) সূর্যালোক

২। বায়ু তাপের তারতম্যের কারণ কী?

i. বায়ুর উর্ধমুখী চলাচল ii. সূর্যরশ্মি তির্যক বা লম্বভাবে পড়া iii. বায়ুতে জলীয়বাষ্পের পরিমাণের ভিত্তি

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii খ. ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩। কোনটি দক্ষিণ নাতিশীতোষ্ণ মন্ডলের বৈশিষ্ট্য?

(ক) দক্ষিণে প্রচন্ড শীত

(খ) সারা বছর মধ্যম উষ্ণতা থাকে

(গ) মকরক্রান্তি থেকে কুমেরু পর্যন্ত সূর্যরশ্মি তির্যক বা লম্বভাবে পড়া

(ঘ) কর্কটক্রান্তি থেকে সুমেরুবৃত্ত পর্যন্ত সূর্যালোক লম্বভাবে বা তির্যকভাবে পড়া

পাঠ-৮.৩ চাপবলয় (Pressure Belt)

উদ্দেশ্য

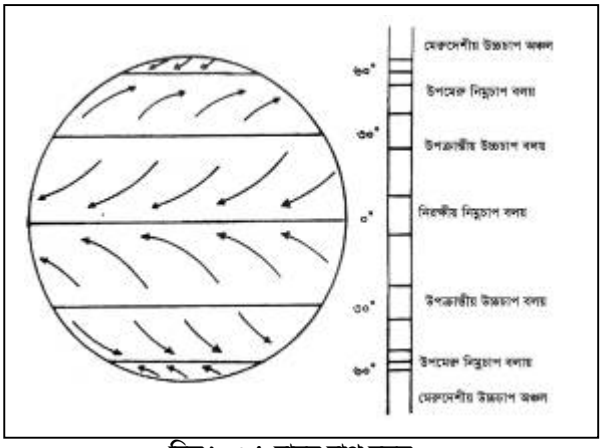
এ পাঠ শেষে আপনি-

- বায়ুচাপ ও চাপবলয় কাকে বলে তা বলতে পারবেন এবং
- চাপবলয়সমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

বায়ুর চাপ ও চাপবলয়

বায়ুর নিজের ওজোন রয়েছে। বায়ুর এ ওজোনের জন্য যে চাপ তৈরি হয় তাকে বায়ুচাপ বলা হয়। বায়ুচাপ সর্বত্র সমান নয়। কারণ ভূ-পৃষ্ঠের একেক অক্ষাংশে একেক ধরনের তাপমাত্রা লক্ষ্য করা যায়। বর্তুলাকার পৃথিবী যখন ক্রমাগত ঘুরতে থাকে তখন বায়ুমন্ডলের সবচেয়ে নিচের স্তরে যে চাপমন্ডল সৃষ্টি হয় সেগুলোকে বলা হয় চাপমন্ডল বা চাপবলয়। বায়ুর চাপবলয়গুলোকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- উচ্চচাপ বলয় এবং নিম্নচাপ বলয়। যে সকল অঞ্চলে বায়ুর চাপ বেশি সে অঞ্চলকে উচ্চচাপ বলয় এবং যে অঞ্চলে বায়ুর চাপ কম সে অঞ্চলকে নিম্নচাপ বলয় বলে। বায়ুর এ চাপ বলয়গুলো পৃথিবীর এক একটি অংশে ভূ-পৃষ্ঠকে বলয়ের ন্যায় পূর্ব-পশ্চিমে আবৃত করে অবস্থান করছে। এ ধরনের ৭টি চাপ বলয় রয়েছে। এর মধ্যে তিনটি নিম্নচাপ বলয় এবং চারটি উচ্চচাপ বলয়। নিম্নে চাপবলয়গুলো বর্ণনা করা হলো (চিত্র : ৮.৩.১)।

নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয় : নিরক্ষরেখার উভয়পাশে ০° থেকে ৫° অক্ষাংশ পর্যন্ত যেখানে সূর্য লম্বভাবে কিরণ দেয়, সেই সকল স্থান নিয়ে এই বলয় বিস্তৃত। এই অঞ্চলে বায়ুর চাপ কম থাকে কারণ পাশের অঞ্চলগুলো থেকেও এই অঞ্চলের বায়ু উষ্ণ ও লঘু। এই বলয়কে নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয় বলা হয়। এই বলয়ে বায়ুতাপ ঊর্ধ্বমুখী হওয়ার জন্য চাপের সৃষ্টি হয়।



চিত্র ৮.৩.১ বায়ুর চাপ বলয়

ক্রান্তীয় উচ্চচাপ বলয় : নিরক্ষীয় উষ্ণ, আর্দ্র ও লঘু বায়ু উত্তর ও দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে শীতল হয়ে পড়ে। এই বায়ু অনবরত উপরে উঠতে থাকলেও নিচে নামতে পারে না। এই ঊর্ধ্বমুখী উষ্ণ বায়ু উত্তর ও দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে ২৫° থেকে ৩০° ক্রান্তীয় প্রদেশে এসে বায়ু শীতল ও ভারী হয়ে ক্রমাগত নিচে নামতে থাকে। উত্তর ও দক্ষিণ অক্ষাংশের ২৫° থেকে ৩৫° মধ্যবর্তী এলাকায় যে দুটি উচ্চচাপ বলয়ের সৃষ্টি হয়েছে তাদের যথাক্রমে কর্কটীয় ও মকরীয় উচ্চচাপ বলয় বলা হয়।

উপ-মেরুবৃত্ত নিম্নচাপ বলয় : দুই মেরুবৃত্ত প্রদেশে পৃথিবীর আবর্তনের বেগ বেশি হওয়ার কারণে এ অঞ্চলের বায়ু ক্রান্তীয় অঞ্চলের দিকে সরে যায়। এই অবস্থায় দুই মেরুবৃত্ত অর্থাৎ ৬০° থেকে ৭০° অক্ষাংশের মধ্যে বায়ুর চাপ যখন কমে যায় তখন যে দুটি নিম্নচাপ বলয়ের সৃষ্টি হয় তাকে উপ-মেরুবৃত্তের নিম্নচাপ বলয় বলে।

মেরু অঞ্চলের উচ্চচাপ বলয় : যখন মেরু অঞ্চলের দুইটি উচ্চচাপ বলয় সৃষ্টি হয় তখন দুই মেরুর কাছাকাছি স্থানে প্রচন্ড শীতের জন্য বায়ু শীতল ও ভারী হয়। এই বলয় দুটিকে বলা হয় মেরু অঞ্চলের উচ্চচাপ বলয়। এই উচ্চচাপ বলয়দ্বয় থেকে বায়ু মেরুবৃত্তের নিম্নচাপ বলয়দ্বয়ের নিকট প্রবাহিত হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	চাপবলয়সমূহের বৈশিষ্ট্যগুলো লিখুন।

সারসংক্ষেপ

ক্রমাগত ঘূর্ণয়ণশীল পৃথিবীর অক্ষাংশের তাপমাত্রার পাথর্ক্যের জন্য বায়ুমন্ডলের নিম্নতম স্তরে চাপবলয়ের সৃষ্টি হয়েছে। প্রতিটি বলয়ের বায়ুর চাপের বৈশিষ্ট্য ভিন্ন। বায়ুতে দুই ধরনের চাপ বলয় রয়েছে। যথা- উচ্চচাপ বলয় এবং নিম্নচাপ বলয়। এর মধ্যে ৩টি নিম্নচাপ বলয় এবং ৪টি উচ্চচাপ বলয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√)চিহ্ন দিন।

১। ভূ-পৃষ্ঠে তাপের পার্থক্য হয় কী ভেদে?

(ক) ভূ-প্রাকৃতিক বিন্যাস ভেদে (খ) অক্ষাংশ ভেদে

(গ) বায়ুমন্ডল ভেদে (ঘ) দ্রাঘিমা ভেদে

২। নিরক্ষীয় নিম্নচাপ বলয়ের বৈশিষ্ট্য-

i. উষ্ণ ও লঘু বায়ুপ্রবাহ ii. শীতল বায়ুপ্রবাহ iii. নিরক্ষরেখার ০°- ৫° পর্যন্ত বিস্তৃত

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii খ. ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩। কোনটি উপ-মেরুবৃত্ত নিম্নচাপ বলয়ের অবস্থান কোথায়?

(ক) ২৫°- ৩০° অক্ষাংশে (খ) ০°- ৫° অক্ষাংশে

(গ) ৬০°- ৭০° অক্ষাংশে (ঘ) ২৫°- ৩৫° অক্ষাংশে

পাঠ-৮.৪ বায়ুপ্রবাহ (Air Movement)



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বায়ুপ্রবাহের সংজ্ঞা, নিয়ামক ও ধরণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।



বায়ু প্রবাহ

বায়ু ও বাতাসের মধ্যে পার্থক্য আছে। চলমান বায়ু (Air) কে বাতাস (Wind) বলে। ভূ-পৃষ্ঠের ওপর দিয়ে বায়ু সবসময়ই একস্থান হতে অন্যস্থানে প্রবাহিত হয়। ভূ-পৃষ্ঠের সমান্তরাল অর্থাৎ আনুভূমিকভাবে বায়ুর এ সঞ্চালনকে বলা হয় বায়ু প্রবাহ। বায়ুচাপের পার্থক্যই বায়ুপ্রবাহের কারণ। বায়ু সাধারণত কয়েকটি বিশেষ নিয়ম দ্বারা পরিচালিত হয়-

১. নিম্নচাপমন্ডলের উত্তপ্ত ও হালকা বায়ু যখন উপরে উঠে যায় তখন বায়ুমন্ডলে চাপের অসমতা সৃষ্টি হয়। ফলে উচ্চ তাপমন্ডল থেকে শীতল ও ভারী বায়ু সবর্দা নিম্নচাপমন্ডলের দিকে প্রবাহিত হয়।

২. পৃথিবীর পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে আবর্তনশীল এবং নিরক্ষরেখা থেকে মেরু অঞ্চলের দিকে আবর্তনের কারণে বায়ুর গতিবেগ ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায়। এ কারণেই বায়ুপ্রবাহ উত্তর গোলার্ধের ডান দিকে ও দক্ষিণ গোলার্ধে বাম দিকে বেঁকে যায়। একে ফেরেলের সূত্র বলা হয়।

বায়ুপ্রবাহের নিয়ামক : বায়ুপ্রবাহ হলো বায়ুর সমতলীয় চাপের পাথর্ক্যের ফল। পৃথিবীর ঘূর্ণন গতি না থাকলে উচ্চচাপ থেকে নিম্নচাপের দিকে বায়ুর প্রবাহ সরল ও নিয়ত হত। বায়ুপ্রবাহের নিয়ামকগুলো নিম্নরূপ-

১. চাপের ক্রমাবনতি
২. কোরিওলিস প্রভাব
৩. কেন্দ্র বিমুখী বল
৪. ঘর্ষণ এবং
৫. মাধ্যাকর্ষণ শক্তি।

চাপের ক্রমাবনতি শক্তি : মাধ্যাকর্ষণ শক্তির দ্বারা পৃথিবীর দিকে বায়ুকে টেনে নামাতে চায়, যা বায়ুচাপ নামে পরিচিত। দুটি স্থানে এই চাপের মাত্রা ভিন্ন হতে পারে। নির্দিষ্ট দূরত্বে ভূ-পৃষ্ঠের দুটি স্থানের চাপের পার্থক্যই হচ্ছে চাপের ক্রমাবনতি। সাধারণত বায়ুর তাপমাত্রার পাথর্ক্যের সাথে সাথে চাপের পার্থক্য ঘটে এবং এর ফলে বায়ুর ঘনত্বেরও পরিবর্তন ঘটে। উষ্ণ বায়ুর ঘনত্ব কম হয় বলে তা উপরের দিকে উঠে যায় এবং সে কারণে ভূ-পৃষ্ঠে চাপ থাকে। উচ্চ অক্ষাংশে শীতল ও ভারী বায়ু এ সময় এই দিকে প্রবাহিত হয়। আবার শীতল ও ভারী বায়ু নিচের দিকে চাপ সৃষ্টি করে ও উচ্চচাপ অঞ্চলের দিকে প্রবহিত হয়ে শূন্যস্থান দখল করে। বায়ুপ্রবাহের সরল ও সাধারণ উদাহরণ হচ্ছে সমুদ্র বায়ু ও স্থল বায়ু।

কোরিওলিস প্রভাব : ফেরেলের সূত্রানুযায়ী বায়ু উত্তর গোলার্ধে ডান দিকে ও দক্ষিণ গোলার্ধে বাম দিকে বেঁকে প্রবাহিত হয়। বায়ুপ্রবাহের পরিবর্তনের এই শক্তিকেই বলা হয় কোরিওলিস প্রভাব/শক্তি। গোলার্ধভিত্তিক এই পরিবর্তন কোনো প্রবাহিত চলমান বস্তুর উপর পৃথিবীর ঘূর্ণন বলের প্রভাব বলে অনুমান করা যায়। এই দিক পরিবর্তনকারী শক্তি-

১. বায়ুপ্রবাহের দিক পরিবর্তনে প্রভাব ফেলে যা সর্বদা লম্বভাবে ক্রিয়া করে।
২. কোরিওলিস শক্তি বায়ুর গতির উপর কোনো প্রভাব ফেলে না।
৩. কোরিওলিসের প্রভাব মেরুতে সবচেয়ে বেশি এবং বিষুবীয় এলাকায় অস্তিত্ব লোপ পায়।

ঘর্ষণশক্তি : বায়ুপ্রবাহের গতিতে ঘর্ষণশক্তির প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ। বায়ু যখন ভূ-পৃষ্ঠের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় তখন অসমতল ভূমিরূপের কারণে সংঘর্ষ ও ঘর্ষণের সৃষ্টি করে। ঘর্ষণ বলের মাত্রা ভূ-পৃষ্ঠের অসমতার উপর নির্ভরশীল।

আকাশচুম্বি অট্টালিকাসমৃদ্ধ নগরী অথবা পাহাড়ী অসমগঠনে ঘষর্ণ মাত্রা বেশি হয়। অন্যদিকে সমুদ্র পৃষ্ঠে বায়ুপ্রবাহ মসৃন তলের উপর কম ঘর্ষণের সৃষ্টি করে।
এছাড়াও মাধ্যাকর্ষণ ও কেন্দ্রবিমুখী বলও বায়ুপ্রবাহের উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রাখে।

শিক্ষার্থীর কাজ	বায়ুপ্রবাহের নিয়ামকসমূহের তালিকা তৈরি করুন।

সারসংক্ষেপ

বায়ুপ্রবাহ নিয়ত পরিবর্তনশীল। বায়ু চাপের পার্থক্যই বায়ুপ্রবাহের মূল কারণ। তবে বায়ুপ্রবাহের অন্যান্য নিয়ামকসমূহ বায়ু প্রবাহের গতি পরিবর্তন ও ধরণ বৈচিত্র্যে প্রভাব বিস্তার করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। নিচের তথ্যগুলো লক্ষ্য করুন-

i. বায়ুর উর্ধ্বদিক গমন করার প্রবনতা রয়েছে
ii. বায়ু সবর্দা গতিশীল
iii. বায়ুর তাপমাত্রা উর্ধমুখী হলে বায়ুর চাপও বৃদ্ধি পায়

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২। কোনটি কোরিওলিসের প্রভাবে হয় ?

(ক) বায়ুর চাপ বৃদ্ধি
(খ) বায়ুর গতি প্রবাহের পরিবর্তন
(গ) বায়ুর নিরক্ষীয় এলাকার লম্বভাবে পতিত হওয়া
(ঘ) বায়ুর দক্ষিণ গোলার্ধে ডান দিকে বেঁকে যাওয়া

৩। বায়ুর ঘর্ষণ বলের মাত্রা কীসের উপর নির্ভরশীল?

(ক) ভূ-পৃষ্ঠের অসমতার উপর
(খ) কোরিওলিস প্রভাবের উপর
(গ) বায়ুর গতির উপর
(ঘ) মাধ্যাকর্ষণ শক্তির উপর

পাঠ-৮.৫ বায়ুর আর্দ্রতা (Air Humidity)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বায়ুর আর্দ্রতা বলতে কী বুঝায় তা বলতে পারবেন এবং
- বায়ুর আর্দ্রতা পরিমাপ পদ্ধতি বর্ণনা করতে পারবেন।

বায়ুর আর্দ্রতা

নির্দিষ্ট পরিমাণ তাপ, চাপ ও আয়তনের বায়ুতে সর্বোচ্চ যে পরিমাণ জলীয়বাষ্প ধারণ করতে পারে সেই পরিমাণ জলীয়বাষ্পের উপস্থিতিকে সম্পৃক্ত অবস্থা বলা হয়। জলীয়বাষ্পজনিত বায়ুচাপ জলীয়বাষ্প চাপ নামে পরিচিত। বায়ুতে উপস্থিত এই জলীয়বাষ্প নানা কারণে হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে। যেমন-

১। তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে জলীয়বাষ্প বৃদ্ধি পায়। ২। চাপবৃদ্ধির সাথে জলীয়বাষ্প হ্রাস পায়।

বায়ুর আর্দ্রতা পরিমাপ পদ্ধতি : বায়ুর আর্দ্রতা পরিমাপের জন্য সংখ্যাতাত্ত্বিক মানে প্রকাশের ক্ষেত্রে দুটি পদ্ধতি উলে- খয্যেগ্য। এগুলো হলো-

আপেক্ষিক আর্দ্রতা (Relative Humidity) : নির্দিষ্ট পরিমাণ বায়ুতে কোনো নির্দিষ্ট সময়ে যে পরিমাণ জলীয়বাষ্প উপস্থিত থাকে তার পরিমাণকে বলা হয় বায়ুর আপেক্ষিক আর্দ্রতা। আপেক্ষিক আর্দ্রতা দ্বারা বায়ুর চাপ বা তাপমাত্রার কোনো তারতম্য ঘটে না বরং তাপমাত্রা বেড়ে গেলে বায়ুতে জলীয়বাষ্প ধারণ ক্ষমতাও বাড়তে থাকে। এ কারণেই আপেক্ষিক আর্দ্রতার মান জলীয়বাষ্পের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া সাপেক্ষে তাপমাত্রার বৃদ্ধির ফলে বৃদ্ধি পায়। সাধারণত বায়ুতে যে পরিমাণ জলীয়বাষ্প উপস্থিত থাকে তার মান গ্রাম/কিলোগ্রামে প্রকাশ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, এই মান একক আয়তনের বায়ুর মধ্যে উপস্থিত জলীয়বাষ্পের পরিমাণকে বুঝায়। যেমন- এক কিলোগ্রাম বায়ুতে এক গ্রাম জলীয়বাষ্প আছে।

তুল্য আর্দ্রতা (Absolute Humidity) : কোনো নির্দিষ্ট আয়তনের বায়ুতে অবস্থিত জলীয়বাষ্পের প্রকৃত পরিমাপকে তুল্য আর্দ্রতা বলে। তুল্য আর্দ্রতা দুই পদ্ধতিতে পরিমাপ করা যায়। যথা- হাইগ্রোমিটার এবং সাইক্রোমিটার। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ২৫০° সে. তাপমাত্রায় সম্পৃক্ত ১ কিলোগ্রাম বায়ুতে ২০ গ্রাম জলীয়বাষ্প থাকে। যদি কোনো সময়ের বায়ুতে উপস্থিত জলীয়বাষ্পের পরিমাণ ১০ গ্রাম হয় তবে ঐ সময়ের তুল্য আর্দ্রতা হবে ১০/২০ অথবা ৫০ শতাংশ। তুল্য আর্দ্রতার সাথে শিশিরাঙ্কের সম্পর্ক রয়েছে। যে তাপমাত্রার বায়ু জলীয়বাষ্পে সম্পৃক্ত হয় তা শিশিরাঙ্ক নামে পরিচিত। অর্থাৎ বায়ুতে উপস্থিত জলীয়বাষ্প দ্বারা ঐ বায়ুতে সম্পৃক্ত করতে হলে যে তাপমাত্রা পর্যন্ত শীতল করা প্রয়োজন সেই তাপমাত্রাকে শিশিরাঙ্ক (Dew Point) বলে। শিশিরাঙ্কের চেয়ে কম তাপমাত্রার বায়ুস্থ জলীয়বাষ্প শিশির (Dew) হিসেবে জমে যেতে পারে।

(শিক্ষার্থীর কাজ)	বায়ুর আর্দ্রতা কীভাবে পরিমাপ করা যায় তা ব্যাখ্যা করুন।

সারসংক্ষেপ

নির্দিষ্ট পরিমাণ তাপ, চাপ ও আয়তনে বায়ুর সর্বোচ্চ যে পরিমাণ জলীয়বাষ্প ধারণ করতে পারে সেই পরিমাণ জলীয়বাষ্পের উপস্থিতিকে বায়ুর আর্দ্রতা বলে। এই আর্দ্রতা প্রকাশ করা যায় দুইভাবে। যথা- বায়ুর আপেক্ষিক আর্দ্রতা ও তুল্য আর্দ্রতা। তুল্য আর্দ্রতাকে দুটি পদ্ধতি দ্বারা পরিমাপ করা যায়। যথা- হাইগ্রোমিটার এবং সাইক্রোমিটার।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৮.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। তুল্য আর্দ্রতা পরিমাপ পদ্ধতি হলো-

i. হাইক্রোমিটার ii. হাইগ্রোমিটার iii. সাইক্রোমিটার iv. সাইট্রোমিটার

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক) i ও ii (খ) ii ও iii গ i ও iii (ঘ) i ও iv

২। তুল্য আর্দ্রতার সাথে কীসের সম্পর্ক আছে ?

(ক) শিশিরাঙ্কের (খ) বায়ুর ঘনত্ব (গ) বায়ুর তাপমাত্রা (ঘ) কুয়াশা

পাঠ-৮.৬ কুয়াশা ও মেঘ (Fog and Cloud)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- কুয়াশা ও মেঘের সংজ্ঞা বলতে পারবেন এবং
- কুয়াশা এবং মেঘের গঠন ও শ্রেণিবিভাগ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

কুয়াশা

জলীয়বাষ্প যখন বায়ুস্তরের ভাসমান ধূলিকণাকে আশ্রয় করে ঘনীভূত হয়ে ধোঁয়ার আকারে ভাসতে থাকে তখন তাকে কুয়াশা বলে।

কুয়াশার বৈশিষ্ট্য : বায়ুর তাপমাত্রা শিশিরাংকের নিচে নেমে গেলে কুয়াশা সৃষ্টি হয়। বায়ুমন্ডলের বিকিরণ, তাপ পরিবহন এবং শীতল ও উষ্ণ বায়ুর সংমিশ্রণের ফলে কুয়াশা সৃষ্টি হয়। কুয়াশা মানবজীবনে ইতিবাচক ও নেতিবাচক উভয় প্রকার প্রভাব বিস্তার করে । যেমন-

১। সামুদ্রিক জাহাজ, উড়োজাহাজ, সড়কপথে যান চলাচলে বিঘ্ন ঘটায়।

২। কুয়াশার জলকণা ভূ-পৃষ্ঠের বিকীর্ণ তাপকে শোষণ করে বায়ুকে উষ্ণ রাখে। তবে শীতপ্রধান দেশে কুয়াশা জন্য শস্যের ক্ষতি হয়।

৩। কুয়াশা ঘন হয়ে ইলশেগুড়ির মত জলকণা বর্ষণ হলে তাকে বলা হয় কুঞ্জঝটিকা।

কুয়াশার শ্রেণিবিভাগ : উৎপত্তির বিভিন্নতার উপর ভিত্তি করে কুয়াশাকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। যথা-

১. বিকিরণজনিত কুয়াশা : শীতল ভূ-পৃষ্ঠের সংস্পর্শে এসে ভূমি সংলগ্ন আর্দ্র বায়ুস্তর যখন শীতল হয়ে যায় তখন বিকিরণজনিত কুয়াশার সৃষ্টি হয়। বায়ুপ্রবাহ যদি ঘন্টায় ৬-১০ মাইলের বেশি হয় তখন এই ধরনের কুয়াশা শিল্পনগরীতে বেশি দেখা যায়। কারণ ঐ সব এলাকায় বায়ুতে যে ধোঁয়া থাকে তা জলাকর্ষী কণা হিসেবে কাজ করে।

২. আনুভূমিক বায়ুসঞ্চালন ও বিকিরনজনিত কুয়াশা : উষ্ণ ও আর্দ্র বায়ু শীতল ভূ-পৃষ্ঠের উপর তাপ বিকিরণ করে শীতল হয়ে এই ধরনের কুয়াশার সৃষ্টি হয়। সমুদ্র উপকূল এবং বৃহৎ হ্রদে এই ধরনের কুয়াশা সৃষ্টি হয়। মেরু অঞ্চলে অনুসন্ধানকারীরা এই ধরনের বাষ্পীয় কুয়াশা দেখে উন্মুক্ত জলভাগ এড়িয়ে চলতে পারে।

৩. বায়ুপ্রাচীরজনিত কুয়াশা : ভিন্ন তাপ ও আর্দ্রতা বিশিষ্ট দুইটি পৃথক বৈশিষ্ট্যের বায়ুপুঞ্জ মিলিত হলে তাদের মধ্যবর্তী স্থানের ঢালু সীমান্তকে বলা হয়। বায়ুপ্রাচীর দুইটি বায়ুপুঞ্জের মধ্যে উষ্ণ বায়ুপুঞ্জ উপরে উঠে যায় এবং শীতল ও ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টিপাত ঘটায়। বৃষ্টির ফলে নিচে অবস্থান করা শীতল বায়ুপুঞ্জ আরও জলীয়বাষ্প সংযোজন করে এবং এভাবে বায়ুপুঞ্জ যখন শীতল হয় তখন বায়ুপ্রাচীরজনিত কুয়াশার সৃষ্টি হয়।

মেঘ (Cloud)

বায়ুতে ভাসমান জলীয়বাষ্প কোনো কারণে শীতল হলে অতিক্ষুদ্র পানিকণা ও তুষার কণায় পরিণত হয়ে বায়ুমন্ডলের সূক্ষ্ম ধূলিকণায় আশ্রয় নিয়ে ভেসে বেড়ায়। বাতাসে ভাসমান এরূপ ছোট ছোট পানিকণা বা তুষারকণাকে মেঘ বলে (চিত্র ৮.১.৫)।



চিত্র-৮.১.৫ : মেঘ

মেঘ সৃষ্টির প্রক্রিয়া হয় (Process of Cloud Formation) : আমাদের চতুর্দিকের বায়ুতে সর্বদা জলীয়বাষ্প থাকে। নদ-নদী, সমুদ্র, হ্রদ, জলাশয়, বৃক্ষ প্রভৃতি হতে বাষ্পীভবনের দ্বারা বায়ু জলীয়বাষ্প গ্রহণ করে থাকে। বায়ু অপেক্ষা জলীয়বাষ্প হাল্কা হওয়ায় জলীয়বাষ্প ঊর্ধ্বে উঠে যায়। বায়ুমন্ডলের ঊর্ধ্বভাগ অপেক্ষাকৃত শীতল এবং বায়ুর চাপ কম। জলীয়বাষ্প বেশি চাপ হতে কম চাপে নীত হলে তা আয়তনে বেড়ে যায় এবং অপেক্ষাকৃত শীতল হয়। এ কারণে বায়ু

উর্ধ্বে উঠলে শীতল হয় এবং জলীয়বাষ্প পানিকণা বা বরফ কণায় পরিণত হয়। এ পানিকণা বা বরফকণা হালকা বলে আকাশে ভাসমান ধূলিকণায় আশ্রয় নিয়ে ভেসে বেড়ায় এবং মেঘের সৃষ্টি হয়।

মেঘের প্রকারভেদ (Types of Couds) : উচ্চতা অনুসারে মেঘকে তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়। যথা–

ক. উঁচু মেঘ
খ. মধ্যম উঁচু মেঘ এবং
গ. নিচু মেঘ।

ক. উঁচু মেঘ (High Cloud) : উঁচু মেঘের উচ্চতা সাধারণত ৬,০০০ মিটার হতে ১২,০০০ মিটার।

খ. মধ্যম উঁচু মেঘ (Medium High Cloud) : এ মেঘ ২,০০০ হতে ৬,০০০ মিটার উচ্চতায় উৎপন্ন হয়।

গ. নিচু আকাশের মেঘ (Low Colud) : ভূ-পৃষ্ঠের নিকটবর্তী অঞ্চলে ২,০০০ মিটারের মধ্যে এ জাতীয় মেঘ গঠিত হয়। এটি অপেক্ষাকৃত ভারী বলে আকাশের নিচে ভেসে বেড়ায়।

শিক্ষার্থীর কাজ	কুয়াশার বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণিবিভাগ করুন।

সারসংক্ষেপ

পৃথিবী পৃষ্ঠের নিকটবর্তী ভাসমান স্তর মেঘের মত জলকণাকে বলা হয় কুয়াশা। অন্যদিকে জলীয়বাষ্প ঘনীভূত হয়ে মেঘ সৃষ্টি হয়। কুয়াশা ও মেঘ তাদের গঠনগত বৈশিষ্ট্যের জন্য কয়েকটি শ্রেণিতে বিভক্ত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কুয়াশা দেখতে কীসের মত ?
(ক) মেঘের মত (খ) ধূলিকণার মত
(গ) বৃষ্টির মত (ঘ) ধোঁয়ার মত

২। *আনুভূমিক বায়ুসঞ্চালন ও বিকিরণজনিত কুয়াশার বৈশিষ্ট্য-*
i. উষ্ণ ও উর্দ্র বায়ু ভূ-পৃষ্ঠে তাপ বিকিরণ করে শীতল হয়ে যায়।
ii. শুষ্ক ও শীতল বায়ু সমুদ্রে পৃষ্ঠে পতিত হয়।
iii. হঠাৎ বারিপাত এবং শিশির কণা উষ্ণ হয়ে যাওয়া।
iv. সমুদ্র উপকূল ও বৃহৎ হ্রদে এই ধরনের কুয়াশা দেখা যায়।
নিচের কোনটি সঠিক ?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii গ i ও iii (ঘ) i ও iv

৩। কোনটি মেঘের বৈশিষ্ট্য নয়?
(ক) মেঘ ও বজ্রঝড় একই বস্তু নয় (খ) মেঘ অসংখ্য জলকণা ও বরফকণার সৃষ্টি
(গ) মেঘ হলো জলীয়বাষ্পের ঘনীভূত রূপ (ঘ) মেঘ হলো তুষারকণার সাথে কুয়াশার মিলিত রূপ

৪। মেঘকে প্রধানত কয়ভাগে ভাগ করা যায় ?
(ক) ৩ (খ) ৪
(গ) ৫ (ঘ) ৬

পাঠ ৮.৭ বৃষ্টিপাত (Rainfall)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

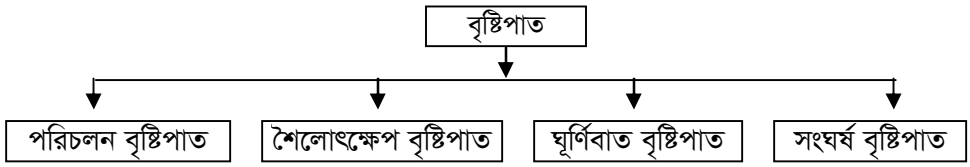
- বৃষ্টিপাতের সংজ্ঞা বলতে পারবেন এবং
- বৃষ্টিপাতের শ্রেণিবিভাগ ও পরিমাপ পদ্ধতিগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বৃষ্টিপাত

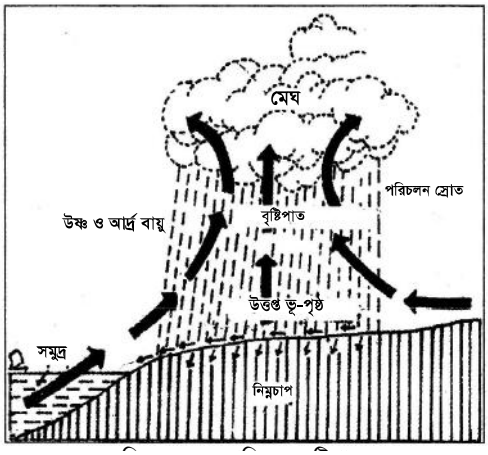
জলীয়বাষ্পপূর্ণ বায়ু উপরে উঠে শীতল হয়ে যায় ও ঘনীভূত হয়ে মেঘে পরিণত হয়। এই মেঘের মধ্যে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পানির কণা থাকে তা মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানে ভূ-পৃষ্ঠে পতিত হয়। মূলত পানির কণাগুলো যখন বড় বড় কণায় পরিণত হয়ে ভূ-পৃষ্ঠে নেমে আসে তাকেই বলা হয় বৃষ্টিপাত।

সমুদ্র, নদ-নদী, জলাশয়, উদ্ভিদ প্রভৃতি থেকে পানি জলীয়বাষ্পে পরিণত হয়। বাষ্পীভবন (Evaporation) প্রক্রিয়ার একটি নির্দিষ্ট উষ্ণতায় বায়ুর জলীয়বাষ্প ধারণ ক্ষমতা নির্দিষ্ট। যেমন- ১০° সেলসিয়াস উত্তাপে প্রতি ঘনমিটার বায়ু ৯.৪১ গ্রাম বাষ্প ধারণ করে এবং এই অবস্থাকে বলা হয় বায়ুর সম্পৃক্ত। বায়ুর তাপমাত্রা ১০° সেলসিয়াস থেকে কম হলে তার জলীয়বাষ্প ধারণ ক্ষমতাও হ্রাস পায়। এই ধরনের ঘনীভবনের (Condensation) সাহায্যে অতিরিক্ত জলীয়বাষ্প বৃষ্টিপাত ঘটায়। বৃষ্টিপাত কঠিন ও তরল দুই ধরনেরই হতে পারে। জলীয়বাষ্পের শিশিরাংক যদি শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস বা হিমাংকের নিচে নেমে যায় তখন জলীয়বাষ্প তুষার ও বরফরূপে ভূ-পৃষ্ঠে পতিত হয়। আবার হিমাংক শিশিরাংকের ওপর থাকলে ঘনীভবনের মাধ্যমে শিশির, কুয়াশা বা বৃষ্টি আকারে পৃথিবী পৃষ্ঠে নেমে আসে।

বৃষ্টিপাতের শ্রেণিবিভাগ : ৪টি উপায়ে জলীয়বাষ্পপূর্ণ বায়ু ঊর্ধ্বাকাশে উত্থিত হয়ে বৃষ্টিপাত ঘটায় বলে বৃষ্টিপাতকে প্রধানত ৪টি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-



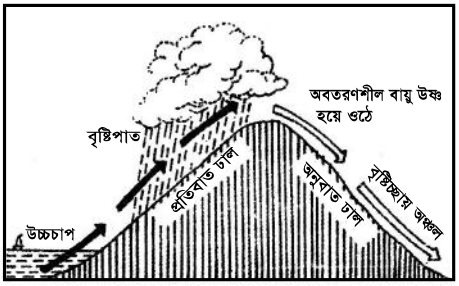
১. পরিচলন বৃষ্টিপাত (Conventional Rainfall) : ভূ-পৃষ্ঠের বায়ু উষ্ণ হলে জলীয়বাষ্প সম্পন্ন হালকা বায়ু উপরে উঠে যায়। এ সময়ে শীতল বায়ুর সংস্পর্শে এসে ঐ জলীয়বাষ্প প্রথমে মেঘ ও পরে বৃষ্টিতে পরিণত হয়ে নিচে নেমে আসে। এই বৃষ্টিপাতকে বলা হয় পরিচলন বৃষ্টিপাত। পরিচলন বৃষ্টিতে বায়ুর তাপ হ্রাস পেয়ে যখন অতিরিক্ত জলীয়বাষ্প ঘনীভূত হয় তখন এ ধরনের বৃষ্টিপাত ঘটায়। নিরক্ষীয় নিম্নচাপ এলাকায় পরিচলন বৃষ্টিপাত বেশি হয় কারণ এসব এলাকার ঊর্ধ্বগামী বায়ুতে প্রচুর জলীয়বাষ্পপূর্ণ বায়ু থাকে। নিরক্ষীয় এলাকায় স্থলভাগের থেকে জলভাগের বিস্তৃতি বেশি এবং এখানে লম্বভাবে সূর্যকিরণ পতিত হয়। এই অঞ্চলে হালকা জলীয়বাষ্পপূর্ণ বায়ু থাকে। হালকা জলীয়বাষ্পপূর্ণ বায়ু যখন শীতল বায়ুর সংস্পর্শে আসে তখন পরিচলন বৃষ্টিপাত ঘটায়। নিরক্ষীয় অঞ্চলে প্রায় সারা বছরই বিকেলে ও সন্ধ্যায় এ ধরনের বৃষ্টি হয়। নাতিশীতোষ্ণ মন্ডলে গ্রীষ্মকালের শুরুতে পরিচলন বৃষ্টিপাত হয়।



পরিচলন বৃষ্টি নিম্নলিখিত পর্যায় অনুসারে ঘটে থাকে-

- সূর্যের তাপে ভূ-পৃষ্ঠ দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে উঠে।
- ভূ-পৃষ্ঠের উপরে অবস্থিত উষ্ণ ও হালকা বায়ু উপরে উঠে গিয়ে পরিচলনের সৃষ্টি করে।
- ঊর্ধ্বমুখী বায়ু যখন শীতল হতে থাকে তখন বায়ুতে যথেষ্ট পরিমাণ জলীয়বাষ্পের উপস্থিতিতে ঘনীভবন হয়।
- ঘনীভবনের ফলে মেঘ উপরের দিকে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে ঝড়োপুঞ্জ মেঘের সৃষ্টি করে। এ ধরনের মেঘ থেকে ঝড়সহ মুষলধারে বৃষ্টি এবং কখনো কখনো শিলাবৃষ্টি ও বজ্রপাত হয় (চিত্র- ৮.৭.১)।

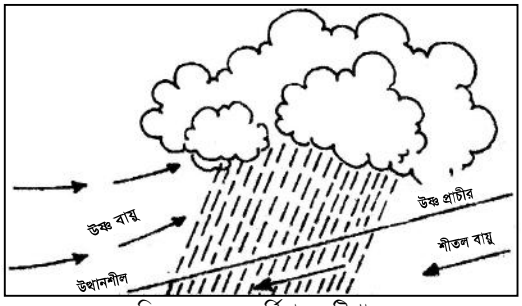
২. **শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টিপাত (Orogaphic Rainfall) :** জলীয়বাষ্পপূর্ণ উষ্ণ ও আর্দ্র বায়ু ভূ-পৃষ্ঠের উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় পর্বতে বাধাপ্রাপ্ত হলে তা পর্বতের ঢাল বেয়ে উপরের দিকে উঠে যায়। এই বায়ু শীতল হয়ে পর্বতের প্রতিবাত ঢালে যে বৃষ্টিপাত ঘটায় তাকে শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টিপাত বলে (চিত্র-৮.৭.২)। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু মেঘালয় পাহাড়ে বাধা পাওয়ায় সিলেট এলাকায় প্রচুর শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টি হয়। তবে পর্বত অতিক্রমকারী বায়ু যদি পর্বতের অপর পাশে অর্থাৎ অনুবাত ঢালে পৌঁছায় তখন ঐ বায়ুতে জলীয়বাষ্প কম থাকে। ঐ বায়ু নিচে নামার ফলে আরও উষ্ণ এবং শুষ্ক হয়ে উঠায় ঐ স্থানে বৃষ্টিপাত হয় না। এই বৃষ্টিহীন স্থানকে বলা হয় বৃষ্টিচ্ছায় অঞ্চল (Rain-Shadow Region)।



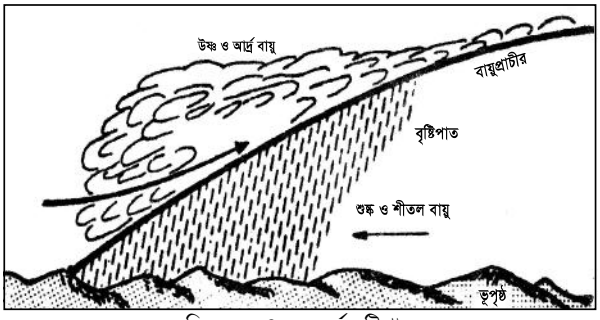
চিত্র-৮.৭.২: শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টিপাত

৩. **ঘূর্ণিবাত বৃষ্টি (Cyclonic Rainfall):** ঘূর্ণিবাত কেন্দ্রের বায়ু যখন উপরে উঠে যায় তখন তাপমাত্রা হ্রাস পায় ও শীতল হয়। এ সময় বায়ুতে থাকা জলীয়বাষ্প অতিরিক্ত ঘনীভূত হয়ে ঘূর্ণিবাত বৃষ্টিপাত ঘটায় (চিত্র-৮.৭.৩)।

৪. **সংঘর্ষ বৃষ্টিপাত (Frontal Rainfall):** শীতল ও উষ্ণ বায়ুপুঞ্জ যখন মুখোমুখি হয় তখন শীতল বায়ুর সংস্পর্শে উষ্ণ বায়ুর তাপমাত্রা হ্রাস পায় এবং শিশিরাঙ্কে পৌঁছায়। পরে আরও ঘনীভূত হয়ে বায়ুপুঞ্জ সংযোগস্থলে বৃষ্টিপাত ঘটায়। এই প্রকার বৃষ্টি সংঘর্ষ বৃষ্টিপাত নামে পরিচিত। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে এই ধরনের বৃষ্টি দেখা যায় (চিত্র-৮.৭.৪)।



চিত্র-৮.৭.৩ : ঘূর্ণিবাত বৃষ্টিপাত



চিত্র-৮.৭.৪ : সংঘর্ষ বৃষ্টিপাত

বৃষ্টিপাতের পরিমাপ : বৃষ্টিপাত সহজেই পরিমাপ করা যায় বৃষ্টি মাপনী যন্ত্র (Rain Gauge) দিয়ে। সময়ের সাথে বৃষ্টিপাতের তীব্রতা পরিমাপের জন্য বিভিন্ন ধরনের অত্যাধুনিক মাপনী যেমন- ওজোন মাপনী, টিপি, বাকেট মাপনী ব্যবহার করা হয়। বৃষ্টি মাপনী একটি তামারতলা যুক্ত খোলা মুখবিশিষ্ট চোঙ যার ভিতরে একটি ফানেলসহ কাঁচের পাত্র বসানো থাকে। মূল তামার চোঙটি মাটিতে এমনভাবে বসানো থাকে যাতে এর ওপরের অংশ ৩০ সেন্টিমিটার মাটির ওপরে থাকে। কাচের পাত্রে দাগ দেয়া থাকায় যে পানি সংগ্রহ করা হয় তার পরিমাণ সহজেই পরিমাপ করা যায়। বর্ষাকালে প্রতি ২৪ ঘন্টায় কয়েকশবার মাপনী যন্ত্র খালি করা হয়। এই মাপনী যন্ত্রটি খোলা জায়গায় বসানো হয় যাতে কোনো দালানের পানি বা গাছের মাধ্যমে পানি চুইয়ে পাত্রে জমা না হয়। এছাড়াও ফানেলের উপস্থিতির জন্য সূর্যালোকও সরাসরি প্রবেশ করে না এবং বাষ্পীভবনও ঘটে না। বৃষ্টিপাত পরিমাপের সময় খেয়াল রাখতে হবে-

১। মাপনীর কাছে বায়ু আড়াল থাকবে কারণ বায়ু ও বায়ুপ্রবাহ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বৃষ্টিপাত পরিমাপে বাধা সৃষ্টি করে।
২। বৃষ্টিপাত মাপনীযন্ত্র উন্মুক্ত স্থানে রাখা হয়।
৩। তুষারপাত পরিমাপের জন্য পুরুত্ব ও পানির সমতাকে পরিমাপ করা হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	বৃষ্টিপাত মাপনী যন্ত্র সম্পর্কে লিখুন।

সারসংক্ষেপ

জলীয়বাষ্পপূর্ণ বায়ু ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টিপাত সংঘটিত হয়। বৃষ্টিপাতকে চারটি ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলো হলো- পরিচলন বৃষ্টিপাত, শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টিপাত, ঘূর্ণিবাত বৃষ্টিপাত এবং সংঘর্ষ বৃষ্টিপাত। বৃষ্টি মাপনী যন্ত্র দ্বারা বৃষ্টিপাত পরিমাপ করা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। নদ-নদী, সমুদ্রের পানি থেকে কোন প্রক্রিয়ায় জলীয়বাষ্প সৃষ্টি হয়?
(ক) বারিপাত (খ) ঘনীভবন
(গ) তুষারপাত (ঘ) বাষ্পীভবন

২। বর্ষাকালে বৃষ্টিপাত মাপনের যন্ত্রটিতে কতবার পানি পরিবর্তন করা হয় ?
(ক) ১ দিনে ৬ বার (খ) ৩ দিন পর পর
(গ) ১ দিনে কয়েকশ বার (ঘ) ১ দেড় মিনিট পর পর

৩। আধুনিক পদ্ধতিতে বৃষ্টিপাত পরিমাপ করা হয় কোন যন্ত্রের দ্বারা ?
(ক) পানি সমতা মাপনী (খ) ওজোন মাপনী
(গ) টিপিং বাকেট মাপনী (ঘ) রেইন ড্রপ বাকেট মাপনী

পাঠ-৮.৮ কালবৈশাখী (The Nor'wester)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- কালবৈশাখী ঝড় ও এর বৈশিষ্ট্যগুলো বলতে পারবেন।

কালবৈশাখী

বাংলাদেশে বিভিন্ন ধরনের ধ্বংসাত্মক প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে কালবৈশাখী ঝড় সুপরিচিত। কালবৈশাখী ঝড় বায়ুপ্রবাহ ও ভারী বৃষ্টিপাতের সাথে সংঘটিত হয়। কালবৈশাখী ঝড় ভারী বৃষ্টিপাত ও বজ্রসহ ভূ-পৃষ্ঠের উপর আঘাত হানে। এতে ঘর-বাড়ি, গাছ-পালা, ফসলি জমি ক্ষতিগ্রস্থ হয় এবং মানুষ ও পশু-পাখি মারা যায়। বাংলাদেশের ঢাকায় ২০১৫ সালের ১৪ এপ্রিলে সংঘটিত কালবৈশাখী ঝড়ে অন্তত ২৪ জন মানুষ মারা গেছে ও শতাধিক মানুষ আহত হয়েছে। মধ্য এপ্রিল থেকে মধ্য মে মাসের মধ্যে কালবৈশাখী ঝড় তীব্র রূপ ধারণ করে। মূলত আর্দ্র ও শুষ্ক বায়ুপুঞ্জ পরস্পর মুখোমুখি হলে এইরূপ কালবৈশাখী ঝড়ের সৃষ্টি হয়। কালবৈশাখী সাধারণত বাংলাদেশের মধ্যভাগে বিশেষ করে ঢাকা, পাবনা, ফরিদপুর এলাকায় আঘাত হানে। কালবৈশাখীর গতি প্রতি ঘণ্টায় ৪০ হতে ৮০ কিলোমিটার। অনেক সময় এ ঝড়ের গতি ঘণ্টায় ১২৮ কিলোমিটারেরও বেশি হয়ে থাকে। কালবৈশাখী মূলত ভূমিতে আঘাত হানে তবে এর প্রভাব সাইক্লোনের থেকে তুলনামূলক কম ধ্বংসাত্মক। মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে এপ্রিল মাস পর্যন্ত বাংলাদেশের তাপমাত্রা পূর্ববর্তী মাসগুলির (শীতকালের মাসগুলি) তুলনায় দ্রুত বাড়তে থাকে। এপ্রিল মাসের মাঝামাঝিতে সারা দেশে বিশেষ করে দেশের উত্তর-পশ্চিমাংশে দৈনিক তাপমাত্রা সর্বোচ্চ পরিমাণে বৃদ্ধি পায়। বায়ুমন্ডলের নিম্নস্তরে উষ্ণ ও আর্দ্র বায়ুর উপস্থিতি কালবৈশাখী সৃষ্টির অপরিহার্য পূর্বশর্ত। অস্থিতিশীল বায়ুমন্ডল আর দ্রুত পরিচলন ক্রিয়া কালবৈশাখীর উৎপত্তি ও বৃদ্ধির জন্য গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক।

কালবৈশাখীকে বায়ুপুঞ্জ বজ্রঝড় অথবা পরিচলনগত বজ্রঝড় নামেও আখ্যায়িত করা যায়। বাংলাদেশে কালবৈশাখী সৃষ্টির প্রধান কারণ দেশের দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে আসা উষ্ণ ও আর্দ্র বায়ু যা ঊর্ধ্বে ২ কিলোমিটার পর্যন্ত আরোহন করে থাকে এবং এ উষ্ণ ও আর্দ্র বায়ু উত্তর-পশ্চিম এবং পশ্চিম দিক থেকে আসা অপেক্ষাকৃত শীতল ও শুষ্ক বায়ুর সঙ্গে মিলিত বা মুখোমুখি হয়। উষ্ণ ও আর্দ্র বায়ু ছোটনাগপুর মালভূমিতে সৃষ্টির পর পূর্বদিকে ধাবিত হয়ে বাংলাদেশের সীমায় উপস্থিত হয়। বিপরীতধর্মী ও অসম এ দু বায়ুপ্রবাহের মুখোমুখি হওয়ার ফলে প্রাক-কালবৈশাখীর সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশ এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গে বজ্র-বিদ্যুৎপূর্ণ ঝড় সৃষ্টি হয়। এই ঝড় বৈশাখ মাসে কখনও চৈত্র মাসে উত্তর-পশ্চিম দিক হতে আসে বলে একে কালবৈশাখী ঝড় বা গ্রীষ্মকালীন উত্তর পশ্চিম ঝড় বা বজ্রবিদ্যুৎপূর্ণ ঝড়বৃষ্টি বলা হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	কালবৈশাখী ঝড় সর্ম্পকে লিখুন।

সারসংক্ষেপ

কালবৈশাখী ঝড় এমনই প্রাকৃতিক দুর্যোগ যা প্রায় প্রতিবছর বাংলাদেশে আঘাত হানে। আর্দ্র ও শুষ্ক বায়ুপুঞ্জের মুখোমুখি সংঘর্ষের ফলাফল এই ঝড় অত্যন্ত ধ্বংসাত্বক প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এর ফলে জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কোনটি কালবৈশাখী ঝড়ের বৈশিষ্ট্য?

(ক) গুড়িগুড়ি বৃষ্টি ও বজ্রপাত
(খ) ভারী বৃষ্টিপাত ও ঝড়ো বায়ুপ্রবাহ
(গ) বজ্রপাত ও টানা বৃষ্টিপাত
(ঘ) সমুদ্র উপকূলে ঝড়ের আঘাত

২। কালবৈশাখী ঝড় কোথায় আঘাত হানে?

(ক) নদীতে (খ) ফসলি জমিতে (গ) সমুদ্রে (ঘ) ভূমিতে

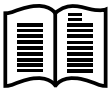
পাঠ-৮.৯ ঘূর্ণিঝড় (Cyclone)



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ঘূর্ণিঝড়ের উৎপত্তি ও বৈশিষ্ট্য বলতে পারবেন এবং
- ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।



ঘূর্ণিঝড়

ঘূর্ণিঝড় হলো একটি অন্যতম প্রাকৃতিক দুর্যোগ যা প্রাকৃতিক পরিবেশ, মানুষ ও প্রাণিজগতের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি করে। সারা বিশ্বে ঘূর্ণিঝড় নানা নামে পরিচিত। যেমন- চীন ও জাপানের উপকূলে টাইফুন, ভারত মহাসাগরে সাইক্লোন, ফিলিপাইনের উপকূলে বাগুই, অস্ট্রেলিয়ার উপকূলে উইলি উইলিছ, ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জ ও মেক্সিকো উপসাগর অঞ্চলে হারিকেন প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হয়।

উৎপত্তি : অনিয়মিত বায়ুর উৎকৃষ্ট উদাহরণ হলো ঘূর্ণিঝড় (Cyclone) ও প্রতীপ ঘূর্ণিঝড় (Anti-cyclone)। উপরের ও নিচের বায়ুর পারস্পরিক ক্রিয়ার মাধ্যমে এই ঘূর্ণিঝড় সংঘটিত হয়। আমাদের দেশে প্রায় প্রতি বছর সাধারণত মার্চ ও নভেম্বর মাসে ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে।

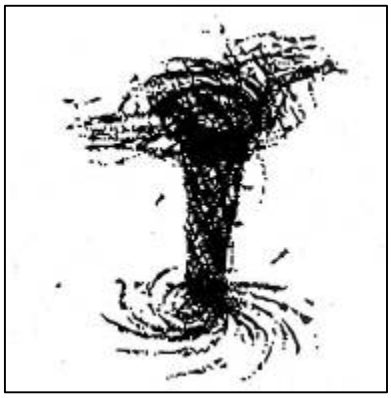
ঘূর্ণিঝড়ের বৈশিষ্ট্যসমূহ : ঘূর্ণিঝড়ের সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নে আলোচনা করা হলো-

- ঘূর্ণিঝড়ের সময় পশ্চিমা বায়ু প্রবাহ দ্বারা মধ্য অক্ষাংশ অঞ্চলের নিম্নচাপ ও উচ্চচাপ পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়।
- এই ঝড়ের সময় বায়ুপ্রবাহের গতিবেগ ঘন্টায় ৬৫ কি.মি বা তারও বেশি হয়। এছাড়াও নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়।
- দ্রুত উর্দ্ধগামী বায়ু জলীয়বাষ্পপূর্ণ থাকলে ঘূর্ণিঝড়ের সময় প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়।
- উত্তর গোলার্ধে প্রবল ঘূর্ণিবায়ু বাইরের থেকে কেন্দ্রের দিকে প্রবাহিত হয়। পরে প্রচন্ড শক্তিতে বায়ু আবর্তনের মাধ্যমে উপরের দিকে উঠতে থাকে।
- ঘূর্ণিঝড়ের বায়ু আবর্তনের কেন্দ্রকে চোখ বলা হয়।
- মধ্য অক্ষাংশে গড়ে প্রতিদিন ৫০-৬০ টি চলমান নিম্নচাপ সৃষ্টি হয় এবং অন্য দিকে সারা পৃথিবীতে প্রতি বছর গড়ে ৮০ টির মত ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হয়।
- ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড় সমূহের ব্যাস ২০০-৭০০ কি.মি হয় এবং গভীরতা হয় ১২-১৬ কি.মি পর্যন্ত।
- ঘূর্ণিঝড়ের সময় কেন্দ্রের ভিতরের দিকে বায়ুচাপ দ্রুত কমতে থাকে।
- ঘূর্ণিঝড় প্রলয়ঙ্করী দুর্যোগ বয়ে আনে।
- ঘূর্ণিঝড় উষ্ণ জলরাশি থেকে সৃষ্টি হয় যার গড় উষ্ণতা ২৭° সেলসিয়াস।

ঘূর্ণিঝড়ের গঠন : ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি হতে হলে কিছু বৈশিষ্ট্য বা উপাদান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এগুলো হলো-

ক) সমুদ্র পৃষ্ঠের কাছাকাছি অন্তত ২৭° সেলসিয়াস তাপমাত্রা বিশিষ্ট যথেষ্ট পরিমাণে উষ্ণ ও আর্দ্র বায়ু থাকে।
খ) মুষলধারে বৃষ্টিপাত হয় এবং বায়ুপ্রবাহের ভেতরে এবং উপরের দিকে খাড়া হয়ে মেঘপুঞ্জের সৃষ্টি হয়।
গ) ঊর্দ্ধস্তরের বায়ু বহির্গামী হবে।

উপরিউক্ত শর্তসমূহ ঘূর্ণিঝড় সংগঠনে মুখ্য ভূমিকা পালন করে। প্রধানত উত্তর ও দক্ষিণ অয়ন বায়ু যে বায়ুপুঞ্জ বয়ে আনে এবং ঐ বায়ুপুঞ্জ যেখানে মিলিত হয় ঐ স্থানেই ঘূর্ণিঝড় সৃষ্টি করে। ঘূর্ণিঝড় সাধারণত সমুদ্রের উপর ও আন্তঃক্রান্তীয় এলাকায় সংঘটিত হয়। সমুদ্রের উপর দিয়ে বয়ে আসা যে বায়ুপুঞ্জ তা হতে বায়ুর নিম্নস্তরের উষ্ণ ও আর্দ্র বায়ু এবং উপরের শীতল ও শুষ্ক বায়ুর মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এসময় একটি স্তর অন্য স্তরের উপরে উঠে যায়। এই উপরের দিকে উঠে যাওয়া বায়ু যখন শীতল হয়ে যায় তখন আর্দ্রতা ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টিপাত ঘটায়। পূর্বেই বলা হয়েছে যে, ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়ের সময় বায়ু প্রবাহ পশ্চিম দিক থেকে প্রবাহিত হয়। এই ঘূর্ণনশক্তি জন্য ঘূর্ণিঝড় ভূমিতে পৌঁছায়, তখন উষ্ণ ও আর্দ্র বায়ু প্রবাহ বন্ধ হয়ে এটি ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে যায় এবং একসময় নিঃশেষ হয়ে পড়ে।



চিত্র-৮.৯.১:ঘূর্ণিঝড়

ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাব

ঘূর্ণিঝড় এমনই এক প্রাকৃতিক বিপর্যয় যা প্রাকৃতিক পরিবেশে ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করে। ঘূর্ণিঝড়ের সবচেয়ে বড় প্রভাব ঘটে আবহাওয়াতে। ঘূর্ণিঝড় শুরু হওয়ার আগে বায়ু শান্ত, উষ্ণ ও আর্দ্র থাকে। তবে ঘূর্ণিঝড়ের অগ্রবর্তী অংশে পৌঁছাবার সঙ্গে সঙ্গে দমকা বাতাস ও ঘন ঘন মেঘ দেখা যায়। ঘূর্ণিঝড়ের মূল অংশ যখন আসে তখন প্রবল ঝড়ো হাওয়া ও ঘন মেঘসহ মুষলধারে বৃষ্টি হয়। আর কেন্দ্রের ভিতরে অবস্থানকারী চোখ শান্ত আবহাওয়া পরিস্থিতি তৈরি করে। ঘূর্ণিঝড়ের পশ্চাৎভাগে পৌঁছানোর পর আবারও ঘন মেঘ, বৃষ্টিপাত ও ঝড়ো হাওয়া প্রবাহিত হয়। এ সময় বায়ু অগ্রবর্তী ঘূর্ণিঝড়ের বিপরীত দিক থেকে প্রবাহিত হয়। ঘূর্ণিঝড় মানুষ ও জানমালের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে।

শিক্ষার্থীর কাজ	ঘূর্ণিঝড় কীভাবে সংঘটিত হয় লিখুন।

সারসংক্ষেপ

অনিয়মিত বায়ুর একটি উদাহরণ হলো ঘূর্ণিঝড়। ঘূর্ণিঝড় মূলত ঊর্দ্ধমুখী শীতল ও শুষ্ক বায়ু এবং নিম্নমুখী উষ্ণ ও আর্দ্র বায়ুর মুখোমুখি সংঘর্ষে সংঘটিত হয়। ঘূর্ণিঝড় বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে ধ্বংসাত্বক প্রাকৃতিক দুর্যোগ বলে পরিচিত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.৯

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ঘূর্ণিঝড়ের বৈশিষ্ট্য হলো-

i. প্রবল নিম্নচাপের ফলে ঘূর্ণিঝড় হয় ii. ঘূর্ণিঝড় নিয়মিত বায়ুর একটি উদাহরণ। iii. ঘূর্ণিঝড় মাটির উপর সৃষ্টি হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২। ঘূর্ণিঝড়ের আবর্তন কেন্দ্রকে কি বলে?

(ক) বায়ুপুঞ্জ (খ) চোখ (গ) মেঘপুঞ্জ (ঘ) মুখ

৩। রফিকের বাড়ি উপকূলের কাছাকাছি। সে তার বন্ধু মুক্তাকে বলল ঘূর্ণিঝড়ের সময় তাদের ঘরবাড়ি ভেঙে গেছে। এ সময় প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়েছে এবং এপ্রিল মে মাসে প্রায়ই তারা এমন দুর্যোগের মুখোমুখি হয়।

উদ্দীপকের আলোকে ঘূর্ণিঝড়ের কোন এলাকার বৈশিষ্ট্যকে বুঝানো হয়েছে?

(ক) মকরক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড় (খ) ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড় (গ) কর্কটক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড় (ঘ) মধ্য অক্ষাংশের ঘূর্ণিঝড়

৪। ঘূর্ণিঝড়ের আগে বায়ু কেমন থাকে?

(ক) শীতল (খ) শুষ্ক ও ঝড়ো (গ) শীতল ও আর্দ্র (ঘ) উষ্ণ ও আর্দ্র

পাঠ-৮.১০ টর্নেডো (Tornado)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- টর্নেডোর সংজ্ঞা বলতে পারবেন এবং
- টর্নেডোর বৈশিষ্ট্য, উৎপত্তি ও গঠন ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

টর্নেডো

টর্নেডো মূলত অতি দ্রুত আবর্তনশীল ক্ষুদ্র আকারের অথচ প্রলয়ঙ্কারী বজ্রঝড়। এটি চোঙ আকৃতির হয়ে থাকে এবং এই বজ্রঝড়ের মধ্যভাগে বায়ু অতিদ্রুত বেগে উপরে উঠতে থাকে। এই চোঙ যদি ভূমি স্পর্শ করে তখন ধ্বংসলীলা ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। তবে চোঙ ভূমি স্পর্শ না করলে তেমন ক্ষয়ক্ষতি হয় না। টর্নেডোর ব্যাস ভূ-পৃষ্ঠের উপরে ১০০ থেকে ৫০০ গজ পর্যন্ত হয়। টর্নেডোর ভিতরে ও বাইরের বায়ু চাপের গড় পার্থক্য প্রায় ২ ইঞ্চি। তবে কখনো কখনো তা ৫ ইঞ্চি হয়ে যায়। টর্নেডোর চোঙ মাটি স্পর্শ করলে ব্যাপক শব্দে সবকিছু ধূলিসাৎ হয়ে যায় এবং কালো মেঘে ছেঁয়ে যায়।

টর্নেডোর বৈশিষ্ট্যঃ টর্নেডোর বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নে আলোচিত হলো-

১. টর্নেডোতে প্রথমত আকস্মিকভাবে বায়ু চাপের হ্রাস ঘটে বলেই বড় বড় ইমারতে ফাটল ধরে।
২. বায়ুর আবর্তন হয় অত্যন্ত দ্রুতবেগে। ফলে বায়ুপ্রবাহের সম্মুখে প্রতি বর্গফুটে বায়ুচাপের পরিমাণ হয় ১৬০ থেকে ১০০০ পাউন্ড।
৩. টর্নেডোর উত্তোলন ক্ষমতা অনেক ভয়ঙ্কর। ভয়ঙ্কর বেগে টর্নেডোর বায়ু উপরের দিকে উত্থিত হয় এবং পথে যা পায় তাই তুলে নেয়।
৪. ভূমিতে টর্নেডোর রৈখিক গতিবেগ বিভিন্ন টর্নেডোর ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকমের হয়। যেমন- উত্তর গোলার্ধে টর্নেডো দক্ষিণ পশ্চিম দিক থেকে আসে।
৫. টর্নেডোর গতিপথ অর্ধবৃত্তাকার হতে পারে এবং উত্তর গোলার্ধে টর্নেডো ডানদিকে আবর্তিত হয়।
৬. টর্নেডোর গতিবেগ ঘন্টায় ৫ হতে ৬৫ মাইল হয়ে থাকে। তবে কখনো কখনো গড় গতিবেগ ঘন্টায় ৩৫ থেকে ৪৫ মাইল হয়।
৭. পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি টর্নেডোপ্রবণ এলাকা উত্তর আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া।
৮. সমুদ্রের উপর টর্নেডো সৃষ্টি হয়। যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব উপকূলের নিকটস্থ সমুদ্রে, মেক্সিকো উপসাগরে এবং চীন ও জাপানের উপকূলের নিকটস্থ সমুদ্রে গ্রীষ্মকালে টর্নেডোর প্রকোপ দেখা যায়।
৯. টর্নেডো ব্যাপক জানমাল ও পরিবেশের ক্ষতিসাধন করে।

টর্নেডোর উৎপত্তি : সাধারণত উত্তর গোলার্ধের কোনো স্থানীয় স্থল নিম্নচাপের দক্ষিণ-পূর্ব অংশেই টর্নেডোর উৎপত্তির হয়। টর্নেডো শীতল বায়ুপ্রাচীরের সাথে সমান্তরালভাবে দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়। আবার টর্নেডো সংঘটিত হওয়ার সময় ঊর্ধ্ব বায়ুস্থ পশ্চিমা জেট প্রবাহের কারণে দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	টর্নেডোর বৈশিষ্ট্যগুলো কী কী তা লিখুন।

সারসংক্ষেপ

টর্নেডো অতি ক্ষুদ্র আকারের বজ্রঝড়। এটি দ্রুত আবর্তনশীল এবং আকৃতি অনেকটা চোঙের মত। টর্নেডোর বিধ্বংসী শক্তির জন্য পৃথিবীতে নানা ধরনের ক্ষতিসাধন হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৮.১০

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। টর্নেডোর চোঙের ব্যাস কত ?

(ক) ২০০-৩০০ গজ (খ) ১০০-৫০০ গজ (গ) ৩০০-৫০০ গজ (ঘ) ৫০০-৬০০ গজ

২। টর্নেডোর বৈশিষ্ট্য-

i. টর্নেডোর চোঙ মাটি স্পর্শ করলে ক্ষয়ক্ষতি বেশি হয়।

ii. টর্নেডোর কেন্দ্রে চোখ থাকে iii. টর্নেডো গমনপথ অর্ধবৃত্তাকার

নিচের কোনটি সঠিক ?

(ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বেশি টর্নেডো কোথায় হয়?

(ক) ভিয়েতনাম ও শ্রীলঙ্কায় (খ) ইন্দোনেশিয়া ও প্রশান্ত সাগরের নিকটবর্তী এলাকায়

(গ) উত্তর আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ায় (ঘ) ভারত মহাসাগরের নিকট

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

পৃথিবীতে নানাভাবে প্রাকৃতিক পরিবর্তন সংঘটিত হয়। পৃথিবীর বায়ুর তাপ, চাপ, আর্দ্রতা, বায়ুপ্রবাহের দিক পরিবর্তন ইত্যাদির প্রভাবে ঋতু পরিবর্তন সংঘটিত হয়। এই পরিবর্তনের কারণে পৃথিবীব্যাপী একেক অঞ্চলে একেক ধরনের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

ক. আবহাওয়া কাকে বলে?

খ. আবহাওয়া ও জলবায়ুর পার্থক্য কী?

গ. বায়ুর তাপমন্ডলের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলোচনা করুন।

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে আবহাওয়া ও জলবায়ুর নিয়ামকসমূহ বর্ণনা করুন।

উত্তরমালা

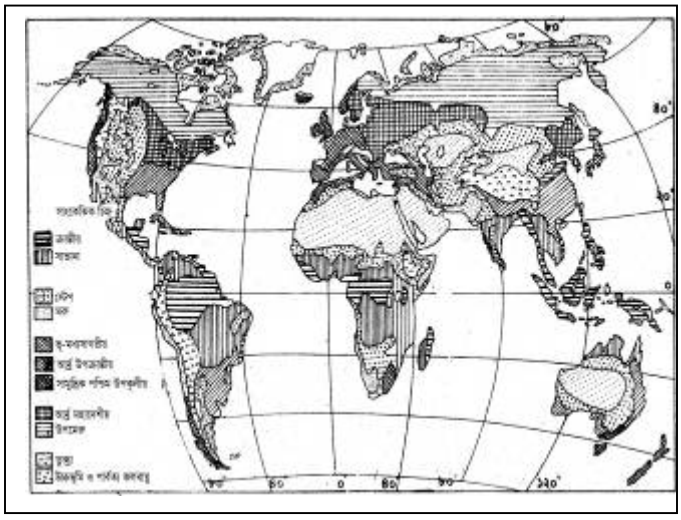
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.১ :	১. গ	২. খ	৩. খ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.২ :	১. ঘ	২. খ	৩. গ	৪. গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৩ :	১. খ	২. গ	৩. গ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৪ :	১. খ	২. খ	৩. ক	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৫ :	১. ঘ	২. ক		
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৬ :	১. ঘ	২. ঘ	৩. ক	৪. ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৭ :	১. ঘ	৩. গ	৪. খ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৮ :	১. খ	২. ঘ		
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.৯ :	১. ক	২. খ	৩. খ	৪. ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৮.১০:	১. খ	২. ঘ	৩. গ	

জলবায়ু অঞ্চলসমূহ ও জলবায়ু পরিবর্তন
(Climatic Regions and Climate Change)

ইউনিট ৯

ভূমিকা

জলবায়ু বলতে সাধারণত ৩০ থেকে ৪০ বছরের আবহাওয়ার উপাদানগুলোর গড় অবস্থাকে বুঝায়। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার জলবায়ু পরিলক্ষিত হওয়ায় জলবায়ু বিজ্ঞানীগণ একে বিভিন্নভাবে বিভক্ত করেছেন। এর মধ্যে জলবায়ু বিজ্ঞানী ভ্লাদিমির কোপেন এর শ্রেণিবিভাগ অন্যতম। এই ইউনিটে জলবায়ুর শ্রেণিবিভাগ, নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চল, ভূ-মধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চল, মৌসুমী জলবায়ু অঞ্চল, বাংলাদেশের জলবায়ু, গ্রিনহাউজ প্রভাব ও বিশ্ব উষ্ণায়ন, জলবায়ু পরিবর্তন ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত প্রভৃতি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া ব্যবহারিক হিসেবে সমতাপ রেখা, সমচাপ রেখা ও সমবর্ষণ রেখা অংকন এবং সমতাপ, সমচাপ ও সমবর্ষণ রেখা মানচিত্রে বিশ্লেষণসহ বৃষ্টিপাত উপাত্তের সাহায্যে রেখাচিত্র অংকন ও বাংলাদেশের ঋতু বা মাসভিত্তিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বিশ্লেষণ করা হয়েছে।





ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ ৯.১ : জলবায়ুর শ্রেণিবিভাগ
পাঠ ৯.২ : নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চল
পাঠ ৯.৩ : ভূ-মধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চল
পাঠ ৯.৪ : মৌসুমী জলবায়ু
পাঠ ৯.৫ : বাংলাদেশের জলবায়ু
পাঠ ৯.৬ : গ্রিন হাউজ প্রভাবও বিশ্ব উষ্ণায়ন
পাঠ ৯.৭ : জলবায়ু পরিবর্তন ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

ব্যবহারিকঃ

পাঠ ৯.৮: সমতাপ রেখা, সমচাপ রেখা, সমবর্ষণ রেখা অংকন এবং মানচিত্রে বিশ্লেষণ
পাঠ ৯.৯: বৃষ্টিপাত উপাত্তের সাহায্যে রেখাচিত্র অংকন ও বিশ্লেষণ

পাঠ-৯.১ জলবায়ুর শ্রেণিবিভাগ (Classification of Climate)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- জলবায়ুর সংজ্ঞা বলতে পারবেন এবং
- জলবায়ুর শ্রেণিবিভাগ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

জলবায়ু

পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে আবহাওয়া ও জলবায়ুর বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে আঞ্চলিক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। সাধারণত ৩০-৪০ বছরের আবহাওয়ার গড় অবস্থাকে বলা হয় জলবায়ু। উষ্ণতা, বৃষ্টিপাত, বায়ুচাপ, তাপমাত্রা ইত্যাদি আবহাওয়া ও জলবায়ুর নিয়ামক।

জলবায়ুর শ্রেণিবিভাগ : পৃথিবীর ভৌগোলিক অবস্থান এবং আবহাওয়া ও জলবায়ুর নিয়ামকসমূহের বিভিন্নতার জন্য ক্রান্তীয় অঞ্চল থেকে মেরু পর্যন্ত ভিন্ন ভিন্ন জলবায়ু দেখা যায়। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে একই ধরনের জলবায়ুগত বৈশিষ্ট্যের জন্য যে অন্তর্নিহিত প্রক্রিয়া ও ধরণ তা বুঝার জন্য পৃথিবীর অঞ্চলের জলবায়ুকে কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। জলবায়ুর বিভিন্ন শ্রেণিবিভাগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভ্লাদিমির কোপেনের শ্রেণিবিভাগ (চিত্র-৯.১.১)।

ভ্লাদিমির কোপেনের জলবায়ু শ্রেণিবিভাগ : প্রতি মাসের এবং বছরের গড় আবহাওয়া এবং শীত ও গ্রীষ্মের তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত ও শুষ্কতার মাত্রার উপর ভিত্তি করে ভ্লাদিমির কোপেন ১৯০১ সালে প্রথম পৃথিবীর জলবায়ুর শ্রেণিবিভাগ প্রকাশ করেন। পরবর্তীতে ১৯৩৬ সালে সংশোধনের পর চূড়ান্তভাবে এই শ্রেণিবিভাগ প্রকাশিত হয়। প্রাকৃতিক উদ্ভিদকে সামগ্রিক জলবায়ুর বহিঃপ্রকাশ হিসেবে ধরে এই শ্রেণিবিভাগ করা হয়। গড় মাসিক তাপমাত্রা ও প্রধান উদ্ভিজ্জ অঞ্চলকে মূল্যায়ন করে কোপেন জলবায়ু অঞ্চলকে ৫ ভাগে ভাগ করে ইংরেজি বর্ণমালার A থেকে E পর্যন্ত নাম দেন। নিম্নে A-E অক্ষরে বিভাজিত এই জলবায়ুর ভাগগুলোর বর্ণনা তুলে ধরা হলো-

A. **উষ্ণমন্ডলীয় বৃষ্টিবহুল জলবায়ুসমূহ (Tropical Rainy Climates) :** এই জলবায়ু অঞ্চলের শীতলতম মাসের গড় তাপমাত্রা ১৮° সে. এর বেশি নয়। এখানে এমন সব গাছ জন্মে যাদের জন্য অধিক তাপ ও বৃষ্টিপাত প্রয়োজন। এই জলবায়ু তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত। যথা-

১. উষ্ণমন্ডলীয় আর্দ্র জলবায়ু, ২. উষ্ণমন্ডলীয় মৌসুমি জলবায়ু এবং ৩. উষ্ণমন্ডলীয় আর্দ্র ও শুষ্ক জলবায়ু।

B. শুষ্ক জলবায়ুসমূহ (Dry Climates) : এ জলবায়ুতে বৃষ্টিপাতের থেকেও বাষ্পীভবন বেশি হওয়ার কারণে ভূ-গর্ভস্থ পানি নিচের স্তরে নেমে যায়। এ জন্য এই এলাকায় সর্বদা প্রবাহমান নদী থাকে না। বাষ্পীভবন ও বৃষ্টিপাতের উপর উদ্ভিজ্জের বৃদ্ধি নির্ভরশীল। আবার বাষ্পীভবনের পরিমাণ নির্ভর করে তাপমাত্রার উপর। এজন্য শীতকাল ও গ্রীষ্মকালে যদি বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সমান হয় তখন গ্রীষ্মকালে বাষ্পীভবন বেড়ে যায়। বায়ুর তাপমাত্রা, বার্ষিক বৃষ্টিপাত ও ঋতুগত বন্টনের উপর ভিত্তি করে কোপেন B গোত্রের জলবায়ুকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করেন। যথা-

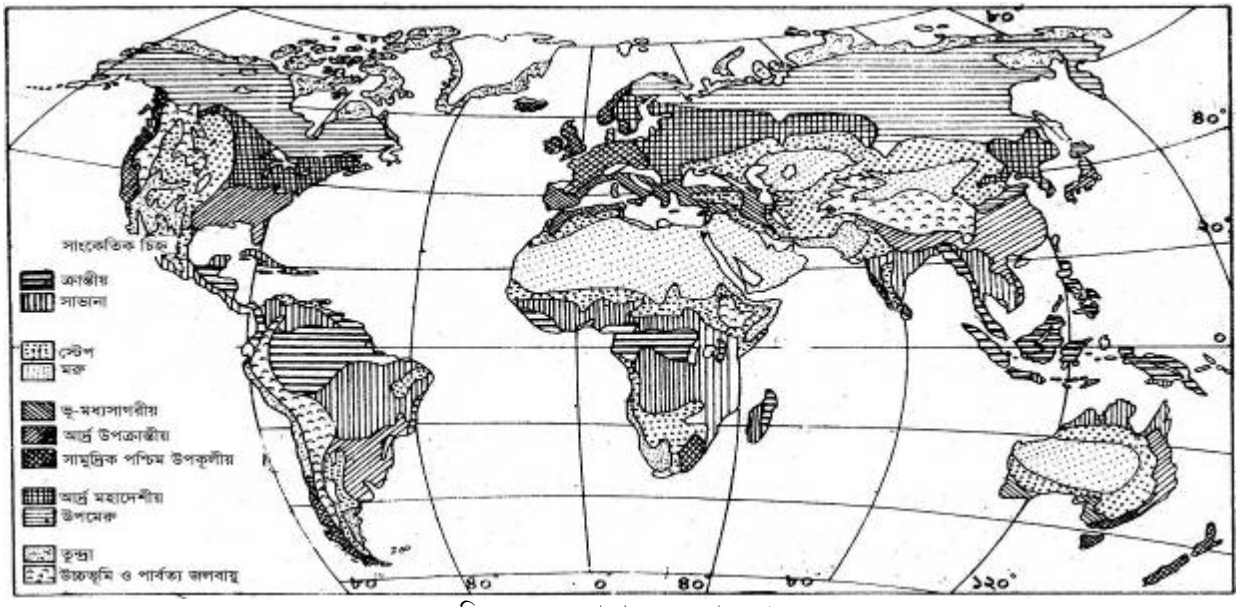
১. মরু জলবায়ু এবং ২. অর্ধশুষ্ক বা স্টেপ জলবায়ু।

C. মৃদু শীতসম্পন্ন মধ্য অক্ষাংশীয় বৃষ্টিবহুল জলবায়ুসমূহ (Mid Latitude Cool Rainy Climates) : এ জলবায়ু অঞ্চলে শীতলতম মাসের গড় তাপমাত্রা ৩°সে. ও ১৮°সে. এর মধ্যে থাকে। এ জলবায়ুর গোত্রকে ৩টি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা-

১. শীতকাল শুষ্ক, ২. গ্রীষ্মকাল শুষ্ক এবং ৩. স্পষ্ট কোনো শুষ্ক ঋতু নেই।

D. চরমভাবাপন্ন মধ্য অক্ষাংশীয় বৃষ্টিবহুল জলবায়ুসমূহ (Mid Latitude Extreme Rainy Climates) : এ জলবায়ু গোত্রে শীতলতম মাসের গড় তাপমাত্রা ৩° সে. এর কম এবং উষ্ণতম মাসের গড় তাপমাত্রা ১০° সে. এর বেশি থাকে এবং ভূমি বরফাবৃত থাকে। এ গোত্রে দুটি প্রধান শ্রেণির জলবায়ু হলো-

১. শুষ্ক শীত ঋতুসহ অতি শীতল জলবায়ু এবং ২. আর্দ্র ও অতি শীতল জলবায়ু।



চিত্র-৯.১.১: কোপেনের জলবায়ু অঞ্চল

E. মেরু জলবায়ুসমূহ (Polar Climates) : এ জলবায়ুতে বছরের বেশিরভাগ সময় তাপমাত্রা হিমাংকের নিচে থাকে। ফলে উদ্ভিজ্জের জন্ম ও বৃদ্ধির জন্য গ্রীষ্মকালের স্থায়িত্ব ও উত্তাপের প্রাচুর্য অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। উষ্ণতম মাসের গড় তাপমাত্রা ১০° সে. এর কম থাকে। এই জলবায়ু মূলত দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত। যথা-

১. তুন্দ্রা অঞ্চল এবং ২. চিরস্থায়ী বরফের আচ্ছাদনজনিত জলবায়ু।

শিক্ষার্থীর কাজ	কোপেনের জলবায়ুর শ্রেণিবিভাগ কত প্রকার ও কী কী? আলোচনা করুন।

সারসংক্ষেপ

গড় মাসিক এবং বার্ষিক শীত ও গ্রীষ্মের তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত ও শুষ্কতার মাত্রার উপর ভিত্তি করে ভ্লাদিমির কোপেন পৃথিবীর জলবায়ুকে ৫টি ভাগে বিভক্ত করেন। এগুলো হলো-শীতল ঋতুবিহীন উষ্ণমন্ডলীয় বৃষ্টিবহুল জলবায়ুসমূহ, শুষ্ক জলবায়ুসমূহ, মৃদু শীতসম্পন্ন মধ্য অক্ষাংশীয় বৃষ্টিবহুল জলবায়ুসমূহ, চরমভাবাপন্ন মধ্য অক্ষাংশীয় বৃষ্টিবহুল জলবায়ু এবং মেরু জলবায়ু। এই শ্রেণিবিভাগে গড় মাসিক তাপমাত্রা ও প্রধান উদ্ভিজ্জ অঞ্চলকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করা হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ভ্লাদিমির কোপেনের জলবায়ুর শ্রেণিবিভাগ কত সালে প্রকাশ হয়?

(ক) ১৯০৭ (খ) ১৯০১ (গ) ১৯৩০ (ঘ) ১৯৩৬

২। কোনটি চরমভাবাপন্ন মধ্য অক্ষাংশীয় জলবায়ু অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য?

(ক) বরফাকৃত ভূমি (খ) কম বৃষ্টিপাত

(গ) শীতলতম মাসের গড় তাপমাত্রা ৫° সে. (ঘ) শীতলতম মাসের গড় তাপমাত্রা ১০° সে.

৩। মেরু জলবায়ু অঞ্চলকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?

(ক) ২ (খ) ৩ (গ) ৪ (ঘ) ৫

পাঠ-৯.২ নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চল (Equatorial Climatic Region)

উদ্দেশ্য

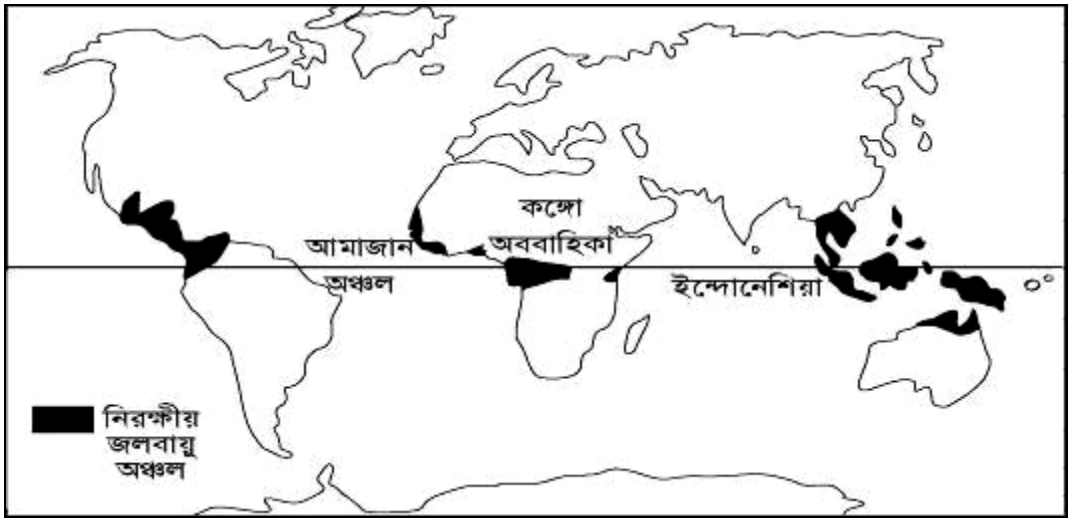
এ পাঠ শেষে আপনি-

- নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান বলতে পারবেন এবং
- নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখতে পারবেন।

নিরক্ষীয় জলবায়ু

পৃথিবীর জলবায়ুর পাথর্ক্যের জন্য সূর্যের অবস্থান একটি বড় নিয়ামক হিসেবে কাজ করে। কারণ তাপমাত্রা প্রাপ্তির ধরনের উপর আবহাওয়া ও জলবায়ুর প্রকৃতির পার্থক্য তৈরি হয়। নিরক্ষরেখায় অবস্থানকারী দেশসমূহ এবং এই নিরক্ষরেখার কাছাকাছি অবস্থানরত দেশসমূহে নিরক্ষীয় জলবায়ু বিরাজমান বলে একে বলা হয় নিরক্ষীয় জলবায়ু।

অবস্থান ও দেশসমূহ : নিরক্ষরেখার উভয় পাশে ৫° অক্ষাংশের মধ্যে নিরক্ষীয় অঞ্চল অবস্থিত। সূর্যের উত্তরায়ন ও দক্ষিণায়নের ফলে এ অঞ্চলে দুইবার মাত্রাতিরিক্ত তাপমাত্রা দেখা যায়। কোনো কোনো স্থানে নিরক্ষরেখার উত্তর ও দক্ষিণে ১০° অক্ষাংশের সীমা পর্যন্ত নিরক্ষরেখা বিস্তৃত। বিষুবরেখার পার্শ্ববর্তী ৯৬৫ কি. মি. এলাকাজুড়ে এই জলবায়ুর প্রভাব বিস্তৃত। আফ্রিকার কঙ্গো নদী অববাহিকা ও গিনি উপকূলীয় এলাকা, মধ্য আমেরিকার পূর্ব উপকূলের পানামা, হন্ডুরাস, কোস্টারিকা, নিকারাগুয়া এবং দক্ষিণ আমেরিকার পূর্ব উপকূল এই জলবায়ু অঞ্চলের অর্ন্তগত। এছাড়াও নিরক্ষরেখার কাছাকাছি অবস্থিত দেশগুলো যেমন- মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া, ব্রুনাই, ফিলিপাইন, আমাজান নদীর অববাহিকা, পেরু, ইকুয়েডর ও কলম্বিয়ার দক্ষিণাঞ্চল জুড়েও এই জলবায়ু প্রভাব বিস্তার করে (চিত্র-৯.২.১)।



চিত্র-৯.২.১: নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চল

নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য : নিরক্ষরেখার নিকটবর্তী দেশগুলোতে সূর্য প্রায় সারাবছরই লম্বভাবে কিরণ দেয় বলে এখানে গ্রীষ্মঋতুর প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। এই অঞ্চলে উষ্ণ ও আর্দ্র জলবায়ুর জন্য দিন-রাতের মধ্যে তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তনশীল থাকে। শীতের প্রকোপ একদম নেই বললেই চলে। নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চলের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো নিম্নরূপ-

১. সারাবছর সূর্য লম্বভাবে কিরণ দেয়ার জন্য এই অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে তাপমাত্রা বেশি থাকে। দিনের ব্যাপ্তি সারা বছর একই থাকে এবং বার্ষিক গড় তাপমাত্রা ২১°-২৭° সে.। স্থলভাগের বার্ষিক সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রার পার্থক্য ৫° সেলসিয়াসের কম। অত্যধিক সূর্য তাপ ও আর্দ্রতা এবং সামান্য মেঘাচ্ছন্নতার জন্য তাপমাত্রার পার্থক্য কম।

২. অধিক সূর্য তাপ ও জলভাগের পরিমাণ বেশি হওয়ায় বাষ্পীভবনের মাত্রাও বেশি। এই সকল এলাকায় পরিচলন বৃষ্টিপাত বেশি হয় এবং বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ১৭০০-২৫০০ মিলিমিটার।

৩. অধিক বৃষ্টিপাতের জন্য চিরহরিৎ বনাঞ্চল দেখা যায়। এই বনাঞ্চলে সেগুন, মেহগনি, রাবার ইত্যাদি গাছ জন্মে। গভীর এই বনাঞ্চলে সহজে সূর্যালোক প্রবেশ করতে পারে না বলে গাছগুলো সূর্যালোক পাওয়ার জন্য উঁচু হয়।

৪. অধিক উত্তাপ এ অঞ্চলে স্থায়ী নিম্নচাপ তৈরি করে এবং উপক্রান্তীয় উষ্ণ চাপ বলয়ের অয়ন বায়ু এ অঞ্চলে প্রবাহিত হয়। উত্তপ্ত বায়ু হালকা হয়ে উপরে উঠে যায় এবং শান্ত বলয় বিরাজমান থাকে। ঊর্ধ্বগামী উষ্ণ ও আর্দ্র বায়ু উপরে উঠে ঘনীভূত হয়ে পরবর্তীতে বৃষ্টি হয়ে ঝরে পড়ে।

৫. এ অঞ্চলের মৃত্তিকা কৃষিকাজের জন্য খুব উপকারী হলেও এখানে মাটি ক্ষয় হয়। অতিরিক্ত তাপ ও বৃষ্টিপাতই এই মাটি ক্ষয়ের কারণ।

শিক্ষার্থীর কাজ	নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলোর নাম উল্লেখ করুন।

সারসংক্ষেপ

নিরক্ষরেখার উভয় পাশে ৫° অক্ষাংশের মধ্যে নিরক্ষীয় অঞ্চল অবস্থিত। নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চলের দেশসমূহ সারা বছর সূর্যের তাপ পায় বলে এখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। সেই সাথে উর্বর মৃত্তিকা এবং জলবায়ুর প্রভাবে চিরহরিৎ বনাঞ্চল দেখা যায়। এখানে দিন ও রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তনশীল থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। নিরক্ষীয় জলবায়ু অঞ্চল গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কত?

(ক) ১০০০-২১০০ মি.মি. (খ) ১২০০-২৫০০ মি.মি.
(গ) ১৭০০-২৫০০ মি.মি. (ঘ) ১৩০০-২৩০০ মি.মি.

২। নিরক্ষরেখার অন্তর্গত দেশগুলোতে কোনটি মাটি ক্ষয়ের কারণ?

(ক) মেরুবায়ু (খ) ঊর্ধ্বমুখী বায়ু প্রবাহ
(গ) অধিক তাপ (ঘ) অধিক বনাঞ্চল

৩। নিরক্ষীয় জলবায়ুর অন্তর্গত দেশ নয় কোনটি?

(ক) সৌদি আরব (খ) ইন্দোনেশিয়া
(গ) ফিলিপাইন (ঘ) ব্রুনাই

পাঠ-৯.৩ ভূ-মধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চল (Mediterranean Climatic Region)

উদ্দেশ্য

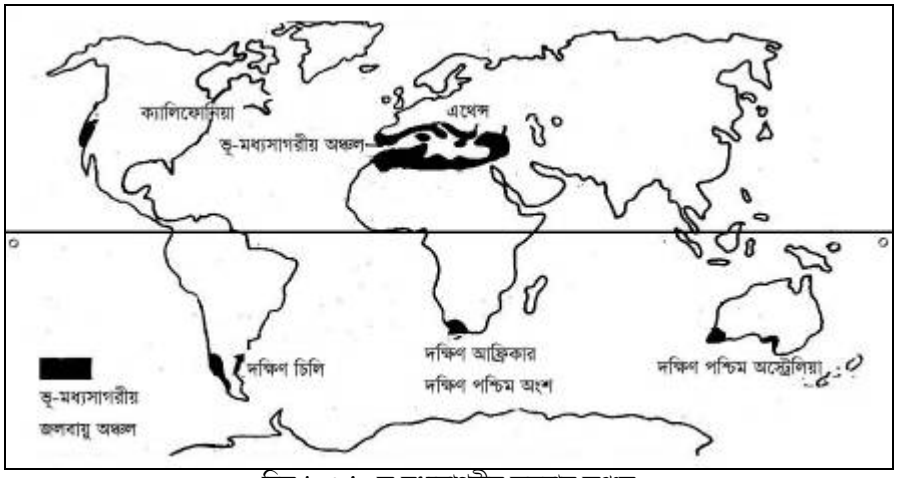
এ পাঠ শেষে আপনি-

- ভূ-মধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত দেশসমূহের নাম বলতে পারবেন এবং
- ভূ-মধ্যসাগরীয় জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।

ভূ-মধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চল

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের বিভিন্নতার কারণে জলবায়ুর ধরনেরও পার্থক্য দেখা যায়। ভূ-মধ্যসাগরীয় অঞ্চল অর্থাৎ পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধের ৩০°-৪৫° অক্ষাংশের মধ্যে যে সকল মহাদেশসমূহের অবস্থান তাদের পশ্চিমাংশ জুড়েই ভূ-মধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চল বিস্তৃত। উত্তর আফ্রিকার লিবিয়া, তিউনিশিয়া, মিশরের উত্তরাংশ, মরক্কোর উত্তরাংশ, ভূ-মধ্যসাগরের তীরবর্তী অঞ্চলসমূহ এই জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্গত। এছাড়াও তুরস্ক, স্পেন, গ্রীস, দক্ষিণ ফ্রান্স, ইতালি, ইসরাইল, সিরিয়া, দক্ষিণ ও পশ্চিম যুগোশ্লাভিয়া এই জলবায়ুর অর্ন্তভুক্ত। ভূ-মধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চলের মধ্যে আরও যে দেশসমূহ রয়েছে সেগুলো হলো- লেবানন, পর্তুগাল, আলবেনিয়া এবং দ্বীপসমূহ হলো কর্ষিকা, মাল্টা, সাইপ্রাস ইত্যাদি। এছাড়াও অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ, আফ্রিকার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ, দক্ষিণ আমেরিকার চিলির মধ্যভাগ এবং উত্তর আমেরিকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া এই জলবায়ুর অর্ন্তগত।

বৈশিষ্ট্য : ভূ-মধ্যসাগরীয় জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো উষ্ণ, শুষ্ক ও বৃষ্টিহীন গ্রীষ্মকাল এবং শীতকাল বৃষ্টিবহুল।



চিত্র-৯.৩.১: ভূ-মধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চল

এই অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে গড় উষ্ণতা থাকে ২০°- ২৮° সে. এবং শীতকালে উষ্ণতা ১০° সে. এর কম থাকে। এই জলবায়ু অঞ্চলে যে বৈশিষ্ট্যটি উল্লেখযোগ্য তা হলো- এখানে সমুদ্র বায়ুর প্রভাবে শীতকালে বৃষ্টিপাত হয় এবং বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৩৮ সে.মি থেকে ৭৫ সে.মি। সাধারণত অন্যান্য এলাকার তুলনায় সমুদ্র উপকূলে বৃষ্টিপাতের হার বেশি। বৃষ্টিপাত অধিক বলে এখানে শীতকালীন বৃক্ষ যেমন- জলপাই, কর্ক, তুঁত, নিম, পাইন গাছের উৎপত্তি লক্ষ্যণীয়। কম বৃষ্টি হয় এমন স্থানে ঝোপঝাড় জন্মে। প্রকৃতপক্ষে ভূ-মধ্যসাগরীয় জলবায়ু স্বাস্থ্যকর ও আরামদায়ক।

শিক্ষার্থীর কাজ	ভূ-মধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চলের অন্তর্গত দেশগুলোর নাম লিখুন।

সারসংক্ষেপ

উত্তর গোলার্ধের ৩০°-৪৫° অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত দেশসমূহ ভূ-মধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চলের অর্ন্তভুক্ত। ভূ-মধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চলের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো শুষ্ক গ্রীষ্মকাল ও বৃষ্টিবহুল শীতকাল। সুস্বাস্থ্যের জন্য এই জলবায়ু অঞ্চলের আবহাওয়া বেশ সহায়ক। এই জলবায়ু অঞ্চলে শীতকালে বৃষ্টিপাত হয় বলে উদ্ভিজ্জের বিস্তৃতি লক্ষ্য করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ভূ-মধ্যসাগরীয় জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য-

i. পাইন, নিম, তুঁত গাছ জন্মে
ii. আম-কাঁঠাল গাছ জন্মে
iii. শীতকালীন বৃষ্টিপাত

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২। ভূ-মধ্যসাগরীয় জলবায়ু অঞ্চলে কোথায় বেশি বৃষ্টিপাত থাকে?

(ক) বনভূমিতে (খ) সমুদ্র উপকূলে (গ) খোলা মাঠে (ঘ) পাহাড়ের কাছে

৩। ভূ-মধ্যসাগরীয় অঞ্চলের ক্ষেত্রে নিচের কোন তথ্যটি সঠিক?

(ক) গ্রীষ্মকালীন তাপমাত্রা ২০°-৪০° সে. (খ) বর্ষাকালীন বৃষ্টিপাত ৩৮°-৭৫° সে. মি.
(গ) গ্রীষ্মকালীন তাপমাত্রা ২০°-২৮° সে. (ঘ) বর্ষাকালীন বৃষ্টিপাত ৩০°-৪০° সে. মি.

পাঠ-৯.৪ মৌসুমি জলবায়ু (Monsoon Climate)

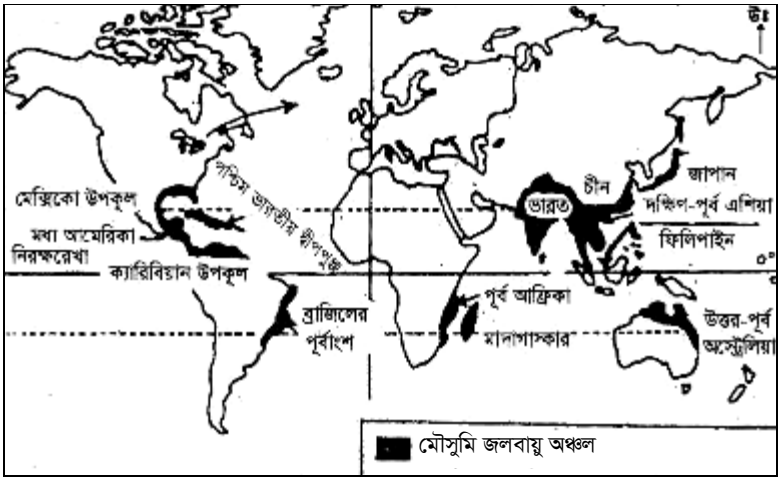
উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মৌসুমি জলবায়ুর অর্ন্তভুক্ত দেশগুলোর নাম বলতে পারবেন এবং
- মৌসুমি জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।

মৌসুমি জলবায়ু

মৌসুমি শব্দটি এসেছে আরবি শব্দ "মওসুম" থেকে যার অর্থ ঋতু। ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে এ বায়ু প্রবাহের দিক পরিবর্তন হয় বলে একে মৌসুমি জলবায়ু বলা হয়। কর্কটক্রান্তি ও মকরক্রান্তির নিকটবর্তী অঞ্চল জুড়ে যে জলবায়ু বিস্তৃত তা মৌসুমি জলবায়ু। ক্যারিবিয়ান সাগর, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপসমূহের দেশগুলো, পূর্ব আফ্রিকা, পূর্ব ব্রাজিল, উত্তর-পূর্ব অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ চীন ও জাপান, থাইল্যান্ড, কম্পুচিয়া, ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, মিয়ানমার অর্থাৎ দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া এই জলবায়ু অঞ্চলের অর্ন্তগত। এছাড়াও মেক্সিকো উপসাগরের উপকূলবর্তী দেশসমূহ, লাওস, মালাগাছি দ্বীপও এই জলবায়ুর অন্তর্ভুক্ত।



চিত্র-৯.৪.১: মৌসুমি জলবায়ু অঞ্চল

মৌসুমি জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য : মৌসুমি জলবায়ুর বৈশিষ্ট্যসমূহ নিম্নরূপ-

১. মৌসুমি জলবায়ুতে গ্রীষ্মকালে অধিক গরম ও শীতকালে শীত পড়ে। জুলাই মাস সবচেয়ে বেশি গরম ও জানুয়ারি মাসে বেশি শীত পড়ে। গ্রীষ্মকাল আর্দ্র ও শীতকাল শুষ্ক এই জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্য। তবে যখন বৃষ্টিপাত বেশি হয় তখন তাপমাত্রা তুলনামূলকভাবে কম থাকে। গ্রীষ্মকালীন তাপমাত্রা গড়ে ২৭° সে. এর বেশি থাকে এবং শীতকালীন গড় তাপমাত্রা ১° সে. থেকে ২২° সে. এর মধ্যে থাকে। শীত ও গ্রীষ্মে তাপমাত্রার পার্থক্য ৫° সে. থেকে ১০° সে. হয়।

২. গ্রীষ্মকালে উত্তর গোলার্ধে সূর্য কর্কটক্রান্তি রেখার উপর দিয়ে লম্বভাবে কিরণ দেয় এবং এই সময় দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া, মধ্য এশিয়া, উত্তর-পশ্চিম ভারত প্রভৃতি স্থানে বায়ুর নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়। দক্ষিণ গোলার্ধের উচ্চচাপ বলয় থেকে আসা দক্ষিণ পূর্ব অয়ন বায়ু এশিয়া মহাদেশের নিম্নচাপ কেন্দ্রের দিকে প্রবলবেগে ছুটে যায়। এই বায়ুকেই বলা হয় উত্তর গোলার্ধের মৌসুমি বায়ু। ফেরেলের সূত্রানুযায়ী একে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু বলা হয়। কারণ নিরক্ষরেখা অতিক্রম করলে ডানদিকে বেঁকে দক্ষিণ পূর্ব অয়ন বায়ু দক্ষিণ পশ্চিম দিক থেকে উত্তর পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়।

৩. আবার শীতকালে সূর্য দক্ষিণ গোলার্ধের মকরক্রান্তির নিকট অবস্থান করায় সেখানে নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়। উত্তর গোলার্ধের স্থলভাগ শীতল হওয়ার জন্য সেস্থানে উচ্চচাপ সৃষ্টি হয়। উচ্চচাপ অঞ্চল থেকে বায়ু দক্ষিণে নিম্নচাপে প্রবাহিত হয় বলেই তাকে বলা হয় উত্তর পূর্ব মৌসুমি বায়ু এবং স্থলভাগে প্রবাহিত হয় বলে এই বায়ু জলীয়বাষ্পহীন।

৪. মৌসুমি জলবায়ু অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে বৃষ্টিপাত বেশি হয় কিন্তু শীতকাল শুষ্ক থাকে। গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাত ১২৫ সে.মি. থেকে ২০০ সে.মি.। তবে অতিবৃষ্টি, বন্যা, খরাও এই জলবায়ু অঞ্চলে দেখা যায়। কখনো কখনো পর্বতের ঢালে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে বায়ু উপরে উঠে যায় ফলে বৃষ্টিপাত হয়।
৫. এই জলবায়ু অঞ্চলে উর্বর ভূমি ও পলিমাটি কৃষিকাজের জন্য উপকারী।

উর্বর মাটি ও বৃষ্টিপাত, পর্যাপ্ত সূর্যালোক মৌসুমি জলবায়ু অঞ্চলে পর্ণমোচী ও চিরহরিৎ বৃক্ষের বনভূমির বিস্তার ঘটায়। চিরহরিৎ বৃক্ষের বনাঞ্চলে ২০০ সে.মি এর বেশি বৃষ্টিপাত হয় এবং তৃণভূমি অঞ্চলে ৫° সে.মি থেকে ১০০ সে.মি পর্যন্ত বৃষ্টিপাত হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	মৌসুমি জলবায়ু কাকে বলে লিখুন।

সারসংক্ষেপ

আরবি "মওসুম" শব্দের অর্থ ঋতু। ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে বায়ুপ্রবাহের দিক পরিবর্তনের কারণে এই ধরনের বায়ুপ্রবাহকে মৌসুমি বায়ুপ্রবাহ বলা হয়। বৃষ্টিবহুল গ্রীষ্ম, অধিক তাপ, শুষ্ক ও বৃষ্টিহীন শীতকাল এই জলবায়ু অঞ্চলের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। মৌসুমি জলবায়ুর বনভূমি হলো-

i. পাতাঝরা ii. তৃণভূমি iii. চিরহরিৎ

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২। মৌসুমি জলবায়ুতে বায়ুপ্রবাহ কোন সূত্র অনুযায়ী হয়?

(ক) ওয়েবারের তত্ত্ব (খ) কোপেনের থিওরি
(গ) ফেরেলের সূত্র (ঘ) কোনটিই নয়

৩। মৌসুমি জলবায়ুতে শীত ও গ্রীষ্মর তাপমাত্রার পার্থক্য কতটুকু হয়?

(ক) ৭°-৮° সে. (খ) ৫°-১০° সে.
(গ) ৮°-১২° সে. (ঘ) ১০°-১৫° সে.

পাঠ-৯.৫ বাংলাদেশের জলবায়ু (Climate of Bangladesh)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

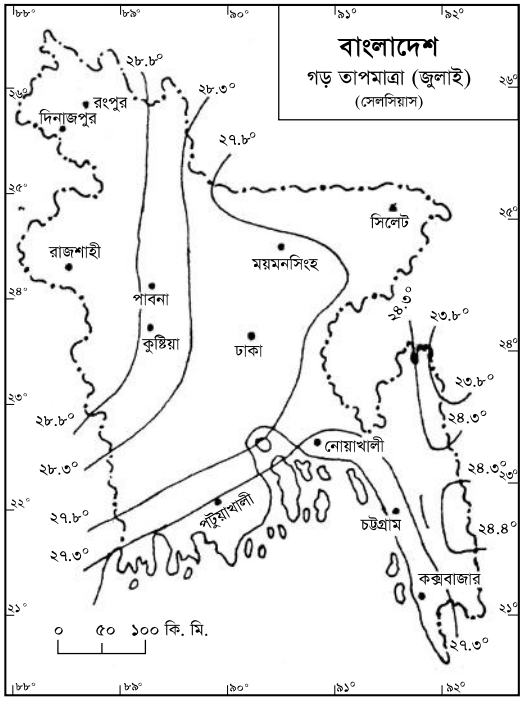
- বাংলাদেশের জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য বলতে পারবেন এবং
- বাংলাদেশের জলবায়ুর প্রকৃতি ও ধরনের বৈচিত্র্য ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বাংলাদেশের জলবায়ু

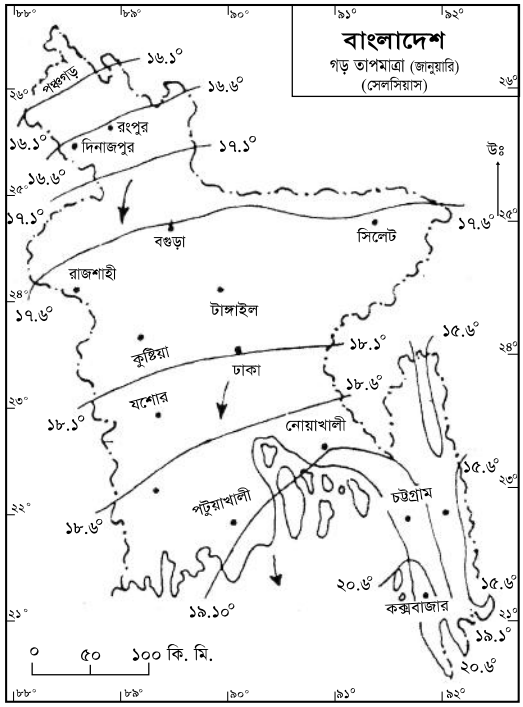
বাংলাদেশের জলবায়ু মোটামুটি সমভাবাপন্ন। কর্কটক্রান্তি রেখা এ দেশের প্রায় মাঝখান দিয়ে অতিক্রম করায় এখানে ক্রান্তীয় জলবায়ু বিরাজমান। তবে বিভিন্ন ঋতুর আবির্ভাব থাকায় এদেশের সামগ্রিক জলবায়ুকে ক্রান্তীয় মৌসুমি জলবায়ু বলা হয়। এদেশের বার্ষিক গড় তাপমাত্রা ২৬° সেলসিয়াস এবং গড় বৃষ্টিপাত ২০৩ সে.মি। মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে জুন থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত বৃষ্টি হয়। বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি বৃষ্টিপাত হয় সিলেট অঞ্চলে। উষ্ণ ও আর্দ্র গ্রীষ্মকাল এবং শুষ্ক শীতকাল এদেশের জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্য।

বাংলাদেশের জলবায়ুকে মৌসুমি বায়ু প্রবাহ, বৃষ্টিপাত ও বার্ষিক তাপমাত্রার ভিত্তিতে ৩টি প্রধান ঋতুতে ভাগ করা যায়। যথা- ক. গ্রীষ্মকাল, খ. বর্ষাকাল এবং গ. শীতকাল (চিত্র ৯.৫.১, চিত্র ৯.৫.২ এবং চিত্র ৯.৫.৩)।

ক. গ্রীষ্মকাল : মার্চ থেকে মে মাস (ফাল্গুন-জ্যৈষ্ঠ) পর্যন্ত সূর্য কর্কটক্রান্তির উপর লম্বভাবে কিরণ দেয় এবং এ সময়কেই গ্রীষ্মকাল ধরা হয়। গ্রীষ্মকালে গড়ে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩৪° সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন ২১° সেলসিয়াস। গড় তাপমাত্রা মধ্য এপ্রিল ও মে মাসে সর্বাধিক বৃদ্ধি পায় যা প্রায় ২৮° সেলসিয়াস। গ্রীষ্মকালেই কালবৈশাখী ঝড়, বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড় দেখা যায়। মার্চ-এপ্রিল মাসের কালবৈশাখী অন্যতম প্রাকৃতিক দুর্যোগ। এ সময় গড় বৃষ্টিপাত ৫১ সে.মি এবং বাংলাদেশের বার্ষিক বৃষ্টিপাতের শতকরা ২০ ভাগ গ্রীষ্মকালে হয়। সূর্যের উত্তরায়নের ফলে বায়ুচাপের পরিবর্তন ঘটে। এছাড়াও বাংলাদেশের দক্ষিণ দিক থেকে আগত উষ্ণ ও আর্দ্র বায়ুপ্রবাহ উচ্চচাপে উপরে উঠে গিয়ে উত্তর-পশ্চিম দিক হতে আগত শীতল ও শুষ্ক বায়ু প্রবাহের সাথে সংঘর্ষে বজ্রঝড়ের সৃষ্টি করে।



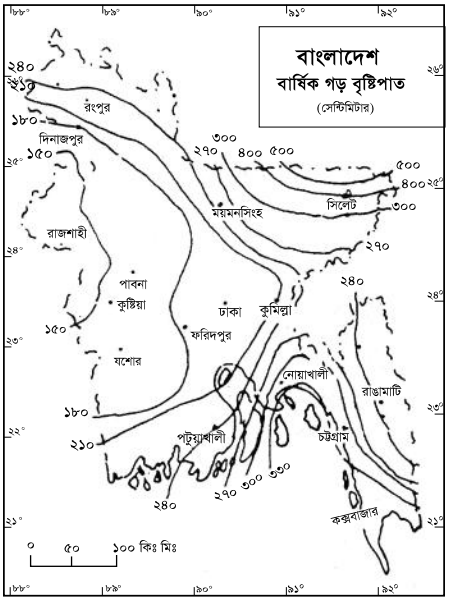
চিত্র-৯.৫.১: বাংলাদেশের গড় তাপমাত্রা (জুলাই)



চিত্র-৯.৫.২: বাংলাদেশের গড় তাপমাত্রা (জানুয়ারি)

খ. বর্ষাকাল : বাংলাদেশে মধ্য জুন থেকে নভেম্বর (জ্যৈষ্ঠ-কার্তিক) পর্যন্ত বর্ষাকাল। বর্ষাকালেও অধিক সূর্যতাপ থাকার ফলে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। তবে আকাশে মেঘ ও প্রচুর বৃষ্টিপাত হওয়ার কারণে অধিক তাপমাত্রা উপলব্ধি করা যায় না। বর্ষাকালে অধিক জলীয়বাষ্পের কারণে শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টিপাত হয়। এই সময় গড় তাপমাত্রা ২৭° সেলসিয়াস পর্যন্ত হয়। বর্ষাকালে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমি বায়ু ভারত মহাসাগর এবং বঙ্গোপসাগরের উপর দিয়ে আসে। বছরে মোট বৃষ্টিপাতের প্রায় ৮০ ভাগ এসময় হয়। বর্ষার শেষ দিকে মাঝে মাঝে ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে।

গ. শীতকাল : বাংলাদেশে নভেম্বর মাসের শেষ থেকে ফেব্রুয়ারি (কার্তিক-ফাল্গুন) পর্যন্ত সময় শীতকাল। এই সময় তাপমাত্রা কমতে থাকে। জানুয়ারি মাসে তাপমাত্রা সর্বনিম্ন থাকে এবং এ মাসের গড় তাপমাত্রা ১৭.৭° সেলসিয়াস। শীতকালের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৯° সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১১° সেলসিয়াস। শুষ্ক শীতকাল এবং উপকূলীয় ও পাহাড়ি এলাকায় সামান্য বৃষ্টিপাত এই দেশের শীতকালের বৈশিষ্ট্য। দেশের উত্তরাঞ্চলে তীব্র শীত অনুভূত হয়। এসময় বাতাসের সর্বনিম্ন আর্দ্রতা শতকরা প্রায় ৩৬ ভাগ থাকে।



চিত্র: ৯.৫.৩: বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাত

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশের জলবায়ুর বৈশিষ্ট্যসমূহ লিখুন।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের জলবায়ুর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো আর্দ্র ও অধিক তাপমাত্রা সম্পন্ন গ্রীষ্মকাল এবং শুষ্ক ও শীতল শীতকাল। বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এদেশের ঋতুকে প্রধানত গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শীত এই তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√)চিহ্ন দিন।

১। বাংলাদেশের বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কত?
(ক) ১০৩ সে.মি (খ) ২০৩ সে.মি (গ) ৩০৩ সে.মি (ঘ) ৪০৩ সে.মি

২। বর্ষাকালে বাংলাদেশে কোন প্রক্রিয়ায় বৃষ্টিপাত হয়?
(ক) পরিচলন (খ) সাংঘর্ষিক (গ) শৈলোৎক্ষেপ (ঘ) সাইক্লোনিক

৩। বাংলাদেশের শীতলতম মাস কোনটি?
(ক) জানুয়ারি (খ) ফেব্রুয়ারি (গ) নভেম্বর (ঘ) ডিসেম্বর

৪। গ্রীষ্মকালীন সর্বনিম্ন তাপমাত্রা কত?
(ক) ১১° সে. (খ) ১৬° সে. (গ) ২১° সে. (ঘ) ২৭° সে.

পাঠ-৯.৬ গ্রিন হাউজ প্রভাব ও বিশ্ব উষ্ণায়ন
(Green House Effect and Global Warming)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- গ্রিন হাউজ ও এর প্রতিক্রিয়া বলতে পারবেন এবং
- বিশ্ব উষ্ণায়নের কারণ, প্রভাব এবং প্রতিরোধের উপায় ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

গ্রিন হাউজ প্রভাব ও বিশ্ব উষ্ণায়ন

পৃথিবী জুড়ে উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন অত্যন্ত আলোচিত বিষয়। বলা হয়ে থাকে, প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হবার জন্য মানবসৃষ্ট কর্মকান্ড দায়ী। শক্তি সম্পদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা বৃদ্ধি, অধিক জনসংখ্যার চাপ, ব্যাপক জ্বীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার ইত্যাদি জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। প্রতিবছরই মানবসৃষ্ট নানা ধরনের দূষণ আমাদের চারপাশের পরিবেশকে বিপর্যস্তড় করছে। পৃথিবী পৃষ্ঠে গ্রিন হাউজ গ্যাস বৃদ্ধির জন্য মানুষের অতি শিল্প নির্ভরশীলতা ও প্রাকৃতিক সম্পদের যথেচ্ছ ব্যবহারের প্রবণতাকে দায়ী করা হয়।

গ্রিন হাউজ হলো এমন একটি কাঁচের ঘর যেখানে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে গাছপালা জন্মানোর জন্য উপযোগী আবহাওয়া তৈরি করা হয়। সূর্যের আলো যখন এই কাঁচের ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে তখন ভিতরে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। পৃথিবীও গ্রিন হাউজের মত এমন একটি আবাসস্থল যেখানে প্রতিদিনই তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে যা পৃথিবী হতে দূরীভূত হচ্ছে না। গ্রিন হাউজের তাপমাত্রা ধরে রাখার প্রক্রিয়াটি বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধি প্রক্রিয়ার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এ কারণেই গ্রিন হাউজ এর সাথে মিল রেখে বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধিকে চিহ্নিত করা হয়েছে গ্রিন হাউজ প্রতিক্রিয়া হিসেবে।

বৈশ্বিক উষ্ণায়ন হলো বিশ্বের গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি। এটিকে গ্রিন হাউজের প্রতিক্রিয়া হিসেবে দেখা হয়। বৈশ্বিক উষ্ণায়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের গ্যাসকে দায়ী করা হয়। এগুলো হলো কার্বন ডাই-অক্সাইড, নাইট্রাস অক্সাইড, ক্লোরোফ্লোরো কার্বন, মিথেন, ওজোন, জলীয়বাষ্প প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বৈশ্বিক উষ্ণায়নের কারণ : ১৮০০ সালের প্রথম দিকে শিল্প বিপ্লবের পর থেকেই কয়লা, তেল, গ্যাসোলিনের মত জ্বীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। ফলে বায়ুমন্ডলে গ্রিন হাউজ গ্যাসের ঘনত্ব বৃদ্ধি পায়। এর ফলে বায়ুমন্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইড বৃদ্ধি, বনায়ন এবং জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হয়। কল-কারখানা ও যানবাহনের নির্গত বিষাক্ত ধোঁয়া, নগরায়ন, বাড়ি ঘরের অবকাঠামোগত বৈশিষ্ট্য, অতিরিক্ত খনিজ সম্পদ আহরণের জন্য আধুনিক প্রযুক্তি নির্ভরতার কারণে বিশ্বজুড়ে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেই সাথে সূর্য থেকে আগত অতিবেগুনি রশ্মিও পৃথিবী পৃষ্ঠে বসবাসরত জীবজগতের জীবনধারণে ক্ষতিকর প্রভাব বিস্তার করে।

বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রভাব : বৈশ্বিক উষ্ণায়নের উল্লেখযোগ্য প্রভাবসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলো-

১. **জলবায়ু পরিবর্তন :** বৈশ্বিক উষ্ণায়নের মুখ্য প্রভাব হলো জলবায়ু পরিবর্তন। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বৃষ্টিপাতের ধরনের পরিবর্তন হচ্ছে। যেমন- অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি। এছাড়া অধিক গরম, খরা, এসিড বৃষ্টি প্রভৃতি দেখা দিচ্ছে।

২. **প্রাকৃতিক দুর্যোগ সৃষ্টি :** বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংঘটনের হার বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে। বন্যা, খরা, ঘূর্ণিঝড়, লবণাক্ততার ন্যায় প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংঘটনের হার সবচেয়ে বেশি।

৩. **মেরু অঞ্চলের বরফ গলন :** বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে বিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে ০.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে মেরু অঞ্চলের বরফ গলতে শুরু করেছে।

৪. **সমুদ্রে পৃষ্ঠের উচ্চতা পরিবর্তন :** বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে। সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পেলে বাংলাদেশ, মালদ্বীপ, মিশর, ভিয়েতনাম, ফিজি, কিরিবাতি, টুভ্যালু প্রভৃতি দেশের উপকূলীয় অঞ্চল সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে যেতে পারে। এছাড়া কৃষি জমি লবণাক্ত হয়ে উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পাবে।

৫. জীববৈচিত্র্য ধ্বংস : বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে পৃথিবীতে বহু প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণিকূল বিলুপ্ত হবে। বৈশ্বিক উষ্ণায়ন উদ্ভিদ ও প্রাণির বসবাসের অনুকূল পরিবেশে সরাসরি আঘাত হানার মধ্য দিয়ে ধ্বংস সাধন করছে।

৬. **রোগব্যাধি :** উষ্ণায়নের ফলে বিভিন্ন সংক্রামক রোগ যেমন-ম্যালেরিয়া, এজমা, এলার্জি প্রভৃতি রোগের বিস্তার ঘটছে।

এছাড়া পৃথিবীর ভূমিক্ষয়, সমুদ্রের পানির তাপমাত্রা বৃদ্ধি, ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়া, মাটির উর্বরতা হ্রাস, প্রাকৃতিক জলাশয়ের উৎস বিনষ্ট হওয়া, খাদ্যে অনিরাপত্তা, বাস্তুসংস্থানের চক্র বিনষ্ট হওয়া, ওজোন স্তরের কার্যক্রম নষ্ট হওয়া, সমুদ্রে অক্সিজেন দ্রবীভূত হওয়ার পরিমাণ কমে যাওয়া ইত্যাদি নানা ধরনের হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে পৃথিবীবাসী।

গ্রিন হাউজ প্রভাব ও বৈশ্বিক উষ্ণায়ন প্রতিরোধের উপায় : পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা সমাধানে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হলো-

১. পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি ও কার্বন উৎপাদনের হারকে কমিয়ে আনা;
২. যানবাহন ও কল-কারখানার দূষিত গ্যাস নির্গমন নিয়ন্ত্রণ;
৩. যথাযথ মাত্রায় জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার;
৪. বিকল্প জ্বালানি যেমন- কয়লা, খনিজ তেল, পারমানবিক শক্তি এর পরিবর্তে সৌরশক্তি, বায়ু শক্তি, জৈব গ্যাস ব্যবহার করা;
৫. প্রাকৃতিক বন সংরক্ষণ এবং নতুন বন সৃজন;
৬. পরিবেশ বান্ধব শিল্পায়ন;
৭. জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং রাষ্ট্রীয় ও বৈশ্বিক পদক্ষেপ প্রভৃতি।

সুতরাং একুশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় পৃথিবী ও প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বৃদ্ধি রোধ করতে হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বৃদ্ধির ফলে বাংলাদেশ কী ধরনের ক্ষতির মুখোমুখি হতে পারে বলে আপনি মনে করেন। বর্ণনা করুন।

সারসংক্ষেপ

পৃথিবী জুড়ে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব ব্যাপকভাবে ক্ষতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করছে। এর উল্লেখযোগ্য কারণ হলো গ্রিন হাউজ প্রভাব ও বৈশ্বিক উষ্ণায়ন। বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বৃদ্ধির ফলে পৃথিবী পৃষ্ঠে বসবাসকারী মানুষ ও জীবজন্তুর জীবন হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে। তাই গ্রিন হাউজ প্রভাব ও বৈশ্বিক উষ্ণায়ন প্রতিরোধে এখনই কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। গ্রিন হাউজ প্রভাবের জন্য দায়ী-

i জলীয়বাষ্প ii. হাইড্রোজেন iii. মিথেন
নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২। কোন সালে শিল্প বিপ্লবের প্রভাব বৈশ্বিক উষ্ণায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে?

(ক) ১৪০০ এর পরে (খ) ২০০০ সালে (গ) ১৮০০ এর পরে (ঘ) ১৬০০ এর পূর্বে

৩। কোনটি বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলাফল?

(ক) নতুন সড়কপথ সৃষ্টি (খ) মহাশুন্যে অভিযান
(গ) হিমালয়ের বরফ গলন (ঘ) সমুদ্রের পানি নিচে নেমে যাওয়া

পাঠ-৯.৭ জলবায়ু পরিবর্তন ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত (Climate Change & Bangladesh Perspective)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ ও প্রভাব সম্পর্কে বলতে পারবেন এবং
- জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

জলবায়ু পরিবর্তন ও বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। বাংলাদেশের মাঝবরাবর কর্কটক্রান্তি রেখা অতিক্রম করেছে। এদেশের ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, আবহাওয়া ও জলবায়ু প্রকৃতির উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। অধিক জনসংখ্যার চাপ, মানুষের গ্রাম হতে শহরে স্থানান্তর, প্রাকৃতিক ও শক্তি সম্পদের উপর অধিক চাহিদা, অপরিকল্পিত নগরায়ন সবই এদেশের প্রাকৃতিক উপাদানের উপর প্রভাব ফেলছে। মানবসৃষ্ট কর্মকান্ডের নেতিবাচক প্রভাব এদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ বিনষ্ট করছে। এছাড়া বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের মানুষ আজ ঝুঁকিপূর্ণ দিনাতিপাত করছে।

জলবায়ু পরিবর্তন : কোনো একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল বা এলাকায় দীর্ঘ মেয়াদে গড় আবহাওয়ার পরিবর্তনকে জলবায়ুর পরিবর্তন বলে। আমরা জানি, পৃথিবীতে প্রতিদিন যে সূর্যকিরণ পতিত হয় ভূ-পৃষ্ঠ তা শোষণ করে নেয়। শোষিত সূর্যকিরণ আবার মহাশূন্যে বিকিরিত বা প্রতিফলিত হয়। প্রকৃতির এটিই স্বাভাবিক নিয়ম। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মের এই শোষণ বিকিরণ প্রক্রিয়ায় কোনো ধরনের বাঁধা বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হলেই জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটে।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ : জলবায়ু পরিবর্তন হয়ে থাকে মূলত পৃথিবীর গড় তাপমাত্রার বৃদ্ধির ফলে। আর তাপমাত্রা বৃদ্ধির প্রধান কারণ হলো-

১. জীবাশ্ম জ্বালানির মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার;
২. শিল্প-কারখানার ধোঁয়া ও বিষাক্ত বর্জ্য;
৩. যানবাহন থেকে নির্গত ধোঁয়া যেমন- কার্বন মনোঅক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড;
৪. ব্যাপকহারে বনাঞ্চল ধ্বংস;
৫. তেজস্ক্রিয় দূষণ;
৬. বনভূমি এলাকায় দাবানল;
৭. ওজোন স্তর ক্ষয় এবং
৮. মানুষের বিলাসবহুল জীবযাপনের জন্য প্রস্তুত বিভিন্ন সামগ্রী (যেমন-এয়ারকন্ডিশনার) প্রভৃতি।

জলবায়ু পরিবর্তনে বৈশ্বিক প্রভাব : আগামী দশকের যে সকল চ্যালেঞ্জ বিশ্ববাসীকে মোকাবেলা করতে হবে তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো জলবায়ু পরিবর্তন এবং এর বিরূপ প্রভাব। সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, খাদ্য নিরাপত্তার অভাব, ক্ষুধা ও দারিদ্রতার হার বৃদ্ধি, কৃষিজাত পণ্যের ফলন ও মান কমে যাওয়া, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, টর্নেডো, ভূমিকম্প, সুনামির প্রকোপ বৃদ্ধি, অস্বাভাবিকভাবে ঋতু বৈচিত্র্যের চক্র নষ্ট হওয়া, জীববৈচিত্র্য ধ্বংস হওয়া, ইকোলজির প্রতি হুমকি প্রভৃতি জলবায়ু পরিবর্তনের উল্লেখযোগ্য প্রভাব ।

জলবায়ু পরিবর্তনে বাংলাদেশের উপর প্রভাব : জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের উপরও বিভিন্ন নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। নিম্নে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের উপরও যেসব প্রভাব পড়বে সেগুলো উল্লেখ করা হলো।

১. উপকূলীয় অঞ্চলের জমিতে লবনাক্ততার পরিমাণ বৃদ্ধি,
২. কৃষি জমির উর্বরতা হ্রাস,
৩. অধিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি,
৪. দেশের উত্তরাংশসহ বিস্তীর্ণ এলাকা খরায় আক্রান্ত হওয়া,
৫. ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়া,
৬. আবাদী জমির পরিমাণ হ্রাস পাওয়া,
৭. মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ যেমন- অতিরিক্ত লবনাক্ততায় মৎস্য প্রজাতির বিলুপ্তি দেখা যাচ্ছে।
৮. যে হারে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে সেই হারে যদি সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পায় তাহলে প্রায় ১৫% স্থলভাগ হারানোর সম্ভাবনা আছে। এক্ষেত্রে উপকূলীয় অঞ্চলে বসবাসকারী প্রায় ৩০ মিলিয়ন (৩কোটি) মানুষ ও নানা প্রজাতির জীবজন্তু, সম্পদ প্রভৃতি ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে।
৯. এদেশের স্বতন্ত্র বাস্তুতন্ত্রের সবচেয়ে বড় উদাহরণ হলো সুন্দরবন, সেখানে প্রাণি বৈচিত্র্য হুমকির সম্মুখীন হতে পারে।
১০. বিশুদ্ধ খাবার পানির সংকট প্রভৃতি।

এছাড়াও অতিবৃষ্টি, বন্যা, শহরে জলাবদ্ধতা, বনভূমি উজাড় হয়ে যাওয়াসহ বিভিন্ন ধরনের এ সকল সমস্যা জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তাই এদেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষা তথা উদ্ভিদ ও প্রাণিকূলের জীবনরক্ষায় যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবগুলো নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবগুলো কী তা লিখুন।

সারসংক্ষেপ

বিশ্বজুড়ে জলবায়ু পরিবর্তন প্রাকৃতিক পরিবেশে নানামুখী প্রভাব বিস্তার করছে। বাংলাদেশেও জলবায়ুর পরিবর্তন সংক্রান্ত প্রভাবসমূহ জীবনযাত্রাকে হুমকির সম্মুখীন করছে। অতিরিক্ত খরা, বন্যা, বনভূমি ধ্বংস, প্রাকৃতিক সম্পদ বিলুপ্তি ইত্যাদি জলবায়ু পরিবর্তনের উল্লেখযোগ্য প্রভাব।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব-
i সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ii. অধিক জনসংখ্যা iii. খাদ্য নিরাপত্তা হ্রাস
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২। অতিরিক্ত লবণাক্ততার ফলাফল কোনটি?
(ক) শহরে অভিগমন (খ) মাছ চাষ বৃদ্ধি (গ) শহরে বনাঞ্চল বৃদ্ধি (ঘ) কৃষি জমি নষ্ট হওয়া

৩। জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে কোনটি সম্পর্কযুক্ত?
(ক) বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধি (খ) গাছ লাগানো (গ) কৃষিকাজ করা (ঘ) মাছের বংশ বৃদ্ধি

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১

মিরা তার বোনকে বললেন, প্রতিদিন যে হারে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে, এর ফলে আবহাওয়া ও জলবায়ুর পরিবর্তনও ব্যাপকহারে লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে জলবায়ু অঞ্চলসমূহের বৈশিষ্ট্যও পরিবর্তিত হচ্ছে। এই পরিবর্তনের ফলে প্রাণি ও উদ্ভিদজগতে ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

(ক) জলবায়ুর পরিবর্তন কী?

(খ) বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রধান কারণ কী?

(গ) উদ্দীপকের আলোকে বৈষ্ণিক উষ্ণায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তনের মধ্যে সম্পর্ক লিখুন।

(ঘ) জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশে কী ধরনের প্রভাব পড়বে বলে আপনি মনে করেন?

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.১: ১. খ ২. ক ৩. ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.২: ১. গ ২. গ ৩. ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৩: ১. গ ২. খ ৩. গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৪: ১. খ ২. গ ৩. খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৯.৫: ১. খ ২. গ ৩. ক ৪. গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৬: ১. খ ২. গ ৩. গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৭: ১. গ ২. ঘ ৩. ক

পাঠ-৯.৮

সমতাপ রেখা, সমচাপ রেখা, সমবর্ষণ রেখা অংকন এবং মানচিত্রে বিশ্লেষণ (Draw a Line of Isotherm, Isober & Isohyet and Analysis on Map)

উদ্দেশ্য

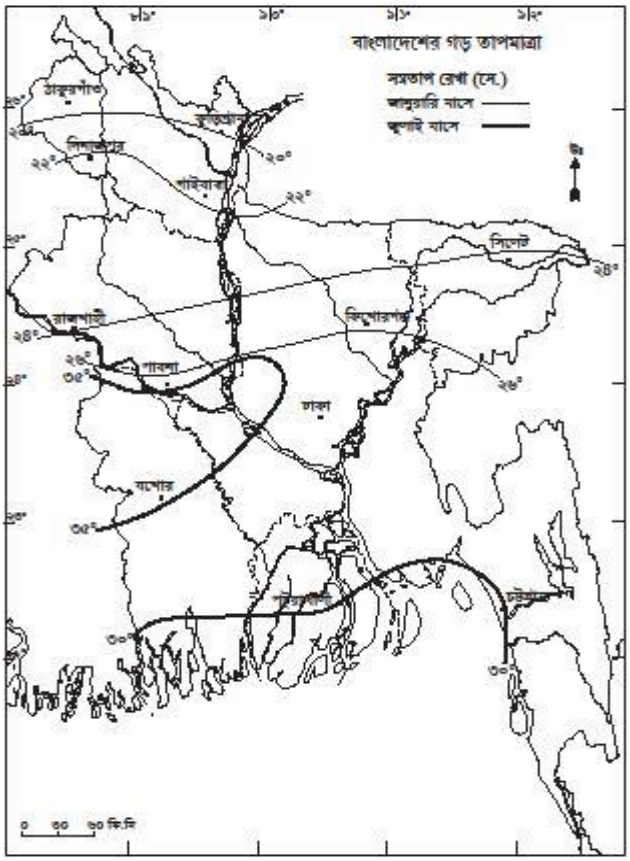
এ পাঠ শেষে আপনি-

- সমতাপ, সমচাপ ও সমবর্ষণ রেখা অংকন ও বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

সমতাপ রেখা

কোনো নির্দিষ্ট সময়ে ভূ-পৃষ্ঠের কোনো স্থান বা দেশের সমান বায়ুতাপ বিশিষ্ট স্থানসমূহকে মানচিত্রের উপর সাবলীল বক্ররেখা দ্বারা সংযুক্ত করে যে মানচিত্র তৈরি করা হয়, তাকে সমতাপ রেখা মানচিত্র বলে এবং সমান রেখাসমূহকে বলা হয় সমতাপ রেখা।

সমতাপ রেখা অঙ্কন পদ্ধতি ও বিশ্লেষণ : কোনো এলাকায় তাপমাত্রার ধরনের উপর ভিত্তি করে সমতাপ রেখা অঙ্কন করা হয়। নিম্নে সমতাপ রেখা মানচিত্রে অঙ্কনের পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা হলো-



চিত্র-৯.৮.১- সমতাপ রেখার মাধ্যমে বাংলাদেশে গড় তাপমাত্রার বিন্যাস বিশ্লেষণ

উপরের মানচিত্রে জুলাই ও জানুয়ারি দুই মাসের তাপমাত্রার বিন্যাস দেখানো হয়েছে। যে সকল অঞ্চলসমূহ একই ধরনের তাপমাত্রা বিশিষ্ট তা একটি রেখা দ্বারা সংযুক্ত করা হয়েছে। অঙ্কিত রেখাটি সমান তাপমাত্রা বিশিষ্ট এলাকাসমূহকে মানচিত্রে সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত করে বলেই এই সকল রেখাকে বলা হয় সমতাপ রেখা। সমতাপ রেখা দ্বারা কোনো অঞ্চলের

ঋতুভিত্তিক তাপমাত্রার পার্থক্য অনুধাবন করা যায়। যেমন- চিত্রে জানুয়ারি ও জুলাই মাসের তাপমাত্রার পার্থক্যের ধরণ দুটি ভিন্ন আকারের সমতাপ রেখা দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। সমতাপ রেখা অঙ্কনে সুবিধা হলো এই রেখা দ্বারা কোনো ভৌগোলিক অঞ্চলের আবহাওয়া ও জলবায়ুর গড় তাপমাত্রাকে জানা যায় এবং ভূগোল শাস্ত্রে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জলবায়ু বিজ্ঞানীরা এই সমতাপ রেখা অঙ্কনের মাধ্যমে একেক অঞ্চলে সূর্যরশ্মি পতন, বায়ুপ্রবাহ, বৃষ্টিপাত, উষ্ণতা ও শীতের প্রকোপ ইত্যাদি পরিমাপ করে থাকেন।

শিক্ষার্থীর কাজ	নিম্নের সারণি থেকে সমতাপ রেখা অঙ্কন করে মানচিত্র তৈরি করুন।

স্থান	তাপমাত্রা
ঢাকা	৩৩.০° সে
টাঙ্গাইল	৩০.৩° সে
ময়মনসিংহ	৩১.৫° সে
পঞ্চগড়	২৮.০° সে
ঠাকুরগাও	২৫.৩° সে
রংপুর	২২.৪° সে

সমচাপ রেখা (Isober Line) : কোনো নির্দিষ্ট সময়ে দেশের বিভিন্ন স্থানের বায়ুর চাপ নির্ধারণ করে যখন মানচিত্রে প্রকাশ করা হয় তাকে সমচাপ রেখা মানচিত্র এবং রেখাসমূহকে সমচাপ রেখা বলে। সাধারণত ৪ মিলিবার পরপর সমচাপ রেখা অঙ্কন করা হয়। যে স্থানে বায়ুর চাপ বেশি সেই স্থানে উচ্চচাপ এবং যে স্থানে বায়ুর চাপ কম সে স্থানে নিম্নচাপ অবস্থা প্রকাশ করা হয়। সমচাপ রেখার মাধ্যমে কোনো স্থানের বায়ুর চাপের ও গতির পার্থক্য সম্পর্কে জানা যায়। সাধারণত সমুদ্রগামী জাহাজ, নদীবন্দরে অবস্থিত নৌযান চলাচলে কোনো সতর্কবার্তা প্রেরণের ক্ষেত্রে এই সমচাপ রেখা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করে। সমচাপ রেখার মাধ্যমেই বায়ুর উচ্চচাপ ও নিম্নচাপ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন এলাকাগুলো সহজে চিহ্নিত করা যায়।

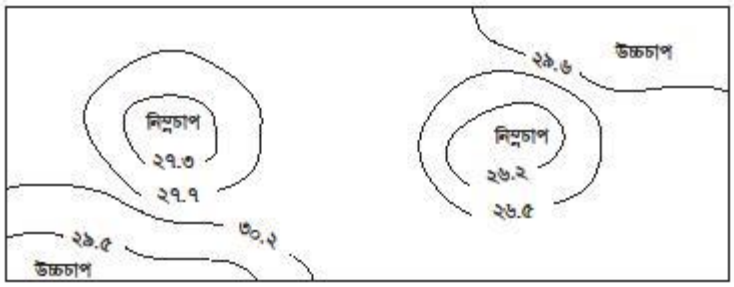
সমচাপ রেখা অঙ্কন পদ্ধতি ও বিশ্লেষণ : সমচাপ রেখা সাধারণত বায়ুর উচ্চচাপ ও নিম্নচাপকে মানচিত্রে রৈখিক বিন্যাস দ্বারা প্রকাশ করে। সমচাপ রেখা দুটি পদ্ধতিতে অঙ্কন করা যায়-

১. ঘূর্ণিবাত, নিম্নচাপ বা অবনমন এবং

২. প্রতীপ ঘূর্ণিবায়ু বা উচ্চচাপ।

১. ঘূর্ণিবাত, নিম্নচাপ বা অবনমন (Cyclone, Low Pressure or Depression) : ঘূর্ণিবায়ুর কেন্দ্রে নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়। বায়ু উত্তর গোলার্ধে বাম দিকে বেঁকে (Anti-Clockwise) এবং দক্ষিণ গোলার্ধে ডানদিকে বেঁকে (Clockwise) যায়। এভাবে ঘুরতে ঘুরতে বায়ু ঘূর্ণিবায়ুর কেন্দ্রেস্থলের দিকে বায়ু ঊর্ধ্বগামী হয় এবং উষ্ণ বায়ুর সাথে মিলিত হয়ে চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে। এ সময় ঐ এলাকায় নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়।

২. প্রতীপ ঘূর্ণিবায়ু বা উচ্চচাপ (Anti-Cyclone or High Pressure) : প্রতীপ ঘূর্ণিবায়ুর কেন্দ্রে উচ্চচাপ সৃষ্টি হয়। অল্প পরিসর স্থানের বায়ু শীতল হয়ে উচ্চচাপ তৈরি হয়। প্রতীপ ঘূর্ণিবায়ু "ডিম্বাকৃতি" আকারের রৈখিক বিন্যাসের দ্বারা অঙ্কিত হয় এবং তা বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে থাকে।



চিত্রঃ ৯.৮.২- সমচাপ রেখার মাধ্যমে বায়ুর উচ্চচাপ ও নিম্নচাপ নির্ণয়

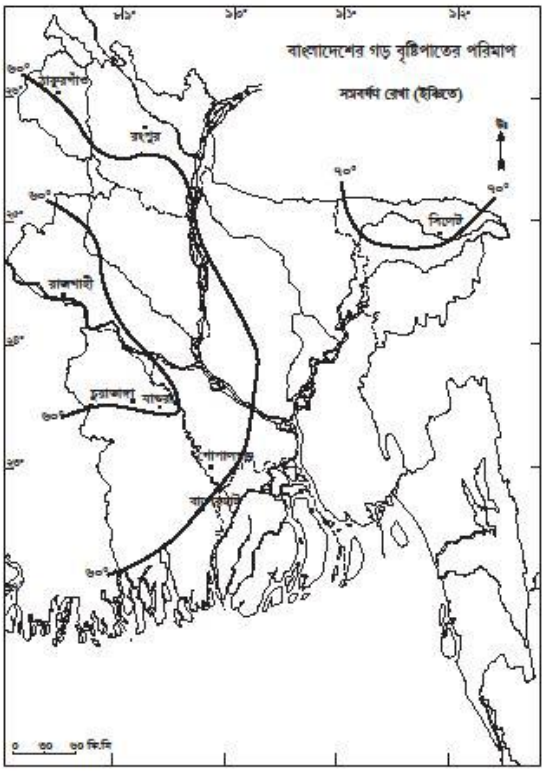
চিত্রে বায়ুর উচ্চচাপ এলাকাসমূহ একে বেঁকে অঙ্কন করা হলে বায়ুর নিম্নচাপ এলাকাসমূহ ডিম্বাকৃতির আকারে অঙ্কিত হয়েছে। মূলত এই সকল সমচাপ রেখার মাধ্যমেই বায়ুর চাপের তারতম্য অনুধাবন করা যায়।

সমবর্ষণ রেখা (Isohyet Line) : ভূ-পৃষ্ঠের একই পরিমাণ বৃষ্টিপাত বিশিষ্ট স্থানসমূহকে যখন মানচিত্রে রেখা দ্বারা সংযুক্ত করা হয় তখন তাকে বলা হয় সমবর্ষণ রেখা এবং যে মানচিত্রে এ রেখাগুলো দেখানো হয় তাকে সমবর্ষণ রেখা মানচিত্র বলে। সমবর্ষণ রেখা দ্বারা কোনো স্থানের গড় বার্ষিক বৃষ্টিপাতের উপাত্ত ইঞ্চিতে প্রকাশ করা হয়। আবহাওয়াবিদ ও জলবায়ু বিশেষজ্ঞরা সমবর্ষণ রেখার মাধ্যমে দৈনিক বৃষ্টিপাতের পরিমাপের সাথে বিভিন্ন বছরের বিভিন্ন সময়ে বৃষ্টিপাতের পরিমাপের পার্থক্য অনুধাবন করতে পারেন।

সমবর্ষণ রেখা অঙ্কন পদ্ধতি ও বিশ্লেষণ : মানচিত্রে সমবর্ষণ রেখা অঙ্কন করার ক্ষেত্রে বৃষ্টিপাতের ইঞ্চি পরিমাপকে প্রাধান্য দেয়া হয়। সাধারণত যে সকল অঞ্চলে একই ধরনের পরিমাপ বিশিষ্ট বৃষ্টিপাতের হার দেখা যায়, ঐ সকল স্থানে সেই ধরনের সমবর্ষণ রেখা অঙ্কন করা হয়।

স্থান	বৃষ্টিপাতের পরিমাপ(ইঞ্চি)	স্থান	বৃষ্টিপাতের পরিমাপ(ইঞ্চি)
ঠাকুরগাঁও	৬০.১	সিলেট	৭১.০
রংপুর	৬০.০	সুনামগঞ্জ	৭০.০
টাঙ্গাইল	৬০.৩	রাজশাহী	৫০.৩
গোপালগঞ্জ	৬১.১	চুয়াডাঙ্গা	৫১.৩
বাগেরহাট	৬০.৩	মাগুরা	৫১.৩

চিত্রে সুনামগঞ্জ ও সিলেট অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের ইঞ্চি দ্বারা প্রাপ্ত অনুপাতের হিসেবে যে রেখা অঙ্কিত হয়েছে তাতে দেখা যায় যে এই অঞ্চলে বৃষ্টিপাতের হার বেশি। অন্যদিকে রাজশাহী, চুয়াডাঙ্গা ও মাগুরায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অপেক্ষাকৃত কম।



চিত্র-৯.৮.৩-সমবর্ষণ রেখার মাধ্যমে বাংলাদেশে গড় বৃষ্টিপাত পরিমাপ

শিক্ষার্থীর কাজ | নিম্নের সারণি থেকে বাংলাদেশের বৃষ্টিপাতের সমবর্ষণ রেখা মানচিত্র অঙ্কন করুন।

স্থান	বৃষ্টিপাতের পরিমাপ
চট্টগ্রাম	৬০.৩
কুমিল্লা	৬১.৪
ব্রাহ্মনবাড়িয়া	৬৫.৭
নোয়াখালি	৬১.০
রাজশাহী	৪৪.০
নবাবগঞ্জ	৪০.১
যশোর	৪২.০০

পাঠ-৯.৯ বৃষ্টিপাত উপাত্তের সাহায্যে রেখাচিত্র অংকন ও বিশ্লেষণ (Analysis of a Line Graph drawn by using Rainfall Data)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বৃষ্টিপাতের পরিমাপ ও ঋতুভিত্তিক বিন্যাস সম্পর্কে জানার পদ্ধতি শিখতে পারবেন।

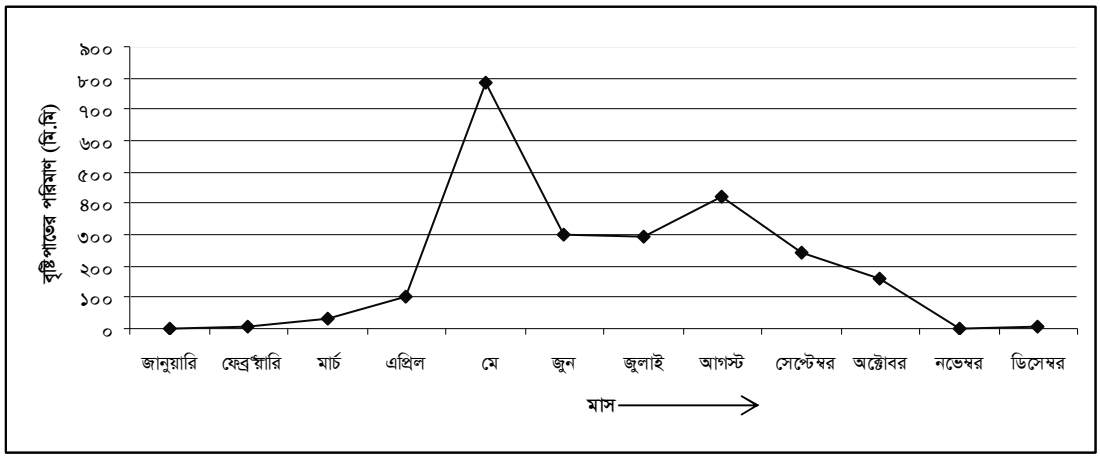
বৃষ্টিপাতের উপাত্ত ব্যবহার করে রেখাচিত্র অঙ্কন ও বিশ্লেষণ

বৃষ্টিপাতের উপাত্ত ব্যবহার করে রেখাচিত্র অঙ্কনের জন্য কোনো একটি মাসের প্রতিদিনের বৃষ্টিপাত বা বছরের প্রতি মাসের গড় বৃষ্টিপাতের উপাত্ত সংগ্রহ করতে হবে। এরপর গ্রাফ পেপার বা সাদা কাগজের x কলামে দিন বা মাস এবং y কলামে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ দেখাতে হবে। এভাবে বৃষ্টিপাতের উপাত্তের সাহায্যে রেখাচিত্র অংকন করতে হবে।

নিম্নে শ্রীমঙ্গল উপজেলার ২০১৩ সালের প্রতি মাসের গড় বৃষ্টিপাতের উপাত্ত থেকে একটি রেখাচিত্র অংকন করে দেখানো হলো।

শ্রীমঙ্গল উপজেলার ২০১৩ সালের মাসভিত্তিক গড় বৃষ্টিপাত (মিলিমিটার)

মাস	গড় বৃষ্টিপাত
জানুয়ারি	০
ফেব্রুয়ারি	৯
মার্চ	৩১
এপ্রিল	১০৪
মে	৭৮৩
জুন	৩০১
জুলাই	২৯৩
আগস্ট	৪২০
সেপ্টেম্বর	২৪১
অক্টোবর	১৫৯
নভেম্বর	০
ডিসেম্বর	৫



চিত্র ৯.৯.১ : শ্রীমঙ্গল উপজেলার বৃষ্টিপাতের উপাত্ত ব্যবহার করে রেখাচিত্র অংকন

উপরিউক্ত লেখচিত্রটি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, x অক্ষে মাস এবং y অক্ষে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ দেখানো হয়েছে। x অক্ষে উল্লিখিত মে মাসে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি (৩৩.৭) এবং জানুয়ারি ও নভেম্বর মাসে বৃষ্টিপাত না হওয়ায় (০ মি.মি) জানুয়ারি ও নভেম্বর মাসের উপর অংকিত রেখাটি সবার নিচে এবং মে মাসের উপর অংকিত রেখাটি সবার উপরে দেখা যাচ্ছে। এপ্রিল থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের পরিমাণ অন্য মাসগুলো অপেক্ষা বেশি থাকায় মান অনুযায়ী রেখাগুলোও উপরের দিকে। অন্যদিকে নভেম্বর হতে ফেব্রুয়ারি মাস এই চার মাস শীতকাল থাকায় মান অনুযায়ী অংকিত রেখাগুলো নিচের দিকে। কারণ শীতকালে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম। মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত গ্রীষ্মকাল থাকায় বর্ষাকালের তুলনায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম এবং শীতকালের তুলনায় বেশি বৃষ্টিপাত হয়। এজন্য মার্চ, এপ্রিল ও মে মাসের উপর অংকিত রেখাগুলো মান অনুযায়ী পাশাপাশি উচ্চতায় রেখাচিত্র দেখা যাচ্ছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	নিম্নের সারণি থেকে বাংলাদেশের বৃষ্টিপাতের উপাত্ত থেকে রেখাচিত্র অঙ্কন করুন।

মাস	গড় বৃষ্টিপাত (মি.মি)
জানুয়ারি	০
ফেব্রুয়ারি	৬৮
মার্চ	৬৯
এপ্রিল	২৯৩
মে	২১৪
জুন	৬২২
জুলাই	২৪৫
আগস্ট	৩৬২
সেপ্টেম্বর	৩৩৩
অক্টোবর	১৫২
নভেম্বর	১৫৯
ডিসেম্বর	১

ইউনিট ১০

বারিমন্ডল
(Hydrosphere)

ভূমিকা

আমাদের এই সুন্দর পৃথিবীর প্রায় তিন চতুর্থাংশ বারিমন্ডলের অন্তর্ভুক্ত। বারিমন্ডল হলো ভূ-ত্বকের অবনমিত অংশে অবস্থিত বিশাল পানিরাশি। এই বিশাল পানিরাশির সবচেয়ে বড় আধার মহাসাগর এবং সাগর। এছাড়া রয়েছে অসংখ্য নদ-নদী, হ্রদ, খাল, বিল ও জলাশয়। ভূ-পৃষ্ঠের ন্যায় মহাসাগর এবং সাগরের তলদেশের ভূমিরূপও বৈচিত্র্যময়। এখানে রয়েছে পাহাড়, পর্বত, মালভূমি, সমভূমি, আগ্নেয়গিরি, জলজ উদ্ভিদ প্রভৃতি। এছাড়া মহাসাগরের তলদেশে রয়েছে সম্পদের ভান্ডার। এই ইউনিটে পৃথিবীর পানির উৎস, বন্টন, সাগর, মহাসাগর, মহাসাগরের তলদেশের ভূমিরূপ, বঙ্গোপসাগরের তলদেশের ভূমিরূপ, পানিচক্র ও মহাসাগরের আয়তন পাইচিত্রে প্রদর্শনের পদ্ধতি প্রভৃতি আলোচনা করা হয়েছে।





ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ ১০.১ : পৃথিবীর পানির উৎস ও বণ্টন
পাঠ ১০.২ : পৃথিবীর মহাসাগর ও সাগর
পাঠ ১০.৩ : মহাসাগরের তলদেশের ভূমিরূপ
পাঠ ১০.৪ : প্রশান্তমহাসাগরের তলদেশের ভূমিরূপ
পাঠ ১০.৫ : আটলান্টিক মহাসাগরের তলদেশের ভূমিরূপ
পাঠ ১০.৬ : ভারত মহাসাগরের তলদেশের ভূমিরূপ
পাঠ ১০.৭ : বঙ্গোপসাগরের তলদেশের ভূমিরূপ
পাঠ ১০.৮ : পানি চক্র ও এর গুরুত্ব

ব্যবহারিকঃ

পাঠ ১০.৯ : মহাসাগরের আয়তন পাইচিত্রে প্রদর্শন

পাঠ-১০.১ পৃথিবীর পানির উৎস এবং বন্টন
(Water Sources & Distribution of the World)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বারিমন্ডলের সংজ্ঞা বলতে পারবেন এবং
- বিশ্বের পানির উৎস ও বন্টন বর্ণনা করতে পারবেন।

বারিমন্ডল

আমরা জানি, পৃথিবীর আকৃতি বর্তুলাকার। এই ভূ-ভাগের উপরিভাগকে দুইটি অংশে বিভক্ত করা যায়। যথা- স্থলভাগ এবং জলভাগ। পৃথিবীর জলভাগই হলো বারিমন্ডল। বারিমন্ডলের ইংরেজি প্রতিশব্দ Hydrosphere। Hydro অর্থ পানি এবং Sphere অর্থ ক্ষেত্র। অর্থাৎ আভিধানিক অর্থে Hydrosphere এর অর্থ পানির ক্ষেত্র বা আধার। সুতরাং বারিমন্ডল বলতে ভূ-ত্বকের অবনমিত অংশে অবস্থিত যে বিশাল পানিরাশি রয়েছে তাকে বুঝায়। পানি একটি যৌগিক পদার্থ। অক্সিজেন (O) এবং হাইড্রোজেন (H_2) এর সমন্বয়ে পানি (H_2o) গঠিত। মহাসাগর, সাগর, উপসাগর, হ্রদ, নদীসহ অন্যান্য জলাধার নিয়ে বারিমন্ডল গঠিত। নিম্নে বারিমন্ডলের অর্ন্তভুক্ত আধারগুলোর সংজ্ঞা উল্লেখ করা হলো-

মহাসাগর (Ocean) : পৃথিবী পৃষ্ঠের উপর অবস্থিত বিশাল আকৃতির পানির আধারকে মহাসাগর বলে। যেমন- প্রশান্তমহাসাগর।

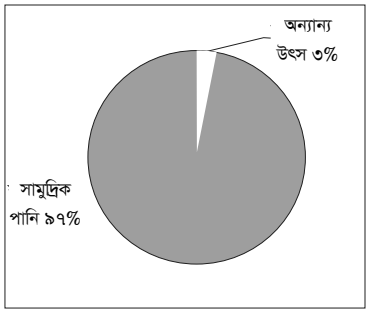
সাগর (Sea) : স্বল্প আয়তনবিশিষ্ট উন্মুক্ত পানিরাশিকে সাগর বলে। এগুলো মহাসাগর অপেক্ষা ছোট। যেমন- আরব সাগর।

উপসাগর (Bay or Gulf) : তিনদিকে স্থল দ্বারা বেষ্টিত পানিরাশিকে উপসাগর বলে। যেমন- বঙ্গোপসাগর।

হ্রদ (Lake) : চারদিকে স্থল দ্বারা বেষ্টিত পানিরাশিকে হ্রদ বলে। যেমন- বৈকাল হ্রদ।

নদী (River) : উঁচু পর্বত বা মালভূমি থেকে হিমবাহ, প্রস্রবণ, বরফগলা পানি বা বৃষ্টির পানিতে সৃষ্ট কোনো জলধারা যখন মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে ভূমির ঢাল বরাবর অগ্রসর হয়ে সমভূমি ও নিম্নভূমির উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বিশাল জলাশয়, হ্রদ বা সমুদ্রে গিয়ে পতিত হয় তখন তাকে নদী বলে। যেমন-পদ্মা নদী।

পানির উৎস ও বন্টন (Sources & Distribution of Water) : পৃথিবী পৃষ্ঠের মোট আয়তন প্রায় ৫১০ মিলিয়ন বর্গকিলোমিটার বা ১৯৭ মিলিয়ন বর্গমাইল। এর মধ্যে ৩৬২.১ মিলিয়ন বর্গকিলোমিটার অর্থাৎ ৭১% জলভাগ এবং ১৪৭.৯ মিলিয়ন বর্গকিলোমিটার অর্থাৎ ২৯% স্থলভাগ। আবার পৃথিবীর মোট জলরাশির শতকরা ৯৭ ভাগই মহাসাগর, সাগর এবং উপসাগর ধারণ করছে। অবশিষ্ট ৩ ভাগ অন্যান্য জলাধার ধারণ করছে (চিত্র: ১০.১.১)। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে পানি একই অবস্থায় না থেকে তিনটি বিশেষ অবস্থায় রয়েছে। পানির তিনটি অবস্থা হলো- কঠিন (বরফ), গ্যাসীয় (জলীয়বাষ্প) এবং তরল। পানি বায়ুমন্ডলে রয়েছে জলীয়বাষ্প হিসেবে এবং ভূ-পৃষ্ঠে রয়েছে কঠিন ও তরল অবস্থায়। সারণি-১০.১.১ এ উৎসভিত্তিক পানির বন্টন দেখানো হলো।



চিত্র-১০.১.১: পৃথিবীর মোট জলরাশির শতকরা বন্টন

আবার আমরা যদি গোলার্ধভিত্তিক পানির বন্টন দেখি তাহলে দেখা যাবে যে, পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধের তুলনায় দক্ষিণ গোলার্ধে পানিরাশির পরিমাণ বেশি। উত্তর গোলার্ধের মোট আয়তনের ৬১% জলভাগ এবং ৩৯% স্থলভাগ। অপরদিকে দক্ষিণ গোলার্ধে ৮১% জলভাগ এবং ১৯% স্থলভাগ। আবার পৃথিবীর মোট স্থলভাগের ৬৭ শতাংশ উত্তর গোলার্ধে এবং অবশিষ্ট ৩৩ শতাংশ দক্ষিণ গোলার্ধে অবস্থিত। এ কারণে নিরক্ষরেখার উত্তরে অবস্থিত উত্তর গোলার্ধকে স্থল গোলার্ধ (Land Hemisphere) এবং দক্ষিণে অবস্থিত দক্ষিণ গোলার্ধকে পানি গোলার্ধ (Water Hemisphere) বলে।

এখানে একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, পৃথিবীর যে অংশে স্থলভাগ রয়েছে তার বিপরীতে জলভাগ এবং যে অংশে জলভাগ আছে তার বিপরীত অংশে স্থলভাগ রয়েছে। যেমন- উত্তর আমেরিকার বিপরীতে অবস্থান করছে ভারত মহাসাগর, আফ্রিকা মহাদেশের বিপরীতে প্রশান্তমহাসাগর, কুমেরু মহাদেশের বিপরীতে সুমেরু সাগর অবস্থিত। তবে দু'একটি ব্যতিক্রম রয়েছে। যেমন- নিউজিল্যান্ডের বিপরীতে আইবেরিয়ান উপদ্বীপ অবস্থিত।

সারণি : ১০.১.১ : পানির উৎসভিত্তিক বন্টন

উৎসের ধরণ	পরিমাণ (ঘনকিলোমিটার×১,০০,০০০)	শতকরা ভাগ
সমুদ্র	১৩৭০	৯৭.২৫
হিমবাহ	২৯	২.০৫
ভূ-গর্ভস্থ	৯.৫	০.৬৮
হ্রদ	০.১২৫	০.০১
মাটির আর্দ্রতা	০.০৬৫	০.০০৫
বায়ুমন্ডল	০.০১৩	০.০০১
নদী	০.০০১৭	০.০০০১
জীবমন্ডল	০.০০০৬	০.০০০০৪

শিক্ষার্থীর কাজ | পৃথিবীর পানির উৎসভিত্তিক বন্টন ছকবদ্ধ করুন।

উৎস	পানির পরিমাণ	উৎস	পানির পরিমাণ

সারসংক্ষেপ

পৃথিবীর ভূ-ভাগের বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে বারিমন্ডল। বারিমন্ডল হলো ভূ-ত্বকের অবনমিত অংশে অবস্থিত বিশাল জলরাশি। এই জলরাশির সিংহভাগই ধারণ করছে সমুদ্র যা মোট জলরাশির ৯৭%। এছাড়া হিমবাহ, ভূ-গর্ভস্থ পানি, নদী, হ্রদ, মাটির আর্দ্রতা, বায়ুমন্ডল, জীবমন্ডল প্রভৃতি ধারণ করছে অবশিষ্ট ৩%। গোলার্ধ হিসেবে উত্তর গোলার্ধের তুলনায় দক্ষিণ গোলার্ধে পানির পরিমাণ বেশি। দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া স্থলভাগের বিপরীতে জলভাগ অবস্থান করছে ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। নিচের কোনটি বারিমন্ডলের অংশ নয়?
(ক) সাগর (খ) মহাসাগর (গ) নদী (ঘ) পাহাড়

২। পৃথিবীর আকৃতি কীসের ন্যায়?
(ক) বর্তুলাকার (খ) গোলাকার (গ) বৃত্তাকার (ঘ) লম্বা

৩। চারদিকে স্থল দ্বারা বেষ্টিত ভূ-ভাগকে কী বলে?
(ক) নদী (খ) হ্রদ (গ) সাগর (ঘ) কোনটিই নয়

৪। পৃথিবী পৃষ্ঠের শতকরা কতভাগ জলরাশি দখল করে আছে?
(ক) ৭১ ভাগ (খ) ৭২ ভাগ (গ) ২৯ ভাগ (ঘ) ২৮ ভাগ

পাঠ-১০.২ পৃথিবীর মহাসাগর ও সাগর (Ocean and Sea of the World)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- পৃথিবীর মহাসাগর ও সাগরসমূহ বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

পৃথিবীর মহাসাগর ও সাগর

আমরা জানি, পৃথিবীর পানিরাশির প্রধান আধার বা ক্ষেত্র মহাসাগর ও সাগরসমূহ। মহাসাগর ও সাগরসমূহের পানি ধারণ ক্ষমতা, আকার ও আকৃতিতে ভিন্নতা রয়েছে। নিম্নে এগুলো বর্ণনা করা হলো (চিত্র ১০.২.১)।

মহাসাগর (Ocean) : পৃথিবীতে পাঁচটি মহাসাগর রয়েছে। এগুলো হলো- প্রশান্তমহাসাগর, আটলান্টিক মহাসাগর, ভারত মহাসাগর, উত্তর মহাসাগর ও দক্ষিণ মহাসাগর ।

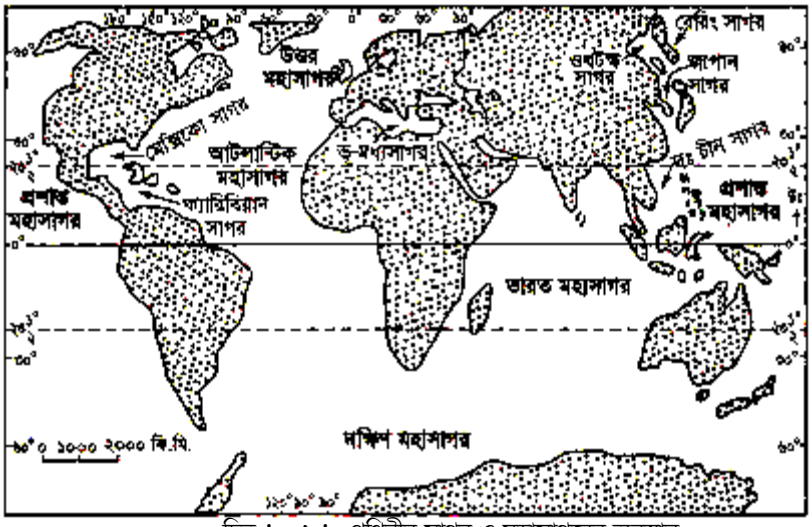
১. প্রশান্তমহাসাগর (Pacific Ocean) : পৃথিবীর মহাসাগরগুলোর মধ্যে সর্ববৃহৎ প্রশান্তমহাসাগর। এটি পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশের অধিক স্থান জুড়ে বিস্তৃত। এ মহাসাগরের আয়তন ১৬ কোটি ৬০ লক্ষ বর্গকিলোমিটার। গড় গভীরতা ৪,২৭০ মিটার এবং সর্বাধিক গভীরতা ১০,৭৯০ মিটার। এ মহাসাগর উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ দ্বারা বেষ্টিত। বিখ্যাত নাবিক ম্যাগেলান (Magellan) এ মহাসাগরের নাম রাখেন প্রশান্তমহাসাগর বা Pacific ocean। কারণ তিনি যখন এ মহাসাগরে প্রবেশ করেন তখন তা ছিল শান্তএবং কোনো ধরনের ঝড়-তুফান বা বড় কোনো তরঙ্গের আঘাত ছিল না।

প্রশান্তমহাসাগর দেখতে অনেকটা অসম ত্রিভুজের মতো। এ মহাসাগর দক্ষিণ দিকে প্রশস্ত এবং উত্তর দিকে ক্রমেই সংকীর্ণ। তবে নিরক্ষরেখা বরাবর সবচেয়ে বেশি প্রশস্ত যা প্রায় ১৬ কিলোমিটার। প্রশান্তমহাসাগরকে উত্তর মহাসাগরের সাথে সংযুক্ত করেছে বেরিং প্রণালি। এ মহাসাগরের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত এশিয়া মহাদেশ যেখানে ছোট-বড় অনেক দ্বীপ রয়েছে এবং মূল মহাদেশের মধ্যে কতকগুলো সাগর আছে। এগুলোর মধ্যে রয়েছে জাপান সাগর, ওখটস্ক সাগর। প্রশান্তমহাসাগরে তুলনামূলকভাবে কম নদী পতিত হয়েছে।

২. **আটলান্টিক মহাসাগর (Atlantic Ocean)** : এটি পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাসাগর। এ মহাসাগর আয়তনে প্রশান্তমহাসাগরের প্রায় অর্ধেক হলেও গুরুত্ব সর্বাধিক। কারণ পৃথিবীর আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের প্রধান অংশ এ মহাসাগর দিয়ে সম্পন্ন করা হয়। এ মহাসাগরের আয়তন ৮ কোটি ২৪ লক্ষ বর্গকিলোমিটার। গড় গভীরতা ৩,৯৩২ মিটার এবং সর্বাধিক গভীরতা ৯,১৮৮ মিটার। আটলান্টিক মহাসাগর তুলনামূলকভাবে প্রশান্তমহাসাগরের চেয়ে কম প্রশস্ত এবং উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে ইংরেজি S অক্ষরের মতো বিস্তৃত। এ মহাসাগরের পূর্বদিকে ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশ এবং পশ্চিমে উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ অবস্থিত। আর্কটিক সাগরসহ এটি সবচেয়ে লম্বা মহাসাগর যা উত্তর ও দক্ষিণ মেরু অঞ্চলকে যুক্ত করেছে। স্থলভাগ সংলগ্ন অনেকগুলো অগভীর সাগর যেমন- আর্কটিক, বাল্টিক, ক্যারাবিয়ান, ভূ-মধ্যসাগর এবং মেক্সিকো উপসাগর রয়েছে। এ মহাসাগরে পতিত নদীগুলোর মধ্যে আমাজান এবং কঙ্গো অন্যতম। আটলান্টিক মহাসাগরে বেশ কিছু দ্বীপ রয়েছে। এর মধ্যে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ দ্বীপ গ্রীনল্যান্ড অন্যতম। এছাড়াও রয়েছে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, দক্ষিণ স্যান্ডউইচ, আইসল্যান্ড, সেন্ট পল বক দ্বীপ প্রভৃতি।

৩. ভারত মহাসাগর (Indian Ocean) : আয়তনের দিক থেকে ভারত মহাসাগরের অবস্থান তৃতীয়। এ মহাসাগরের আয়তন ৭ কোটি ৩৬ লক্ষ বর্গকিলোমিটার। গড় গভীরতা ৩,৯৬২ মিটার এবং সর্বোচ্চ গভীরতা ৬,৯৯৮ মিটার। এ মহাসাগরের উপকূলভাগ সামান্য ভগ্ন। ভারত মহাসাগরের উত্তরে আরব সাগর ও বঙ্গোপসাগর অবস্থিত। আরব সাগরের অংশবিশেষ হলো পারস্য ও লোহিত সাগর। এ মহাসাগরের পূর্ব দিকে পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ এবং পশ্চিমে মাদাগাস্কার দ্বীপ উল্লেখযোগ্য। ভারত মহাসাগরের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো মৌসুমী বায়ুর উৎপত্তি। অপর একটি বৈশিষ্ট্য হলো উত্তর মেরু অঞ্চলের সাথে পানির আদান-প্রদান না হওয়া। ফলে উত্তরের শীতল পানি এসে গরম পানির সাথে এবং ক্রান্তীয় গরম পানি গিয়ে শীতল পানির সাথে মিশতে পারে না।

৪. উত্তর মহাসাগর (Northern or Arctic Ocean) : এই মহাসাগরটি সুমেরু বৃত্তের চারদিকে অবস্থিত। এজন্য এ মহাসাগরকে সুমেরু মহাসাগরও বলা হয়ে থাকে। এর আয়তন ১ কোটি ৫০ লক্ষ বর্গকিলোমিটার। গড় গভীরতা ৮২৪ মিটার এবং সর্বোচ্চ গভীরতা ৫,৪৪০ মিটার। এ মহাসাগর প্রায় সারা বছর বরফাচ্ছন্ন থাকে। ফলে এ অঞ্চল হতে বহু হিমশৈল ভাসতে ভাসতে দক্ষিণের উষ্ণতর সমুদ্রে প্রবেশ করে। এর উপকূলভাগ অভগ্ন এবং দ্বীপের সংখ্যা তুলনামূলক কম।



চিত্র-১০.২.১: পৃথিবীর সাগর ও মহাসাগরের অবস্থান

৫. দক্ষিণ মহাসাগর (Southern or Antarctic Ocean) : দক্ষিণ মহাসাগর আয়তনে সবচেয়ে ছোট। এর আয়তন ১ কোটি ৪৭ লক্ষ বর্গকিলোমিটার। গড় গভীরতা ১৪৯ মিটার এবং সর্বোচ্চ গভীরতা ৫,৭৪০ মিটার। এ মহাসাগর এন্টার্কটিকা মহাদেশের চতুর্দিকে অবস্থিত। মহাসাগরটির কিছু অংশ মেরুবৃত্তের ভিতরে এবং অল্প কিছু অংশ মেরুবৃত্তের বাইরে অবস্থিত। দক্ষিণ মহাসাগর বছরে প্রায় বার মাসই বরফে আচ্ছন্ন থাকে। অনেক সময় এ মহাসাগর থেকে হিমশৈল ভাসতে ভাসতে উষ্ণ মহাসাগরে প্রবেশ করে।

সাগর (Sea) : সাগর হচ্ছে মহাদেশের উপকূলভাগে মহাসাগরের প্রান্তেঅবস্থিত জলভাগ যা প্রাকৃতিকভাবেই ভূ-প্রকৃতি দ্বারা মহাসাগর থেকে আংশিক বিচ্ছিন্ন। পৃথিবীতে অনেকগুলো সাগর রয়েছে। যেমন- আর্কটিক সাগর, কৃষ্ণসাগর, ভূ-মধ্যসাগর, ক্যারাবিয়ান সাগর, জাপান সাগর, মেক্সিকো উপসাগর প্রভৃতি। অধিকাংশ সাগরের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন-

১. উন্মুক্ত সাগরের সাথে সীমিত যোগাযোগ,
২. পার্শ্ববর্তী মহাদেশের প্রভাব,
৩. অতিরিক্ত বাষ্পীভবন বা অধিক বৃষ্টিপাত এবং
৪. পানিতে দ্রবীভূত পদার্থের আপেক্ষিক অনুপাত স্থিতিশীল।

সাগরের সীমা সাধারণত প্রাকৃতিকভাবে নির্ধারিত হয়। যেমন- স্থলভাগের অবস্থান, নিমজ্জিত দ্বীপ, দ্বীপ বা দ্বীপপুঞ্জের অবস্থান প্রভৃতি দ্বারা। আবার সমুদ্র বিজ্ঞানীরা অনেক সময় কাল্পনিক রেখার সাহায্যে এক সাগর থেকে অন্য সাগর অঞ্চলকে পৃথক করেছেন। যেমন- বঙ্গোপসাগরের উত্তর ও পশ্চিম সীমা ভূ-ভাগ দ্বারা বেষ্টিত। পূর্ব দিকে আন্দামান সাগর এবং দক্ষিণ দিকে ভারত মহাসাগর অবস্থিত। ভারত মহাসাগর থেকে বঙ্গোপসাগরের সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে International Hydrographic Bureau কর্তৃক নির্ধারিত একটি কাল্পনিক রেখা দ্বারা। এই রেখা দ্বারা শ্রীলংকার সর্ব দক্ষিণের বিন্দুকে সুমাত্রার সর্ব উত্তর বিন্দুতে যোগ করে বঙ্গোপসাগরকে ভারত মহাসাগর থেকে পৃথক করা হয়েছে। এছাড়াও সমুদ্রস্রোত, লবণাক্ততা, তাপমাত্রা ইত্যাদির উপর ভিত্তি করেও সীমা নির্ধারণ করা হয়। নিম্নে কয়েকটি সাগরের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হলো:

আর্কটিক সাগর (Arctic Sea) : আংশিক বিচ্ছিন্ন প্রান্তীয় সাগরসমূহের মধ্যে আর্কটিক সাগর সর্ববৃহৎ। এটি আটলান্টিক মহাসাগর থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন উত্তরের বর্ধিতাংশ। এ সাগরে এশিয়ার বেশ কয়েকটি বড় নদী যেমন- লেনা, ইনিসি পতিত হয়েছে। আর্কটিক সাগরের প্রায় ৭০ শতাংশ অঞ্চল সারা বছরই বরফে আচ্ছন্ন থাকে।

কৃষ্ণ সাগর (Black Sea) : কৃষ্ণ সাগর পূর্ব ইউরোপ এবং পশ্চিম এশিয়ার মধ্যে অবস্থিত। ইউরোপ মহাদেশ, আনাতোলিয়া এবং ককেশাস পর্বতমালা দ্বারা আবদ্ধ এবং ভূ-মধ্যসাগর হয়ে আটলান্টিক মহাসাগরের সাথে মিলেছে। এই

সাগর ভূ-মধ্যসাগরের সাথে বসফরাস প্রণালি দ্বারা যুক্ত হয়েছে। এই প্রণালিটি সরু যার গড় গভীরতা ৭০০ মিটার এবং সর্বনিম্ন গভীরতা ৪০ মিটার। কৃষ্ণ সাগরের আয়তন প্রায় ৪.৩৬ বর্গকিলোমিটার এবং গড় গভীরতা ১,৩১১ মিটার।

ভূ-মধ্যসাগর (Mediterranean Sea) : ভূ-মধ্যসাগর আটলান্টিক মহাসাগরের সাথে যুক্ত যা ভূ-মধ্যসাগরীয় অঞ্চল দ্বারা বেষ্টিত। এর উত্তরে দক্ষিণ ইউরোপ এবং আনাতোলিয়া, দক্ষিণে উত্তর আফ্রিকা, পূর্বে ল্যাভেন্ট অবস্থিত। এ সাগরটির আয়তন প্রায় ২৫ লক্ষ বর্গকিলোমিটার এবং গড় গভীরতা ১,৫০০ মিটার।

ক্যারাবিয়ান সাগর (Caribbean Sea) : ক্যারাবিয়ান সাগর উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার সংযোগস্থলে অবস্থিত। এ সাগরটির আয়তন ২৭.৫৪ লক্ষ বর্গকিলোমিটার এবং গড় গভীরতা ২,৫৬০ মিটার।

জাপান সাগর (Japan Sea) : জাপান সাগর পশ্চিম প্রশান্তমহাসাগরের একটি প্রান্তীয় সাগর (Marginal Sea) যা এশিয়ার মূল ভূ-খন্ড, জাপানী দ্বীপপুঞ্জ এবং শাখালিন এর মধ্যে অবস্থিত। এটি জাপান, উত্তর কোরিয়া এবং দক্ষিণ কোরিয়া দ্বারা বেষ্টিত। এর আয়তন ৯.৭৮ লক্ষ বর্গকিলোমিটার এবং গড় গভীরতা ১,৭৫২ মিটার।

মেক্সিকো উপসাগর (Gulf of Maxico) : মেক্সিকো উপসাগরটিও উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার সংযোগ স্থলে অবস্থিত। এ উপসাগরের উত্তর-পূর্ব, উত্তর এবং উত্তর-পশ্চিমে যুক্তরাষ্ট্রের গালফ্ কোস্ট, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমে মেক্সিকো এবং দক্ষিণ-পূর্বে কিউবা অবস্থিত। মেক্সিকো উপসাগরের আয়তন ১৫.৫০ লক্ষ বর্গকিলোমিটার এবং গড় গভীরতা ১,৪৩৩ মিটার।

এছাড়া অন্যান্য সাগরের মধ্যে আরব সাগর, পীত সাগর, দক্ষিণ চীন সাগর, বেরিং সাগর, ওখটস্ক সাগর, লোহিত সাগর, বাল্টিক সাগর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

শিক্ষার্থীর কাজ	পৃথিবীর মানচিত্রে মহাসাগরগুলোর অবস্থান চিহ্নিত করে দেখান।

সারসংক্ষেপ

পৃথিবীর জলরাশির যে আধার তার প্রধান ক্ষেত্র মহাসাগর ও সাগরসমূহ। পৃথিবীতে পাঁচটি মহাসাগর রয়েছে। এর মধ্যে বৃহত্তম প্রশান্তমহাসাগর। এটির আয়তন ১৬ কোটি ৬০ লক্ষ বর্গকিলোমিটার এবং ক্ষুদ্রতম হলো দক্ষিণ মহাসাগর যার আয়তন ১ কোটি ৪৭ লক্ষ বর্গকিলোমিটার। আবার মহাসাগরগুলোর গড় গভীরতাও সমান নয়। গড় গভীরতা সবচেয়ে বেশি প্রশান্তমহাসাগরের (৪,২৭০ মিটার) এবং সবচেয়ে কম গড় গভীরতা দক্ষিণ মহাসাগরের (১৪৯ মিটার)। অন্যদিকে পৃথিবীর সাগরসমূহ মহাদেশগুলোর উপকূলভাগে অবস্থিত। পৃথিবীতে অনেকগুলো সাগর রয়েছে। যেমন- আরব সাগর, পীত সাগর, জাপান সাগর প্রভৃতি। সাগরগুলোর আয়তন মহাসাগরের তুলনায় অনেক কম এবং সাগরের সীমা সাধারণত প্রাকৃতিকভাগে নির্ধারিত হয় ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। পৃথিবীতে কতটি মহাসাগর রয়েছে?
(ক) ৫টি (খ) ৬টি (গ) ৭টি (ঘ) ৮টি

২। প্রশান্তমহাসাগরের গড় গভীরতা কত?
(ক) ৩,২৭০ মিটার (খ) ৪,২৭০ মিটার (গ) ৫,২৭০ মিটার (ঘ) ৬,২৭০ মিটার

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ৩, ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি টিউটোরিয়াল ক্লাসে টিউটর জনাব আসাদ পৃথিবীর পানির যে আধার বা ভান্ডার রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। শিক্ষার্থীরা মনোযোগ দিয়ে উক্ত আলোচনা শেষে নিজেদের মধ্যে গ্রুপভিত্তিক বিভক্ত হয়ে পৃথিবীর পানির ভান্ডার সম্পর্কে একে অন্যের সাথে প্রানবন্তআলোচনা করলেন।

৩। পৃথিবীর সর্ববৃহৎ পানি আধার কোনটি?
(ক) সাগর (খ) মহাসাগর (গ) নদী (ঘ) হ্রদ

৪। কোন মহাসাগরটি ইংরেজি `S' অক্ষরের মতো?
(ক) প্রশান্তমহাসাগর (খ) ভারত মহাসাগর (গ) আটলান্টিক মহাসাগর (ঘ) দক্ষিণ মহাসাগর

৫। সাগরের সীমা নির্ধারিত হয় সাধারণত-
(ক) রাজনৈতিকভাবে (খ) অর্থনৈতিকভাবে (গ) সামাজিকভাবে (ঘ) প্রাকৃতিকভাবে

পাঠ-১০.৩ মহাসাগরের তলদেশের ভূমিরূপ (Topography of the Ocean)

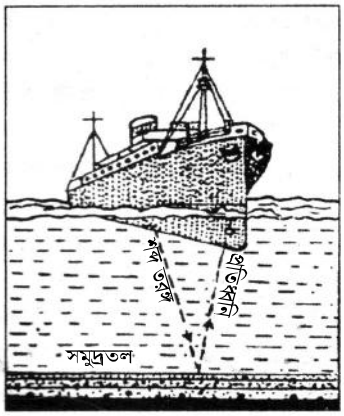
উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মহাসাগরের তলদেশের গভীরতা মাপার পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং
- মহাসাগরের তলদেশের ভূমিরূপ বর্ণনা করতে পারবেন।

মহাসাগরের তলদেশের ভূমিরূপ

মহাসাগরের তলদেশ বৈচিত্র্যপূর্ণ। ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগের ভূমিরূপ যেমন উঁচু-নিচু ঠিক তেমনি মহাসাগরের তলদেশও অনুরূপ উঁচু-নিচু বা বন্ধুর। ভূ-পৃষ্ঠের ন্যায় মহাসাগরের তলদেশেও পাহাড়, পর্বত, মালভূমি, সমভূমি, গভীর খাত প্রভৃতি রয়েছে। প্রাচীনকালে জাহাজ থেকে তারের মাথায় ভারী জিনিস বেঁধে সমুদ্রে নিক্ষেপ করে তলদেশ সম্পর্কে জানার চেষ্টা করা হতো। ঊনবিংশ শতাব্দীতে তলদেশ সম্পর্কে জানার জন্য প্রথম অনুসন্ধান চালানো হয়। বর্তমানে শব্দ তরঙ্গের মাধ্যমে সমুদ্রের গভীরতা মাপা হয় (চিত্র: ১০.৩.১)। শব্দ তরঙ্গ পানিরাশির মধ্য দিয়ে প্রতি সেকেন্ডে ১,৪৭৫ মিটার গতিতে নিচে নেমে সমুদ্রের তলদেশ স্পর্শ করে ফিরে আসে। সমুদ্রের গভীরতা মাপার যন্ত্রটির নাম ফ্যাদোমিটার (Fatho Meter)। বর্তমানে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে জরিপ চালিয়ে সমুদ্রের তলদেশের সমোন্নতি রেখাসহ ভূ-প্রকৃতি সম্বলিত মানচিত্র তৈরি করা হচ্ছে যা থেকে সহজেই তলদেশ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। মহাসাগরের তলদেশে পাঁচ ধরনের ভূমিরূপ রয়েছে (চিত্র-১০.৩.৩)। এগুলো হলো-



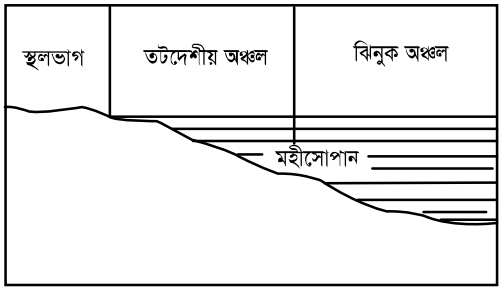
চিত্র-১০.৩.১: শব্দ তরঙ্গের সাহায্যে গভীরতা নির্ণয়

১. মহীসোপান
২. মহীঢাল
৩. গভীর সমুদ্রের সমভূমি
৪. নিমজ্জিত শৈলশিরা এবং
৫. গভীর সমুদ্রখাত।

১. মহীসোপান (Continental Shelf) : পৃথিবীর মহাদেশসমূহের চারদিকে স্থলভাগের কিয়দংশ ক্রমশ সমুদ্রের পানির মধ্যে বিস্তৃত থাকে। এরূপ ক্রমনিম্ন স্বল্প গভীর নিমজ্জিত অংশকে মহীসোপান বলে। মহীসোপান অংশের পানির গভীরতা সাধারণত ২০০ মিটার পর্যন্তহয়ে থাকে। এটি এক ডিগ্রি কোণে সমুদ্র তলদেশে নিমজ্জিত থাকে। মহীসোপান অঞ্চলটি সমুদ্রের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। মহাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল নিমজ্জিত হওয়ার ফলে অথবা সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতার তারতম্য হওয়ার কারণে মহীসোপানের সৃষ্টি হয়। আবার অনেক সময় সমুদ্র তরঙ্গ ও ক্ষয়ক্রিয়া মহীসোপান গঠনে সহায়তা করে। মহীসোপানের গড় প্রশস্ততা প্রায় ৭০ কিলোমিটার। এ অংশের বিস্তৃতি সর্বত্র সমান নয়। উপকূলভাগের বন্ধুরতার উপর এর বিস্তৃতি নির্ভর করে। মহীসোপানের সবচেয়ে উপরের অংশকে উপকূলীয় ঢাল বলে। উপকূলীয় ঢালকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায় (চিত্র ১০.৩.২)। যথা-

ক. তটদেশীয় অঞ্চল এবং
খ. ঝিনুক অঞ্চল।

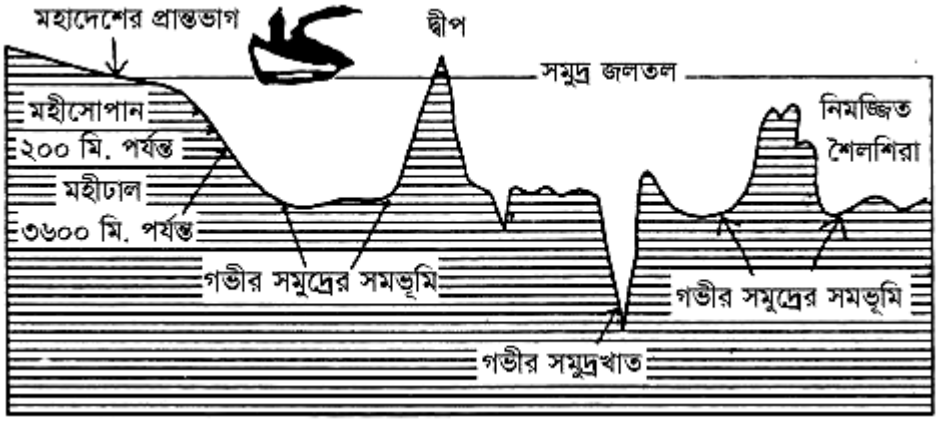
ক. তটদেশীয় অঞ্চল (Litoral Zone) : মহীসোপানের যে অংশের মধ্যে জোয়ার-ভাঁটার সময় পানি উঠানামা করে তাকে তটদেশীয় অঞ্চল বলে। স্থল হতে সমুদ্র পর্যন্তএ অঞ্চল প্রায় ৩.২ কিলোমিটার প্রশস্ত। পৃথিবীর তটদেশীয় অঞ্চলের আয়তন ১ লক্ষ ৫৫ হাজার বর্গকিলোমিটার।



চিত্র : ১০.৩.২ মহীসোপান অঞ্চল

খ. ঝিনুক অঞ্চল (Neritic Zone) : তটদেশীয় অঞ্চলের পর হতে মহীসোপানের শেষ সীমা পর্যন্তঅংশকে ঝিনুক অঞ্চল বলে। এ অঞ্চলে সমুদ্র তরঙ্গ সবচেয়ে বেশি ক্রিয়াশীল। সমুদ্র তরঙ্গের ক্ষয় ও গঠন প্রক্রিয়া এখানে সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায়। পৃথিবীতে ঝিনুক অঞ্চলের আয়তন প্রায় ২ কোটি ৫০ লক্ষ বর্গকিলোমিটার। মহীসোপান অঞ্চলেই পলিমাটি, নুড়ি, বালি সঞ্চিত হয়। এখানে সূর্যের আলো প্রবেশ করতে পারে বলে সামুদ্রিক উদ্ভিদ, প্রাণি ও প্লাঙ্কটন দেখা যায়। এই অঞ্চলে থেকে খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস উত্তোলন করা হয়।

২. মহীঢাল (Continental Slope): মহীঢাল হলো খাড়া ঢালু অংশ। মহীসোপানের শেষ সীমা হতে ভূ-ভাগ হঠাৎ খাড়াভাবে নেমে সমুদ্রের গভীর তলদেশের সাথে মিশে যাওয়া অংশটিই মহীঢাল। সমুদ্রে এর গভীরতা ২০০ মিটারের পর হতে ৩,৬০০ মিটার পর্যন্ত। মহীঢাল অধিক খাড়া হওয়ায় প্রশস্ততা খুব বেশি হয় না। এটি গড়ে ১৬ থেকে ৩২ কিলোমিটার পর্যন্তপ্রশস্ত। মহীঢালের উপরিভাগ সমান নয়। এখানে অসংখ্য আন্ত:সাগরীয় গিরিখাত অবস্থান করায় তা খুবই বন্ধুর প্রকৃতির। মহীঢালের শেষ প্রান্তেজীবজন্তুর দেহাবশেষ, বিভিন্ন খনিজ ও পলি জমা হয় এবং সেখানে মহীউত্থানের সৃষ্টি করে।



চিত্র-১০.৩.৩: সমুদ্র তলদেশের ভূমিরূপ

৩. গভীর সমুদ্রের সমভূমি (Deep Sea Plain) : মহীঢাল শেষ হওয়ার পর সমুদ্র তলদেশে যে বিস্তৃত সমভূমি দেখা যায় তাকে গভীর সমুদ্রের সমভূমি বলে। এর গভীরতা ৩ থেকে ৫ কিলোমিটার পর্যন্তহয়ে থাকে। এ অঞ্চলটিকে সমভূমি বলা হলেও স্থলভাগের সমভূমির মতো সমতল নয়। এটি বেশ বন্ধুর প্রকৃতির। কারণ গভীর সমুদ্রের সমভূমির উপর জলমগ্ন অবস্থায় বহু পাহাড়, পর্বত, মালভূমি রয়েছে। আবার কোথাওবা রয়েছে আগ্নেয়গিরি, শৈলশিরা প্রভৃতি। এসব উচ্চভূমির কোনোটি আবার পানির উপর দ্বীপরূপে অবস্থান করছে। গভীর সমুদ্রে যে বন্ধুরতা সৃষ্টি হয়েছে তার কারণ ভূ-আন্দোলন এবং আগ্নেয়ক্রিয়া।

৪. নিমজ্জিত শৈলশিরা (Oceanic Ridge) : কয়েক কিলোমিটার পর্যন্তসুদীর্ঘ পর্বত শ্রেণির মতো ভূ-ভাগই হলো নিমজ্জিত শৈলশিরা। মহাসাগরের তলদেশে অনেকগুলো আগ্নেয়গিরি রয়েছে। এগুলো থেকে নির্গত লাভা সমুদ্রগর্ভে সঞ্চিত হয়ে শৈলশিরার ন্যায় ভূমিরূপ গঠন করেছে। নিমজ্জিত শৈলশিরাগুলোর মধ্যে মধ্য আটলান্টিক শৈলশিরা উল্লেখযোগ্য। অনেক সময় সামুদ্রিক শৈলশিরাগুলো সমুদ্র সমতল থেকে উঁচু হয়ে সামুদ্রিক দ্বীপের সৃষ্টি করে।

৫. গভীর সমুদ্রখাত (Deep Oceanic Trench) : গভীর সমুদ্রের সমভূমিতে অর্থাৎ সমুদ্রের তলদেশে মাঝে মাঝে যে সুগভীর খাত থাকে সেগুলোকে গভীর সমুদ্র খাত বলে। এই সমুদ্র খাত অল্প পরিসর জায়গা জুড়ে থাকে। এদের গভীরতা সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে ৫,৪০০ মিটারের অধিক। পাশাপাশি অবস্থিত মহাদেশীয় ও সামুদ্রিক প্লেট সংঘর্ষের ফলে সৃষ্ট হওয়ায় সমুদ্রখাত প্লেট সীমানায় অবস্থিত। অর্থাৎ আগ্নেয়গিরি ও ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চলে সমুদ্রখাত বেশি দেখতে পাওয়া যায়।

মহাসাগরগুলোর মধ্যে প্রশান্তমহাসাগরে গভীর সমুদ্রখাতের সংখ্যা অধিক। এখানকার খাতগুলোর মধ্যে মারিয়ানা খাত (Mariana Trench) সর্বাপেক্ষা গভীর। এর গভীরতা ১০,৮৬০ মিটার এবং এটি পৃথিবীর গভীরতম খাত। এছাড়া আটলান্টিক মহাসাগরের পোর্টোরিকো খাত (৮,৫৩৮ মিটার), ভারত মহাসাগরের সুন্ডা খাত (৭,৩০৩ মিটার) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শিক্ষার্থীর কাজ	মহাসাগরের তলদেশের নিম্নোক্ত ভূমিরূপগুলোর ২টি করে বৈশিষ্ট্য লিখুন।

মহীসোপান	মহীঢাল	গভীর সমুদ্রের সমভূমি	নিমজ্জিত শৈলাশিরা	গভীর সমুদ্রখাত

সারসংক্ষেপ

সমুদ্রের তলদেশ সম্পর্কে জানার প্রচেষ্টা দীর্ঘদিনের। ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগের ন্যায় সমুদ্রের তলদেশেও পাহাড়, পর্বত, মালভূমি, সমভূমি প্রভৃতি রয়েছে। সমুদ্রের তলদেশের ভূমিরূপকে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায়। এগুলো হলো- ১. মহীসোপান, ২. মহীঢাল, ৩. গভীর সমুদ্রের সমভূমি, ৪. নিমজ্জিত শৈলশিরা এবং ৫. গভীর সমুদ্রখাত। ভূমিরূপের প্রত্যেকটি ভাগের রয়েছে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। যেমন- মহীঢাল মহীসোপানের শেষ সীমা হতে হঠাৎ খাড়াভাবে নিচে নেমে গভীর সমুদ্রের তলদেশে মিশেছে। প্রশান্তমহাসাগরের মারিয়ানা খাত পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা গভীর খাত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। সমুদ্রের গভীরতা মাপার যন্ত্রটি নাম কী?
(ক) ফ্যাদোমিটার (খ) ব্যারোমিটার
(গ) ল্যাক্টোমিটার (ঘ) ম্যানোমিটার

২। মহাসাগরের তলদেশের ভূমিরূপকে কত ভাগে ভাগ করা যায়?
(ক) ৩ (খ) ৪
(গ) ৫ (ঘ) ৬

৩। মহীসোপানের গভীরতা কত মিটার পর্যন্তহয়?
(ক) ২০০ মিটার (খ) ২৮৩ মিটার
(গ) ৩৮৩ মিটার (ঘ) ৪৮৩ মিটার

৪। পোর্টোরিকো নামটি কোন মহাসাগরের সাথে সম্পৃক্ত?
(ক) প্রশান্তমহাসাগর (খ) ভারত মহাসাগর
(গ) আটলান্টিক মহাসাগর (ঘ) উত্তর মহাসাগর

পাঠ-১০.৪ প্রশান্তমহাসাগরের তলদেশের ভূমিরূপ (Topography of the Pacific Ocean)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

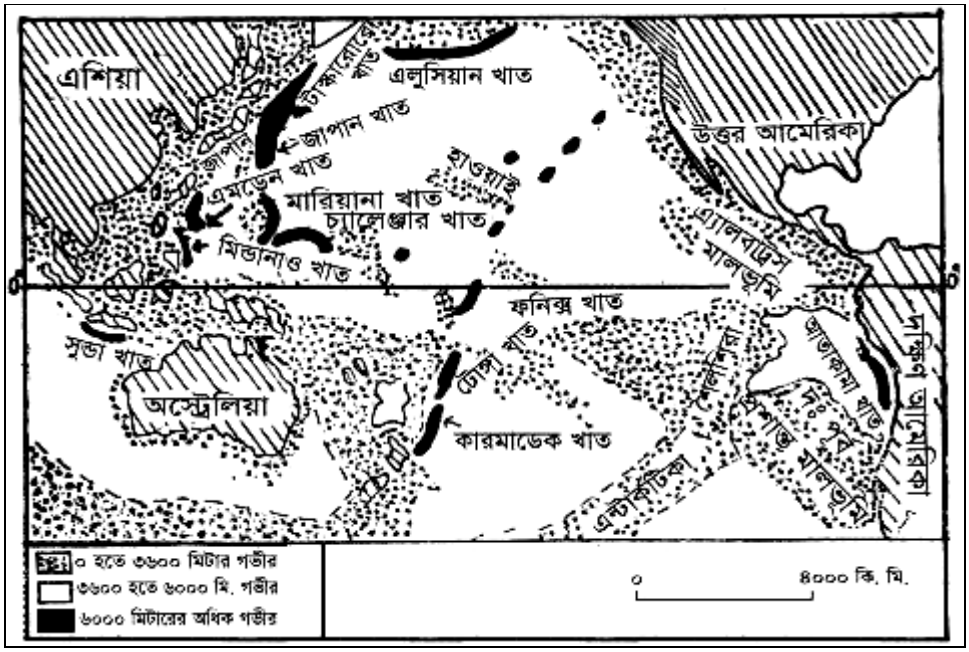
- প্রশান্তমহাসাগরের অবস্থান ও আয়তন বলতে পারবেন এবং
- তলদেশের ভূমিরূপ বর্ণনা করতে পারবেন।

প্রশান্তমহাসাগরের তলদেশের ভূমিরূপ

প্রশান্তমহাসাগর পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বৃহত্তম এবং গভীরতম মহাসাগর। এর আয়তন ১৬ কোটি ৬০ লক্ষ বর্গকিলোমিটার যা মহাসাগরগুলোর মোট আয়তনের ৪৭.২০ শতাংশ। অন্যদিকে, এ মহাসাগরের আয়তন পৃথিবীর মোট ভূ-ভাগের ৩৫% এবং সমগ্র পৃথিবীর জলভাগের ৪৫%। প্রশান্তমহাসাগর দেখতে অনেকটা অসম ত্রিভুজের মতো। এর শীর্ষদেশ বেরিং প্রণালি থেকে শুরু করে দক্ষিণ-পূর্বে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা এবং দক্ষিণ-পশ্চিমে এশিয়া ও ওশেনিয়া পর্যন্তবিশাল ত্রিভুজ সৃষ্টি করেছে। উত্তর-দক্ষিণে এর দৈর্ঘ্য প্রায় ১৪,৯৬২ কিলোমিটার এবং পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তার ১৬,০৮৯ কিলোমিটার। অর্থাৎ উত্তর-দক্ষিণ সীমার দূরত্ব পূর্ব-পশ্চিম সীমার চেয়ে কম।

প্রশান্তমহাসাগরের তলদেশ (The Floor of the Pacific Ocean) : প্রশান্তমহাসাগরের তলদেশের ভূমিরূপ অন্যান্য মহাসাগর অপেক্ষা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমন্ডিত। এ মহাসাগরের তলদেশ অন্যান্য মহাসাগর অপেক্ষা অধিক গভীর। এছাড়া মহাসাগরটির অধিকাংশই গভীর সমুদ্রের সমভূমি দিয়ে গঠিত। প্রশান্তমহাসাগরের প্রায় ৭৮% এলাকার গভীরতা ৩.৬ কিলোমিটার এর অধিক। তবে গড় গভীরতা ৭.২৪ কিলোমিটার বা ৪,০০০ ফ্যাদম। নিম্নে এ মহাসাগরের তলদেশের ভূমিরূপের বণনা দেওয়া হলো (চিত্র-১০.৪.১)।

১. মহীসোপান (Continental Shelf) : এটি সর্ববৃহৎ মহাসাগর হলেও অন্যান্য মহাসাগরের তুলনায় মহীসোপানের বিস্তৃতি কম। প্রশান্তমহাসাগরের পূর্ব-উপকূলে বিস্তৃত সুউচ্চ পর্বতমালা থাকায় উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা উপকূলের নিকটে মহীসোপান নেই। অস্ট্রেলিয়া মহাদেশের পূর্ব-প্রান্তেউচ্চভূমি থাকায় সে অঞ্চলও প্রায় মহীসোপানবিহীন। তবে অস্ট্রেলিয়া, ওয়েস্ট ইন্ডিজ এবং এশিয়া মহাদেশের পূর্ব উপকূলে মহীসোপান রয়েছে। এখানকার গড় গভীরতা প্রায় ১০০ মিটার।



চিত্র-১০.৪.১: প্রশান্তমহাসাগরের তলদেশের ভূমিরূপ

২. মহীঢাল (Continental Slope) : প্রশান্তমহাসাগরে মহীসোপানের পরিমাণ কম থাকায় মহীঢালের পরিমাণ বেশি। এখানকার দ্বীপসমূহের উপকূলের মহীঢালের পরিমাণ অধিক। এ মহীঢালগুলো ক্রমশ মহাসাগরের তলদেশ পর্যন্তপৌঁছেছে।

৩. তলদেশের উচ্চভূমিসমূহ (High Lands of the Floor) : প্রশান্তমহাসাগরের তলদেশে সমভূমির পরিমাণ যেমন বেশি ঠিক তেমনি সমভূমির মধ্যে উন্নত বা উচ্চভূমির পরিমাণও অধিক। এসব উচ্চভূমিসমূহ নিম্নরূপ-

ক. মালভূমি (Plateau) : প্রশান্তমহাসাগরের তলদেশে ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগের ন্যায় কয়েকটি মালভূমি রয়েছে। কোনো কোনো মালভূমি এত উঁচু যে, এদের উপরিভাগে পানির গভীরতা মাত্র ১০০ মিটার। এসব মালভূমির মধ্যে সর্ববৃহৎ এবং অন্যতম হলো ক্যালিফোর্নিয়া উপদ্বীপের দক্ষিণ সীমা হতে দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশের ইকুয়েডর পর্যন্তবিস্তৃত এ্যালবাট্রস মালভূমি। একে দক্ষিণ-পূর্ব প্রশান্তমহাসাগরীয় মালভূমি (South-East Pacific Plateau) বলা হয়।

খ. শৈলশিরা (Ridge) : মালভূমি ছাড়াও প্রশান্তমহাসাগরের তলদেশে স্থলভাগের সুউচ্চ পর্বতমালার ন্যায় বিস্তৃত শৈলশিরা রয়েছে। এ মহাসাগরের দক্ষিণ সীমা ও এন্টার্কটিকা মহাদেশের মধ্যে একটি বিশাল শৈলশিরা রয়েছে যা প্যাসিফিক এন্টার্কটিকা শৈলশিরা (Pacific Antarctic Ridge) নামে পরিচিত। এটি এ্যালবাট্রস মালভূমি ও দক্ষিণ-পূর্ব প্রশান্তমহাসাগরীয় মালভূমির সাথে উঁচু অংশ দ্বারা যুক্ত এবং মূল প্রশান্তমহাসাগরীয় তলদেশকে দক্ষিণ আমেরিকা ও এন্টার্কটিকা হতে পৃথক করেছে। এছাড়া এ মহাসাগরের সমগ্র পশ্চিম প্রান্তব্যাপী একটি অপ্রশস্ত এবং সুদীর্ঘ শৈলশিরা অবস্থিত। এটি জাপান হতে দক্ষিণ দিকে অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব প্রান্তও নিউজিল্যান্ড হয়ে কুমেরু মহাসাগর পর্যন্তবিস্তৃত।

প্রশান্তমহাসাগরের অন্যান্য শৈলশিরার মধ্যে রয়েছে গালাপা গোস, কোকেস, হাওয়াইসান সওয়েল, মারকাস নিকার, চেতাম, ক্যারেলিনা সানোসন, কিউসু পালাউ শৈলশিরা প্রভৃতি।

গ. দ্বীপ ও দ্বীপপুঞ্জ (Island & Islandmass) : প্রশান্তমহাসাগরে ছোট বড় প্রায় ২০,০০০ দ্বীপ ও দ্বীপমালা রয়েছে। এ দ্বীপগুলো মহাসাগরের তলদেশের উচ্চ ভূমিরই অংশবিশেষ। এখানকার দ্বীপগুলোর মধ্যে বহু আগ্নেয় ও প্রবাল দ্বীপ রয়েছে। আগ্নেয় দ্বীপসমূহ প্লেট সীমানা বরাবর ভূ-অভ্যন্তরস্থ লাভা নির্গত হয়ে সৃষ্টি হয়েছে। মহাদেশীয় দ্বীপগুলোর অধিকাংশই মূল মহাদেশীয় ভূ-খন্ডের মহীসোপানের অন্তর্গত। এছাড়াও প্রবাল কীটের দেহাবশেষ সঞ্চিত হয়ে প্রবাল দ্বীপ সৃষ্টি হয়েছে।

প্রশান্তমহাসাগরের মহাদেশীয় দ্বীপসমূহের মধ্যে রয়েছে জাপানের দ্বীপপুঞ্জ, এলুসিয়ান দ্বীপপুঞ্জ, চিলি দ্বীপসমূহ। আগ্নেয় দ্বীপের মধ্যে মারকুইসার্স, হাওয়াই দ্বীপসমূহ এবং প্রবাল দ্বীপের মধ্যে ফিজি, ওশেনিয়ার আশেপাশের দ্বীপসমূহ অন্যতম।

৪. গভীর খাত (Deep Trench) : গভীর খাত প্রশান্তমহাসাগরের তলদেশের ভূমিরূপের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এর প্রান্তদেশে অনেকগুলো সুদীর্ঘ ও গভীর খাত রয়েছে। এ খাতসমূহের অধিকাংশই ভূ-পৃষ্ঠের উচ্চ পর্বতের নিকটতম স্থানে অবস্থিত। কোনো কোনো খাত পর্বতসমূহের সাথে সমান্তরালে অবস্থিত। ধারণা করা হয়, প্লেট সীমানা বরাবর প্লেটগুলোর মুখোমুখি সংঘর্ষের ফলে খাতগুলো সৃষ্টি হয়েছে। গভীর সমুদ্র খাতগুলো মহাসাগরের পশ্চিম প্রান্তেঅধিক দেখা যায়। এ সকল গভীর সমুদ্র খাতের মধ্যে গুয়াম দ্বীপের ৩২২ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত মারিয়ানা খাত সর্বাপেক্ষা গভীর। এর গভীরতা প্রায় ১০.৮৬ কিলোমিটার বা ৫৯৪০ ফ্যাদম। প্রশান্তমহাসাগরের কয়েকটি খাতের নাম ও গভীরতা সারণি-১০.৪.১ দেখানো হলো (১ ফ্যাদম = প্রায় ৬ ফুট)।

সারণি-১০.৪.১: প্রশান্তমহাসাগরের কয়েকটি খাতের নাম ও গভীরতা

গভীর খাতের নাম	গভীরতা (ফ্যাদম)
এমডেন	৫৯০২
মিন্ডানাও	৫৯০০
জাপান খাত	৫৭৭১
টাস্কারোরা	৪৬৫৫
কারমাডেক	৫১৫৫
টোদগ	৪৭৬২

উপরিউক্ত খাতগুলো ছাড়াও এ মহাসাগরে ছোট ছোট অনেকগুলো গভীরখাত রয়েছে। তাছাড়া প্রশান্তমহাসাগরের প্রান্তভাগে কতকগুলো সাগর রয়েছে। এগুলোর মধ্যে বেরিং সাগর, ওখটস্ক সাগর, জাপান সাগর, পূর্ব চীন সাগর, দক্ষিণ চীন সাগর, শ্যাম সাগর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শিক্ষার্থীর কাজ	প্রশান্তমহাসাগরের দ্বীপ ও দ্বীপপুঞ্জ এবং শৈলশিরাগুলো পৃথকভাবে ছকবদ্ধ করুন।

সারসংক্ষেপ

প্রশান্তমহাসাগর পৃথিবীর বৃহত্তম মহাসাগর। এর আয়তন ১৬.৬০ কোটি বর্গকিলোমিটার যা মহাসাগরগুলো মোট আয়তনের ৪৭.২০ ভাগ। এ মহাসাগরটি বৃহত্তম হলেও এর মহীসোপানের বিস্তৃতি কম। তবে মহীঢালের পরিমাণ বেশি। তলদেশের উচ্চভূমিসমূহের মধ্যে রয়েছে মালভূমি, শৈলশিরা, দ্বীপ ও দ্বীপপুঞ্জ। এ মহাসাগরের দ্বীপের সংখ্যা প্রায় ২০,০০০। এ মহাসাগরটিতে আগ্নেয় এবং প্রবাল উভয় প্রকার দ্বীপ রয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। প্রশান্তমহাসাগরের আয়তন পৃথিবীর মোট ভূ-ভাগের কত ভাগ?
(ক) ২৫% (খ) ৩০%
(গ) ৩৫% (ঘ) ৪০%

২। প্রশান্তমহাসাগর দেখতে অনেকটা-
(ক) ত্রিভুজাকার (খ) গোলাকার
(গ) ডিম্বাকার (ঘ) বৃত্তকার

৩। কোনটি প্রশান্তমহাসাগরের দ্বীপ নয়?
(ক) মারকুইসাস (খ) ফিজি
(গ) হাওয়াই (ঘ) এ্যালবাট্রস

৪। মারিয়ানা খাতের গভীরতা কত কি.মি.?
(ক) ৯.৮৬ কি.মি. (খ) ১০.৮৬ কি.মি.
(গ) ১১.৮৬ কি.মি. (ঘ) ১২.৮৬ কি.মি.

৫। প্রশান্তমহাসাগরীয় খাত-
i. এমডেন ii. মিন্দানাও iii. কারমাডেক
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১০.৫ আটলান্টিক মহাসাগরের তলদেশের ভূমিরূপ
(Topography of the Atlantic Ocean)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- আটলান্টিক মহাসাগরের অবস্থান ও আয়তন বলতে পারবেন এবং
- তলদেশের ভূমিরূপ বর্ণনা করতে পারবেন।

আটলান্টিক মহাসাগরের তলদেশের ভূমিরূপ

আটলান্টিক মহাসাগর পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাসাগর। এর আয়তন ৮ কোটি ২৪ লক্ষ বর্গকিলোমিটার। যা সমগ্র পৃথিবীর ভূ-ভাগের ১৬% এবং পানিরাশির ২৫%। এ মহাসাগরের পশ্চিমে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা এবং পূর্ব দিকে ইউরোপ ও আফ্রিকা মহাদেশ অবস্থিত। মহাসাগরটির উত্তরাংশ গ্রীনল্যান্ড, আইসল্যান্ড প্রভৃতি দ্বীপ দিয়ে বেষ্টিত। দক্ষিণ অংশটি ক্রমশ দক্ষিণ মহাসাগরের সাথে মিশেছে। নিম্নে এ মহাসাগরের তলদেশের ভূমিরূপ বর্ণনা করা হলো (চিত্র-১০.৫.১)।

১. মহীসোপান : আটলান্টিক মহাসাগরের মহীসোপান অন্যান্য মহাসাগরের চেয়ে বেশি বিস্তৃত। এ মহাসাগরের উত্তরে আটলান্টিকের বিস্তৃত মহীসোপান রয়েছে। তবে দক্ষিণ আটলান্টিকের উপকূলের মহীসোপান খুবই সরু। এছাড়া উত্তর আটলান্টিকের পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলের অগভীর সাগর ও উপসাগরগুলো মহীসোপানেরই অংশবিশেষ। উত্তর আটলান্টিকের পূর্ব দিকের উত্তর সাগর, বাল্টিক সাগর এবং পশ্চিমের বেফিন ও হাডসন উপসাগর এ মহীসোপানের অন্তর্গত। এ সকল সাগর এবং উপসাগরের পানির গভীরতা ১৮০ মিটারের কম। নিউফাউন্ডল্যান্ড ও ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের কাছে পৃথিবীর বৃহত্তম মহীসোপান গ্রান্ড ব্যাংক ও ডর্গাস ব্যাংক অবস্থিত।

২. মহীঢাল : আটলান্টিক মহাসাগরের উত্তর দিকে সুবিস্তৃত মহীসোপান থাকায় এ অংশে মহীঢালের পরিমাণ কম। একইভাবে দক্ষিণ আটলান্টিকের মহীসোপান সংকীর্ণ হওয়ায় মহীঢালের পরিমাণ বেশি।

৩. তলদেশের উচ্চ ভূমিসমূহ : আটলান্টিক মহাসাগরের তলদেশের সুবিস্তৃত উঁচু অংশসমূহ শৈলশিরা এবং আন্ত:মহাসাগরীয় মালভূমিরূপে অবস্থিত। এখানকার তলদেশের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো মহাসাগরটির মধ্যভাগে অবস্থিত উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত মধ্য আটলান্টিক শৈলশিরা (Mid Atlantic Ridge)। এটি একটি জলমগ্ন শৈলশিরা এবং আকৃতি মহাসাগরটির আকৃতির অনুরূপ ইংরেজি 'S' অক্ষরের মতো। এ শৈলশিরাটি দুইটি অংশে বিভক্ত। প্রথমটি নিরক্ষরেখার উত্তরে অবস্থিত যাকে ডলফিন শৈলশিরা (Dolphin Ridge) বলে। দ্বিতীয়টি নিরক্ষরেখার দক্ষিণে অবস্থিত চ্যালেঞ্জার শৈলশিরা (Chanllenger Ridge)। এ উচ্চভূমির গভীরতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৩,০৪৮ মিটার।

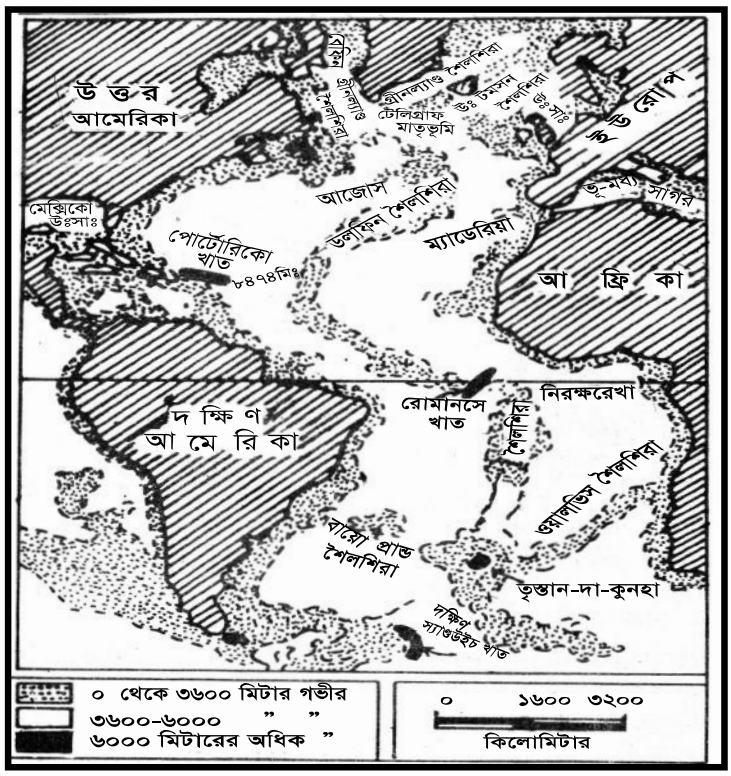
ডলফিন শৈলশিরা উত্তর দিকে ধীরে ধীরে প্রশস্ত হয়ে লাব্রাডর ও আয়ারল্যান্ডের কাছে একটি নিমজ্জিত মালভূমিতে পরিণত হয়েছে যা টেলিগ্রাফ মালভূমি (Telegraph Pleteau) নামে পরিচিত। গ্রীনল্যান্ড ও বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের মধ্যবর্তী অংশে উচ্চতা অধিক হওয়ায় এর উপরের পানি গভীরতা ৯১৪ থেকে ১,০৬৭ মিটার। বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের পশ্চিম দিকে এ মালভূমির পূর্বাংশ উইভিল টমসন শৈলশিরা (Wyvill Tomson Ridge) এবং ফ্যারো-আইসল্যান্ড শৈলশিরা (Farro Islands Ridge) নামে পরিচিত। দক্ষিণ আটলান্টিকের শৈলশিরার মধ্যে রয়েছে ওয়ালভিস শৈলশিরা (Walvis Ridge)। এটি তৃস্তান-দা-কুনহা দ্বীপ থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল পর্যন্তবিস্তৃত। রায়োগ্রান্ড নামের শৈলশিরাটি তৃস্তান-দা-কুনহা দ্বীপ থেকে পশ্চিমে অবস্থিত। এছাড়াও অন্যান্য শৈলশিরার মধ্যে রয়েছে গ্রীনল্যান্ড শৈলশিরা, ক্যানারী শৈলশিরা, রিও-গ্রান্ডি শৈলশিরা।

৪. মহাসাগরীয় দ্বীপসমূহ : এ মহাসাগরের দ্বীপের সংখ্যা কম এবং যেগুলো রয়েছে সেগুলো উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরে অবস্থিত। উত্তর আটলান্টিকের দ্বীপগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ, আইসল্যান্ড, নিউফাউন্ডল্যান্ড প্রভৃতি। মধ্য আটলান্টিকে অবস্থিত শৈলশিরাকে অবলম্বন করে রয়েছে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ। সেন্ট হেলেনা, আর্জোস এদের মধ্যে প্রধান। ১০° পশ্চিম ও ৩০° উত্তর অক্ষাংশের অবস্থিত ম্যাডেরিয়া (Maderia) দ্বীপমালা আগ্নেয়গিরি থেকে উৎক্ষিপ্ত পদার্থ দ্বারা গঠিত। এছাড়া পশ্চিমে ৬৪° ও ৩২° উত্তর অক্ষাংশের মধ্যে অবস্থিত একটি প্রধান দ্বীপপুঞ্জ। দক্ষিণ

আটলান্টিকের দ্বীপসমূহের মধ্যে সেন্টহেলেনা, ত্রিনিদাদ অন্যতম।

৫. গভীর খাত : আটলান্টিক মহাসাগরে প্রশান্তমহাসাগরের তুলনায় গভীর খাত অনেক কম। এ মহাসাগরের গভীর খাতগুলোর মধ্যে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের উত্তরে পোর্টোরিকো দ্বীপের নিকট অবস্থিত পোর্টোরিকো খাত (Puerto Rico Trench) অন্যতম। এর গভীরতা ৮,৪৭৪ মিটার বা ৪,৮১২ ফ্যাদম। স্যান্ডউইচ দ্বীপের নিকট অবস্থিত দ্বিতীয় বৃহত্তম খাতটি হলো স্যান্ডউইচ (Sandwitch)। এর গভীরতা ৮,২৩০ মিটার বা ৪,৫৪৫ ফ্যাদম। এছাড়া রোমানসে্ খাত (Romanche Trench) মধ্য আটলান্টিক শৈলশিরাকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছে। এর গভীরতা ৭,৩১৫ মিটার বা ৪,০৩০ ফ্যাদম।

দক্ষিণ আটলান্টিকের প্রান্তদেশীয় সাগরগুলোর মধ্যে রয়েছে বাল্টিক সাগর, উত্তর সাগর, ভূ-মধ্যসাগর, ক্যারাবিয়ান সাগর, অ্যাড্রিয়াটিক সাগর, বিস্কে উপসাগর, বেফিন ও হার্ডসন সাগর প্রভৃতি।



চিত্র-১০.৫.১: আটলান্টিক মহাসাগরের তলদেশের ভূমিরূপ

শিক্ষার্থীর কাজ	চিত্রে আটলান্টিক মহাসাগরের তলদেশের ভূ-প্রকৃতি চিহ্নিত করুন।

সারসংক্ষেপ

আটলান্টিক মহাসাগর পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাসাগর যার আয়তন ৮.২৪ কোটি বর্গকিলোমিটার। এ মহাসাগরের ভূমিরূপের আকৃতি অনেকটা ইংরেজি `S' অক্ষরের মতো। নিরক্ষরেখার দিকে এটি সর্বাপেক্ষা সংকীর্ণ কিন্তু নিরক্ষরেখা হতে উত্তর ও দক্ষিণে ক্রমশ চওড়া। আটলান্টিক মহাসাগরের তলদেশের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভূমিরূপগুলোর মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন আকার ও আকৃতির শৈলশিরা, গভীর সমুদ্রখাত, মালভূমি, দ্বীপ ও দ্বীপপুঞ্জ প্রভৃতি। ভূ-প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য এবং অবস্থানগত কারণে এ মহাসাগর বৈচিত্র্যময়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। পৃথিবীর পানিরাশির কতভাগ আটলান্টিক মহাসাগর অবস্থিত?
(ক) ১৫% (খ) ১৬% (গ) ২৫% (ঘ) ২৬%

২। গ্রান্ড ব্যাংক ও ডর্গাস ব্যাংক কী?
(ক) মহীসোপান (খ) মহীঢাল (গ) সমুদ্রখাত (ঘ) দ্বীপ

৩। কোনটি দক্ষিণ আটলান্টিকের শৈলশিরা?
(ক) ওয়ালভিস (খ) ডলফিন (গ) উইভিল টমসন (ঘ) ফ্যারো আইসল্যান্ড

৪। পোর্টোরিকো খাতের গভীরতা কত?

(ক) ৬,৪৭৪ মিটার (খ) ৭,৪৭৪ মিটার (গ) ৮,৪৭৪ মিটার (ঘ) ৯,৪৭৪ মিটার

পাঠ-১০.৬ ভারত মহাসাগরের তলদেশের ভূমিরূপ (Topography of the Indian Ocean)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

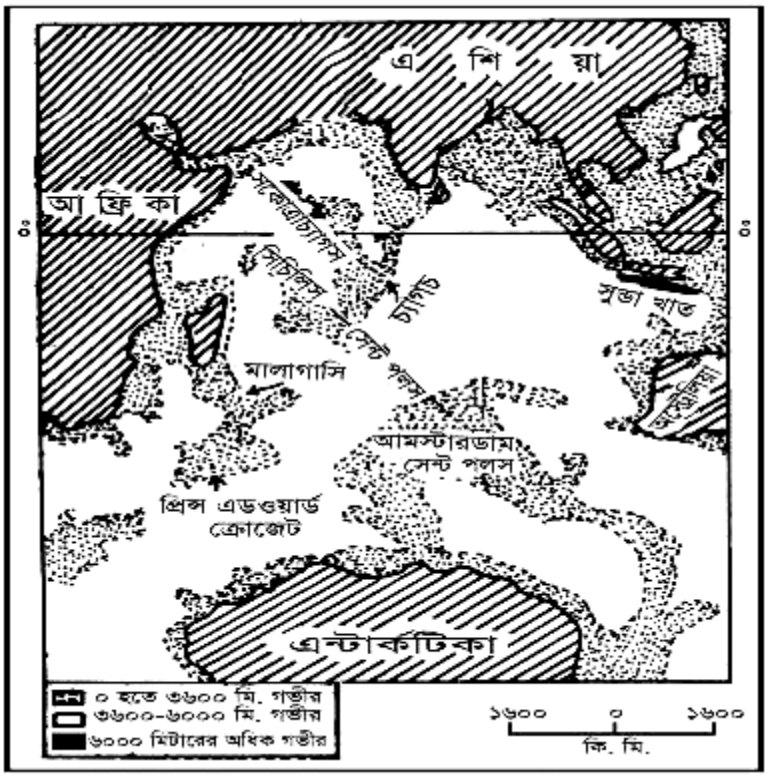
- ভারত মহাসাগরের অবস্থান ও আয়তন এবং ভূমিরূপ বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

ভারত মহাসাগরের তলদেশের ভূমিরূপ

ভারত মহাসাগর আয়তনে তৃতীয় বৃহত্তম। এর আয়তন ৭ কোটি ৩৪ লক্ষ বর্গকিলোমিটার। অবস্থান ও আকৃতির দিক দিয়ে এটি প্রশান্তএবং আটলান্টিক মহাসাগর থেকে ভিন্ন প্রকৃতির। এর তিনদিকে স্থলভাগ দ্বারা বেষ্টিত। এ মহাসাগরের অল্প অংশ নিরক্ষরেখার উত্তরে বিস্তৃত এবং উত্তর সীমা মোটামুটিভাবে কর্কটকান্তিরেখা দ্বারা সীমাবদ্ধ। মহাসাগরের অবশিষ্ট অংশ দক্ষিণ গোলার্ধে অবস্থিত।

তলদেশের ভূমিরূপ : ভারত মহাসাগরের তলদেশ প্রশান্তএবং আটলান্টিক মহাসাগরের মতো বৈচিত্র্যপূর্ণ নয়। নিম্নে এ মহাসাগরের তলদেশের ভূমিরূপের বর্ণনা দেওয়া হলো (চিত্র ১০.৬.১)।

১. মহীসোপান ও মহীঢাল : ভারত মহাসাগরের উপকূলভাগের প্রশস্ততা খুব বেশি। বিস্তীর্ণ উপকূলভাগের মধ্যে বঙ্গোপসাগর এবং আরব সাগরের তীরে উপকূলের প্রশস্ততা অধিক। এখানকার সর্বাধিক প্রশস্ততা ৬২০ কিলোমিটার। আফ্রিকার পূর্ব উপকূলের প্রশস্ততা মাঝারি ধরনের। মহাসাগরটির পূর্ব ভাগের তটভাগ সংকীর্ণ যা সুমাত্রা ও জাভার নিকট প্রায় ১৫০ কিলোমিটার বিস্তৃত। অস্ট্রেলিয়ায় পশ্চিম উপকূলের সামান্য অংশ কম প্রশস্ত এবং উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ উপকূলে মহীসোপান বেশ চওড়া। মহীসোপানের পরই মহীঢাল অবস্থিত।



চিত্র-১০.৬.১: ভারত মহাসাগরের তলদেশের ভূমিরূপ

২. তলদেশের উচ্চভূমিসমূহ : ভারত মহাসাগরের তলদেশে কিছু মগ্ন শৈলশিরা রয়েছে। যা এই মহাসাগরটিকে কয়েকটি অংশে বিভক্ত করেছে। এ মহাসাগরের দীর্ঘতম অংশটি ভারতের দক্ষিণে কুমারিকা অন্তরীপের নিকট হতে সোজাসুজি দক্ষিণ দিকে এন্টার্কটিকা পর্যন্তবিস্তৃত। এ শৈলশিরাটি ভারত মহাসাগরের মধ্যভাগে অবস্থান করে তলদেশকে পূর্ব ও পশ্চিম এ দুইটি অংশে বিভক্ত করেছে। শৈলশিরাটির দক্ষিণাংশ সবচেয়ে বেশি বিস্তৃত যা আমস্টারডাম সেন্ট পল (Amsterdam Sant Paul) মালভূমি নামে পরিচিত। মধ্যভাগ অনেকটা সরু। একে সেন্ট পল শৈলশিরা (Sant Paul Ridge) বলে। উত্তরের অংশ কিছুটা চওড়া যা চ্যাগস শৈলশিরা (Chagos Ridge) নামে পরিচিত।

আফ্রিকার সোমালিল্যান্ডের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত সকোত্রা দ্বীপ হতে অপর একটি শৈলশিরা দক্ষিণ-পূর্বদিকে চ্যাগস দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্তবিস্তৃত। এটিকে সাকোত্রা চ্যাগস শৈলশিরা (Socotra Chagos Ridge) বলে। মালাগাসি দ্বীপের উত্তর-পূর্ব দিক থেকে

অপর একটি প্রশস্ত শৈলশিরা দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে চ্যাগস শৈলশিরার সাথে মিলিত হয়েছে। একে সিচিলিস শৈলশিরা (Scychilles Ridge) বলা হয়। মালাগাসির দক্ষিণ হতে অপর একটি শৈলশিরা মালাগাসি শৈলশিরা নামে দক্ষিণে বিস্তৃত। এর দক্ষিণ প্রান্তঅপর একটি সুবিস্তৃত শৈলশিরা প্রিন্স এডওয়ার্ড ক্রোজেট শৈলশিরার (Prince Edward Crozet Ridge) সাথে মিলিত হয়েছে। এর উত্তর-পশ্চিম দিকে ২০০ মিটার গভীর একটি খাত আছে।

ভারত মহাসাগরের বিভিন্ন অংশে অনেকগুলো শৈলশিরা থাকায় মধ্যবর্তী স্থানে বিভিন্ন গভীরতায় অনেক উপত্যকা রয়েছে। এদের গড় গভীরতা প্রায় ৪,০০০ থেকে ৬,০০০ মিটারের মধ্যে। এসব উপত্যকার মধ্যে রয়েছে আরবীয়, সোমালী, মরিশাস, ওমান, নাটাল, কোকাস কিলিং প্রভৃতি।

তলদেশের পাতালিক সমভূমি : ভারত মহাসাগরের তলদেশের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিরূপ হচ্ছে পাতালিক সমভূমি। পৃথিবীর স্থলভাগ এবং তলদেশের মধ্যে এ অঞ্চলটি সর্বাপেক্ষা সমতল অঞ্চল। এর আঞ্চলিক ঢাল বা নতিমাত্রা ১:১০০০ থেকে ১:৭০০০ এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। এ পাতালিক সমভূমিটি মহাসাগরটির উত্তর ও দক্ষিণ অংশে বিদ্যমান।

গভীর খাত : ভারত মহাসাগরে গভীর খাত নেই বললেই চলে। জাভা দ্বীপের দক্ষিণে সুন্ডাখাত (Sunda Trench) নামে একটি গভীর খাত রয়েছে। এর গভীরতা প্রায় ৭,৩১৫ মিটার বা ৪,০৭৬ ফ্যাদম। এছাড়াও মোজাম্বিক খাত, এ্যাগোস খাত, ওব খাত উল্লেখযোগ্য।

মহাসাগরীয় দ্বীপসমূহ : ভারত মহাসাগরের বৃহত্তম দ্বীপসমূহ হচ্ছে পশ্চিম দিকে অবস্থিত মালাগাসি এবং উত্তর দিকের শ্রীলংকা। উভয় দ্বীপই মহাদেশের বিচ্ছিন্ন অংশ। গুয়ারদা দুই অন্তরীপের অনতিদূরে সাকোত্রো, জাঞ্জিবার এবং কামারো প্রভৃতি দ্বীপ অবস্থিত। পূর্ব দিকে অবস্থিত আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ মহাদেশীয় দ্বীপ। এ মহাসাগরের ভগ্ন শৈলশিরাকে কেন্দ্র করে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ গড়ে উঠেছে। এর মধ্যে রয়েছে-মালদ্বীপ, লাক্ষা দ্বীপ, কারগোয়েলন দ্বীপ প্রভৃতি। মালাগাসির পূর্বে মরিসাস ও রিইউনিয়ন নামে দুইটি শম্বুকাকৃতি আগ্নেয় দ্বীপ রয়েছে। অপেক্ষাকৃত গভীর হওয়ায় ভারত মহাসাগরের পূর্বাংশে দ্বীপ নেই। তবে জাভার দক্ষিণ-পশ্চিমের ককোস (Cocos) ও ক্রীস্টমাস (Christmas) দ্বীপ দুইটি ব্যতিক্রম।

ভারত মহাসাগরের উপকূলভাগে সাগর, উপসাগরের সংখ্যা খুবই কম। এ মহাসাগরের উত্তরাংশ দক্ষিণ ভারতের উপদ্বীপ অঞ্চল দ্বারা দুইটি অংশে বিভক্ত। ভারতীয় উপদ্বীপের পশ্চিম দিকে অবস্থিত অংশের নাম আরব সাগর এবং পূর্ব দিকের অংশের নাম বঙ্গোপসাগর। আফ্রিকা মহাদেশ ও মালাগাসি দ্বীপের মধ্যবর্তী অংশ মোজাম্বিক সাগর। উত্তর-পশ্চিম সীমানায় অবস্থিত পারস্য উপসাগর ও লোহিত সাগরের মহীসোপান খুবই অগভীর। পারস্য উপসাগর ওমান উপদ্বীপ দ্বারা ভারত মহাসাগর হতে বিচ্ছিন্ন। কিন্তু লোহিত সাগর আফ্রিকা মহাদেশ ও আরব মালভূমির মধ্যবর্তী উপত্যকা অঞ্চলে অবস্থিত।

শিক্ষার্থীর কাজ	মানচিত্রে ভারত মহাসাগরের তলদেশের ভূমিরূপ দেখানো অনুশীলন করুন।

সারসংক্ষেপ

ভারত মহাসাগর আয়তনে তৃতীয় বৃহত্তম মহাসাগর। এটি তিনদিকে স্থলভাগ দ্বারা বেষ্টিত। এ মহাসাগরের উপকূল ভাগের প্রশস্ততা খুব বেশি। ভারত মহাসাগরের তলদেশে কিছু শৈলশিরা রয়েছে যা এটিকে কয়েকটি অংশে বিভক্ত করেছে। এছাড়া এখানে দ্বীপপুঞ্জ, গভীর সমুদ্রখাত, পর্বত, মালভূমি ইত্যাদি রয়েছে। মহাসাগরটিতে দ্বীপগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো- আন্দামান, নিকোবর, সাকোত্রা, জাঞ্জিবার, কামারো, মালদ্বীপ, লাক্ষা দ্বীপ প্রভৃতি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। ভারত মহাসাগরের আয়তন কত ব.কি.মি?

(ক) ১৬.৬০ কোটি ব.কি.মি (খ) ৮.২৪ কোটি ব.কি.মি

(গ) ৭.৩৪ কোটি ব.কি.মি (ঘ) ১.৫০ কোটি ব.কি.মি

২। চ্যাগস শৈলশিরাটি কোন মহাসাগরে অবস্থিত?

(ক) প্রশান্ত (খ) আটলান্টিক

(গ) ভারত (ঘ) কোনটিই নয়

৩। সুন্ডা খাতের গভীরতা কত মিটার?

(ক) ৭,৩১৫ মিটার
(খ) ৭,৪১৫ মিটার
(গ) ৭,৫১৫ মিটার
(ঘ) ৭,৬১৫ মিটার

পাঠ-১০.৭ বঙ্গোপসাগরের তলদেশের ভূমিরূপ (Topography of the Bay of Bengal)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বঙ্গোপসাগরের অবস্থান ও আয়তন সম্পর্কে বলতে পারবেন এবং
- বঙ্গোপসাগরের তলদেশের ভূমিরূপ বর্ণনা করতে পারবেন।

বঙ্গোপসাগরের তলদেশের ভূমিরূপ

বঙ্গোপসাগরের ইংরেজি প্রতিশব্দ Bay of Bengal. প্রাচীন মোঘল সাম্রাজ্য 'বঙ্গদেশ' থেকে বঙ্গোপসাগর শব্দটি এসেছে। ভারতীয় উপদ্বীপের পূর্বদিকে এবং বাংলাদেশের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত ভারত মহাসাগরের উত্তর-পূর্ব অংশই বঙ্গোপসাগর নামে পরিচিত। এর তিনদিকে স্থলভাগ দ্বারা বেষ্টিত। শুধু দক্ষিণ দিকে উন্মুক্ত ভারত মহাসাগর।

অবস্থান ও আয়তন : বঙ্গোপসাগরের উত্তরে বাংলাদেশ, ভারত, দক্ষিণ মহাসাগর, পূর্বে মিয়ানমার, মালয় উপদ্বীপ, পশ্চিমে শ্রীলংকা ও ভারত এবং দক্ষিণে ভারত মহাসাগর। International Hydrographic Bureau এর জরিপ অনুযায়ী বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণ দিকের সীমারেখা নির্ধারিত হয়েছে একটি বিশেষ কাল্পনিক রেখার সাহায্যে। যা শ্রীলংকার সর্ব দক্ষিণ বিন্দু 'ডোন্ড্রা হেড'কে (Dondra Head) সুমাত্রা দ্বীপের সর্ব উত্তর বিন্দুকে সংযোজিত করেছে। বঙ্গোপসাগর ৪° থেকে ২২°৩০´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৭৮°৩০´ থেকে ৯৫°৩০´ পূর্ব দ্রাঘিমার মধ্যে অবস্থিত। এর আয়তন প্রায় ২২ লক্ষ বর্গকিলোমিটার। গড় গভীরতা ২,৫৮৬ মিটার এবং সর্বোচ্চ গভীরতা ৫,২৫৮ মিটার।

তলদেশের ভূমিরূপ : বঙ্গোপসাগরের তলদেশের ভূমিরূপ বৈচিত্র্যময়। এটি ফানেল আকৃতির (ইংরেজি U অক্ষরের মতো) এবং দক্ষিণ দিকে উন্মুক্ত। নিম্নে বঙ্গোসাগরের তলদেশের ভূমিরূপ বর্ণনা করা হলো (চিত্র ১০.৪.১)।

১. মহীসোপান ও মহীঢাল : বঙ্গোপসাগরের স্থলভাগ সংলগ্ন প্রায় ২ লক্ষ ৫৫ হাজার বর্গমাইল বা ৭ লক্ষ বর্গকিলোমিটার এলাকা মহীসোপানের অন্তর্গত। অবশিষ্ট অংশ গভীর সমুদ্রের তলদেশ দ্বারা গঠিত। বঙ্গোপসাগরের মহীসোপানের গভীরতা সর্বত্র ২০০ মিটারের কম। দক্ষিণ পূর্বাংশের মহীসোপান খুবই চওড়া। শ্রীলংকার চারদিকে ১৩.২ থেকে ৩২ কিলোমিটার প্রস্থ বিশিষ্ট মহীসোপান দেখা যায়। পক্ প্রণালি এবং উত্তর-পূর্ব উপকূলে অবস্থিত মহীসোপানের কিছু অংশের বিস্তৃতি অপেক্ষাকৃত বেশি। বঙ্গোপসাগরের পশ্চিম প্রান্তেভারতীয় উপকূলে অবস্থিত মহীসোপানের প্রশস্ততা ১২৮ থেকে ১৬০ কিলোমিটারের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আর মিয়ানমার উপকূল বরাবর মহীসোপানের প্রশস্ততা ১৬০ থেকে ১৬৪ কিলোমিটার। বঙ্গোপসাগরের শীর্ষ প্রান্তেমহীঢালের প্রস্থ ১৬০ কিলোমিটার। অন্ধ্র উপকূলে মহীঢালের গড় প্রস্থ ৩৮.৪ কিলোমিটার এবং ঢালের গভীরতা ১০০ ফ্যাদম। পললের বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে বঙ্গোপসাগরের মহীঢালকে ৫টি জোনে ভাগ করা হয়। এগুলো হলো-

ক. বালি জোন খ. কাঁদামাটি জোন গ. খোলক কাঁদা জোন
ঘ. জমাট বাঁধন জোন এবং ঙ. কদর্ম জোন।

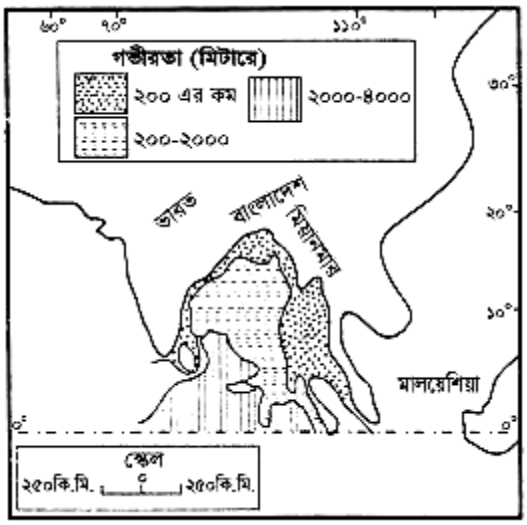
বঙ্গোপসাগরের তলদেশের ভূমিরূপের বৈশিষ্ট্য : বঙ্গোপসাগরের তলদেশের ভূমিরূপের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলো হলো-

১. ৯০° পূর্ব-শৈলশিরা (Ninety Degree East Ridge) : এই শৈলশিরাটি বঙ্গোপসাগরের মাঝ বরাবর উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে প্রায় ৯০° পূর্ব দ্রাঘিমা বরাবর বিস্তৃত বলে একে ৯০° পূর্ব শৈলশিরা বলে। এটি বেঙ্গল শৈলশিরা নামেও পরিচিত। এই শৈলশিরা ১৫০° উত্তর অক্ষাংশ থেকে শুরু করে ৩০° দক্ষিণ অক্ষাংশ পর্যন্তপ্রায় ৫,০০০ কিলোমিটার দীর্ঘ।

২. বেঙ্গল ও নিকোবার গিরিখাত (Bengal & Nicobar Trench) : ৯০° শৈলশিরার পশ্চিমে বেঙ্গল সামুদ্রিক গিরিখাত এবং ৯০° শৈলশিরার পূর্বে নিকোবর গিরিখাত অবস্থিত।

৩. ইন্দোনেশিয়া ও আন্দামান সুন্দা গিরিখাত (Indonesia and Andaman Sunda Trench) : নিকোবর-সুমাত্রার নিকটে উত্তর-দক্ষিণে ইন্দোনেশিয়া খাত অবস্থিত। এই খাতের গভীরতা ৪,৫০০ মিটারের বেশি। আর নিকোবর গিরিখাতের পূর্ব প্রান্তেআন্দামান সুন্দা গিরিখাত অবস্থিত।

৪. গঙ্গা গিরিখাত (Ganga Trench) : বঙ্গোপসাগরের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিরূপ হলো গঙ্গা গিরিখাত। যা সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড (Swatch of no Ground) নামে পরিচিত। এটি একটি অত্যন্তখাড়া তীর বিশিষ্ট সামুদ্রিক গিরিখাত, যা উত্তর-পূর্ব দিক থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রলম্বিত হয়ে বঙ্গোপসাগরের গভীর তলদেশের সাথে মিশেছে। সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড জোয়ার-ভাটা, পললের গতিবিধি ও অবক্ষেপন, পানির গতি-প্রকৃতি প্রভৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করে। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র নদীবাহিত পলি সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ডের মধ্য দিয়ে টারবিডিটি স্রোতের মাধ্যমে প্রায় ৩,০০০ কিলোমিটার দক্ষিণে নিয়ে আসে। এ পলি মিশ্রিত স্রোত বঙ্গোপসাগরের তলদেশে অগভীর খাতের সৃষ্টি করে শিরা-উপশিরার ন্যায় বেষ্টনি তৈরি করেছে। যা 'বেঙ্গল ফ্যান' (Bengal Fan) বা 'গাঙ্গেয় ফ্যান' (Ganges Fan) নামে পরিচিত।



চিত্র-১০.৪.১: বঙ্গোপসাগরের তলদেশের ভূমিরূপের গভীরতা

৫. বার্মা গিরিখাত (Barma Trench) : এটিও একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গিরিখাত। বঙ্গোপসাগরের পূর্ব প্রান্তেচট্টগ্রাম, কক্সবাজার ও মিয়ানমারের উপকূল বরাবর অবস্থিত। এটি সমুদ্র তলদেশে সরু আকারে লম্বা হয়ে খাড়া ঢাল বিশিষ্ট নিম্নভূমিতে মিশেছে।

দ্বীপ ও ব-দ্বীপসমূহ (Islands & Delta) : বঙ্গোপসাগরের উপকূলে অনেকগুলো দ্বীপ এবং ব-দ্বীপ রয়েছে। বাংলাদেশ ও ভারত সীমান্তেরাইমঙ্গল নদীর মোহনাতে অবস্থিত দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া ভোলা, হাতিয়া, সন্দ্বীপ, সেন্টমার্টিন, মহেশখালী উল্লেখযোগ্য দ্বীপ। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ শৈলশিরার অংশবিশেষ।

শিক্ষার্থীর কাজ	বঙ্গোপসাগরের তলদেশের ভূমিরূপের গভীরতা মানচিত্রে প্রদর্শন করুন।

সারসংক্ষেপ

বঙ্গোপসাগরের ভূ-প্রকৃতি বৈচিত্র্যপূর্ণ। এর তলদেশের আকৃতি ফানেল বা ইংরেজি `U' অক্ষরের মতো। দক্ষিণে ভারত মহাসাগরের দিকে উন্মুক্ত। তলদেশের বৈচিত্র্যের মধ্যে রয়েছে ৯০° পূর্ব শৈলশিরা, বেঙ্গল গিরিখাত, নিকোবর গিরিখাত, সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড, বার্মা ট্রেন্সসহ বিভিন্ন গিরিখাত। দ্বীপগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো দক্ষিণ তালপট্টি, হাতিয়া, সন্দ্বীপ, সেন্টমার্টিন প্রভৃতি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। বঙ্গোপসাগরের আয়তন কত বর্গকিলোমিটার?

(ক) ২১ লক্ষ (খ) ২২ লক্ষ (গ) ২৩ লক্ষ (ঘ) ২৪ লক্ষ

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ২ ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

একদল শিক্ষার্থী বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল বেড়াতে গেলেন। তাঁরা সেখানে বিশাল জলরাশি দেখে মুগ্ধ হলেন। এছাড়া সৈকত দেখতে পেলেন এবং কয়েকটি দ্বীপও ঘুরে দেখলেন।

২। উল্লিখিত জলরাশিটির নাম কী?

(ক) কৃষ্ণ সাগর (খ) আরব সাগর (গ) ভূ-মধ্যসাগর (ঘ) বঙ্গোপসাগর

৩। সেন্টমার্টিন কী?

(ক) দ্বীপ (খ) গভীর খাত (গ) শৈলশিরা (ঘ) মালভূমি

পাঠ-১০.৮ পানি চক্র ও এর গুরুত্ব (Hydrological Cycle & its Importance)



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- পানি চক্রের সংজ্ঞা ও পানি চক্র কীভাবে সংঘটিত হয় তা বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- পানি চক্রের গুরুত্ব বলতে পারবেন।



পানি চক্র

সাধারণভাবে পানি চক্র বলতে পানি রূপান্তরের মাধ্যমে স্থানান্তর এবং বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আবার স্ব-স্থানে ফিরে আসাকে বুঝায়। অন্যভাবে বলা যায় যে, সূর্যরশ্মির তাপে পানি সমুদ্র, হ্রদ, নদী এবং জলাধার থেকে বাষ্পীভবনের মাধ্যমে বায়ুমন্ডলে প্রবেশ করে। এছাড়া উদ্ভিদের প্রস্বেদনের মাধ্যমেও প্রচুর পানি বাষ্পাকারে বায়ুমন্ডলে প্রবেশ করে। সেখান থেকে ক্রমাগতভাবে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় আবর্তিত হয়ে বারিপাতের মাধ্যমে পুনরায় ফিরে আসে। পানির এরূপ চক্রাকারে আবর্তনকে পানি চক্র বলে। পানি চক্রই সমুদ্র, স্থলভাগ এবং বায়ুমন্ডলের পানির মধ্যে একটি সমতা রক্ষা করে।

পানি চক্রের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Hydrological Cycle) : পানি চক্রের কতিপয় বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এগুলো হলো-

১. পানি চক্রের অধ:পতন পদ্ধতি ভৌত শক্তির কর্মধারার উপর নির্ভরশীল।
২. সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে অধিক পরিমাণ বাষ্পীভবন হয়।
৩. এ চক্রটি দ্রুত আবর্তিত হয়।
৪. বারিপাতের ফলে স্থলভাগে বেশি পানি ফিরে আসে।
৫. পানি চক্র বিশ্বের পানির মধ্যে একটি সমতা রক্ষা করে।

পানি চক্রের প্রক্রিয়া (Process of Hydrological Cycle) : পানি চক্র হলো সমুদ্র থেকে বায়ুমন্ডল এবং বায়ুমন্ডল থেকে ভূ-পৃষ্ঠে প্রত্যাবর্তনের এক সুষম চক্রাকার আবর্তন। পানি চক্রের সাথে নিম্নলিখিত প্রক্রিয়াগুলো সম্পৃক্ত। যথা-

১. বাষ্পীভবন
২. ঘনীভবন
৩. বারিপাত এবং
৪. অনুস্রাবন।

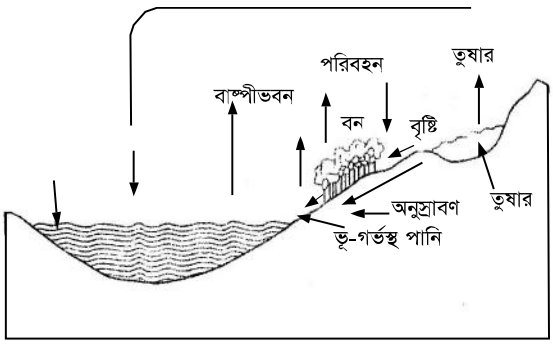
১. বাষ্পীভবন (Evaportation): বাষ্পীভবন হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যা দ্বারা সমুদ্র, হ্রদ, নদী বা জলাশয় থেকে সূর্যরশ্মির তাপে পানি বাষ্পে পরিণত হয় এবং বায়ুমন্ডলে মিশে যায়। বায়ুর উষ্ণতার পরিমাণের উপর নির্ভর করে জলীয়বাষ্পের ধারণ ক্ষমতা। বাষ্পীভবনের জন্য জলীয়বাষ্প সরবরাহের ৮৪% আসে সমুদ্র থেকে এবং অবশিষ্ট ১৬% আসে স্থলভাগ থেকে।

২. ঘনীভবন (Condensation) : বায়ু যত বেশি উষ্ণ হয় তত বেশি জলীয়বাষ্প ধারণ করতে পারে। এ জলীয়বাষ্প উপরে উঠে শীতল ও ঘনীভূত হয়।

৩. বারিপাত (Precipitation) : জলীয়বাষ্প শীতল ও ঘনীভূত হওয়ার পর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলকণা ও তুষারকণায় পরিণত হয়। যা পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানে ভূ-পৃষ্ঠে পতিত হয়, একে বারিপাত বলে। বারিপাত বিভিন্নভাবে হয়ে থাকে। যেমন- বৃষ্টিপাত, তুহিন, তুষার ইত্যাদি। বায়ুমন্ডল হতে অধিকাংশ পানিই বৃষ্টিপাতরূপে ফিরে আসে। ভূ-পৃষ্ঠে পতিত পানির একটি বড় অংশ নদী-নালার মাধ্যমে প্রবাহিত হয়ে পুনরায় সমুদ্রে পতিত হয়। বৃষ্টির পানি প্রত্যক্ষভাবে ভূ-পৃষ্ঠে পতিত হওয়ার পথে উদ্ভিদের ডালপালা ও পাতার দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হওয়াকে ইন্টারসেপশন (Interception) বলে।

৪. **অনুস্রাবন (Percolation or Infilteration) :** অধিক বৃষ্টিপাতের ফলে পানি ভূ-গর্ভে প্রবেশ করে গভীর স্তরে চলে যায় এবং ভূ-গর্ভস্থ পানি হিসেবে জমা হয় যাকে অনুস্রাবন বলে। পরবর্তীতে এই পানি ঝর্ণা বা আন্ত:প্রবাহের মাধ্যমে পানি চক্রকে পরিপূর্ণ করে।

সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, উপরিউক্ত প্রক্রিয়াগুলোর মাধ্যমে পানি চক্র সম্পন্ন হয় (চিত্র ১০.৮.১)। এ প্রক্রিয়াটি সব সময় চলমান থাকে এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে।



চিত্র-১০.৮.১: পানি চক্র

পানি চক্রের গুরুত্ব (Importance of Hydrological Cycle) : পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও জীবের অস্তিত্বের সাথে পানির সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এছাড়া পানি চক্র না থাকলে মহাসাগর এবং মহাদেশগুলোর মধ্যে পানির বিনিময় সম্ভব হতো না। ফলে নদ-নদী, খাল বা নালা ইত্যাদির মাধ্যমে পানি স্থলভাগ থেকে সমুদ্রে পতিত হলে স্থলভাগ পানি শূন্য হয়ে যেতো। এ শূন্যতা পূরণ করছে পানি চক্র। এছাড়াও নিম্নোক্ত কারণে পানি চক্র জীবজগতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ।

১. মানব দেহের দুই-তৃতীয়াংশ পানি।
২. জীবের অনুকূল তাপমাত্রা বজায় রাখে পানি চক্র।
৩. দ্রাবক হিসেবে পানি জীবের ক্ষরণ, রেচন, শোষণ, পরিবহন ইত্যাদি প্রক্রিয়ায় সহায়তা করে।
৪. জীবের শ্বসন প্রক্রিয়ায় সাহায্য করে।
৫. শস্য উৎপাদনে পানি ব্যবহৃত হয়।
৬. পানি চক্রের ফলে ভূ-পৃষ্ঠে পানি ফিরে আসে এবং ধরিত্রী সবুজ শ্যামল থাকে।
৭. ভূ-গর্ভস্থ পানির উৎস হিসেবে কাজ করে এবং উদ্ভিদ ও প্রাণিকূলের জীবন রক্ষা করে।

সুতরাং উপরের আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রাণি ও উদ্ভিদজগতের জন্য পানি চক্রের গুরুত্ব অপরিসীম।

শিক্ষার্থীর কাজ	পানি চক্রের চিত্রটি অনুশীলন করুন।

সারসংক্ষেপ

যে প্রক্রিয়ার মাধমে পানি সমুদ্র, হ্রদ, নদী বা জলাশয় হতে বাষ্পীভূত হয়ে পুনরায় শীতল হয়ে ঘনীভূত হয় এবং বারিপাতের মাধ্যমে ভূ-পৃষ্ঠে ফিরে আসে তাকে পানি চক্র বলে। পানি চক্রের প্রধান উপাদান হলো জলীয়বাষ্প। পানি চক্রের কারণে বারিপাত অর্থাৎ বৃষ্টিপাত, তুষার, শিশির, কুয়াশা ইত্যাদি সংঘটিত হয়। পানি চক্রের মাধ্যমে মোট পানির কোনো ঘাটতি বা সংযোজন কিছুই ঘটে না অর্থাৎ সমতা বজায় থাকে। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, পানি চক্র আমাদের জীবনধারণের জন্য অত্যন্তগুরুত্বপূর্ণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। পানি চক্রের অংশ-

i. বাষ্পীভবন ii. ঘনীভবন iii. বারিপাত iv. অনুস্রাবন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i, ii ও iii (ঘ) i, ii, iii ও iv.

২। পানি চক্রের প্রধান উপাদান কোনটি?

(ক) জলীয়বাষ্প (খ) কুয়াশা (গ) শিশির (ঘ) বৃষ্টিপাত

৩। বাষ্পীভবনের প্রধান উৎস কোনটি?

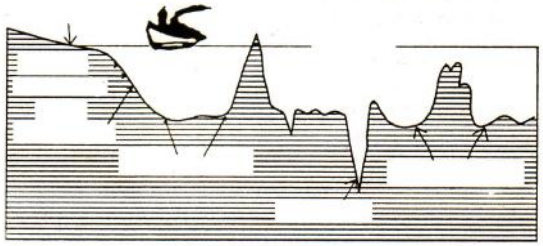
(ক) সমুদ্র (খ) নদী (গ) জলাশয় (ঘ) পুকুর

৪। জীবের অনুকূল তাপমাত্রা বজায় রাখে কোন চক্র?

(ক) পানি চক্র (খ) নাইট্রোজেন চক্র (গ) কার্বন চক্র (ঘ) অক্সিজেন চক্র

চূড়ান্তমূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন-১



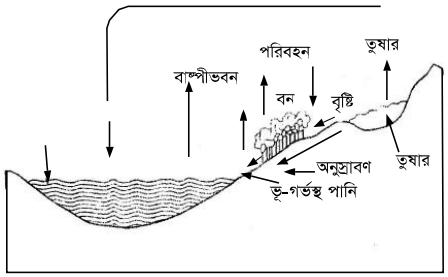
ক. উল্লিখিত চিত্রটি কীসের?

খ. সমুদ্র তলদেশের গভীরতা কীভাবে পরিমাপ করা যায়?

গ. মহীসোপান এবং মহীঢালের মধ্যে পার্থক্য লিখুন।

ঘ. 'মহাসাগরের তলদেশের ভূমিরূপের ভিন্নতা রয়েছে'-ব্যাখ্যা করুন।

সৃজনশীল প্রশ্ন-২



ক. পানি চক্র কী?

খ. পানি কীভাবে ঘনীভূত হয়?

গ. পানি চক্রের প্রক্রিয়াটি ব্যাখ্যা করুন।

ঘ. জীবজগতের জন্য পানিচক্রের গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.১ :	১. ঘ	২. ক	৩. খ	৪. ক	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.২ :	১. ক	২. খ	৩. খ	৪. গ	৫.ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৩ :	১. ক	২. গ	৩. ক	৪. গ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৪ :	১. গ	২. ক	৩. ঘ	৪. খ	৫.ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৫ :	১. গ	২. ক.	৩. ক	৪. গ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৬ :	১. গ	২. গ.	৩. ক		
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৭ :	১. খ	২. ঘ.	৩. ক		
পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১০.৮ :	১. ঘ	২. ক	৩. ক	৪.ক	

পাঠ-১০.৯ ব্যবহারিক : মহাসাগরের আয়তন পাইচিত্রে প্রদর্শন

(Practical: Show the Area of Oceans Through Pi Diagram)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- পাইচিত্র বলতে কী বুঝায় তা বলতে পারবেন এবং
- মহাসাগরের আয়তন পাইচিত্রে প্রদর্শন করতে পারবেন।

মহাসাগরের আয়তন পাইচিত্রে প্রদর্শন

তথ্য বা উপাত্তকে সুন্দর এবং সাবলীলভাবে উপস্থাপনের জন্য বিভিন্ন পরিসংখ্যানিক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এসব পদ্ধতির মধ্যে পাইচিত্র অন্যতম একটি পদ্ধতি। পাইচিত্র হলো বৃত্তের সাহায্যে তথ্য প্রদর্শনের পদ্ধতি। সাধারণত কতিপয় তথ্যের পরস্পরের মধ্যে এবং প্রত্যেক প্রকার তথ্যের সম্পর্ক বুঝানোর জন্য পাইচিত্র ব্যবহৃত হয়। এ ধরনের চিত্র অঙ্কন করার জন্য কোনো নির্ধারিত ব্যাসার্ধ থাকে না। যে কোনো ব্যাসার্ধের বৃত্ত অঙ্কন করে তা দেখানো যায়। এক্ষেত্রে তথ্যগুলোর সমষ্টিকে শতকরা হিসেবে অথবা বৃত্তের কেন্দ্রের ৩৬০° এর সমান ধরে অঙ্কন করতে হবে।

এই পাঠে আমরা পৃথিবীর মহাসাগরগুলোর আয়তন পাইচিত্রে কীভাবে অঙ্কন করা যায় তা শিখব। আমরা জানি, অবস্থান, আয়তন এবং গভীরতা অনুসারে বারিমন্ডলের বিশাল জলরাশিসমূহই মহাসাগর হিসেবে পরিচিত। পৃথিবীতে মোট পাঁচটি মহাসাগর রয়েছে। নিম্নে আয়তনসহ মহাসাগরগুলো উল্লেখ করা হলো। মহাসাগরগুলোর আয়তনকে পাইচিত্রে প্রদর্শন করতে হবে।

ক্রমিক নং	মহাসাগরের নাম	আয়তন (কোটি বর্গকিলোমিটার)
১.	প্রশান্তমহাসাগর	১৬.৬০
২.	আটলান্টিক মহাসাগর	৮.২৪
৩.	ভারত মহাসাগর	৭.৩৬
৪.	উত্তর মহাসাগর	১.৫০
৫.	দক্ষিণ মহাসাগর	১.৪৭
মোট		৩৫.১৭

দুইটি পদ্ধতিতে পাইচিত্রে তথ্য উপস্থাপন করা যায়। নিম্নে পদ্ধতি দুইটি বর্ণনা করা হলো।

প্রথম পদ্ধতি

মহাসাগরের আয়তন পাইচিত্রে প্রদর্শনের জন্য প্রথমেই প্রত্যেকটি মহাসাগরের আয়তনের শতকরা ভাগ পৃথকভাবে নির্ণয় করতে হবে। শতকরা নির্ণয়ের পদ্ধতি নিম্নরূপ–

ধরি, ৫টি মহাসাগরের মোট আয়তন ৩৫.১৭ কোটি বর্গকিলোমিটার=১০০%

প্রশান্তমহাসাগরের আয়তন ১৬.৬০ কোটি ব.কি.মি. $= \frac{১৬.৬০ \times ১০০}{৩৫.১৭} = ৪৭.২০\%$

আটলান্টিক মহাসাগরের আয়তন ৮.২৪ কোটি ব.কি.মি. $= \frac{৮.২৪ \times ১০০}{৩৫.১৭} = ২৩.৪০\%$

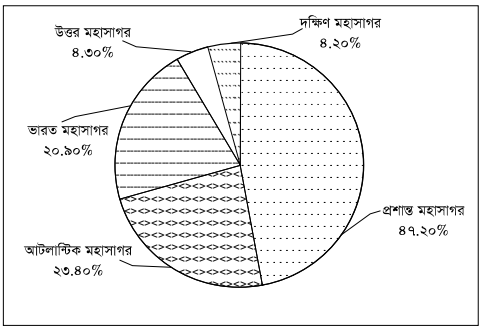
ভারত মহাসাগরের আয়তন ৭.৩৬ কোটি ব.কি.মি. $= \frac{৭.৩৬ \times ১০০}{৩৫.১৭} = ২০.৯০\%$

উত্তর মহাসাগরের আয়তন ১.৫০ কোটি ব.কি.মি. $= \frac{১.৫০ \times ১০০}{৩৫.১৭} = ৪.৩০\%$

দক্ষিণ মহাসাগরের আয়তন ১.৪৭ কোটি ব.কি.মি. $= \frac{১.৪৭ \times ১০০}{৩৫.১৭} = ৪.২০\%$

এবার মহাসাগরগুলোর শতকরা অংশ সারণিবদ্ধ করি এবং একটি পাইচিত্র তৈরি করি ।

ক্রমিক নং	মহাসাগরের নাম	শতকরা অংশ
১.	প্রশান্তমহাসাগর	৪৭.২০
২.	আটলান্টিক মহাসাগর	২৩.৪০
৩.	ভারত মহাসাগর	২০.৯০
৪.	উত্তর মহাসাগর	৪.৩০
৫.	দক্ষিণ মহাসাগর	৪.২০
মোট		১০০



চিত্র -১০.৯.১ : মহাসাগরের আয়তন পাইচিত্রে প্রদর্শন (শতকরা হিসেবে)

দ্বিতীয় পদ্ধতি

এ পদ্ধতিতে মহাসাগরগুলোর আয়তনকে ডিগ্রিতে রূপান্তর করে পাইচিত্র অঙ্কন করা হয়। এক্ষেত্রে প্রথমে মহাসাগরগুলোর আয়তনের সমষ্টি নির্ণয় করে বৃত্তের কেন্দ্রের ৩৬০° এর সমান ধরে প্রত্যেক মহাসাগরের আয়তনকে ডিগ্রিতে রূপান্তর করতে হবে।

১. প্রশান্তমহাসাগরের ক্ষেত্রে,

যেহেতু, ৩৫.১৭ কোটি ব.কি.মি. আয়তন $= ৩৬০^\circ$

$\therefore$ ১ কোটি ব.কি.মি. আয়তন $= \frac{৩৬০}{৩৫.১৭}$

$\therefore$ ১৬.৬০ কোটি ব.কি.মি. আয়তন $= \frac{৩৬০ \times ১৬.৬}{৩৫.১৭} = ১৬৯.৯২^\circ$

২. আটলান্টিক মহাসাগরের ক্ষেত্রে,

যেহেতু, ৩৫.১৭ কোটি ব.কি.মি. আয়তন $= ৩৬০^\circ$

$\therefore$ ১ কোটি ব.কি.মি. আয়তন $= \frac{৩৬০}{৩৫.১৭}$

$\therefore$ ৮.২৪ কোটি ব.কি.মি. আয়তন $= \frac{৩৬০ \times ৮.২৪}{৩৫.১৭} = ৮৪.৩৪^\circ$

৩. ভারত মহাসাগরের ক্ষেত্রে,

যেহেতু, ৩৫.১৭ কোটি ব.কি.মি. আয়তন $= ৩৬০^\circ$

$\therefore$ ১ কোটি ব.কি.মি. আয়তন $= \frac{৩৬০}{৩৫.১৭}$

$\therefore$ ৭.৩৬ কোটি ব.কি.মি. আয়তন $= \frac{৩৬০ \times ৭.৩৬}{৩৫.১৭} = ৭৫.৩৪^\circ$

৪. উত্তর মহাসাগরের ক্ষেত্রে,

যেহেতু, ৩৫.১৭ কোটি ব.কি.মি. আয়তন $= ৩৬০^{\circ}$

$\therefore$ ১ কোটি ব.কি.মি. আয়তন $= \frac{৩৬০}{৩৫.১৭}$

$\therefore$ ১.৫০ কোটি ব.কি.মি. আয়তন $= \frac{৩৬০ \times ১.৫০}{৩৫.১৭} = ১৫.৩৬^{\circ}$

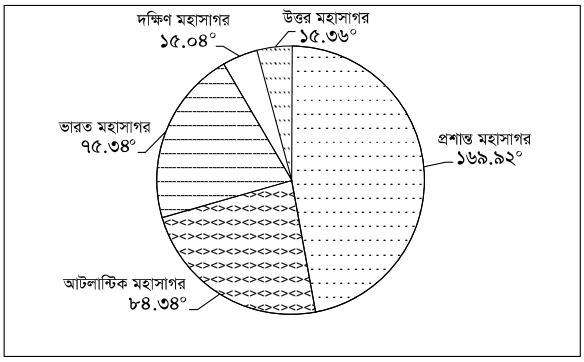
৫. দক্ষিণ মহাসাগরের ক্ষেত্রে,

যেহেতু, ৩৫.১৭ কোটি ব.কি.মি. আয়তন $= ৩৬০^{\circ}$

$\therefore$ ১ কোটি ব.কি.মি. আয়তন $= \frac{৩৬০}{৩৫.১৭}$

$\therefore$ ১.৪৭ কোটি ব.কি.মি. আয়তন $= \frac{৩৬০ \times ১.৪৭}{৩৫.১৭} = ১৫.০৪^{\circ}$

অঙ্কন পদ্ধতি : এখন সুবিধাজনক ব্যাসার্ধ নিয়ে একটি বৃত্ত অঙ্কন করে তাকে চাঁদার সাহায্যে প্রশান্তমহাসাগরের জন্য ১৬৯.৯২°, আটলান্টিক মহাসাগরের জন্য ৮৪.৩৪°, ভারত মহাসাগরের জন্য ৭৫.৩৪°, উত্তর মহাসাগরের জন্য ১৫.৩৬° এবং দক্ষিণ মহাসাগরের জন্য ১৫.০৪° ডিগ্রিতে বিভক্ত করে পাইচিত্র অঙ্কন করা সম্পন্ন হয়।



চিত্র-১০.৯.২ : মহাসাগরের আয়তন পাইচিত্রে প্রদর্শন (ডিগ্রি হিসেবে)

উপরিউক্ত প্রক্রিয়া অনুসরণ করে মহাসাগরের আয়তন পাইচিত্রে প্রদর্শন করা যায়। অর্থাৎ মহাসাগরের আয়তন শতকরা হিসেবে অথবা ডিগ্রিতে রূপান্তর করে পাইচিত্রে দেখানো যায়।

শিক্ষার্থীর কাজ	পৃথিবীর মহাসাগরগুলোর আয়তনকে পাইচিত্রে প্রদর্শন করুন।

ইউনিট
১১

সমুদ্রস্রোত
(Ocean Current)

ভূমিকা

বায়ুপ্রবাহের ন্যায় সমুদ্রের পানিও স্থির নয়। প্রতিনিয়ত একস্থান হতে অন্যস্থানে প্রবাহিত হয়। সাগর মহাসাগরের পানির এইরূপ নির্দিষ্ট ও নিয়মিত প্রবাহকে সমুদ্রস্রোত বলে। এই ইউনিটে সমুদ্রস্রোত, সমুদ্রস্রোতের কারণ, শ্রেণিবিভাগ, আটলান্টিক, প্রশান্তও ভারত মহাসাগরের স্রোতসমূহ ও সমুদ্রস্রোতের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।






ইউনিট সমাপ্তির সময়	**ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ**

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ ১১.১ : সমুদ্রস্রোত ও সমুদ্রস্রোতের কারণ
পাঠ ১১.২ : সমুদ্রস্রোতের শ্রেণিবিভাগ
পাঠ ১১.৩ : আটলান্টিক মহাসাগরীয় স্রোত
পাঠ ১১.৪ : প্রশান্তমহাসাগরীয় স্রোত
পাঠ ১১.৫ : ভারত মহাসাগরীয় স্রোত
পাঠ ১১.৬ : সমুদ্রস্রোতের প্রভাব

পাঠ-১১.১ সমুদ্রস্রোত ও সমুদ্রস্রোতের কারণ
(Ocean Currents and Causes of Ocean Currents)

উদ্দেশ্য

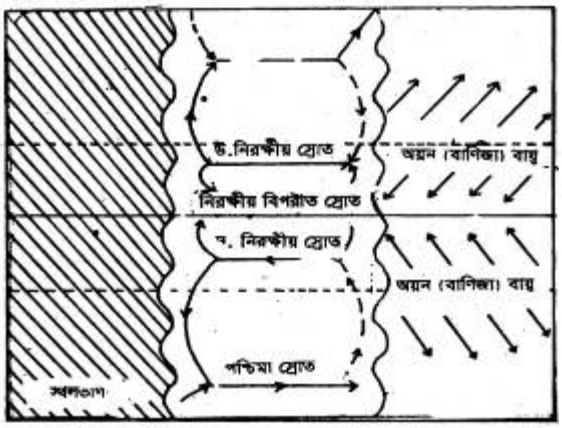
এ পাঠ শেষে আপনি-

- সমুদ্রস্রোতের সংজ্ঞা বলতে পারবেন এবং
- সমুদ্রস্রোতের কারণ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

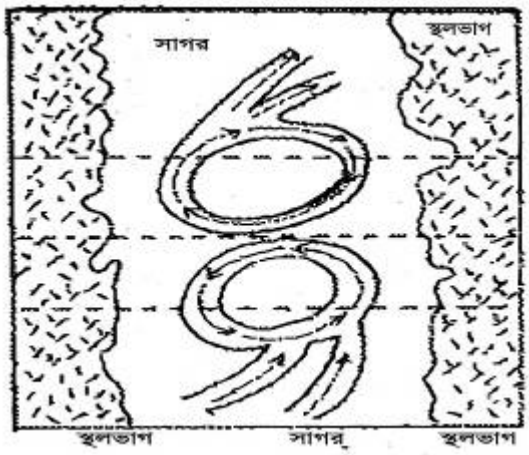
সমুদ্রস্রোত

পানির উপরিভাগের সমতা রক্ষা করা পানির স্বাভাবিক ধর্ম। পানি স্বাভাবিক নিয়মে সমুদ্রপৃষ্ঠের উপরিভাগের পানির সমতা রক্ষার জন্য একস্থান হতে অন্যস্থানে নির্দিষ্ট ও নিয়মিতভাবে প্রবাহিত হয়। পানির এইরূপ প্রবাহকে সমুদ্রস্রোত বলে। সমুদ্রস্রোতের কারণসমূহ হলো- বায়ুপ্রবাহ, পৃথিবীর আবর্তন, উষ্ণতার তারতম্য, লবণাক্ততার তারতম্য, স্থলভাগের অবস্থান, শৈলশিরার অবস্থান, অসম বাষ্পীভবন ও সমুদ্রের গভীরতা। নিম্নে সমুদ্রস্রোতের কারণসমূহ বর্ণনা করা হলো।

১. বায়ুপ্রবাহ (Wind Movement) : বায়ুপ্রবাহ সমুদ্রস্রোতের প্রধান কারণ। প্রধান বায়ুপ্রবাহের গতি অনুসরণ করে সমুদ্রের প্রধান স্রোতগুলো প্রবাহিত হয়। অয়ন বায়ু প্রবাহিত অঞ্চলে সমুদ্রস্রোত পূর্ব হতে পশ্চিম দিকে এবং প্রত্যয়ন বায়ু প্রবাহিত অঞ্চলে পশ্চিম হতে পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়। অপরদিকে মৌসুমী বায়ুপ্রবাহের গতিপথ অনুসরণ করে ভারত মহাসাগরের স্রোতসমূহ প্রবাহিত হয়। ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে মৌসুমী বায়ুপ্রবাহের দিক পরিবর্তিত হলে সমুদ্রস্রোতের গতি ও দিক পরিবর্তিত হয়। যেমন: উত্তর পূর্ব অয়ন বায়ু ও দক্ষিণ পূর্ব অয়ন বায়ুপ্রবাহের প্রভাবে নিরক্ষীয় অঞ্চলে যথাক্রমে উত্তর নিরক্ষীয় স্রোত এবং দক্ষিণ নিরীক্ষীয় স্রোতের উৎপত্তি হয়। অপরদিকে দক্ষিণ পশ্চিম প্রত্যয়ন বায়ুর প্রভাবে উত্তর আটলান্টিক ও প্রশান্তমহাসাগরে যথাক্রমে উপসাগরীয় স্রোত ও কুরোশিও স্রোত উত্তর-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয় (চিত্র: ১১.১.১)।



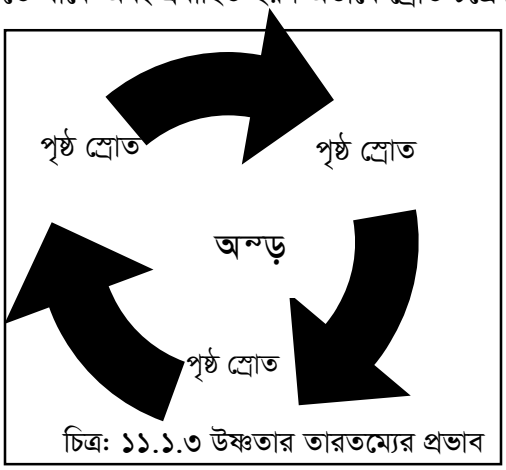
চিত্র : ১১.১.১ বায়ুপ্রবাহ



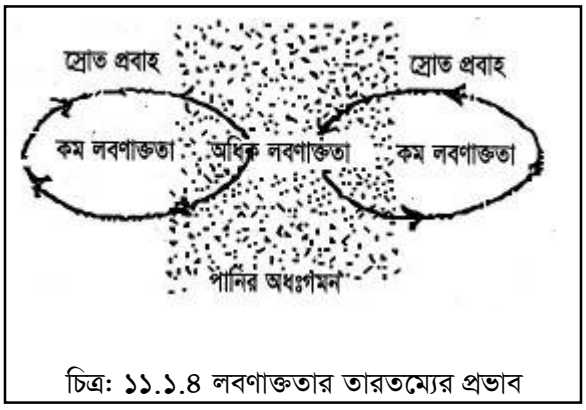
চিত্র : ১১.১.২ পৃথিবীর আবর্তন

২. পৃথিবীর আবর্তন (Rotation of the Earth) : আহ্নিক গতির কারণে পৃথিবী নিজ অক্ষের উপর পশ্চিম থেকে পূর্বদিকে ঘুরছে। পৃথিবীর এইরূপ আর্বতনের সাথে সাথে সাগর মহাসাগরের পানিরাশিও পশ্চিম হতে পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রস্রোতের সৃষ্টি হয়। আবর্তন গতির ফলে সৃষ্ট সমুদ্রস্রোত ফেরেলের সূত্র অনুযায়ী উত্তর গোলার্ধে ডান দিকে এবং দক্ষিণ গোলার্ধে বাম দিকে বেঁকে প্রবাহিত হয। যেমন: উত্তর গোলার্ধে উপসাগরীয় স্রোত ও ক্যানারি স্রোতের প্রবাহ ঘড়ির কাঁটার দিকে অর্থাৎ ডান দিক ঘুরে প্রবাহিত হয়। একইভাবে দক্ষিণ গোলার্ধে ব্রাজিল স্রোত ও পশ্চিমা বায়ুপ্রবাহজনিত স্রোত ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে ঘুরে প্রবাহিত হয় (চিত্র: ১১.১.২)।

৩. উষ্ণতার তারতম্য (Variation of Temperature) : সূর্যরশ্মি নিরক্ষীয় ও মেরু অঞ্চলে যথাক্রমে সোজা ও তীর্যকভাবে পতিত হয় ফলে তাপমাত্রার পার্থক্য হয়। একই কারণে সমুদ্র পৃষ্ঠের পানির তাপমাত্রারও পরিবর্তন ঘটে। নিরক্ষীয় অঞ্চলে সমুদ্রের পানি উত্তপ্ত হয় কারণ সূর্য লম্বভাবে কিরণ দেয়। অপরদিকে মেরু প্রদেশের সমুদ্রের পানি শীতল থাকে কারণ সূর্যরশ্মি তীর্যকভাবে পতিত হয়। ফলে নিরক্ষীয় অঞ্চলে উষ্ণ পানি সমুদ্রের তলদেশ দিয়ে অন্তঃস্রোত রূপে নিরক্ষীয় প্রদেশে আসতে থাকে এবং প্রবাহিত হয়। এভাবে স্রোত চক্রের উৎপত্তি হয় (চিত্র: ১১.১.৩)।



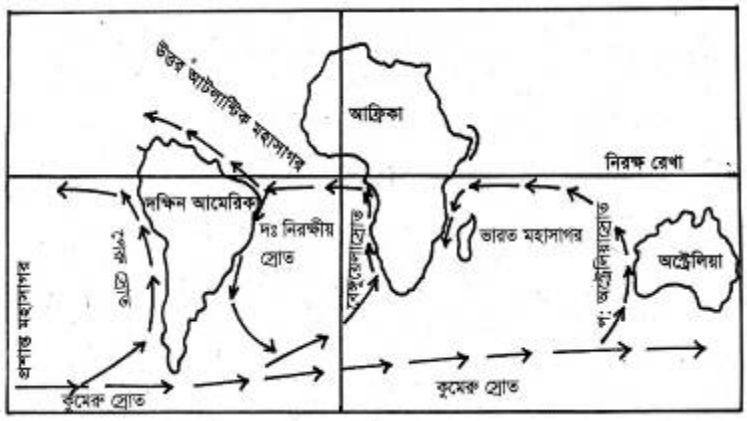
চিত্র: ১১.১.৩ উষ্ণতার তারতম্যের প্রভাব



চিত্র: ১১.১.৪ লবণাক্ততার তারতম্যের প্রভাব

৪. লবণাক্ততার তারতম্য (Variation of Salinity) : বৃষ্টিপাত, বাষ্পীভবন, নদনদী, বরফগলা পানি প্রভৃতি প্রাকৃতিক কারণে সমুদ্রের পানির লবণাক্ততার পরিমাণ সর্বত্র সমান থাকে না। সমুদ্রের পানি অধিক লবণাক্ত হলে পানির ঘনত্ব অধিক হয় ও পানি ভারী হয়। এই ভারী ও অধিক লবণাক্ত পানি স্বভাবতই সমুদ্রের নিচের দিকে প্রবাহিত হয় এবং কম ঘনত্বের হালকা পানি উপরের দিকে প্রবাহিত হয়। ফলে সমুদ্রস্রোতের উদ্ভব ঘটে (চিত্র : ১১.১.৪)।

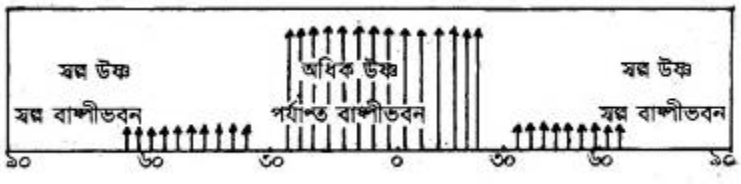
৫. স্থলভাগের অবস্থান (Presence of Land Masses) : সমুদ্রস্রোত প্রবাহিত হওয়ার সময় স্থলভাগে বাঁধাপ্রাপ্ত হলে সমুদ্রস্রোতের গতি পরিবর্তিত হয়ে নতুন স্রোতের উৎপত্তি হয়। যেমন: আটলান্টিক মহাসাগরের দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত দক্ষিণ আমেরিকার সেন্টরক অন্তরীপে বাঁধাপ্রাপ্ত হয়ে দুটি নতুন স্রোতের সৃষ্টি করে। প্রথম ও প্রধান শাখা দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর উপকূল দিয়ে ক্যারিবিয়ান সাগরে প্রবেশ করে এবং পরে মেক্সিকো উপসাগরে পৌঁছে উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোতে পরিণত হয়। দ্বিতীয় শাখাটি দক্ষিণ আমেরিকার পূর্ব উপকূল দিয়ে প্রবাহিত হয়। কুমেরু স্রোতের একটি শাখা পশ্চিমা বায়ুর প্রভাবে আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে বাঁধাপ্রাপ্ত হয়ে বেঙ্গুয়েলা স্রোতের উৎপত্তি হয়, একইভাবে স্থলভাগের অবস্থানের দরুণ দক্ষিণ প্রশান্তমহাসাগরে পেরু এবং ভারত মহাসাগরে পশ্চিম অস্ট্রেলিয় স্রোতের সৃষ্টি হয়েছে (চিত্র: ১১.১.৫)।



চিত্র: ১১.১.৫ সমুদ্র স্রোতের উপর স্থলভাগের প্রভাব

৬. শৈলশিরার অবস্থান (Presence of Ridge) : সমুদ্র তলদেশের শৈলশিরা সমুদ্রস্রোতকে প্রভাবিত করে। শৈলশিরার কারণে শীতল অঞ্চল হতে শীতল পানি উষ্ণ অঞ্চলে পৌঁছাতে বাঁধাপ্রাপ্ত হয়। যেমন: আফ্রিকার উত্তরাঞ্চল ও জিব্রাল্টারের মধ্যভাগে শৈলশিরা থাকায় আটলান্টিক মহাসাগর হতে শীতল স্রোত ভূ-মধ্যসাগরে পৌঁছাতে বাঁধাপ্রাপ্ত হয়। একইভাবে উত্তর স্কটল্যান্ডের উত্তরাঞ্চল ও গ্রীনল্যান্ডের সংযোগকারী ওয়েভিল টমসন নামক শৈলশিরা উত্তর মহাসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগরে অন্তঃস্রোত প্রবাহে বাঁধার সৃষ্টি করে।

৭. বাষ্পীভবনের তারতম্য (Variation of Evaporatoin) : সূর্যের তাপ অধিক হওয়ায় উষ্ণমন্ডলে সমুদ্রের পানি অধিক বাষ্পীভূত হয়। অপরদিকে শীতল অঞ্চলে কম বাষ্পীভূত হয়। তখন পানির সমতা রক্ষার জন্য এক অংশের পানি অন্য অংশে প্রবাহিত হয় ফলে সমুদ্রস্রোতের সৃষ্টি হয় (১১.৫.৬)।



চিত্র: ১১.৫.৬ বাষ্পীভবনের তারতম্য

৮. সমুদ্রের গভীরতা (Depth of the Ocean) : সমুদ্রের গভীরতা যদি কম হয় তাহলে পানি দ্রুত উত্তপ্ত হয়ে উপরে উঠে এবং শীতল পানি নিচে নেমে যায়। এতে উর্দ্ধগামী ও নিম্নগামী সমুদ্রস্রোতের সৃষ্টি হয় এবং গভীর সমুদ্রে ভিন্ন ধরনের প্রবাহ তৈরি হয়। সূর্যরশ্মি সমুদ্রের গভীরে ২১০ মিটারের অধিক গভীরতায় প্রবেশ করতে পারে না ফলে উক্ত গভীরতার পর সমুদ্রের পানির তাপমাত্রা ক্রমশ কমতে থাকে। ফলে গভীর সমুদ্রের উপরিভাগ দিয়ে পৃষ্ঠস্রোত এবং তলদেশ দিয়ে অন্তঃস্রোত রূপে পানি প্রবাহিত হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	সমুদ্রস্রোতের আর কী কী কারণ হতে পারে এ সম্পর্কে শিক্ষার্থীরা তাদের মতামত প্রদান করবেন।

সারসংক্ষেপ

সমুদ্রের পানিও বায়ুর ন্যায় স্থির নয়। বায়ু যেমন একস্থান হতে অন্যস্থানে প্রবাহিত হয় তেমনি সমুদ্রের পানিও প্রতিনিয়ত একস্থান হতে অন্যস্থানে প্রবাহিত হয়। সমুদ্রের পানির এইরূপ নির্দিষ্ট ও নিয়মিত প্রবাহকে সমুদ্রস্রোত বলে। বায়ুপ্রবাহ, উষ্ণতা, পৃথিবীর আবর্তন, লবণাক্ততার তারতম্য, স্থলভাগের অবস্থান ও সমুদ্রের গভীরতা প্রভৃতি কারণে সমুদ্রস্রোতের সৃষ্টি হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১১.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

একাদশ শ্রেণির অধ্যাপক আবিদুর রহমান ক্লাসে বারিমন্ডল সম্পর্কে বর্ণনা দেন। তিনি বলেন, বারিমন্ডলের একটি বিশাল অংশ সাগর ও মহাসাগর। বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণে এ বিশাল পানিরাশি সর্বদা একস্থান হতে অন্যস্থানে চলাচল করে। অর্থাৎ সাগর ও মহাসাগরের পানি স্থির নয়।

১। কোনটি সমুদ্রস্রোতের কারণ?
ক) সূর্যরশ্মি খ) চন্দ্রকিরণ গ) মহীসোপান ও মহীঢালের অবস্থান ঘ) বায়ু প্রবাহ

২। ব্রাজিল স্রোত প্রবাহিত হয়
ক) ঘড়ির কাঁটার দিকে খ) ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে গ) চক্রাকারে ঘ) ঘূর্ণন আকারে

৩। সমুদ্রের পানির লবণাক্ততা অধিক হলে সমুদ্রের পানির ঘনত্ব
ক) কমে খ) বাড়ে গ) সমান থাকে ঘ) অপরিবর্তিত থাকে

৪। সমুদ্রের গভীরতার কারণে সমুদ্রস্রোত প্রবাহিত হয়
ক) উপরে নিচে খ) চক্রাকারে গ) পশ্চাতে ঘ) সামনের দিকে

পাঠ-১১.২ সমুদ্রস্রোতের শ্রেণিবিভাগ
(Classificatoin of Ocean Currents)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সমুদ্রস্রোতের শ্রেণিবিভাগ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

সমুদ্রস্রোতের শ্রেণিবিভাগ

সমুদ্রের স্রোতের অধিকাংশই বায়ু প্রবাহজনিত এবং পানির ঘনত্বের পার্থক্যজনিত স্রোত। সমুদ্রের স্রোত নিম্নোক্ত নিয়ামকগুলো দ্বারা প্রভাবিত। যথা :

১। সমুদ্রের পানির ঘনত্বের নতিমাত্রা। যা তাপমাত্রা ও লবণাক্ততার পরিবর্তন দ্বারা প্রভাবিত।

২। বায়ুর চাপ, পানি পৃষ্ঠে বাতাসের ঘর্ষণ প্রভৃতির প্রভাব ।

৩। পৃথিবীর ঘূর্ণনের ফলে সৃষ্ট কোরিওলিসের প্রভাব। বায়ুপ্রবাহ সাধারণত ফেরেলের সূত্র অনুসারে উত্তর গোলার্ধে ডান দিকে ও দক্ষিণ গোলার্ধে বাম দিকে বেঁকে প্রবাহিত হয়। প্রবাহের এই ধরণ পরিবর্তনকে কোরিওলিস শক্তি (Coriolis Force) বলে।

সমুদ্রসোতকে বিভিন্নভাবে শ্রেণিবিভাগ করা হলেও এর প্রধান দুটি শ্রেণিবিভাগ হলো-

১। তাপ ও লবণাক্ততার পার্থক্যজনিতস্রোত বা ঘনত্বের পার্থক্যজনিত স্রোত

২। বায়ু প্রবাহের ফলে সৃষ্টস্রোত বা সমুদ্র পৃষ্ঠের স্রোত।

ঘনত্বজনিত স্রোত মূলত সমুদ্রের পানির ঘনত্বের পার্থক্যের ফলেই হয়ে থাকে এবং পৃষ্ঠদেশের স্রোতের তুলনায় এটি গভীর সমুদ্রের ও অত্যন্তধীরগতির স্রোত। বায়ু প্রবাহে সৃষ্ট স্রোত সাধারণত আনুভূমিকভাবে প্রবাহিত হয়, অন্যদিকে ঘনত্বজনিত স্রোত উলম্বভাবে বা অন্ত:প্রবাহ রূপে প্রবাহিত হয়।

স্রোতের বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে সমুদ্রস্রোতকে নিম্নোক্তভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১। সময়ভিত্তিক স্রোত:
ক) স্থায়ী স্রোত (Permanent Current) এবং খ) ঋতুভিত্তিক বা মৌসুমী স্রোত (Seasonal Current)

২। সমুদ্রের পানির স্তরের উপর ভিত্তি করে সমুদ্রেরস্রোতকে নিম্নোক্তভাবে ভাগ করা যায়। যথা-
ক) সমুদ্রপৃষ্ঠের স্রোত (Surface Current)
খ) সমুদ্রপৃষ্ঠের নিচের স্রোত (Sub Surface Current)
গ) মাধ্যমিক স্তরের স্রোত (Intermediate Layer Current)
ঘ) গভীর সমুদ্রের স্রোত (Deep Water Current)
ঙ) সমুদ্রের তলদেশের স্রোত (Bottom Water Current)

৩। তাপমাত্রার উপর ভিত্তি করে সমুদ্রস্রোতকে নিম্নোক্তভাগে ভাগ করা যায়। যথা-
ক) উষ্ণ স্রোত (Warm Current) এবং খ) শীতল স্রোত (Cold Current)

৪। এছাড়া সমুদ্রের অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্রোতসমূহ হলো:
ক) প্রান্তীয় স্রোত (Boundary Current) এবং খ) বিপ্রতীপ স্রোত (Counter Current)

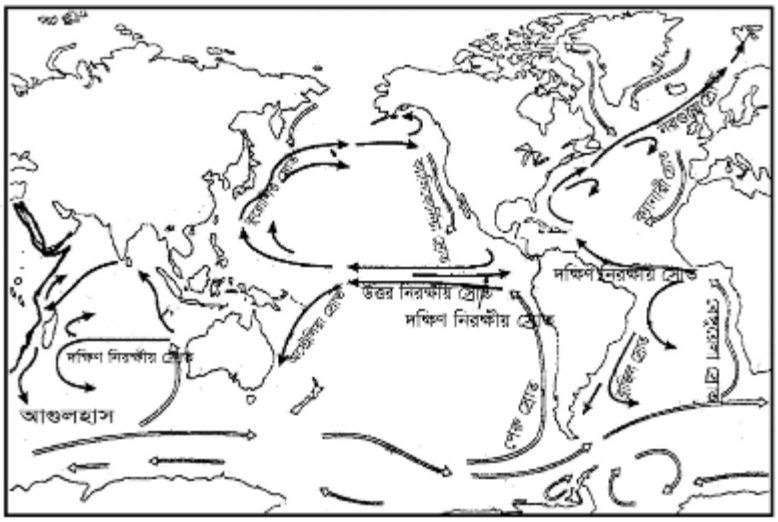
৫। ভৌগোলিক অবস্থানের উপর ভিত্তি করে নিম্নলিখিতভাগে ভাগ করা যায়। যথা-
ক) নিরক্ষীয় স্রোত (Equatiorial Current), খ) উপকূলীয় স্রোত (Coastal Current) এবং
গ) মেরু স্রোত (Polar Current)

৬। সমুদ্রস্রোতের বহমানতার উপর নির্ভর করে সমুদ্রস্রোতকে প্রধান তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-
১। প্রশান্তমহাসাগরীয় স্রোতসমূহ, ২। আটলান্টিক মহাসাগরীয় স্রোতসমূহ এবং
৩। ভারত মহাসগারীয় স্রোতসমূহ (চিত্র ১১.২.১)।

১. প্রশান্তমহাসাগরীয় স্রোত : প্রশান্তমহাসাগীয় স্রোত আটলান্টিক মহাসাগরীয় স্রোতের অনুরূপ। উপকূলরেখার অবস্থানের বিভিন্নতার দরুণ আটলান্টিক ও প্রশান্তমহাসাগরের স্রোতসমূহের মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়। প্রশান্তমহাসাগরের মধ্য দিয়ে পূর্ব-পশ্চিমে নিরক্ষরেখা অবস্থান করায় প্রশান্তমহাসাগীয় স্রোতসমূহকে আঞ্চলিকভাবে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা- ১.১। দক্ষিণ প্রশান্তমহাসাগরীয় স্রোত, ১.২। উত্তর প্রশান্তমহাসাগরীয় স্রোত এবং ১.৩। নিরক্ষীয় বিপরীত স্রোত।

২. ভারত মহাসাগরীয় স্রোত: আটলান্টিক ও প্রশান্তমহাসাগরের ন্যায় ভারত মহাসাগরের স্রোতসমূহ একইরূপ নয়। ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে সমুদ্র স্রোতেরও পরিবর্তন হয় তাই ভারত মহাসাগরীয় স্রোতসমূহকে নিম্নোক্ত তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা-

২.১। দক্ষিণ ভারত মহাসাগরীয় স্রোত, ২.২। উত্তর ভারত মহাসাগরীয় স্রোত, ২.৩। ভারত মহাসাগরীয় বিপরীত স্রোত বা নিরক্ষীয় বিপরীত স্রোত



চিত্র: ১১.২.১ পৃথিবীর প্রধান সমুদ্র স্রোতসমূহ

৩. আটলান্টিক মহাসাগরীয় স্রোত: আটলান্টিক মহাসাগরের মধ্যস্থান দিয়ে পূর্ব-পশ্চিমে বিষুবরেখা অবস্থান করায় এই স্রোতকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা-

৩.১। উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরীয় স্রোত, ৩.২। দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরীয় স্রোত এবং ৩.৩। নিরক্ষীয় বিপরীত স্রোত।

শিক্ষার্থীর কাজ	মহাসাগরসমূহের বিভিন্ন স্রোতসমূহের একটি তালিকা প্রস্তুত করুন।

সারসংক্ষেপ

সমুদ্রের পানির ঘনত্বের নতিমাত্রা ও বায়ুপ্রবাহ সমুদ্র স্রোত সৃষ্টির মূল নিয়ামক। তাই বায়ুপ্রবাহ ও পানির ঘনত্বের উপর নির্ভর করে সমুদ্রস্রোতকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা- পৃষ্ঠস্রোত, অন্ত:স্রোত, উষ্ণস্রোত, শীতল স্রোত, স্থায়ী স্রোত, ঋতুভিত্তিক স্রোত প্রভৃতি। অপরদিকে প্রধান তিনটি মহাসাগরকে কেন্দ্র করে সমুদ্রস্রোতকে প্রধান তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা- প্রশান্তমহাসাগরীয় স্রোত, আটলান্টিক মহাসাগরীয় স্রোত ও ভারত মহাসাগরীয় স্রোত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন -১১.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। বায়ুপ্রবাহ দ্বারা সৃষ্ট স্রোতকে কী বলে?
ক) সমুদ্রপৃষ্ঠের স্রোত খ) গভীর সমুদ্রপৃষ্ঠের স্রোত গ) মাধ্যমিক স্তরের স্রোত ঘ) শীতল স্রোত

২। সমুদ্রস্রোতের নিয়ামকসমূহ হলো
i. সমুদ্রের পানির ঘনত্বের নতিমাত্রা ii. বায়ুপ্রবাহ, বায়ুচাপ iii. পানির সমতলের পার্থক্য
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩। প্রশান্তমহাসাগরের মধ্য দিয়ে পূর্ব-পশ্চিমে কোন রেখাটি অবস্থান করে?
ক) নিরক্ষরেখা খ) বিষুব রেখা গ) দ্রাঘিমা রেখা ঘ) মেরুরেখা

৪। ঋতু পরিবর্তনের সাথে সাথে ভারত মহাসগরীয় স্রোত

ক) পরিবর্তিত হয় খ) একইরূপ থাকে গ) উপর নিচে প্রবাহিত হয় ঘ) শীতল থাকে

পাঠ-১১.৩ আটলান্টিক মহাসাগরীয় স্রোত (Current of the Atlantic Ocean)

উদ্দেশ্য

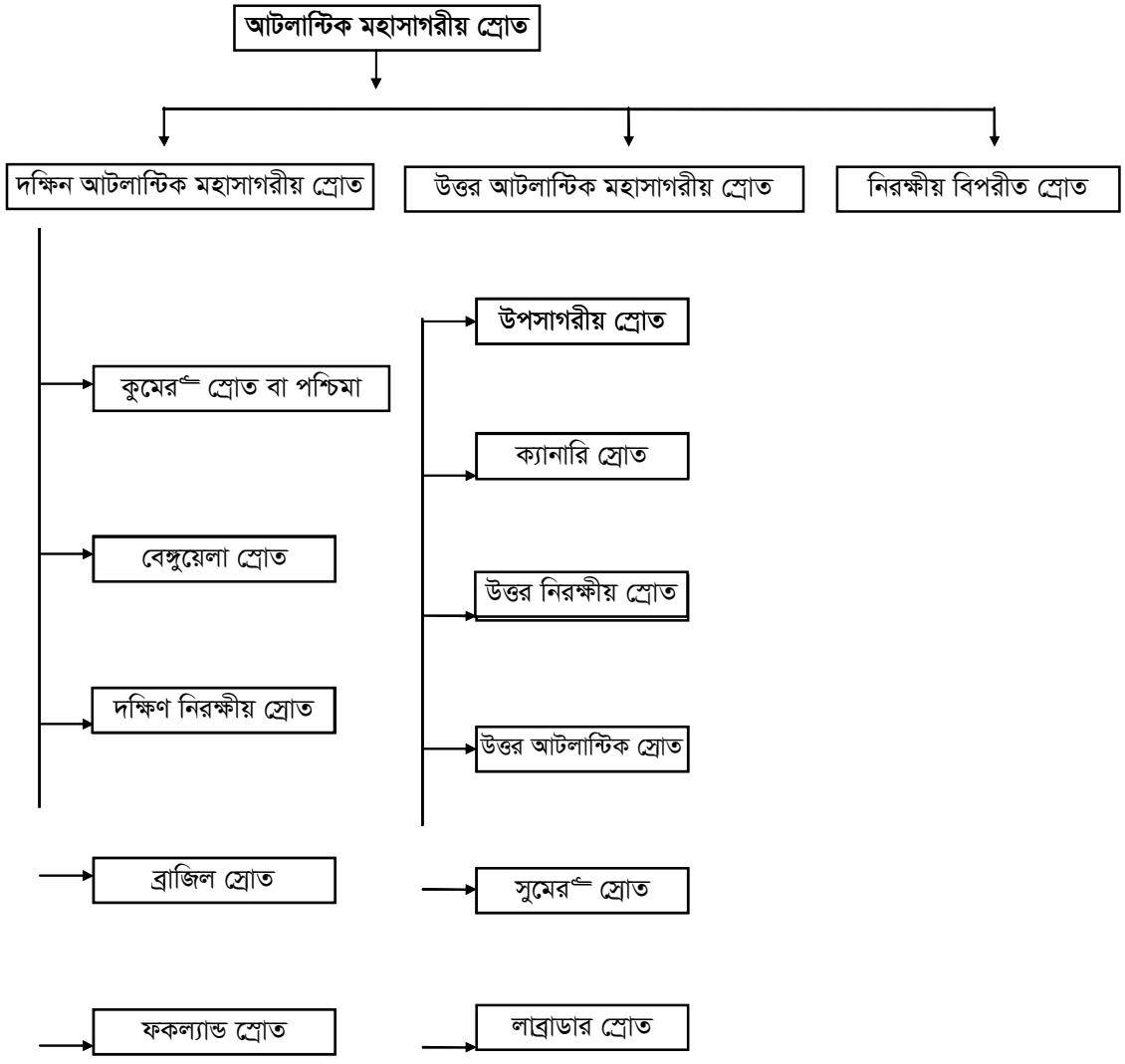
এ পাঠ শেষে আপনি-

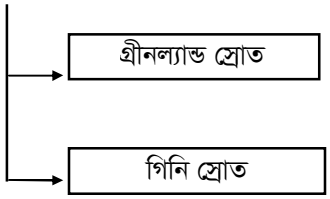
- আটলান্টিক মহাসাগরীয় স্রোতের শ্রেণিবিভাগ করতে পারবেন এবং
- আটলান্টিক মহাসাগরীয় স্রোতসমূহ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

আটলান্টিক মহাসাগরীয় স্রোত

আটলান্টিক মহাসাগরের মধ্যস্থান দিয়ে পূর্ব-পশ্চিমে বিষুবরেখা অতিক্রম করায় আটলান্টিক মহাসাগরীয় স্রোতকে প্রধান তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা-

ক) উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরীয় স্রোত, খ) দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরীয় স্রোত এবং গ) নিরক্ষীয় বিপরীত স্রোত (চিত্র : ১১.৩.১)। নিম্নে আটলান্টিক মহাসাগরের প্রধান স্রোতসমূহের শ্রেণিবিভাগ ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো-



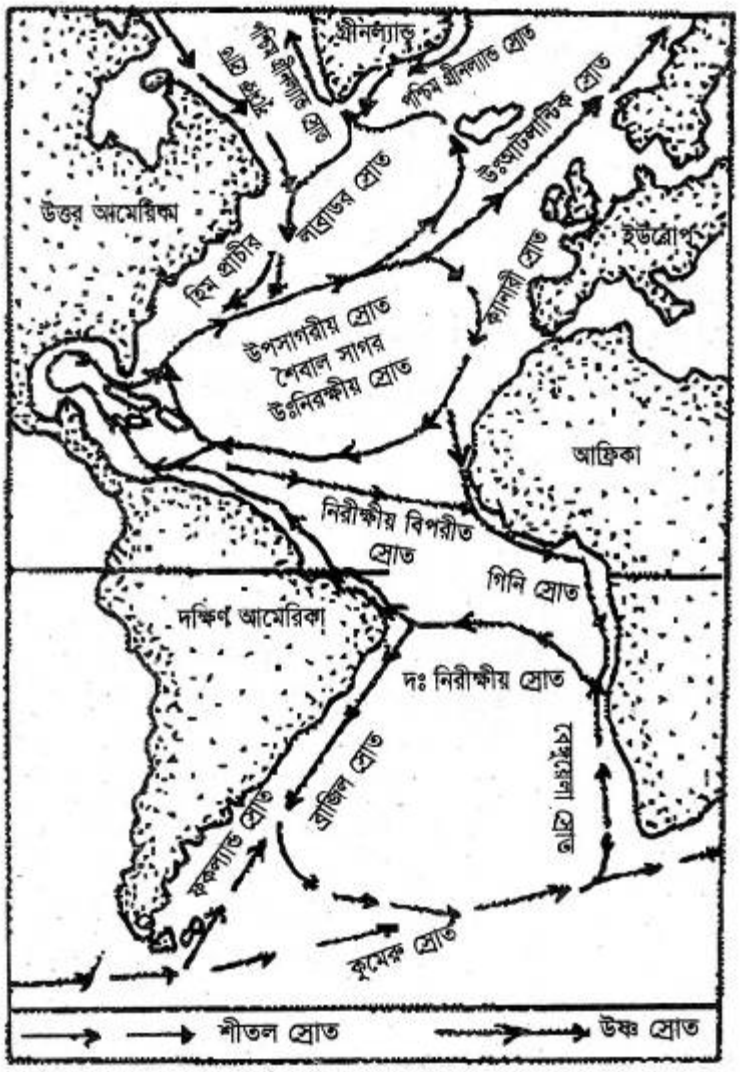

গ্রীনল্যান্ড স্রোত
গিনি স্রোত

ক) উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরীয় স্রোত

নিরক্ষরেখার উত্তর দিকে আটলান্টিক মহাসাগরে প্রবাহিত স্রোতগুলো উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরীয় স্রোত নামে পরিচিত। গ্রীনল্যান্ডের উভয় পার্শ্ব দিয়ে উত্তর আটলান্টিক মহাসাগর ও সুমেরু মহাসাগর সংযুক্ত। একারণে সুমেরু মহাসাগরের শীতল স্রোতসমূহ আটলান্টিক মহাসাগরে প্রবেশ করে। উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরের স্রোতসমূহ নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

১. উপসাগরীয় স্রোত : দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতের উত্তরাংশের শাখাটি নিরক্ষরেখা অতিক্রম করে দক্ষিণ ও উত্তর উপকূল দিয়ে অগ্রসর হয়ে ক্যারিবিয়ান সাগরে প্রবেশে করেছে। দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতের উত্তরাংশে এই শাখাটি পূর্বদিক হতে আগত উত্তর নিরক্ষীয় স্রোতের উষ্ণ শাখার সাথে মিলিত হয়। পরবর্তীতে এই স্রোত উত্তর-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে উত্তর আটলান্টিকের মধ্যভাগে এসে তিনটি শাখায় বিভক্ত হয়।

২. ক্যানারি স্রোত : উত্তর আটলান্টিকের মধ্যভাগে উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোত যে তিনটি শাখায় বিভক্ত হয়, তার সর্বাপেক্ষা দক্ষিণ দিকের শাখাটি প্রথমে পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়ে পর্তুগালের উপকূলে পৌঁছে এবং সেখানে বাঁধাপ্রাপ্ত হয়ে দক্ষিণ দিকে বেঁকে ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জের পার্শ্ব দিয়ে প্রবাহিত হয়। ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জের পার্শ্ব দিয়ে প্রবাহিত হয় বলে একে ক্যানারি স্রোত বলে। উচ্চ অক্ষাংশের শীতল অঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত হয় বলে একে শীতল স্রোত বলে। এই স্রোত পশ্চিম দিকে বেঁকে উত্তর নিরক্ষীয় স্রোতের সাথে মিলিত হয়।



চিত্র: ১১.৩.১ আটলান্টিক মহাসাগীয় স্রোতসমূহ

৩. উত্তর নিরক্ষীয় স্রোত : ক্যানারি স্রোত দক্ষিণাভিমুখী হয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় উত্তর পূর্ব অয়ন বায়ুর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়। পরবর্তীতে কর্কটক্রান্তিরেখা দক্ষিণ দিক দিয়ে পশ্চিম দিকে উত্তর নিরক্ষীয় স্রোত নামে প্রবাহিত হয়। উত্তর নিরক্ষীয় স্রোত একটি উষ্ণ স্রোত। উত্তর নিরক্ষীয় এই স্রোতটি পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে বাঁধাপ্রাপ্ত হয়ে দুইটি শাখায় বিভক্ত হয়। তন্মধ্যে একটি শাখা ক্যারিবিয়ান সাগরের মধ্য দিয়ে মেক্সিকো উপসাগরে প্রবেশ করে এবং অপর শাখাটি উপসাগরীয় স্রোতের সাথে মিলিত হয়। অর্থাৎ উত্তর নিরক্ষীয় স্রোতের উভয় শাখাই উপসাগরীয় স্রোতের মিলিত রূপ।

উপসাগরীয় স্রোত, ক্যানারি স্রোত ও উত্তর নিরক্ষীয় এই তিনটি স্রোত মূলত একই স্রোত এবং এই তিনটি স্রোত উপসাগরীয়, ক্যানারি ও উত্তর নিরক্ষীয় স্রোত নামে উত্তর আটলান্টিক মহাসাগরে চক্রাকারে আবর্তিত হয়ে প্রবাহিত হয়। এই স্রোতসমূহের অভ্যন্তরে অর্থাৎ জলাবর্তের অভ্যন্তরে কোে না স্রোত প্রবাহিত হয় না। অভ্যন্তরের এই স্রোতহীন জলে ভাসমান আগাছা শৈবাল জন্মে। তাই একে শৈবাল সাগর বলা হয়।

৪. উত্তর আটলান্টিক স্রোত: উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোতের যে শাখাটি দিক পরিবর্তন না করে সরাসরি উত্তর-পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়ে উত্তর মহাসাগরে মিলিত হয় তাকে উত্তর আটলান্টিক স্রোত বলে। এই স্রোতটি উষ্ণ স্রোতরূপে বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ ও উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের পশ্চিম দিক দিয়ে প্রবাহিত হয়।

৫. সুমেরু স্রোত : সুমেরু মহাসাগর হতে দুটি শীতল স্রোত গ্রীনল্যান্ডের উভয় পার্শ্ব দিয়ে আটলান্টিক মহাসাগরে প্রবেশ করে। এই স্রোতটি অন্তঃস্রোতরূপে উত্তর আটলান্টিক স্রোতের নিচ দিয়ে পূর্তগালের নিকট ক্যানারি স্রোতের সাথে মিলিত হয়ে শীতল স্রোতে পরিণত করে। অপর শাখাটি গ্রীনল্যান্ডের পূর্ব উপকূল দিয়ে প্রবাহিত হয় যা পূর্ব গ্রীনল্যান্ড স্রোত নামে পরিচিত।

৬. লাব্রাডার স্রোত : সুমেরু মহাসাগর হতে অপর একটি স্রোত ডেভিস প্রণালির মধ্য দিয়ে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়ে উত্তর আমেরিকায় লাব্রাডার উপদ্বীপের উত্তর পাশে গ্রীনল্যান্ড স্রোতের সাথে মিলিত হয়। এই মিলিত স্রোত লাব্রাডার স্রোত নামে পরিচিত। লাব্রাডার স্রোত নিউফাউন্ডল্যান্ডের নিকট দুটি শাখায় বিভক্ত হয়। উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোতের নীল পানি উত্তর-পূর্ব দিকে এবং এই স্রোতের পাশ দিয়ে শীতল লাব্রাডার স্রোতের সবুজ পানি দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়। এই উভয় স্রোতের মধ্যবর্তী সীমা রেখাকে হিমপ্রাচীর বলে। উষ্ণ ও শীতল স্রোত পাশাপাশি প্রবাহিত হওয়ার কারণে সেখানে প্রায়ই কুয়াশা এবং ঘূর্ণিবাতের সৃষ্টি হয়।

৭. গ্রীনল্যান্ড স্রোত : সুমেরু স্রোতের যে শাখাটি গ্রীনল্যান্ডের পূর্ব উপকূল দিয়ে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয় তাকে গ্রীনল্যান্ড স্রোত বলে।

৮. গিনি স্রোত : নিরক্ষীয় বিপরীত স্রোত আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে ক্যানারি স্রোতের ক্ষুদ্র শাখায় সাথে মিলিত হয়ে গিনি উপসাগরে প্রবেশ করে। একে গিনি স্রোত বলে। এটি একটি উষ্ণ স্রোত।

খ) দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরীয় স্রোত

বিষুবরেখা হতে দক্ষিণ দিকে দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরের অধিকাংশ স্রোত প্রবাহিত হয়। দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরীয় স্রোতগুলো নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

১. কুমেরু স্রোত বা পশ্চিমা স্রোত : কুমেরু মহাসাগরে পশ্চিমা বায়ুর প্রভাবে যে শীতল স্রোতের উৎপত্তি হয় তাকে কুমেরু স্রোত বলে। আবার পশ্চিমা বায়ুর প্রভাবে সৃষ্ট হয় বলে একে পশ্চিমা স্রোতও বলে। পশ্চিমা বায়ু দ্বারা প্রবাহিত হয়ে পশ্চিমা স্রোত উত্তর-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে সমগ্র দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগর অতিক্রম করে দক্ষিণ আফ্রিকার উপকূলে পৌঁছে এবং দক্ষিণ আফ্রিকার স্থলভাগে বাঁধাপ্রাপ্ত হয়ে দুইটি ভাগে বিভক্ত হয়। একটি স্রোত পশ্চিম উপকূল দিয়ে উত্তর দিকে অগ্রসর হয় এবং মূল শীতল স্রোতটি আফ্রিকার দক্ষিণ দিক দিয়ে ভারত মহাসাগরে প্রবেশ করে।

২. বেঙ্গুয়েলা স্রোত : কুমেরু স্রোত দক্ষিণ আফ্রিকার স্থলভাগে বাঁধাপ্রাপ্ত হয়ে উত্তর দিকে প্রবাহিত হয়। একে বেঙ্গুয়েলা স্রোত বলে। এটি একটি শীতল স্রোত। উত্তরে উষ্ণমন্ডলের দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় এই স্রোতটি ক্রমশ উষ্ণ হতে থাকে। পরবর্তীতে এই স্রোত উত্তর-পশ্চিম দিকে বেঁকে নিরক্ষরেখার দক্ষিণ দিক দিয়ে সোজা পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়।

৩. দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত : বেঙ্গুয়েলা স্রোতটি নিরক্ষরেখার দক্ষিণ দিক দিয়ে সোজা পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়। একে দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত বলে। এটি একটি উষ্ণ স্রোত। এই স্রোতটি দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিলের পূর্ব দিকে সেন্টরক অন্তরীপে বাঁধাপ্রাপ্ত হয়ে দুইটি শাখায় বিভক্ত হয়। তন্মধ্যে একটি শাখা নিরক্ষরেখা অতিক্রম করে দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর উপকূল দিয়ে অগ্রসর হয়ে ক্যারিবিয়ান সাগরে প্রবেশ করে। যা উপসাগরীয় স্রোত নামে পরিচিত। অন্য শাখাটি ব্রাজিলের পূর্ব উপকূল দিয়ে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়।

৪. ফকল্যান্ড স্রোত : কুমেরু স্রোতের যে শাখাটি ফকল্যান্ড দ্বীপের নিকট দিয়ে দক্ষিণ আমেরিকার পূর্ব উপকূল এবং ব্রাজিল স্রোতের যে ক্ষুদ্র শাখাটি ফকল্যান্ড দ্বীপের নিকট দিয়ে দক্ষিণ আমেরিকার পূর্ব উপকূল এবং ব্রাজিল স্রোতের মধ্য দিয়ে উত্তর দিকে কিছু দূর অগ্রসর হয়ে অধিক শক্তিশালী ব্রাজিল স্রোতের মধ্যে বিলীন হয়ে যায়, তাকে ফকল্যান্ড স্রোত বলে। এটি একটি শীতল স্রোত।

গ. নিরক্ষীয় বিপরীত স্রোত : নিরক্ষরেখার উত্তর পার্শ্ব দিয়ে এবং উত্তর ও দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতের মধ্যদিয়ে যে ক্ষীণ স্রোতটি এদের বিপরীত দিকে অর্থাৎ পশ্চিম হতে পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয় তাকে নিরক্ষীয় বিপরীত স্রোত বলে। এটি একটি উষ্ণ স্রোত।

শিক্ষার্থীর কাজ	মানচিত্র অঙ্কন করে শীতল স্রোত এবং উষ্ণ স্রোত সমূহ চিহ্নিত করুন।

সারসংক্ষেপ

আটলান্টিক মহাসাগরের মধ্যভাগ দিয়ে বিষুবরেখা অতিক্রম করায় আটলান্টিক মহাসাগরের উত্তর ও দক্ষিণ দিকের স্রোতসমূহকে পৃথকভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এই মহাসাগরে উষ্ণ ও শীতল উভয় প্রকার স্রোত বিদ্যমান।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন -১১.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কোনটি দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরীয় স্রোত ?
- ক) বেঙ্গুয়েলা স্রোত
- খ) সুমেরু স্রোত
- গ) নিরক্ষীয় বিপরীত স্রোত
- ঘ) সুমেরু স্রোত

২। উত্তর নিরক্ষীয় স্রোত এলাকাকে কী বলে?
- ক) শৈবাল সাগর
- খ) ফকল্যান্ড স্রোত
- গ) পশ্চিম উপকূল স্রোত
- ঘ) ব্রাজিল স্রোত

৩। দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতটি কোথায় বাঁধা পড়ে?
- ক) আল্পস পর্বতমালায়
- খ) হিমালয় পবর্তমালা
- গ) সেন্টরক অন্তরীপে
- ঘ) কোনটিই নয়

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।
শিক্ষক ক্লাসে বললেন, উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোতের নীল পানি উত্তর পূর্বদিকে এবং তার পাশ দিয়ে শীতল ল্যাব্রাডর স্রোতের সবুজ পানি দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়। অর্থাৎ উষ্ণ ও শীতল স্রোত পাশাপাশি প্রবাহিত হয়।

৪। এই উভয় স্রোতের মধ্যবর্তী সীমারেখাকে কী বলে?
- ক) হিমশৈল
- খ) স্রোত প্রাচীর
- গ) হিমপ্রাচীর
- গ) শৈবাল প্রাচীর

৫। উষ্ণ ও শীতল উভয় স্রোত পাশাপাশি প্রবাহিত হওয়ার ফলে সেখানে-
- ক) প্রচুর সামুদ্রিক উদ্ভিদ জন্মে
- খ) কুয়াশা এবং ঘূর্ণিবাতের সৃষ্টি হয়
- গ) স্রোতের বেগ অধিক হয়
- ঘ) অন্তঃস্রোতের সৃষ্টি হয়

পাঠ-১১.৪ প্রশান্তমহাসাগরীয় স্রোত
(Current of the Pacific Ocean)

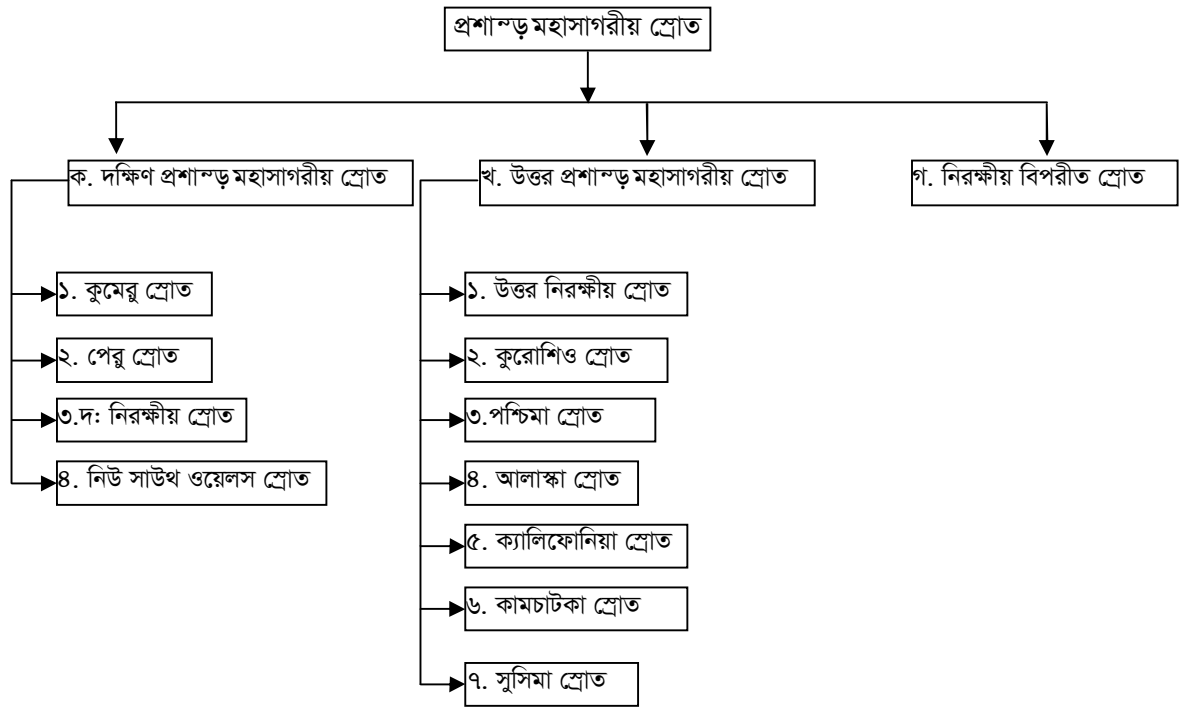
উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- প্রশান্তমহাসাগরীয় স্রোতসমূহ বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

প্রশান্তমহাসাগরীয় স্রোত

প্রশান্তমহাসাগরীয় স্রোতসমূহ আটলান্টিক মহাসাগরের স্রোতের অনুরূপ। প্রশান্তমহাসাগরের মধ্য দিয়ে পূর্ব-পশ্চিমে নিরক্ষরেখা অবস্থান করায় প্রশান্তমহাসাগরীয় স্রোতসমূহকে প্রধান তিনটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা-
ক) দক্ষিণ প্রশান্তমহাসাগরীয় স্রোত, খ) উত্তর প্রশান্তমহাসাগরীয় স্রোত এবং গ) নিরক্ষীয় বিপরীত স্রোত (চিত্র ১১.৪.১) নিম্নে প্রশান্তমহাসাগরীয় স্রোতসমূহের শ্রেণিবিভাগ ছকের মাধ্যমে দেখানো হলো। যথা-

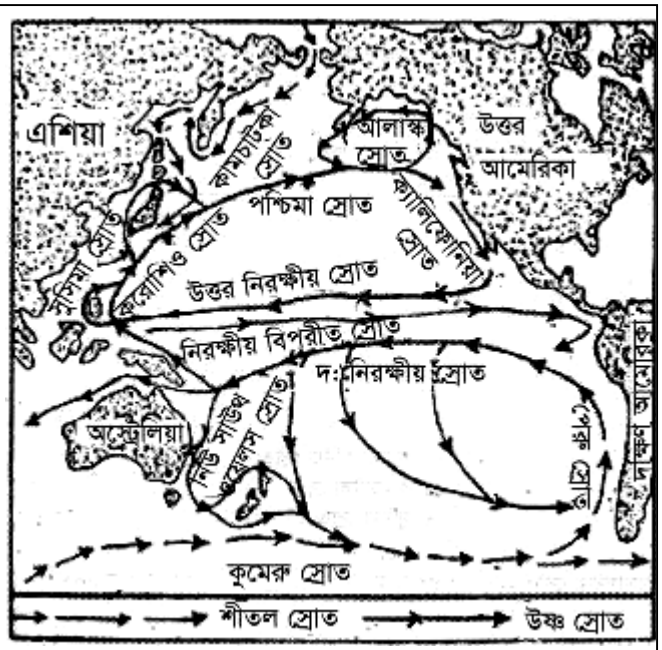


ক. দক্ষিণ প্রশান্তমহাসাগরীয় স্রোত

১। কুমেরু স্রোত (Antarctic Current): পশ্চিমা বায়ুর প্রভাবে কুমেরু মহাসাগরে যে শীতল স্রোতের সৃষ্টি হয় তা পশ্চিম হতে পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়। একে কুমেরু স্রোত বা পশ্চিমা স্রোত বলে। এই স্রোত দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণে হর্ন অন্তরীপে বাঁধাপ্রাপ্ত হয়ে দুটি শাখায় বিভক্ত হয়। প্রধান বা মূল শাখাটি দিক পরিবর্তন না করে দক্ষিণ আমেরিকার দক্ষিণ দিক দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সরাসরি আটলান্টিক মহাসাগরে প্রবেশ করে। অপর শাখাটি দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূল দিয়ে উত্তর দিকে অগ্রসর হয়।

২। পেরু স্রোত (Peruvian Current): কুমেরু স্রোতের যে শাখাটি দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূল দিয়ে উত্তর দিকে প্রবাহিত হয় তাকে পেরু বা হামবোল্ট স্রোত বলে। এটি আটলান্টিক মহাসাগরের বেঙ্গুয়েলা স্রোতের অনুরূপ। উত্তর দিকে প্রবাহিত হওয়ার সময় এ শীতল স্রোতটি ক্রমশ উষ্ণ হতে থাকে।

৩। **দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত (South Equatorial Current):** পেরু স্রোত উত্তর দিকে প্রবাহিত হয়ে নিরক্ষরেখার নিকটবর্তী হলে উত্তর-পশ্চিম দিকে বেঁকে প্রবাহিত হয়। অত:পর এই স্রোতটি দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত নামে নিরক্ষরেখার দক্ষিণ দিক দিয়ে সোজা পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়। নিরক্ষরেখার নিকটবর্তী বলে এটিও একটি উষ্ণ স্রোত। দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতের মূল শাখাটি প্রশান্তমহাসাগরের প্রায় ১২.৮৮০ কিলোমিটার অতিক্রম করে অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব উপকূলে পৌঁছে এবং সেখানে বাঁধাপ্রাপ্ত হয়ে তিনটি শাখায় বিভক্ত হয়। প্রথম শাখাটি অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব উপকূল দিয়ে দক্ষিণে দ্বিতীয়টি অস্ট্রেলিয়ার উত্তর দিক দিয়ে পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়ে ভারত মহাসাগরে প্রবেশে করে এবং তৃতীয় শাখাটি উত্তর পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়ে উত্তর নিরক্ষীয় স্রোতের সাথে মিলিত হয়।



চিত্র: ১১.৪.১ প্রশান্ড় মহাসাগরীয় স্রোত

৪। **নিউ সাউথ ওয়েলস স্রোত (New South Wales Current):** দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতের যে শাখাটি দক্ষিণ দিকে বেঁকে অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব উপকূল দিয়ে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয় তাকে নিউ সাউথ ওয়েলস স্রোত বলে। একে পূর্ব অস্ট্রেলিয় স্রোতও বলা হয়। এই স্রোতটি আটলান্টিক মহাসাগরের ব্রাজিল স্রোতের অনুরূপ। এটি একটি উষ্ণ স্রোত। এই স্রোতটি দক্ষিণে প্রবাহিত হয়ে ক্রমশ শীতল হতে থাকে। অস্ট্রেলিয়ার উপকূল অতিক্রম করে নিউজিল্যান্ডের নিকট পৌঁছলে এ স্রোতটি পশ্চিমা বায়ুর প্রভাবে বেঁকে পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়। এখানে এ স্রোতটি দুটি শাখায় বিভক্ত হয়। একটি শাখা নিউজিল্যান্ডের উত্তর দিক এবং অপর শাখাটি দক্ষিণ দিক দিয়ে পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়ে পরস্পর মিলিত হয়। এই মিলিত স্রোতসমূহ দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে ক্রমশ কুমেরু স্রোতের মধ্যে বিলীন হয়ে যায়।

খ) উত্তর প্রশান্তমহাসারীয় স্রোতসমূহ

নিরক্ষরেখার উত্তর প্রান্তের প্রশান্তমহাসাগরের স্রোতসমূহকে উত্তর প্রশান্তমহাসাগরীয় স্রোত বলে। উত্তর প্রশান্তমহাসাগরীয় স্রোতসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করা হলো। যথা-

১. **উত্তর নিরক্ষীয় স্রোত (North Equatorial Current) :** নিরক্ষরেখার উত্তর প্রান্তদিয়ে যে স্রোতটি প্রশান্তমহাসাগরে পূর্ব হতে পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয় তাকে উত্তর নিরক্ষীয় স্রোত বলে। এটি ক্যালিফোর্নিয়া স্রোতের বর্ধিত অংশ। এই স্রোতটি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার উপকূলে দুটি শাখায় বিভক্ত হয়। শাখা দুটি ফিলিপাইনের দু'দিক দিয়ে প্রবাহিত হয়ে কুরোশিও স্রোতের সাথে মিলিত হয়।

২. **কুরোশিও বা জাপান স্রোত (Kurosio or Japan Current) :** দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতের তৃতীয় শাখাটি নিরক্ষরেখা অতিক্রম করে উত্তর-পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হওয়ার সময় উত্তর নিরক্ষীয় স্রোতের সাথে মিলিত হয়। এই মিলিত স্রোতটি এশিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে বাঁধাপ্রাপ্ত হয়ে জাপানের পার্শ্ব দিয়ে জাপান বা কুরোশিও স্রোত নামে উত্তর পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়। অত:পর দক্ষিণ পশ্চিম বায়ুর প্রভাবে উত্তর প্রশান্তমহাসাগরের মধ্য দিয়ে পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়।

৩. **পশ্চিমা স্রোত (West Wind Current):** কুরোশিও স্রোত বা জাপান স্রোত জাপানের পূর্ব উপকূল হতে উত্তর-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়ে পূর্বদিকে বেঁকে প্রশান্তমহাসাগর অতিক্রম করে কানাডার পশ্চিম উপকূলে উপনীত হয়। উত্তর মহাসাগরের এ স্রোতটিকে পশ্চিমা স্রোত বা উত্তর প্রশান্তমহাসাগরীয় স্রোত বলা হয়। এই স্রোতের দুটি শাখা। তন্মধ্যে একটি শাখা আলাস্কা স্রোত নামে উত্তর দিকে এবং অপরটি ক্যালিফোর্নিয়া স্রোত নামে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়। এটি একটি উষ্ণ স্রোত।

৪. **আলাস্কা স্রোত (Alaska Current):** পশ্চিমা স্রোতের একটি শাখা উত্তর দিকে বেঁকে আলাস্কা উপসাগরে প্রবেশ করে। এই স্রোতকে আলাস্কা স্রোত বলা হয়। আলাস্কার স্রোতটি আলাস্কার উপকূল দিয়ে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে এলিউশিয়ান দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণে, দক্ষিণ দিকে বেঁকে চক্রাকার স্রোতরূপে পশ্চিমা স্রোতের সাথে মিলিত হয়। এটি একটি উষ্ণ স্রোত।

উষ্ণ স্রোত হওয়ার দরুণ এর প্রভাবে উত্তর আমেরিকায় উত্তর-পশ্চিম উপকূল অক্ষাংশ অনুযায়ী যেরূপ শীতল হওয়া উচিত সেরূপ শীতল হতে পারে না।

৫. ক্যালিফোর্নিয়া স্রোত (California Current): পশ্চিমা স্রোতের যে শাখাটি উত্তর আমেরিকায় পশ্চিম উপকূল দিয়ে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয় তাকে ক্যালিফোর্নিয়া স্রোত বলে। এই স্রোতটি ডান দিকে আবর্তন করে পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হওয়ার সময় উত্তর নিরক্ষীয় স্রোতের সাথে মিলিত হয়। এই স্রোতসমূহের জলাবর্তের মধ্যে স্রোতহীন কেন্দ্রস্থল থাকায় কেন্দ্রস্থলে শৈবাল সাগরের সৃষ্টি হয়েছে। ক্যালিফোর্নিয়া স্রোত উষ্ণ স্রোতের শাখা হলেও সুমেরু স্রোতের একটি শাখা উত্তর প্রশান্তমহাসাগরীয় স্রোতের নিম্নভাগ দিয়ে প্রবাহিত হয়ে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে শীতল স্রোতে পরিণত হয়।

৬. **কামচাটকা বা সুমেরু স্রোত (Kamchatka or Arctic Current) :** উত্তর মহাসাগরে শীতল সুমেরু স্রোতটি বেরিং স্রোত নামে বেরিং প্রণালির মধ্য দিয়ে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হয়। পরবর্তীতে এই স্রোতটি কামচাটকা স্রোত নামে কামচাটকার পার্শ্ব দিয়ে ওখটস্ক সাগরে প্রবেশ করে। ওখটস্ক সাগর হতে প্রবাহিত হয়ে কামচাটকা স্রোতটি শাখালীন ও হোক্কাইডো দ্বীপদ্বয়ের পূর্ব পার্শ্ব দিয়ে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয়। হোক্কাইডোর পূর্ব পার্শ্বে এটি ওয়াশিও স্রোত নামে পরিচিত। এ স্রোতটি উষ্ণ কুরোশিও স্রোত ও বিপরীত স্রোতের পার্শ্ব দিয়ে বিপরীত দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় শীতল ও উষ্ণ স্রোতের সংমিশ্রণে এখানে নিবিড় কুয়াশা ও ঝড়ের সৃষ্টি হয়। দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হতে হতে এটি ক্রমশ উষ্ণ হয়ে কুরোশিও স্রোতের সাথে মিশে যায়।

৭। **সুসিমা স্রোত (Tsushima Current) :** সুসিমা স্রোতটি জাপানের দক্ষিণে কুরোশিও স্রোত হতে উৎপন্ন হয়ে জাপানের পশ্চিম পার্শ্ব দিয়ে উত্তর দিকে অগ্রসর হয়। অত:পর এই স্রোতটি হনসু ও হোক্কাইডোর মধ্য দিয়ে পূর্ব দিকে অগ্রসর হয়। পরিশেষে এই স্রোতটি কুরোশিও স্রোতের সাথে মিলিত হয়। উষ্ণ কুরোশিও স্রোতের শাখা বলে এটিও একটি উষ্ণ স্রোত।

গ) নিরক্ষীয় বিপরীত স্রোত (Counter Equatorial Current): উত্তর ও দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতের মধ্য দিয়ে যে উষ্ণ স্রোতটি পশ্চিম হতে পূর্বদিকে প্রবাহিত হয় তাকে নিরক্ষীয় বিপরীত স্রোত বলে। প্রশান্তমহাসাগরীয় স্রোতসমূহের মধ্যে এটি দীর্ঘতম স্রোত। ফিলিপাইনের পূর্ব উপকূল হতে নিরক্ষীয় বিপরীত স্রোতটি প্রায় ১২,৮০০ কি.মি বা ৮০০০ মাইল পথ অতিক্রম করে মধ্য আমেরিকার পশ্চিম উপকূল পর্যন্তপ্রবাহিত হয়। এ স্রোতটি আটলান্টিক নিরক্ষীয় বিপরীত স্রোত অপেক্ষা অধিক শক্তিসম্পন্ন কারণ প্রশান্তমহাসাগর আটলান্টিক মহাসাগর অপেক্ষা অধিক প্রশস্ত।

শিক্ষার্থীর কাজ	প্রশান্তমহাসাগরীয় স্রোতসমূহ দলগতভাবে আলোচনা করবেন।

সারসংক্ষেপ

প্রশান্তমহাসাগরীয় স্রোত আটলান্টিক মহাসাগরীয় স্রোতের অনুরূপ। প্রশান্তমহাসাগর নিরক্ষরেখা দ্বারা দুইভাগে বিভক্ত। এজন্য প্রশান্তমহাসাগরীয় স্রোতসমূহকে উত্তর ও দক্ষিণ প্রশান্তমহাসাগরীয় স্রোত ও নিরক্ষীয় বিপরীত স্রোত হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন -১১.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√)চিহ্ন দিন।

১। প্রশান্তমহাসাগরীয় স্রোতকে প্রধান কয়টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে?
ক) দুই খ) তিন গ) চার ঘ) পাঁচ

২। কোন বায়ুর প্রভাবে কুমেরু স্রোতের সৃষ্টি হয়?
ক) পশ্চিমা বায়ু খ) প্রত্যয়ন বায়ু গ) নিরক্ষীয় বায়ু ঘ) মেরু বায়ু

৩। শীতল স্রোতের সাথে ভেসে আসে-
ক) হিমশৈল খ) প্রস্তর খন্ড গ) লতা গুল্ম ঘ) কাঠ

৪। কোনটি দীর্ঘতম স্রোত?
ক) পশ্চিমা স্রোত খ) ক্যালিফোর্নিয়া স্রোত গ) সুসিমা স্রোত ঘ) নিরক্ষীয় স্রোত

পাঠ-১১.৫ ভারত মহাসাগরীয় স্রোত
(Current of the Indian Ocean)

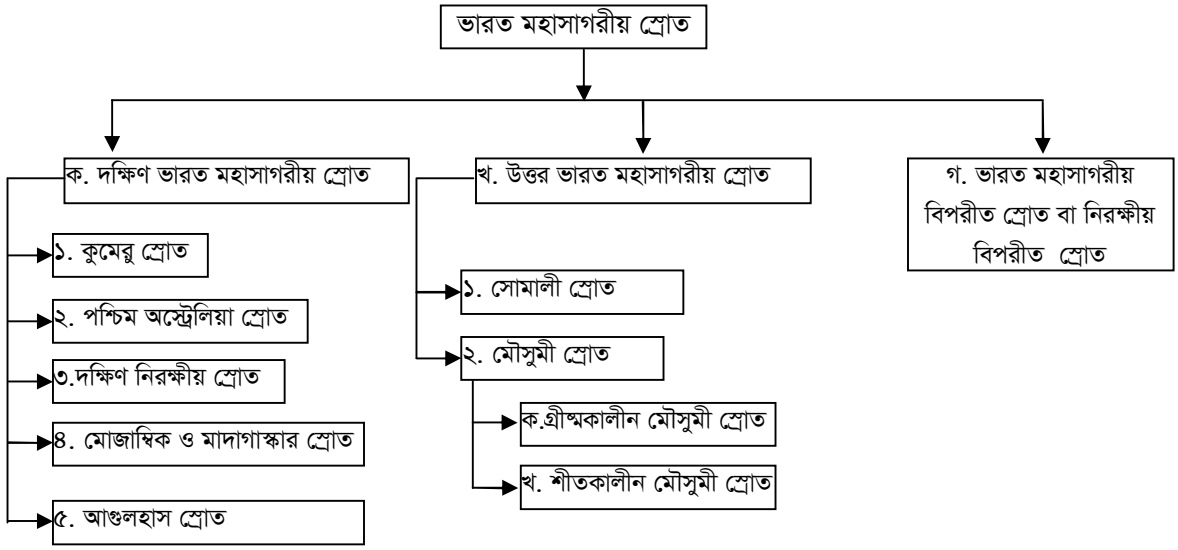
উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ভারত মহাসাগরীয় স্রোত সম্পর্কে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

ভারত মহাসগরীয় স্রোত

ভারত মহাসাগরের অবস্থান ও পরিবেশ আটলান্টিক ও প্রশান্তমহাসাগর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আটলান্টিক ও প্রশান্তমহাসাগরের উত্তরাংশ সুমেরু মহাসাগরে উন্মুক্ত। অপরদিকে ভারত মহাসাগরের উত্তরাংশ স্থলভাগ দ্বারা সম্পূর্ণরূপে বেষ্টিত। যার দরুণ উত্তর আটলান্টিক ও উত্তর প্রশান্তসাগরের স্রোতের সাথে ভারত মহাসাগরের স্রোতের কোনো সাদৃশ্যতা নেই। অন্যদিকে দক্ষিণ ভারত মহাসাগরীয় স্রোতের সাথে দক্ষিণ আটলান্টিক ও দক্ষিণ প্রশান্তমহাসাগরীয় স্রোতের মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে। মৌসুমী বায়ু দ্বারা উত্তর ভারত মহাসাগরীয় স্রোত নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় ঋতুভেদে স্রোতের দিক সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত হয় এবং দক্ষিণ ভারত মহাসাগরীয় স্রোতগুলো সারা বছর প্রায় একই দিকে প্রবাহিত হয়। নিম্নে ভারত মহাসাগরীয় স্রোতসমূহের শ্রেণিবিভাগ দেখানো হলো ।



ক) দক্ষিণ ভারত মহাসাগরীয় স্রোতসমূহ

১. কুমেরু বা পশ্চিমা স্রোত : প্রবল পশ্চিমা বায়ুর প্রভাবে কুমেরু মহাসাগরের যে স্রোতটি পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয় তাকে কুমেরু স্রোত বলে। এটি একটি শীতল স্রোত। এই পশ্চিমা বা কুমেরু স্রোতটি সমগ্র দক্ষিণ ভারত মহাসাগর অতিক্রম করে অস্ট্রেলিয়ার উপকূলে দুটি শাখায় বিভক্ত হয়। প্রধান শাখা বা মূল শাখাটি অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ পার্শ্ব দিয়ে প্রশান্তমহাসাগরে প্রবেশ করে। অপর শাখাটি অস্ট্রেলিয়ার লিউউইন (Leewin) অন্তরীপে বাঁধাপ্রাপ্ত হয়ে অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিম উপকূল দিয়ে উত্তর দিকে প্রবাহিত হয়।

২. পশ্চিম অস্ট্রেলিয় স্রোত (West Australia Current): অস্ট্রেলিয়ার পশ্চিম উপকূল দিয়ে কুমেরু স্রোতের যে শাখাটি উত্তর দিকে প্রবাহিত হয় তাকে পশ্চিম অস্ট্রেলিয় স্রোত বলে। শীতল কুমেরু স্রোতের শাখা বলে এটিও একটি শীতল স্রোত। ক্রান্তীয় অঞ্চলে উপনীত হলে এই স্রোতটি ক্রমশ উষ্ণ হতে থাকে।

৩. দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত (South Equatinial Current): পশ্চিম অস্ট্রেলিয় স্রোতটি পশ্চিম দিকে বেঁকে প্রবাহিত হওয়ার সময় অস্ট্রেলিয়ার নিউগিনির নিকটবর্তী টরেস (Torres) প্রণালির মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সময় প্রশান্ত

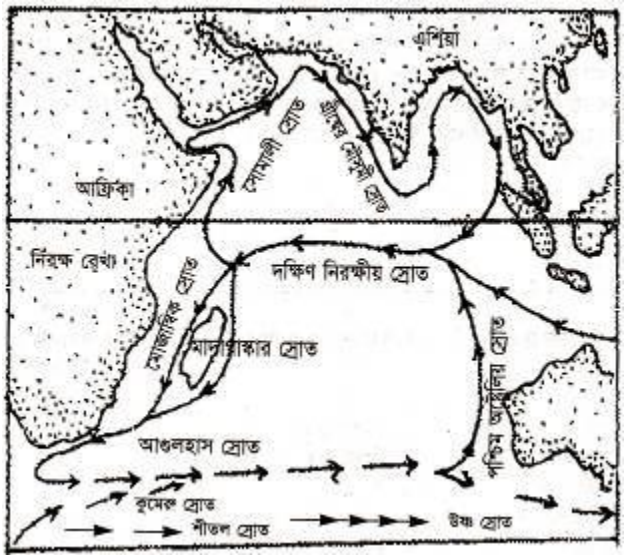
মহাসাগরের দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতের একটি শাখার সাথে মিলিত হয়। এই মিলিত স্রোতটি দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোত নামে সোজা পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়। আফ্রিকার দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলের মাদাগাস্কার দ্বীপের নিকট পৌঁছে দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতটি তিনটি শাখায় বিভক্ত হয়। দুটি শাখা মাদাগাস্কার দ্বীপের দু'পার্শ্ব দিয়ে দক্ষিণে এবং অপরটি উত্তর দিকে প্রবাহিত হয়।

৪. আগুল হাসস্রোত (Agulhus Current) : মাদাগাস্কার বা মালাগাসি দ্বীপের দক্ষিণে মোজাম্বিক এবং মাদাগাস্কার স্রোতসমূহ মিলিত হয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে প্রবাহিত হয়, এই মিলিত স্রোতসমূহ আগুলহাস স্রোত। এটি একটি উষ্ণ স্রোত। আগুলহাস স্রোতটি আফ্রিকার দক্ষিণ উপকূল দিয়ে উত্তমাশা অন্তরীপের নিকট পৌঁছলে পশ্চিমা বায়ু দ্বারা প্রবাহিত হয়ে পূর্ব দিকে বেঁকে শীতল কুমেরু স্রোতের সাথে মিলিত হয়।

খ) উত্তর ভারত মহাসাগরীয় স্রোতসমূহ

১। সোমালী স্রোত (Somali Current): দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতের যে শাখাটি মালাগাসি দ্বীপের উত্তর হতে পশ্চিম দিকে বেঁকে আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে সোমালিয়ার পার্শ্ব দিয়ে সোজা উত্তর দিকে প্রবাহিত হয় তাকে সোমালী স্রোত বলে। এটি একটি উষ্ণ স্রোত।

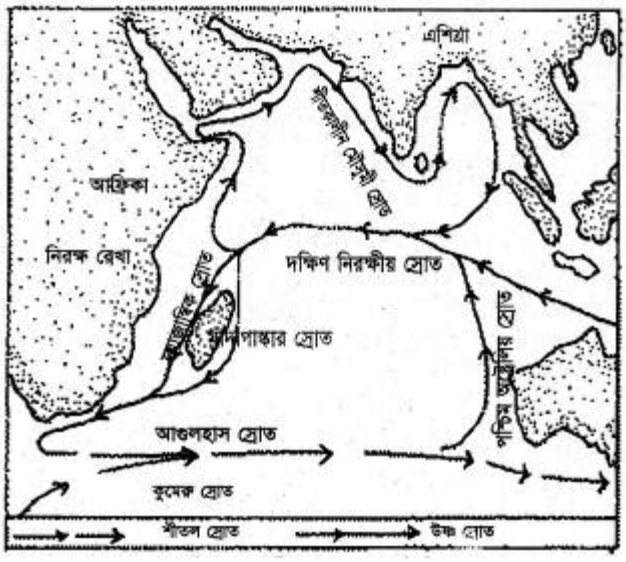
২। মৌসুমী স্রোত (Monsoon Current) : মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে উত্তর ভারত মহাসাগরের উত্তর উপকূল বরাবর যে স্রোত প্রবাহিত হয় তাকে মৌসুমী স্রোত বলে। গ্রীষ্মকালে এই স্রোত পশ্চিম হতে পূর্বদিকে এবং শীতকালে একই পথে বিপরীত দিকে প্রবাহিত হয়। তাই মৌসুমী স্রোত দু প্রকার। যেমন: গ্রীষ্মকালীন ও শীতকালীন মৌসুমী স্রোত।



চিত্র : ১১.৫.১ ভারত মহাসাগরীয় স্রোত (গ্রীষ্মকালীন)

ক. গ্রীষ্মকালীন মৌসুমী স্রোত : দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে গ্রীষ্মকালে সোমালী স্রোত আফ্রিকার পূর্ব উপকূল হতে প্রথমে আরব সাগরে প্রবেশ করে। পরবর্তীতে সেখান হতে এ স্রোত ভারতের পশ্চিম উপকূল দিয়ে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত হয় এবং শ্রীলংকার দক্ষিণ পূর্ব দিক প্রদক্ষিণ করে ভারতের পূর্ব উপকূল দিয়ে বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করে। এটিই গ্রীষ্মের মৌসুমী স্রোত বা দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী স্রোত। এই সময় উত্তর ভারত মহাসাগরে অন্য কোনো স্রোত দেখা যায় না (চিত্র ১১.৫.১)।

খ. শীতকালীন মৌসুমী স্রোত : উত্তর পূর্ব মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে শীতকালে গ্রীষ্মকালীন মৌসুমী স্রোতটি দেখা যায় না। কিন্তু একই স্রোতের গতিপথ অনুসরণ করে বিপরীতমুখী একটি স্রোত সর্বপ্রথম মালয় ও সুমাত্রার মধ্যদিয়ে আন্দামান সাগরে প্রবেশ করে এবং পরিশেষে বঙ্গোপসাগরে উপনীত হয়। বঙ্গোপসাগরে এই স্রোতটি উত্তর-পূর্ব মৌসুমী বায়ুর অধীনে চলে যায় এবং সম্পূর্ণরূপে গ্রীষ্মকালীন স্রোতের গতিপথ অনুসরণ করে আরব সাগর ঘুরে আফ্রিকার সোমালিয়ার দক্ষিণ প্রান্তপর্যন্তঅগ্রসর হয়। এটিই শীতকালীন মৌসুমী স্রোত বা উত্তর পূর্ব মৌসুমী স্রোত (চিত্র- ১১.৫.২)।



চিত্র: ১১.৫.২ ভারত মহাসাগরীয় স্রোত (শীতকালীন)

গ. ভারত মহাসাগরীয় বিপরীত স্রোত : আফ্রিকার সোমালিয়ার দক্ষিণে পৌঁছে শীতকালীন মৌসুমী স্রোতটি পূর্বদিকে বেঁকে প্রবাহিত হয় এবং নিরক্ষরেখা বরাবর সোজা পূর্ব দিকে প্রবাহিত হয়। অত:পর এই স্রোতটি ভারত মহাসাগরের পূর্ব

উপকূলে অবস্থিত সুমাত্রা দ্বীপের নিকট অগ্রসর হয়ে দক্ষিণ দিকে দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতের সাথে মিলিত হয়। এই স্রোতটি শুধুমাত্র শীতকালেই দেখা যায়। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে গ্রীষ্মকালে শীতকালীন মৌসুমী স্রোতের সঙ্গে ভারত মহাসাগরীয় বিপরীত স্রোতটি আর দেখা যায় না বা অন্তর্হিত হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	ভারত মহাসাগরীয় স্রোতসমূহকে গ্রীষ্মকালীন এবং শীতকালীন বিভক্ত করে স্রোত সমূহের তালিকা তৈরি করুন।

সারসংক্ষেপ

ভারত মহাসাগরের অবস্থান ও পরিবেশ আটলান্টিক ও প্রশান্তমহাসাগর থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আটলান্টিক ও প্রশান্তমহাসাগরের উত্তরাংশ সুমেরু মহাসাগরে উন্মুক্ত কিন্তু ভারত মহাসাগরের উত্তরাংশ সম্পূর্ণরূপে স্থলভাগ দ্বারা বেষ্টিত। যার দরুণ উত্তর ভারত মহাসাগরের সাথে উত্তর আটলান্টিক ও দক্ষিণ প্রশান্তমহাসাগরের স্রোতসমূহের কোন সাদৃশ্য নেই। অপরদিকে দক্ষিণ ভারত মহাসাগরীয় স্রোতের সাথে দক্ষিণ আটলান্টিক ও প্রশান্তমহাসাগরীয় স্রোতের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য রয়েছে। একারণে ভারত মহাসাগরীয় স্রোতকে প্রধান তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা- দক্ষিণ ভারত মহাসাগরীয় স্রোত, উত্তর ভারত মহাসাগরীয় স্রোত এবং ভারত মহাসাগরীয় বিপরীত স্রোত।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন -১১.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√)চিহ্ন দিন।

১। ভারত মহাসাগরের উত্তরাংশে স্রোতের সংখ্যা
ক) কম খ) বেশি
গ) একবারেই নেই ঘ) ক ও খ উভয়

২। আগুলহাস স্রোতটি কোন ধরনের স্রোত?
ক) উষ্ণ স্রোত খ) শীতল স্রোত
গ) নাতিশীতোষ্ণ স্রোত ঘ) কোনটিই নয়

৩। মৌসুমী স্রোতের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে-
i. মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে উত্তর ভারত মহাসাগরের উত্তর উপকূল বরাবর প্রবাহিত হয়
ii. গ্রীষ্মকালে এই স্রোত পশ্চিম হতে পূর্বদিকে এবং শীতকালে একই পথে বিপরীত দিকে প্রবাহিত হয়।
iii. মৌসুমী স্রোত দু প্রকার যথা গ্রীষ্মকালীন ও শীতকালীন মৌসুমী স্রোত
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৪। পশ্চিম অস্ট্রেলিয় স্রোতটি
ক) শীতল স্রোত খ) উষ্ণ স্রোত
গ) নাতিশীতোষ্ণ ঘ) খ ও গ সঠিক

৫। ভারত মহাসাগরীয় বিপরীত স্রোতটি কখন দেখা যায়?
ক) গ্রীষ্মকালে খ) শীতকালে
গ) বর্ষাকালে ঘ) সারা বছর

পাঠ-১১.৬ সমুদ্রস্রোতের প্রভাব
(Causes and Effects of Ocean Currents)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সমুদ্রস্রোতের প্রভাব সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

সমুদ্রস্রোতের প্রভাব

পৃথিবীর সাগর ও মহাসাগরসমূহের বিভিন্ন স্থানে প্রধানত দুই ধরনের সমুদ্রস্রোতের (উষ্ণ ও শীতল স্রোত) প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। নিম্নে প্রধান দুটি ভাগে সমুদ্র স্রোতকে বর্ণনা করা করা হলো। যথা-

ক. জলবায়ুর উপর প্রভাব : জলবায়ুর উপর সমুদ্রস্রোতের প্রভাব নিম্নে বর্ণনা করা হলো। যথা-

১. সমুদ্র তীরবর্তী দেশসমূহের উপর সমুদ্রস্রোতের প্রভাব সর্বাধিক। উষ্ণ সমুদ্রস্রোত প্রবাহিত অঞ্চলের জলবায়ু উষ্ণ থাকে অপরদিকে শীতল সমুদ্র স্রোত প্রবাহিত অঞ্চলের জলবায়ু অপেক্ষাকৃত শীতল হয়। যেমন: উত্তর আমেরিকার সেন্ট লরেন্স নদী ও তার মোহনা শীতল লাব্রাডার স্রোতের প্রভাবে বছরের প্রায় নয় মাসই বরফাবৃত থাকে। কিন্তু একই অক্ষাংশে অবস্থিত বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের উপকূল উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোতের প্রভাবে সর্বদা বরফমুক্ত থাকে। লন্ডন এবং নিউইয়র্ক একই অক্ষাংশে অবস্থিত হলেও শীতকালে শীত অনুভূত হয় কারণ নিউইয়র্কের পূর্বপার্শ্ব দিয়ে শীতল লাব্রাডার স্রোত প্রবাহিত হয়।

২. উষ্ণ স্রোতের উপর দিয়ে প্রবাহিত বায়ুতে অধিক জলীয়বাষ্প থাকে বলে তা স্থলভাগের উপর দিয়ে প্রবাহিত হলে বৃষ্টিপাত ঘটায়। অপরদিকে শীতল স্রোতের উপর দিয়ে প্রবাহিত বায়ু শুষ্ক হয় বিধায় স্থলভাগে বৃষ্টিপাত ঘটায় না।

৩। উষ্ণ ও শীতল সমুদ্রস্রোতের মিলনস্থলে তাপমাত্রা বা উষ্ণতার পার্থক্যের দরুণ ঘন কুয়াশা এবং ঝড়ের সৃষ্টি হয়। এ কারণে নিউফাউন্ডল্যান্ড ও জাপানের পূর্ব উপকূলে কুয়াশা এবং ঝড়-বৃষ্টির সৃষ্টি হয়।

খ. বাণিজ্যের উপর প্রভাব : নাতিশীতোষ্ণ এবং হিমমন্ডলের অনেক সমুদ্র শীতকালে পানি বরফে পরিণত হয়। এইরূপ অঞ্চলে উষ্ণ স্রোত প্রবাহিত হলে সমুদ্রের পানি বরফে পরিণত হতে পারে না। উপসাগরীয় উষ্ণ স্রোতের দরুণ নরওয়ের উত্তর উপকূলে শীতকালেও বরফ জমে না, ফলে বন্দরগুলোর পথ বন্ধ হতে পারে না। উষ্ণ জাপান বা কুরোশিও স্রোতের জন্য কানাডার পশ্চিম উপকূলও বরফমুক্ত থাকে। সুমেরু শীতল স্রোতের প্রভাবে উত্তর আমেরিকার লাব্রাডার উপদ্বীপের বন্দরগুলো বছরের অধিকাংশ সময়ই বরফে আবৃত থাকে ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যে বিঘ্ন ঘটে।

স্রোতের অনুকূলে জাহাজ চলাচল সহজ। এতে সুলভে মালপত্র রপ্তানি ও আমদানি করা সহজ হয়। উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোতের প্রভাবে আমেরিকা হতে ইউরোপ যাওয়া সহজ হয় কিন্তু এই পথে ইউরোপ হতে আমেরিকা প্রবেশের সময় অনেক বেশি সময় প্রয়োজন হয়। পূর্বে পালের জাহাজগুলো সমুদ্রস্রোত অনুসরণ করে একস্থান হতে অন্যস্থানে চলাচল করত। পূর্বে পালের জাহাজগুলো পশ্চিম ইউরোপের বন্দরগুলো হতে ক্যানারি ও উত্তর নিরক্ষীয় স্রোতের টানে সহজেই উত্তর আমেরিকার পূর্ব উপকূলে পৌঁছাত।

একই পথে জাহাজগুলো ফিরার সময় উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোতের সাহায্যে উত্তর আটলান্টিক স্রোত বরাবর ইউরোপে ফিরে যেত। অনুরূপভাবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জাহাজগুলো রপ্তানি সামগ্রী নিয়ে উত্তর-পূর্ব মৌসুমী স্রোতের সাহায্যে আরব, ইরান প্রভৃতি দেশে পৌঁছাত এবং গ্রীষ্মকালে স্রোতের গতি পরিবর্তিত হয়ে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী স্রোত উৎপত্তি হতো এবং এই স্রোতের অনুকূলে আমদানি সামগ্রী নিয়ে ফিরে আসত।

উষ্ণ স্রোতের অনুকূলে জাহাজ চলাচল নিরাপদ। শীতল স্রোতের গতিপথে হিমশৈল থাকায় জাহাজ চলাচলে অসুবিধা হয়। এ কারণে আটলান্টিকের উষ্ণ স্রোতের অনুকূলে সর্বাধিক জাহাজ যাতায়াত করে। বিশ্ববিখ্যাত জাহাজ টাইটানিক হিম-শৈলের আঘাতে নিমজ্জিত হয়েছিল।

হিমশৈল উষ্ণ স্রোতের সংস্পর্শে গলে যায় এবং হিমশৈলের সাথে প্রবাহিত উপাদান সঞ্চিত হয়ে চরাভূমির সৃষ্টি হয়। নিউফাউন্ডল্যান্ডের নিকটে এরূপ এক বিশাল চড়ার সৃষ্টি হয়ে মৎস্যক্ষেত্র গড়ে উঠেছে। ফলে এ অঞ্চল মৎস্য ব্যবসায় প্রসিদ্ধ।

মগ্নচূড়ার নিকট উষ্ণ ও শীতল স্রোতের মিলন হলে মাছের প্রিয় খাদ্য প□্যাঙ্কটন অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়। এ কারণে এই ধরনের মগ্নচূড়ায় বিশাল মৎস্যক্ষেত্র গড়ে উঠেছে। যেমন: উষ্ণ ও শীতল স্রোতের মিলনের ফলে নিউফাউন্ডল্যান্ড, বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ, নরওয়ে ও জাপান উপকূলে মৎস্য ব্যবসা ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	বঙ্গোপসাগরের স্রোত ঐ অঞ্চলে জলবায়ু এবং মানুষের জীবন-যাপনের উপর কী ধরনের প্রভাব বিস্তার করে তার একটি তালিকা প্রস্তুত করুন।

সারসংক্ষেপ

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সমুদ্রস্রোত প্রবাহিত অঞ্চলের মানুষের দৈনন্দিন জীবন-যাপন থেকে শুরু করে অর্থনৈতিক কার্যাবলী সমুদ্রস্রোত দ্বারা প্রভাবিত হয়। আবহাওয়া এবং জলবায়ুর উপরও সমুদ্রস্রোতের প্রভাব রয়েছে। মানুষের জীবন-যাপনের উপর সমুদ্রস্রোতের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব বিদ্যমান থাকায় সমুদ্রস্রোতের প্রভাব আলোচনা বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১১.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√)চিহ্ন দিন।

১। নাতিশীতোষ্ণ ও হিমমন্ডলের অনেক সমুদ্রের পানি শীতকালে-
ক) বরফে পরিণত হয় খ) বাষ্পীভূত হয়ে উপরে উঠে যায়
গ) পৃষ্ঠস্রোতরূপে প্রবাহিত হয় ঘ) আন্ত:স্রোতরূপে প্রবাহিত হয়

২। সামুদ্রিক জাহাজ চলাচলের উপর কীসের প্রভাব রয়েছে?
ক) সমুদ্র স্রোত খ) হিমশৈল গ) প□াঙ্কটন ঘ) সামুদ্রিক উদ্ভিদ

৩। উষ্ণ স্রোতের অনুকূলে জাহাজ চালানো
ক) নিরাপদ খ) বিপদজনক গ) সম্ভব নয় ঘ) কোনটি নয়

৪। নিউফাউন্ডল্যান্ডের নিকট বিশাল চূড়ার সৃষ্টি হয়ে সেখানে কী গড়ে উঠেছে?
ক) পর্যটন কেন্দ্র খ) মৎস্য ক্ষেত্র গ) বিশাল সমুদ্র সৈকত ঘ) বিশাল বন্দর

সৃজনশীল প্রশ্ন : ১

অধ্যাপক আব্দুল হক তার ক্লাসে বারিমন্ডল সম্পর্কে বর্ণনা দেন। তিনি বলেন, বারিমন্ডলের একটি বিশাল অংশ সাগর ও মহাসাগর। সাগর-মহাসাগরের পানি স্থির নয়। বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণে এ বিশাল পানিরাশি সর্বদা একস্থান হতে অন্যস্থানে চলাচল করে থাকে।

ক) সমুদ্রস্রোত কাকে বলে?
খ) সমুদ্রস্রোতের কারণসমূহ কী কী?
গ) সমুদ্রস্রোতের কারণসমূহ বর্ণনা করুন।
ঘ) 'বায়ুপ্রবাহ সমুদ্রস্রোতের উৎপত্তির প্রধান কারণ'- এর স্বপক্ষে যুক্তি প্রদান করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১১.১ :	১. ঘ	২.খ	৩. খ	৪. ক	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১১.২ :	১. ক	২.ঘ	৩. ক	৪. ক	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১১.৩ :	১. ক	২.ক	৩. গ	৪. গ	৫. খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১১.৪ :	১. খ	২. ক	৩. খ	৪. ঘ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১১.৫ :	১. ক	২. ক	৩. ঘ	৪. ক	৫. খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১১.৬ :	১. ক	২. ক	৩. ক	৪. খ	

জোয়ার ও ভাঁটা
(Wave and Tide)

ইউনিট ১২

ভূমিকা

চন্দ্র ও সূর্য ভূ-পৃষ্ঠের জল ও স্থলকে অবিরাম আকর্ষণ করছে। এ আকর্ষণের প্রভাবে ভূ-পৃষ্ঠের পানি প্রত্যহ নিয়মিতভাবে স্থান বিশেষে ফুলে ওঠে এবং অন্যত্র নেমে যায়। পানির এ ফুলে ওঠা বা স্ফীতিকে জোয়ার এবং নেমে যাওয়াকে ভাঁটা বলে। চন্দ্র পৃথিবীর নিকটতম উপগ্রহ। এজন্য পৃথিবীর ওপর এর আকর্ষণ সর্বাধিক। স্থলভাগ অপেক্ষা জলভাগ সহজে আকৃষ্ট হয় বলে চন্দ্রের আকর্ষণের ফলে পানি স্ফীত হয়ে ওঠে ও জোয়ারের সৃষ্টি হয়। জোয়ার ভাঁটা সংঘটিত হওয়ার ফলে ভূ-পৃষ্ঠের নানারকম প্রাকৃতিক পরিবর্তন ঘটে।





ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ ১২.১ : জোয়ার ভাঁটা ও এর কারণ
পাঠ ১২.২ : জোয়ার ভাঁটার শ্রেণিবিভাগ
পাঠ ১২.৩ : জোয়ার ভাঁটার সময় ও ব্যবধান
পাঠ ১২.৪ : বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে জোয়ার ভাঁটার প্রভাব

পাঠ-১২.১ জোয়ার ভাঁটা ও এর কারণ (Wave and Tide and its Causes)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- জোয়ার ভাঁটার সংজ্ঞা বলতে পারবেন এবং
- জোয়ার ভাঁটার কারণ ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

জোয়ার ভাঁটা

চন্দ্র ও সূর্যের আকর্ষণ শক্তি এবং পৃথিবীর কেন্দ্রাতিক শক্তি প্রভৃতির প্রভাবে সমুদ্রের পানি নির্দিষ্ট সময় অন্তর ফুলে উঠে আবার নেমে যায়। সমুদ্রের পানি এভাবে ফুলে উঠাকে বলা হয় জোয়ার (High Tide) এবং নেমে যাওয়াকে ভাঁটা (Ebb or low Tide) বলে। প্রতি ১২ ঘন্টা ২৬ মিনিট পরপর এই জোয়ার ভাঁটা সংঘঠিত হয়। অর্থাৎ সমুদ্রে একই জায়গায় প্রতিদিন দু'বার জোয়ার ও দু'বার ভাঁটা হয়। সমুদ্রের মোহনা থেকে নদীগুলোর স্রোতের বিপরীতে উজানে কয়েক কিলোমিটার পর্যন্ত জোয়ার ভাঁটা বেশি অনুভূত হয়। সমুদ্রের মধ্যভাগ থেকে উপকূলের কাছে পানির অগভীর অংশে জোয়ারের পানির উচ্চতা বেশি থাকে। তবে বিভিন্ন নদীপথে দেশের ভিতরে সমুদ্রের পানি যখন প্রবেশ করে এবং নেমে যায় তাকে জোয়ার ভাঁটা বলে না।

জোয়ার ভাঁটার কারণ : জোয়ার ভাঁটা সম্পর্কে প্রাচীনকালে মানুষ নানা রকম অবাস্তব কল্পনা করত। কিন্তু বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে চন্দ্র ও সূর্যের প্রভাবেই এবং পৃথিবীর আবর্তনের ফলে সৃষ্ট কেন্দ্রাতিগ শক্তির প্রভাবে জোয়ার ভাঁটা হয়। জোয়ার ভাঁটা সংঘটনের কারণকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

ক. মহাকর্ষণ শক্তির প্রভাব এবং খ. কেন্দ্রাতিগ শক্তির প্রভাব।

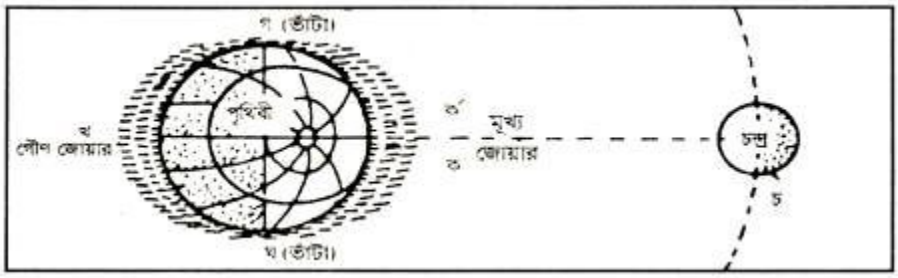
ক. মহাকর্ষ শক্তির প্রভাব (Gravitational Force) : পৃথিবীর সকল পদার্থ একটি অপরটিকে আকর্ষণ করছে। এ আকর্ষণকে মহাকর্ষ (gravitation) বলে। মহাকর্ষের প্রভাবে পৃথিবী সর্বদা সূর্যের চারদিকে এবং চন্দ্র সর্বদা পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে। আর এই কারণেই পৃথিবীর জলরাশি কখনো বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। মহাকাশে অবস্থিত সব নক্ষত্র, গ্রহ ও উপগ্রহের এ আকর্ষণের পরিমাণ সমান না। বড় পদার্থের আকর্ষণ ক্ষমতা ছোট পদার্থ অপেক্ষা বেশি। চন্দ্র অপেক্ষা সূর্য ২ কোটি ৬০ লক্ষ গুণ বড় এবং পৃথিবী অপেক্ষা সূর্য প্রায় ১৩ লক্ষ গুণ বড় হলেও পৃথিবী থেকে সূর্য গড়ে প্রায় ১৫ কোটি কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এবং পৃথিবী থেকে চন্দ্র গড়ে প্রায় ৩৮.৪ লক্ষ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এ কারণেই পৃথিবীর ওপর চন্দ্রের আকর্ষণ ক্ষমতা সূর্য অপেক্ষা বেশি। ফলে জোয়ার ভাঁটায় চন্দ্রের প্রভাব বেশি লক্ষ্য করা যায়। জোয়ার-ভাঁটার ক্ষেত্রে চন্দ্র ও সূর্য উভয়ই পৃথিবীর ওপর নিজ নিজ শক্তি প্রয়োগ করলেও চন্দ্রের শক্তির অধিকতর প্রয়োগ হয়। চন্দ্র ও সূর্যের আকর্ষণ শক্তি স্থলভাগের কেন্দ্রস্থলেও ভূ-পৃষ্টের জলরাশির ওপর বেশি কার্যকর হয়। মূলত স্থলভাগের ওপরে চন্দ্র সূর্যের আকর্ষণ শক্তি প্রায় নেই বললেই চলে। আর এ কারণেই পৃথিবীর কেন্দ্র ও পানির উপরিভাগের উপর চন্দ্র ও সূর্যের আকর্ষণের পার্থক্য দেখা যায় এবং তার ফলাফল হিসেবে জোয়ার ভাঁটা সংঘটিত হয়।

মহাকর্ষ শক্তি নিম্ন সূত্রানুযায়ী কাজ করে।

$$F = G \frac{M_1 M_2}{d^2}$$

এখানে,

F	=	মহাকর্ষ শক্তি
G	=	মহাকর্ষীয় ধ্রুবক
d	=	দূরত্ব
M_1	=	পৃথিবীর ভর/আয়তন
M_2	=	চন্দ্রের ভর/আয়তন



চিত্র-১২.১.১ : জোয়ার ভাঁটা

খ) কেন্দ্রাতিগ শক্তির প্রভাব (Centrifugal Force) : মহাকর্ষ শক্তির মত ঘূর্ণনশীল পৃথিবী পৃষ্ঠে যে কেন্দ্রাতিগ শক্তি উৎপন্ন হয় সেটিও জোয়ার ভাঁটা উৎপত্তির কারণ। কেন্দ্রাতিগ শক্তির প্রভাবে গৌণ জোয়ার সৃষ্টি হয়। পৃথিবী যখন তার অক্ষের উপর ঘুরতে থাকে তখন একটি বিপরীত শক্তি এর পৃষ্ঠ থেকে বিপরীত দিকে নিয়ে যেতে চায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বৃষ্টির পানিতে পূর্ণ কোনো রাস্তা দিয়ে কোনো যানবাহন যদি খুব দ্রুতগতিতে এগিয়ে যায়, তখন চাকার প্রভাবে ঐ পানি দূরে ছিটকে পরে। অনুরূপভাবে পৃথিবী শুধু নিজ অক্ষেই ঘুরছে না। সেই সাথে অভিকর্ষ শক্তির প্রভাবে পৃথিবীর প্রতিটি বস্তু নিজ অবস্থানে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে। আবার আরেকটি শক্তি কেন্দ্র থেকে বাইরের দিকে প্রবাহিত হচ্ছে যা সবকিছু বাইরের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এই শক্তিকেই বলা হয় কেন্দ্রাতিগ শক্তি বা বিকর্ষণ শক্তি। এই কেন্দ্রাতিগ শক্তির কারণেই ভূ-পৃষ্ঠের জলরাশি বাইরের দিকে প্রবাহিত হয় এবং জোয়ার ভাঁটার সৃষ্টি হয়।

জোয়ার ভাঁটা সৃষ্টির ক্ষেত্রে কেন্দ্রাতিগ শক্তি একটি প্রধান শক্তি পৃথিবী নিজ কক্ষ পথে ঘূর্ণনের সময় নিম্নোক্ত সূত্রানুযায়ী কেন্দ্রাতিগ শক্তি কাজ করে ; যথাঃ

$$F_c = \frac{MV^2}{r}$$

এখানে, Fc = কেন্দ্রাবিমুখী শক্তি/কেন্দ্রাতিগ শক্তি
M = পৃথিবীর ভর
V = পৃথিবীর গতিবেগ
r = পৃথিবীর ব্যাসার্ধ

শিক্ষার্থীর কাজ	জোয়ার ভাঁটা সংঘটনের কারণ ব্যাখ্যা করুন।

সারসংক্ষেপ

চন্দ্র ও সূর্যের আকর্ষণে বিভিন্ন সময়ে সমুদ্রের পানি ফুলে উঠে ও নেমে যায়। এই ফুলে উঠাকে জোয়ার ও নেমে যাওয়াকে বলা হয় ভাঁটা। মূলত দু'টি কারণে জোয়ার ভাঁটা সংঘটিত হয়। যথা- (১) মহাকর্ষণ শক্তির প্রভাব ও (২) কেন্দ্রাতিগ শক্তির প্রভাব। প্রতি ১২ ঘন্টা ২৬ মিনিট পরপর এই জোয়ার ভাঁটা সংঘটিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। জোয়ার ও ভাঁটার কারণ কীসের প্রভাব?
(ক) পৃথিবীর সাথে গ্রহ নক্ষত্রের আকর্ষণ (খ) গ্রহ-নক্ষত্রের সাথে চন্দ্র ও সূর্যের আকর্ষণ
(গ) পৃথিবীর সাথে চন্দ্র ও সূর্যের আকর্ষণ (ঘ) পৃথিবীর সাথে সূর্যের আকর্ষণ

২। কোনটি না থাকলে জোয়ার ভাঁটা সম্ভব হত না?
i ঋতুর পরিবর্তন ii. মহাকর্ষ শক্তি iii. পৃথিবীকে কেন্দ্র করে চন্দ্রের আবর্তন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ.

৩। কেন্দ্রাতিগ শক্তির ফলাফল-
i. অমাবস্যা ও পূর্ণিমা ii. গৌণ জোয়ার
iii. ভূ-পৃষ্ঠের জলরাশি কেন্দ্র থেকে বাইরের দিকে প্রবাহিত হওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১২.২ জোয়ার ভাঁটার শ্রেণিবিভাগ
(Classification of Wave and Tide)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- জোয়ার ভাঁটার শ্রেণিবিভাগ বর্ণনা করতে পারবেন।

জোয়ার ভাঁটার শ্রেণিবিভাগ

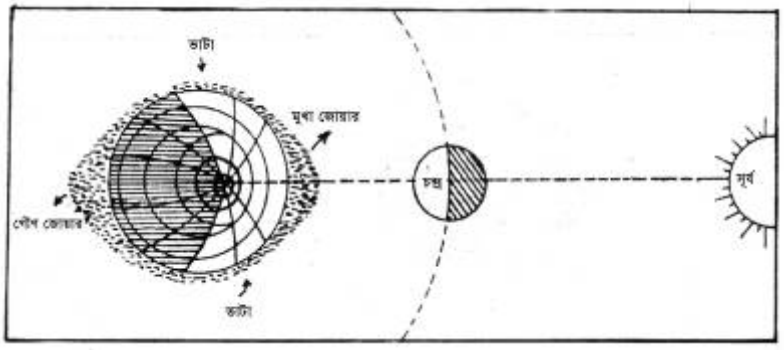
জোয়ার ভাঁটাকে মূলত দুইটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে শ্রেণিবিভাগ করা যায়। যথা-

ক. চন্দ্রের অবস্থান ভিত্তিতে এবং খ. পানির উচ্চতা ভিত্তিতে।

ক. **চন্দ্রের অবস্থান ভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ :** চন্দ্রের অবস্থানের ভিত্তিতে জোয়ার ভাঁটাকে মূলত দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা- ১. মুখ্য জোয়ার এবং ২. গৌণ জোয়ার (চিত্র-১২.২.১)।

১. মুখ্য জোয়ার (Primary Tide) : চন্দ্র সর্বদা পৃথিবীর চারদিকে আবর্তনশীল। চন্দ্রের এ আবর্তনকালে যে অংশ পৃথিবীর সবচেয়ে নিকটে অবস্থান করে সেখানে চন্দ্রের আকর্ষণ সর্বাপেক্ষা বেশি থাকে। সাধারণত কঠিন স্থলভাগের চেয়ে জলভাগের উপর এই প্রভাব বেশি থাকায় পৃথিবীর জলরাশি মূলত কেন্দ্রস্থলের দিকে প্রবাহিত হয়। একই সময়ে এবং একই সঙ্গে পৃথিবীর কেন্দ্রাতিগ শক্তি কার্যকর হয় বলেই সে সময় জোয়ার সৃষ্টি হয়। এরূপ জোয়ারকে বলা হয় মুখ্য জোয়ার বা প্রত্যক্ষ জোয়ার ।

২. গৌণ জোয়ার (Secondary Tide) : চন্দ্র পৃথিবীর যে পাশে আকর্ষণ করে তার বিপরীত দিকে অর্থাৎ প্রতিপাদ স্থানে পৃথিবীর আকর্ষণ শক্তি তুলনামূলক কম। পানির নিচের কঠিন স্থলভাগে চন্দ্রের আকর্ষণ কেন্দ্রস্থলের আকর্ষণের সমান। এ কারণেই বিপরীত দিকের জলরাশি থেকেও স্থলভাগ চন্দ্রের দিকে বেশি আকৃষ্ট হয়। এ সময় চন্দ্রের বিপরীত দিকে কেন্দ্রাতিগ শক্তির সৃষ্টি হয়। মূলত চন্দ্রের বিপরীত দিকের জলরাশির ওপর মহাকর্ষণ শক্তির প্রভাব তখন কমে যায়। এর ফলে চারদিক থেকে পানি ঐ স্থানে এসে জোয়ারের সৃষ্টি করে। চন্দ্রের বিপরীতে সৃষ্ট এই জোয়ারকে বলা হয় গৌণ বা পরোক্ষ জোয়ার।

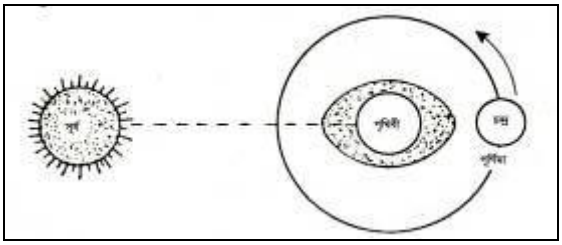


চিত্র-১২.২.১ : মুখ্য ও গৌণ জোয়ার

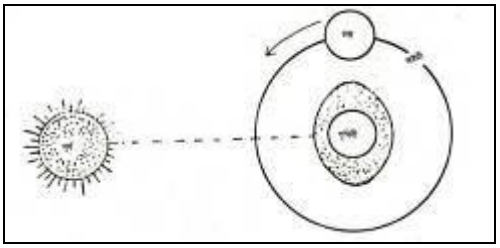
খ. পানির উচ্চতা ভিত্তিক শ্রেণিবিভাগ : পানির উচ্চতার উপর ভিত্তি করে জোয়ার ভাঁটাকে মূলত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১. তেজ কটাল বা ভরা কটাল এবং ২. মরা কটাল।

১. তেজ কটাল বা ভরা কটাল (Spring Tide) : চন্দ্রের মত সূর্যও জোয়ার ভাঁটা সৃষ্টিতে সাহায্য করে। যখন অমাবস্যার সৃষ্টি হয় তখন সূর্য, চন্দ্র ও পৃথিবী একই সরলরেখায় অবস্থান করে। অন্যদিকে পূর্ণিমার সময় পৃথিবীর একপাশে সূর্য ও অন্যপাশে চন্দ্র অবস্থান করে। এই সময় চন্দ্র, সূর্য ও পৃথিবী একই সরলরেখায় অবস্থান করে। এ সময় সূর্যের আকর্ষণ চন্দ্রের আকর্ষণকে সাহায্য করে। মূলত পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় চন্দ্র ও সূর্যের আকর্ষণে জোয়ারের পানি ফুলে উঠে। এই জোয়ারকেই বলা হয় ভরা কটাল বা তেজ কটাল। পূর্ণিমা তিথিতে পৃথিবী পৃষ্ঠের যে স্থানে চন্দ্রের প্রভাবে মুখ্য জোয়ার হয়, সে স্থানে সূর্যের প্রভাবে গৌণ জোয়ার হয়। আবার চন্দ্রের প্রভাবে যে স্থানে গৌণ জোয়ার হয় ঐ স্থানে সূর্যের আকষর্ণে মুখ্য জোয়ার হয়।

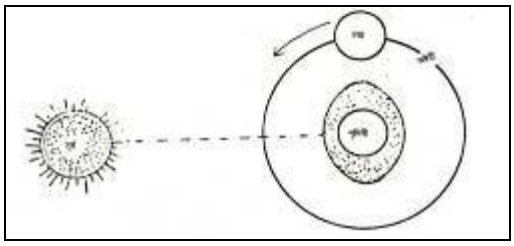


চিত্র ১২.২.২: অমাবস্যা তিথিতে ভরা কটাল



চিত্র ১২.২.৩ : পূর্ণিমা তিথিতে ভরা কটাল

২. মরা কটাল (Neap Tide) : সপ্তমী ও অষ্টমী তিথিতে চন্দ্র ও সূর্য একই সরলরেখায় অবস্থান করে না। এ সময় চন্দ্র ও সূর্য পৃথিবীর সাথে এক সমকোণে থেকে পৃথিবীকে আকর্ষণ করে। এই সময় তারা পৃথিবীকে আড়াআড়ি আকর্ষণ করে এবং এই আকর্ষণ বেগ কম হয়। এ সময় চন্দ্রের আকর্ষণে চন্দ্র ও তার বিপরীত দিকে জোয়ার হয়। কিন্তু চন্দ্রের আকর্ষণ সূর্য হতে বেশি বলে সূর্য ও তার বিপরীত দিকে ভাঁটা হয়। সপ্তমী ও অষ্টমী তিথিতে জোয়ারের তীব্রতা সবচেয়ে কম থাকায় এইরূপ জোয়ারকে বলা হয় মরা কটাল (চিত্র ১২.২.৪)।



চিত্র ১২.২.৪ : অষ্টমীর মরা কটাল

শিক্ষার্থীর কাজ	তেজ কটাল ও মরা কটালের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করুন।

সারসংক্ষেপ

চন্দ্রের অবস্থানের উপর ভিত্তি করে মুখ্য ও গৌণ জোয়ার হয়। অন্যদিকে পানির উচ্চতার উপর ভিত্তি করে সংঘটিত হয় মরা কটাল এবং ভরা কটাল। মুখ্য জোয়ারকে বলা হয় প্রত্যক্ষ জোয়ার এবং চন্দ্রের বিপরীতে সৃষ্ট জোয়ারকে বলা হয় গৌণ জোয়ার। পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় চন্দ্রের আকর্ষণের ভরা কটাল সংঘটিত হয়। আবার সপ্তমী ও অষ্টমী তিথিতে মরা কটাল সংঘটিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কোনটি প্রত্যক্ষ জোয়ার?

(ক) গৌণ জোয়ার (খ) তেজ কটাল (গ) মুখ্য জোয়ার (ঘ) মরা জোয়ার

২। নিচের তথ্যগুলো লক্ষ্য করুন-

i. গৌণ জোয়ার শুধুমাত্র অমাবস্যায় দেখা যায়।
ii. মুখ্য জোয়ারে চন্দ্র পৃথিবীর যে দিকে অবস্থিত, সেই দিকে আকর্ষণ বেশি থাকে।
iii. মুখ্য জোয়ারে কেন্দ্রাতিগ শক্তি ও মহাকর্ষণ শক্তি সমান থাকে।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩। মরা কটালের বৈশিষ্ট্য হলো-

i. সপ্তমী ও অষ্টমী তিথিতে চন্দ্র ও সূর্য একই সরলরেখায় অবস্থান করে।
ii. পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় চন্দ্র ও সূর্যের আকর্ষণে জোয়ার ভাঁটা হয়।
iii. সপ্তমী ও অষ্টমী তিথিতে জোয়ার তুলনামূলকভাবে কম হয়।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

পাঠ-১২.৩ জোয়ার ভাঁটার সময় ও ব্যবধান
(Time and Difference of Wave and Tide)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- জোয়ার ভাঁটার সময় ও ব্যবধান সর্ম্পকে বলতে পারবেন।

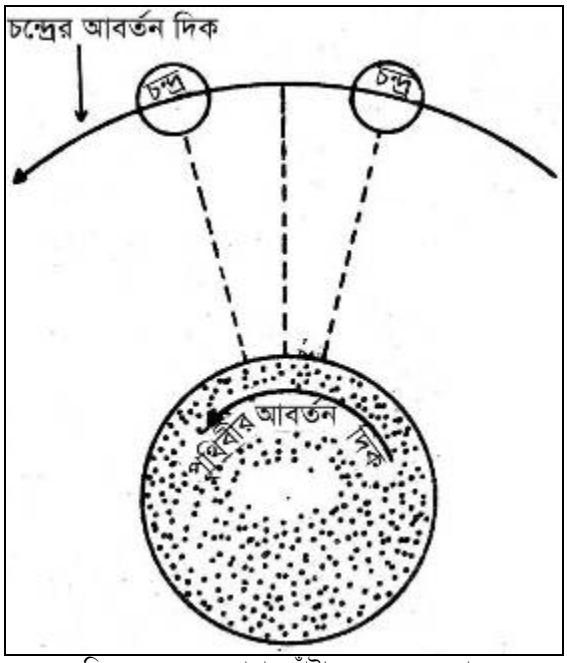
জোয়ার ভাঁটার সময়

পৃথিবীর আহ্নিক গতির কারণে বিভিন্ন অংশে প্রতিদিন দু'বার করে জোয়ার ও দু'বার করে ভাঁটা হয়ে থাকে। পশ্চিম থেকে পূর্বে পৃথিবী ২৪ ঘন্টায় একবার নিজ অক্ষের ওপর ঘোরে। চন্দ্রও নিজ কক্ষপথে অবস্থান করে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে ঘোরে এবং পৃথিবীর চারদিকে পরিক্রমণ করে। চন্দ্র যদি স্থির থাকত তবে পৃথিবীর প্রত্যেক স্থান ২৪ ঘন্টা অন্তর একবার চাঁদের সামনে আসত এবং ঐ স্থানে মুখ্য জোয়ার হত। চন্দ্র যেহেতু নিজ কক্ষপথে সাড়ে উনত্রিশ দিনে পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করে, সেহেতু এটি একদিনে তার কক্ষের সাড়ে উনত্রিশ ভাগের একভাগ অগ্রসর হয়। কাজেই পৃথিবীর একবার আর্বতন সময়ে অর্থাৎ ২৪ ঘন্টায় চন্দ্র নিজ কক্ষের প্রায় ১৩° পথ অগ্রসর হয়। সম্পূর্ণ একবার ঘুরে আসার পর ভূ-পৃষ্ঠের কোণ মধ্যরেখায় পুনরায় চাঁদের ঠিক নিচে আসতে ঐ ১৩° পথ বেশি অগ্রসর হতে হয়। এই ১৩° পথ অগ্রসর হতে পৃথিবীর আরো ১৩×৪=৫২ মিনিট সময় লাগে। তাই আজ যে জায়গায় মুখ্য জোয়ার হলো, আগামীকাল সেই জায়গায় মুখ্য জোয়ার ঠিক ২৪ ঘন্টা পর না এসে ২৪ ঘন্টা ৫২ মিনিট অর্থাৎ প্রায় ২৫ ঘন্টা পরে আসে।

এক মুখ্য জোয়ার চলে যাবার ১২ ঘন্টা ২৬ মিনিট অর্থাৎ প্রায় সাড়ে বার ঘন্টা পরে সেই জায়গায় গৌণ জোয়ার এবং ঐ স্থানের প্রত্যেক জোয়ারের প্রায় ৬ ঘন্টা ১৩ মিনিট অর্থাৎ প্রায় সোয়া ছয় ঘন্টা পরে ভাঁটা হয়।

জোয়ার-ভাঁটার ব্যবধান

উন্মুক্ত সমুদ্রে জোয়ারের পানি খুব বেশি ফুলে ওঠে না। জোয়ার ও ভাঁটার মধ্যে মাত্র কয়েক মিটারের ব্যবধান দেখতে পাওয়া যায়। উপকূলের কাছে এ অবস্থার পরিবর্তন দেখা যায়। বড় বড় সাগর, মহাসাগরে জোয়ারের পানি ১-২ মিটারের বেশি উঁচু হয় না। কিন্তু স্থানভেদে উপকূলের কাছে নদীর খাড়ি, মোহনা, পোতাশ্রয় এবং সাগরের মহীসোপানে জোয়ারের স্রোত ৩ থেকে ৪ এবং ৯ থেকে ১২ মিটার পর্যন্ত উঁচু হয়ে থাকে। উন্মুক্ত উপসাগরে ভাঁটার সময় পানির গভীরতা অপেক্ষা জোয়ারের সময়ের গভীরতা ২১ মিটারের বেশি হয়। ভূ-মধ্যসাগর, লোহিত সাগর, কৃষ্ণ সাগর ও বাল্টিক সাগর প্রায় চারদিক স্থল বেষ্টিত থাকায় সেসব জলাশয়ে মহাসাগরের জোয়ার ভাঁটার প্রভাব খুব কম দেখা যায়।



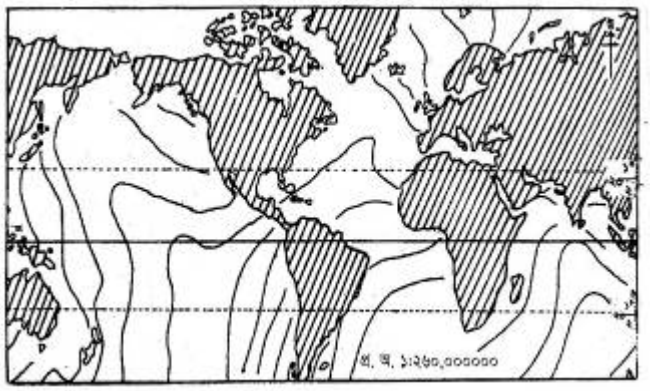
চিত্র ১২.৩.১ : জোয়ার ভাঁটার সময়ের ব্যবধান

জোয়ার ভাঁটার বিস্তৃতি (Tidal Range)

উচ্চ জোয়ারের সময় পানির সর্বোচ্চ উচ্চতা ও নিম্ন জোয়ারের সময় পানির সর্বনিম্ন উচ্চতার ব্যবধানকে জোয়ার ভাঁটার বিস্তৃতি বা টাইডাল রেঞ্জ বলে। টাইডাল রেঞ্জ সাধারণত ১ মিটার থেকে ২০ মিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। ভৌগোলিক অবস্থা ও এলাকার জ্যামিতিক আকৃতি অনুযায়ী টাইডাল রেঞ্জ এর বিভিন্নতা হয়।

সমজোয়ার রেখা

সমুদ্রের অনেক স্থানে একই সঙ্গে জোয়ার আসতে দেখা যায়। পৃথিবী পৃষ্ঠে যেসব স্থানে একই সময়ে জোয়ার আসে সেসব স্থানগুলোকে কাল্পনিক রেখা দ্বারা যোগ করলে যে রেখাসমূহ পাওয়া যায় তাকে 'সমজোয়ার' রেখা (Co-tidal-lines) বলে (চিত্র ১২.৩.২)। নাবিকদের জন্য এই সমজোয়ার রেখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।



চিত্র ১২.৩.২ : সমজোয়ার রেখার বণ্টন

শিক্ষার্থীর কাজ	জোয়ার ভাঁটার সময় ব্যবধান বলতে কী বুঝায়?

সারসংক্ষেপ

চন্দ্র পৃথিবীকে ক্রমাগত পরিক্রমণ করছে বলে জোয়ার ও ভাঁটার সময়ের পার্থক্য তৈরি হয়। প্রত্যেক মুখ্য জোয়ারের ১২ ঘন্টা ২৩ মিনিট পর ঐ স্থানে গৌণ জোয়ার হয়। একইভাবে প্রত্যেক জোয়ারের ৬ ঘন্টা ১৩ মিনিট পর ঐ স্থানে ভাঁটা হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। জোয়ার ও ভাঁটার সময়ের পার্থক্য কত ?

(ক) ৬ ঘন্টা ১০ মিনিট (খ) ৬ ঘন্টা ১৫ মিনিট (গ) ৬ ঘন্টা ১৩ মিনিট (ঘ) ৮ ঘন্টা

২। টাইডাল রেঞ্জ-এর দৈর্ঘ্য কত ?

(ক) ১-১০ মিটার (খ) ১-১৫ মিটার (গ) ১-২০ মিটার (ঘ) ১-২৫ মিটার

৩। একদিনে চন্দ্র কত ডিগ্রি কৌণিক পথ অতিক্রম করে ?

(ক) ১০° (খ) ১৩° (গ) ১৫° (ঘ) ১৭°

৪। সাধারণত জোঁয়ারের পানি কত উঁচু হয় ?

(ক) ১-২ মি. (খ) ৩-৪ মি. (গ) ৫-৬ মি. (ঘ) ১-৪ মি.

পাঠ-১২.৪ বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে জোয়ার ভাঁটার প্রভাব
(Effect of Wave and Tide on Coastal Area of Bangladesh)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় জোয়ার ভাঁটার প্রভাব বলতে পারবেন।

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে জোয়ার ভাঁটার প্রভাব

বাংলাদেশ একটি নদীমাতৃক দেশ। আর দক্ষিণে অবস্থিত বঙ্গোপসাগর। ফলে বঙ্গোপসাগরের উপকূলীয় অঞ্চলে জোয়ার ভাঁটা আশীর্বাদ বয়ে নিয়ে আসে। যা বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ওপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে। যা দ্বারা মানুষ নানাভাবে উপকৃত হয়ে থাকে। নিম্নে জোয়ার ভাঁটার সুফল ও কুফলসমূহ আলোচনা করা হলো।

সুফল

১. **ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা :** জোয়ার ভাঁটার ফলে সমুদ্রগামী জাহাজ চলাচলে বিশেষ সুবিধা হয়। জোয়ারের সময় নদীর মোহনায় ও তার অভ্যন্তরে পানি বেশি উঁচু হয়। ফলে বড় বড় সমুদ্রগামী জাহাজগুলো আমদানিকৃত পণ্য নিয়ে সহজেই নদীতে প্রবেশ করতে পারে এবং ভাঁটার টানে এসব জাহাজ রপ্তানিকৃত পণ্য নিয়ে সহজেই সমুদ্রে চলে যেতে পারে। এ কারণে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে চট্টগ্রাম ও মংলা নামক দুটি সমুদ্র বন্দর গড়ে উঠেছে। এ বন্দর দুটি গড়ে উঠায় ঐসব এলাকায় বহু শিল্প-কারখানা গড়ে উঠেছে এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পথ সুগম করেছে।

২. **নদীর পানি নির্মল থাকা :** জোয়ার ভাঁটার ফলে নদীর পানি নির্মল থাকে। দৈনিক দু'বার করে জোয়ার ভাঁটা হওয়ার ফলে নদীতে সঞ্চিত সব আবর্জনা ধুয়ে মুছে যায়। ফলে পরিবেশ থাকে পরিচ্ছন্ন।

৩. **নদী মুখ নৌ চলাচলযোগ্য থাকা :** জোয়ার ভাঁটার জন্য পলিমাটি পড়ে নদীর মুখ বন্ধ হয়ে যেতে পারে না। ফলে নৌ চলাচলযোগ্য থাকে। ইংল্যান্ডের টেমস্ নদীতে জোয়ার ভাঁটার ফলে পলি জমতে পারে না বলে সর্বদা নাব্য থাকে।

৪. **লবণ উৎপাদন কেন্দ্র :** জোয়ার ভাঁটার ওপর নির্ভর করে সমুদ্র উপকূলে লবণ তৈরির কারখানা গড়ে ওঠে। জোয়ারের সময় সমুদ্রের পানি লবণ উৎপাদন কেন্দ্রের অগভীর চওড়া জলাশয়ে প্রবেশ করে। পরে ঐ আবদ্ধ পানিরাশিকে শুকিয়ে লবণ তৈরি করা হয়।

৫. **সেচ কাজে সুবিধা :** উপকূলীয় অঞ্চলে অনেক নদীর পাশে খাল খনন করে পানি আটকিয়ে জমিতে সেচ দেয়া হয়। ফলে উপকূলীয় অঞ্চলে কৃষিক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নতির সম্ভাবনা তৈরি হয়।

৬. **মৎস্য বন্দর ও মৎস্য ব্যবসা কেন্দ্র :** জোয়ার ভাঁটার প্রভাবে সমুদ্রের মৎস্য বন্দর ও মৎস্য ব্যবসায় কেন্দ্র গড়ে উঠেছে। বাংলাদেশে প্রায় ৭১৬ কিলোমিটার উপকূল রেখা রয়েছে। এসব উপকূল রেখার বিভিন্ন অংশ দিয়ে বহু নদী, অসংখ্য শাখানদীসহ বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়েছে। তাই উপকূল রেখার সর্বত্রই অসংখ্য ছোট-বড় নদীর মোহনা ও খাঁড়ি বিদ্যমান। এসব মোহনা ও খাঁড়িতে মৎস্য খাদ্যের প্রাচুর্যতা থাকায় অসংখ্য মৎস্য সে ভিড় জমায় এবং প্রচুর মৎস্য ধরা পড়ে। এ অঞ্চলের ধৃত মৎস্যের মধ্যে ভেটকি, কোরাল, চান্দা, রূপচান্দা, চিংড়ি, গলদা চিংড়ি, পোয়া, স্যামন এবং ছুরিমাছ প্রভৃতি প্রধান। এ সকল মৎস্য দেশ-বিদেশের বাজারে বিক্রি করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করা হয়।

৭. **কর্মসংস্থান :** উপকূলীয় জোয়ার ভাঁটার প্রভাবে মৎস্য ক্ষেত্রে বহু লোক কাজে নিয়োজিত থাকে যা তা দেশের বেকারত্ব হ্রাসে সহায়তা করে।

কুফল

১. **কৃষি জমি উর্বরতা হ্রাস :** উপকূলীয় অঞ্চলে কৃষি জমিতে জোয়ারের পানি প্রবেশ করলে জমির উর্বরতা শক্তি হ্রাস পায়। এর ফলে উৎপাদন ক্ষমতা কমে যায়।

২. **জানমালের ক্ষতি :** তীব্র জোয়ারের ফলে উপকূলীয় অঞ্চলে জানমালের ক্ষতি হতে পারে।

৩. **নৌযান ডুবি :** তীব্র জোয়ারের ফলে ক্ষুদ্র নৌযান ডুবে যেতে পারে।

সুতরাং বলা যায় যে, বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের জোয়ার ভাঁটার প্রভাব দেশের কৃষিক্ষেত্র, ব্যবসায়-বাণিজ্য, যোগাযোগ ব্যবস্থা ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে থাকে। যদিও এর সামান্য কিছু কুফল রয়েছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের জীবনযাত্রায় জোয়ার ভাঁটা কী ধরনের প্রভাব ফেলে তা বর্ণনা করুন।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে জোয়ার ভাঁটার নানামুখী প্রভাব রয়েছে। নদীপ্রবাহ, শিল্প বিকাশ, নৌযান চলাচল, পানিসেচ সুবিধা, পলিমাটি উৎপাদনসহ নানাভাবে জোয়ার ভাঁটা প্রভাবিত করলেও এর কিছু কুফল আছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১২.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। নিচের তথ্যগুলো খেয়াল করুন-

i. জোয়ার ভাঁটার কারণে উপকূলে লবণ শিল্প গড়ে উঠেছে ii. জাহাজ ও নৌযান চলাচলে সহজ
iii. জোয়ার ভাঁটার কুফল হলো নদীতে মাছ মরে যাওয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

২। পানিসেচ পদ্ধতিতে জোয়ার ভাঁটা প্রভাব রাখে-

i. জোয়ারের সময় পানি নেমে গিয়ে ii. ভাঁটার সময় পানি ফুলে উঠে
iii. নদীর পাশে খাল খনন করে পানি সঞ্চয় করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল-১

নাসরিন তার বাবার সাথে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে বেড়াতে গেলেন। তারা সকাল বেলা সমুদ্রের এক ধরনের রূপ এবং সন্ধ্যায় অন্যরূপ দেখলেন। নাসরিন তার বাবার কাছে এর কারণ জানতে চাইলেন। নাসরিনের বাবা এর কারণ ও ফলাফল বুঝিয়ে বললেন।

ক. জোয়ার ভাঁটা বলতে কী বুঝায়?
খ. জোয়ার ভাঁটা কত প্রকার ও কী কী?
গ. উদ্দীপকের ঘটনাটির কারণ ব্যাখ্যা করুন।
ঘ. প্রতিদিন একই স্থানে জোয়ারের পার্থক্য হয় কেন? বর্ণনা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১২.১ : ১. গ ২. খ ৩. খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১২.২ : ১. গ ২. খ ৩. খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১২.৩ : ১. গ ২. গ ৩. খ ৪. ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১২.৪ : ১. ক ২. খ

জীববৈচিত্র্য
(Biodiversity)

ইউনিট ১৩

ভূমিকা

পৃথিবীতে কালের বিবর্তনের সাথে পরিবেশগত যে পরিবর্তন ঘটে তার ফলে সকল প্রকারের জীবের মধ্যে বিরাজমান প্রজাতিগত, জীনগত ও পরিবেশগত বিভিন্নতার জন্য যে বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায় তাই জীববৈচিত্র্য। এই ইউনিটে জীববৈচিত্র্য, ইকোলজি, ইকোসিস্টেম, বায়োম, জীব-ভূ-রাসায়নিক চক্র, কার্বন চক্র, নাইট্রোজেন চক্র, বাংলাদেশের বনাঞ্চল এবং বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।





ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ ১৩.১ : জীববৈচিত্র্য
পাঠ ১৩.২ : ইকোলজি, ইকোসিস্টেম ও বায়োম
পাঠ ১৩.৩ : জীব-ভূ-রাসায়নিক চক্র
পাঠ ১৩.৪ : কার্বন চক্র
পাঠ ১৩.৫ : নাইট্রোজেন চক্র
পাঠ ১৩.৬ : বাংলাদেশের বনাঞ্চল
পাঠ ১৩.৭ : বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য

পাঠ-১৩.১ জীববৈচিত্র্য (Biodiversity)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- জীববৈচিত্র্য কাকে বলে তা জানতে পারবেন এবং
- জীববৈচিত্র্যের প্রকারভেদ সম্পর্কে বলতে পারবেন।

জীববৈচিত্র্য

পৃথিবী পৃষ্ঠের জল ও স্থলভাগে বসবাসকারী সকল প্রকার জীবের মধ্যে বিরাজমান জীনগত, প্রজাতিগত ও বাস্তুতান্ত্রিক বিভিন্নতা ও সংখ্যা প্রাচুর্যতা রয়েছে এবং কালের ক্রমধারায় পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিজেদের বৈচিত্র্যময় অবস্থার পরিবর্তন ও বিকাশ ঘটানোকে বলা হয় জীববৈচিত্র্য। ভৌগোলিক বৈচিত্র্যময় পরিবেশে বিভিন্ন প্রজাতিসমূহের মধ্যে আন্তঃগোষ্ঠিয় বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। প্রাকৃতিক পরিবেশে মানবসৃষ্ঠ কারণে নানা রকম পরিবর্তনের সাথে সাথে তাই জীবজগত ও পরিবেশের বিকাশ, বসবাস, বংশবিস্তারের মধ্যেও ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। পৃথিবীতে সময়ের সাথে সাথে হাজার হাজার প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণির আবির্ভাব হয়েছে। তবে জীবের প্রয়োজনে অন্য জীবের সৃষ্টি ও বিলুপ্তির প্রক্রিয়াও প্রচলিত রয়েছে।

জীববৈচিত্র্যের প্রকারভেদ : জীববৈচিত্র্যকে প্রধানত তিনভাগে ভাগ করা যায়। নিম্নের ছকে তা দেখানো হলো-



১. **বাস্তুতান্ত্রিক জীববৈচিত্র্য :** কোনো নির্দিষ্ট অঞ্চলে বিরাজমান জীবের ভৌত ও পারিবেশগত বিভিন্নতাকে বাস্তুতান্ত্রিক জীববৈচিত্র্য বলে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরনের জলবায়ু ও প্রাকৃতিক পরিবেশ বিরাজমান। প্রত্যেকটি বাস্তুতন্ত্রে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যমন্ডিত বৈচিত্র্যময় জীবজগতের সৃষ্টি হয়।

২. **প্রজাতিগত জীববৈচিত্র্য :** ভিন্ন প্রজাতির জীবের মধ্যে যে বৈচিত্র্যতা বিদ্যমান তাকে প্রজাতিগত জীববৈচিত্র্য বলা হয়। এরূপ বৈচিত্র্য কোনো নির্দিষ্ট এলাকায় বিরাজমান মোট প্রজাতির সংখ্যা দ্বারা পরিমাপিত হয়।

৩. **জীনগত জীববৈচিত্র্য :** উদ্ভিদ ও প্রাণির প্রতিটি সদস্যই তাদের জীনগত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে পরস্পর আলাদা। জীবগোষ্ঠির এই জীনগত বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যতাই জীনগত জীববৈচিত্র্য। জীনগত ভিন্নতার কারণেই আমেরিকান শ্বেতাঙ্গ ও আফ্রিকান কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের গায়ের রং, চুলের প্রকৃতি, নাক ও ঠোঁটের আকৃতি, উচ্চতা ইত্যাদির অনেক পার্থক্য বিদ্যমান।

জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব : পৃথিবীর জীবকূল এবং অজীব উপাদান পারস্পরিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে জীব প্রবাহকে অক্ষুণ্ন রাখে। সুতরাং জীবকূলের মধ্যে বৈচিত্র্যের আধিক্য অজীব উপাদানের সাথে আদান-প্রদানের মাত্রাকে বাড়িয়ে দেয়। ফলে জীবজগতের শক্তির প্রবাহ বৃদ্ধি পায়। এতে মানুষসহ সকল জীবই বিলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পায়। এছাড়া মানুষ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিভিন্ন প্রজাতির জীবকে ব্যবহার করে উপকৃত হয়। এভাবে বহুমুখী দিক থেকে জীবজগতের প্রতিটি জীবেরই রয়েছে স্বকীয় ভূমিকা। সুতরাং বলা যায় যে, জীববৈচিত্র্যের বাস্তুতান্ত্রিক এবং অর্থনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম।

জীববৈচিত্র্যের অবনতির কারণ : জীববৈচিত্র্যের অবনতির অর্থ হলো জীবগত বৈচিত্র্যের অবলুপ্তি এবং পরিবেশগত পদ্ধতিসমূহের ক্ষতিসাধন, যা জীবগোষ্ঠির পুনরুৎপাদনকে প্রতিহত করে। ফলে প্রাথমিক অবস্থায় আঞ্চলিক প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটে এবং চরম পর্যায়ে সমগ্র প্রজাতির বিলুপ্তি ঘটে। জীববৈচিত্র্য অবনতির কারণসমূহকে দুইভাবে

ভাগ করা যায়। যথা-

ক. প্রাকৃতিক কারণ : জীববৈচিত্র্য অবনতির প্রাকৃতিক কারণগুলোর মধ্যে রয়েছে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, ভূমিকম্প, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা, খরা, দাবানল প্রভৃতি।

খ. মানব সৃষ্ট কারণ : মানুষের বিভিন্ন কর্মকান্ড এবং এসব কর্মকান্ডের প্রতিক্রিয়া জীববৈচিত্র্যের অবনতি ঘটায়। যেমন- দূষণ, এসিড বৃষ্টি, খনিজ সম্পদের অনুসন্ধান, জৈবিক সম্পদের অতিমাত্রায় ব্যবহার, হাইব্রিড প্রজাতি, জনসচেতনতার অভাব প্রভৃতি।

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ : জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের দুইটি পদ্ধতি রয়েছে। যথা-
ক. স্ব-স্থানে সংরক্ষণ এবং খ. অন্যস্থানে সংরক্ষণ।

ক. স্ব-স্থানে সংরক্ষণ (In-Situ Conservation) : মূল বাসস্থানে অর্থাৎ নিজের স্বাভাবিক পরিবেশে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণকে স্ব-স্থানে সংরক্ষণ বলে। যেমন- সুন্দরবনের সুন্দরী গাছকে সুন্দরবনের সিক্ত, কর্দমাক্ত ও লবণাক্ত পরিবেশে সংরক্ষণ করাই স্ব-স্থানে সংরক্ষণ।

খ. অন্যস্থানে সংরক্ষণ (Ex-Situ Conservation) : জীববৈচিত্র্যের উপাদানসমূহকে তাদের মূল বাসস্থান বা স্বাভাবিক প্রাকৃতিক পরিবেশের বাইরে বাঁচিয়ে রাখাই হলো অন্যস্থানে সংরক্ষণ। যেমন- সুন্দরবনের সুন্দরী গাছকে ঢাকার বোটানিক্যাল গার্ডেনে লাগিয়ে সংরক্ষণ করাই হলো অন্যস্থানে সংরক্ষণ।

শিক্ষার্থীর কাজ	জীববৈচিত্র্যের প্রকারভেদ লিখুন।

সারসংক্ষেপ

কালের বিবর্তনের সাথে সাথে পরিবেশগত যে পরিবর্তন ঘটে তার সাথে সাথে পৃথিবীর সকল প্রকারের জীবের মধ্যে বিরাজমান প্রজাতিগত, জীনগত ও পরিবেশগত বিভিন্নতার জন্য যে বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায় তাই জীববৈচিত্র্য। জীববৈচিত্র্য প্রধানত তিন প্রকারের হয়। প্রাকৃতিক ও মানবসৃষ্ট কারণে জীববৈচিত্র্য বিনষ্ট হচ্ছে। জীববৈচিত্র্য দুইভাবে সংরক্ষণ করা যায়। যথা- স্ব-স্থানে সংরক্ষণ এবং অন্যস্থানে সংরক্ষণ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ১, ২ ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

রফিক তার বোন রেহেনাকে বলল যে মানুষ দিন দিন তার চারপাশের প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। পরিবেশের এই পরিবর্তনের সাথে সাথে প্রাণিজগৎ ও তার উৎপত্তি, বিকাশ ও অভিযোজন ক্ষমতারও পরিবর্তন সাধন হয়।

১। উদ্দীপকের আলোকে কোন পরিবর্তনকে বুঝানো হয়েছে?
(ক) বাস্তুসংস্থান (খ) জীববৈচিত্র্য
(গ) প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য (ঘ) খাদ্য শৃঙ্খল বৈচিত্র্য

২। জীববৈচিত্র্য প্রধানত কয় প্রকার?
(ক) ৩ (খ) ৪ (গ) ৫ (ঘ) ৬

৩। জীববৈচিত্র্যে জীবের কোন কোন বৈচিত্র্যের পরিবর্তন ঘটে?
i. জীনগত বৈশিষ্ট্যের ii. প্রাণির বৈচিত্র্য iii. বাস্তুতান্ত্রিক বৈশিষ্ট্য
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১৩.২ ইকোলজি, ইকোসিস্টেম ও বায়োম
(Ecology, Ecosystem and Biom)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- ইকোলজি ও ইকোসিস্টেম কাকে বলে তা বুঝতে পারবেন এবং
- বায়োম সম্পর্কে বর্ণনা করতে পারবেন।

ইকোলজি

প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে জীবজগতের যে আন্ত:সম্পর্ক এবং সেই সম্পর্কিত গবেষণা ও পঠন-পাঠনের শাস্ত্রকেই বলা হয় ইকোলজি বা বাস্তুতন্ত্র। ইকোলজি হলো এমনই এক বিজ্ঞান যা জৈব ও অজৈব উপাদানসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক, পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়া ব্যাখ্যা করে।

ইকোসিস্টেম বা বাস্তুসংস্থান : মানুষ, পশু-পাখি, জীবজন্তু প্রাকৃতিক নানা উপকরণ যেমন গাছপালা, মাটি, সূর্যালোক, পানি, বাতাসের উপর পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার দ্বারা নির্ভরশীল। জীব ও জড় পরিবেশের এই পারস্পরিক আন্তঃসম্পর্ককেই বলা হয় বাস্তুসংস্থান। পরিবেশ ও জীবের এই সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য এবং মানুষ, জীব ও পরিবেশ একে অন্যের জীবনধারণের প্রতিটি স্তরে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। কখনো কখনো এই প্রভাব হতে পারে ইতিবাচক আবার কখনো তা হতে পারে জীবন বিপন্নকারী।

বাস্তুসংস্থানের উপাদান : বাস্তুসংস্থানের উপাদান মূলত দুটি। যথা-

ক. সজীব উপাদান এবং খ. জড় উপাদান।

ক. সজীব উপাদান : সজীব সম্প্রদায় হলো বাস্তুসংস্থানের জীব উপাদান। সজীব উপাদান আবার তিন প্রকার। যথা-

১. উৎপাদক
২. খাদক এবং
৩. বিয়োজক।

১. **উৎপাদক :** সবুজ উদ্ভিদ পরিবেশ থেকে পানি, কার্বন ডাই-অক্সাইড, খনিজ লবণ প্রভৃতি জীব উপাদান গ্রহণ করে সৌরশক্তির মাধ্যমে নিজেদের শর্করা জাতীয় খাদ্য নিজেরা তৈরি করে। এ সবুজ উদ্ভিদই উৎপাদক।

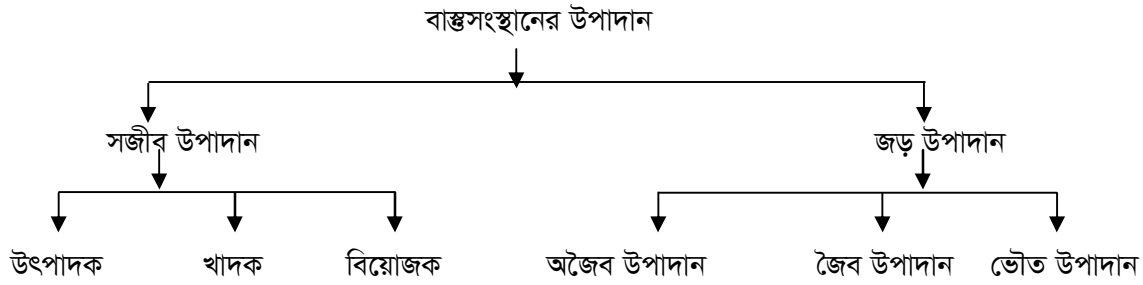
২. **খাদক :** ইকোসিস্টেম প্রক্রিয়ায় উৎপাদক কর্তৃক তৈরি খাদ্যের উপর নির্ভরশীল জীবগোষ্ঠিকে বলে খাদক। খাদক তিন প্রকার। যথা- প্রথম স্তরের খাদক, দ্বিতীয় স্তরের খাদক এবং তৃতীয় স্তরের খাদক।

৩. **বিয়োজক :** ইকোসিস্টেম প্রক্রিয়ায় উৎপাদক ও খাদকের মৃতদেহ মাটিতে মিশে ব্যাকটেরিয়া, ক্ষুদ্র পোকামাকড় ইত্যাদির দ্বারা বিয়োজক স্তর গড়ে উঠে। পরিশেষে উৎপাদক জীবগোষ্ঠি পুনরায় বিয়োজক স্তর হতে খাদ্য গ্রহণ করে দেহে পুষ্টি জোগায়।

উপরিউক্ত প্রক্রিয়ায় পরিবেশ থেকে সংগৃহীত অজীব উপাদানের পুন:পূরণ ঘটে এবং নির্দিষ্ট স্থানে অজীব ও সজীব পরিবেশের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বজায় থাকে।

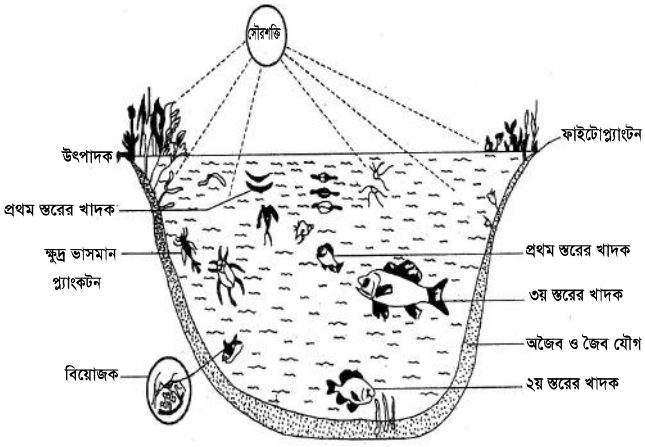
খ. জড় উপাদান : পরিবেশের সকল অজৈব ও জৈব উপাদান হলো বাস্তুসংস্থানের জড় উপাদান। জড় উপাদান আবার তিন প্রকার। যথা-

১. **অজৈব উপাদান :** মাটি, পানি, পটাশিয়াম, ক্যালশিয়াম, খনিজ লবণ ইত্যাদি হচ্ছে বাস্তুসংস্থানের অজৈব উপাদান।
২. **জৈব উপাদান :** উদ্ভিদ ও প্রাণির মৃতদেহ হতে তৈরি হিউমাস ও ইউরিয়া হলো মাটির জৈব উপাদান।
৩. **ভৌত উপাদান :** আবহাওয়া, জলবায়ু, মাটির গুণাগুণ বাস্তুসংস্থানের ভৌত উপাদান।



বাস্তুসংস্থানের উদাহরণ

একটি পুকুরে বসবাসকারী জীব সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রধান হচ্ছে ভাসমান ও সঞ্চারমান ক্ষুদ্র জীব অর্থাৎ প□াঙ্কটন। এছাড়া রয়েছে সবুজ শেওলা ও ক্ষুদ্র জলজ প্রাণি। আর জড় উপাদানের মধ্যে রয়েছে পানি, মাটি ও সৌরশক্তি ইত্যাদি। পুকুরের বাস্তুসংস্থানের উৎপাদক হচ্ছে সাধারণ ভাসমান ও অগভীর পানির বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ। যেমন- কচুরিপানা, শাপলা, হাইড্রিলা ইত্যাদি। বিভিন্ন প্রকার ভাসমান ক্ষুদ্র পোকা, মশার শুককীট প্রভৃতি প্রথম শ্রেণির খাদক। দ্বিতীয় শ্রেণির খাদক হলো খামারি আকৃতির মাছ, ব্যাঙ, কচ্ছপ ইত্যাদি। আর তৃতীয় শ্রেণির খাদকের মধ্যে রয়েছে বড় মাছ, বক, গাংচিল প্রভৃতি। মৃত্যুর পর একই নিয়মে জীবাণু, মৃতজীবি ছত্রাক, কাঁদায় বসবাসকারী পোকা বিয়োজকের কাজ করে। বিয়োজিত অজৈব লবণ পুকুরের উৎপাদক সম্প্রদায় খাদ্য উপাদান হিসেবে গ্রহণ করে। এভাবে পুকুরের প্রত্যেকটি উপাদান স্বাভাবিক নিয়মে নিজ নিজ কার্যাদি সম্পন্ন করে থাকে। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, একটি পুকুরের বাস্তুসংস্থান তার সুশৃঙ্খল ধারা বজায় রেখে ভারসাম্য বজায় রাখছে। কোনো কারণে এই শৃঙ্খলের ব্যত্যয় ঘটলে ভারসাম্যহীনতা তৈরি হয়। পুকুরের বাস্তুসংস্থানের অন্তর্গত কোনো একটি শ্রেণি নষ্ট বা ধ্বংশ হলে শৃঙ্খলা ভেঙ্গে যাবে।



চিত্র-১৩.২.১ : একটি পুকুরের বাস্তুসংস্থান

বায়োম : পৃথিবীর কোনো বিশাল অঞ্চলে প্রায় একই বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জীব সম্প্রদায় একত্রে যে সুসংহত জীবন গড়ে তুলে তাকে বায়োম বলে। বায়োমে যারা বাস করে তারা পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে একে অন্যকে প্রভাবিত করে। পৃথিবীর সকল বায়োম বা সজীব বস্তু মিলে গড়ে উঠে জীবমন্ডল। জীবমন্ডল হলো এক বিশাল বাস্তুসংস্থান যেখানে জীবের সম্মিলিত অস্তিত্ব গড়ে তুলে এক নতুন পরিবেশ। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়- পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে নানারকম আবহাওয়া, জলবায়ু ও প্রাকৃতিক পরিবেশের বৈশিষ্ট্যের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বায়োম গড়ে উঠে। যেমন- অরণ্য, মরুভূমি, তৃণভূমি ইত্যাদি। বায়োমে অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি সদস্যের মধ্যে সমতা বজায় থাকে।

বায়োমের বৈশিষ্ট্য : বায়োমের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো হলো-

১. বায়োমে বৈশিষ্ট্যসূচক উদ্ভিদ ও প্রাণি বিদ্যমান থাকে।

২. সকল বায়োম ক্রমবর্ধমান পর্যায়ে সিরিজ অতিক্রম করে বর্তমান পর্যায়ে পৌঁছেছে।

৩. আঞ্চলিক পরিবেশে এগুলোর প্রত্যেকটি মোটামুটি ভারসাম্য অবস্থা বহন করে।

৪. প্রত্যেক বায়োম প্রাকৃতিক অবস্থায় নিজস্ব ভারসাম্য প্রকাশ করে এবং এই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অন্য বায়োম হতে পৃথক।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাস্তুসংস্থান প্রক্রিয়াটি চিত্রসহ ব্যাখ্যা করুন।

সারসংক্ষেপ

ইকোলজি হলো জীবজগত ও প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে বিরাজমান যে আন্তঃসম্পর্ক সে সম্পর্কিত অধ্যয়ন শাস্ত্র। আর জীব, জড় ও পরিবেশের এই পারস্পরিক আন্তঃসম্পর্কই হলো বাস্তুসংস্থান। আবার একই বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন জীবজগত নিয়ে যে বিশাল বাস্তুসংস্থান গড়ে উঠে তাকে বলা হয় বায়োম।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. বাস্তুসংস্থানের উপাদান মূলত কতটি?
   (ক) ২ (খ) ৩ (গ) ৪ (ঘ) ৫
২. সজীব উপাদান কত প্রকার?
   (ক) ২ (খ) ৩ (গ) ৪ (ঘ) ৫
৩. জড় উপাদান নয় কোনটি?
   (ক) উৎপাদক (খ) অজৈব উপাদান (গ) জৈব উপাদান (ঘ) ভৌত উপাদান

পাঠ-১৩.৩ জীব-ভূ-রাসায়নিক চক্র (Bio-geo-chemical Cycle)



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- জীব-ভূ-রাসায়নিক চক্রের সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য বলতে পারবেন এবং
- জীব-ভূ-রাসায়নিক চক্রসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।



জীব-ভূ-রাসায়নিক চক্র

জীব-ভূ-রাসায়নিক চক্র এর ইংরেজি প্রতিশব্দ Bio-geo-chemical Cycles। Bio শব্দটির অর্থ জীব, geo শব্দের অর্থ পৃথিবী বা ভূ-ভাগ, chemical অর্থ রাসায়নিক এবং Cycle এর অর্থ চক্র। সুতরাং জীব-ভূ-রাসায়নিক চক্র বলতে বায়ুমন্ডল, মহাসাগর ও পলি রাশির মধ্য দিয়ে রাসায়নিক পদার্থের চক্রাকার সঞ্চালনকে বুঝায়। বৃহৎ অর্থে বলা যায় যে, জীব-ভূ-রাসায়নিক চক্র এমন একটি চক্র যেখানে বারিমন্ডল, অশ্বমন্ডল, বায়ুমন্ডল ও জীবমন্ডল নিয়ে গঠিত বিশাল জগতের মধ্য দিয়ে যাবতীয় রাসায়নিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এই চক্র অনুযায়ী পৃথিবী হতে জলাশয়ের পানি উত্তপ্ত হয়। অতপর বাষ্পীভূত হয়, এরপর ঘনীভূত হয়ে মেঘ হওয়ার পর পুনরায় বৃষ্টিরূপে পৃথিবীতে ফিরে আসে। জীব-ভূ-রাসায়নিক এই শব্দটির সাথে ভূ-তাত্ত্বিক, রাসায়নিক ও জীববিজ্ঞানের তাত্ত্বিক উপাদানসমূহ সম্পৃক্ত। জীব-ভূ-রাসায়নিক চক্র এমনই একটি প্রক্রিয়া যেখানে পৃথিবীর জৈব ও অজৈব উপাদানসমূহের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক তৈরি হয়। এই চক্রকে কখনো কখনো "পুষ্টি চক্র"ও বলা হয়। কারণ এই চক্রের মাধ্যমে প্রাণি ও উদ্ভিদ পর্যাপ্ত পুষ্টি উপাদান গ্রহণ করে থাকে।

বৈশিষ্ট্য : জীব-ভূ-রাসায়নিক চক্র অনুধাবন করতে হলে বর্তমানে বায়ুমন্ডল সম্পর্কিত বিদ্যা, বাস্তুসংস্থান সম্পর্কিত শাস্ত্র, ভূ-তত্ত্ব, মৃত্তিকা বিজ্ঞান ইত্যাদি পঠন-পাঠনে গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে। কারণ এই চক্রের মাধ্যমে উদ্ভিদ ও প্রাণি তাদের জীবনধারণের নানা পর্যায়ে প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল হয়ে বছরের পর বছর বংশ বিস্তার করে। সুতরাং পৃথিবীতে উদ্ভিদ, প্রাণি এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখতে এই চক্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

জীব-ভূ-রাসায়নিক চক্রের প্রক্রিয়াসমূহ : জীব-ভূ-রাসায়নিক চক্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রক্রিয়াসমূহ হলো-

১। কার্বন চক্র ২। নাইট্রোজেন চক্র ৩। অক্সিজেন চক্র
৪। ফসফরাস চক্র ৫। সালফার চক্র এবং ৬। পানি চক্র

১. **কার্বন চক্র :** যে প্রক্রিয়ায় কার্বন মৌল কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসরূপে পরিবেশ থেকে জীবদেহে এবং জীবদেহ থেকে পরিবেশে আবর্তিত হয়ে পরিবেশের মধ্যকার কার্বনের সমতা বজায় রাখে তাকে কার্বন চক্র বলে।

২. **নাইট্রোজেন চক্র :** যে প্রক্রিয়ায় বায়ুমন্ডলের নাইট্রোজেন জীবজগতে এবং জীবজগত থেকে নাইট্রোজেন বায়ুমন্ডলে আবর্তিত হয়ে পরিবেশে নাইট্রোজেন সমতা রক্ষা করে তাকে নাইট্রোজেন চক্র বলে।

৩. **অক্সিজেন চক্র :** যে প্রক্রিয়ায় পরিবেশের অক্সিজেন দহন ও শ্বসনের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং সালোক সংশ্লেষণের মাধ্যমে আবার অক্সিজেন তৈরি করে পরিবেশের মধ্যে অক্সিজেনের সমতা রক্ষা করে, সেই চক্রটিকে অক্সিজেন চক্র বলে।

৪. **ফসফরাস চক্র :** যে প্রক্রিয়ায় ফসফরাস মৌল পরিবেশ থেকে জীবদেহে এবং জীবদেহ থেকে পরিবেশে আবর্তিত হয়ে পরিবেশে সমতা বজায় রাখে, তাকে ফসফরাস চক্র বলে।

৫. **সালফার চক্র :** যে পদ্ধতিতে পরিবেশ থেকে জীবদেহে এবং জীবদেহ থেকে পরিবেশে সালফার আবর্তিত হয় এবং পরিবেশে সালফারের সমতা বজায় রাখে, তাকে সালফার চক্র বলে।

৬. **পানি চক্র :** সাগর, মহাসাগর, নদী, জলাশয় উদ্ভিদ প্রভৃতি থেকে পানি বাষ্পীভবনের মাধ্যমে বায়ুমন্ডলে প্রবেশ করে। পরবর্তীতে ঘণীভবনসহ বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় আবর্তিত হয়ে বারিপাতের মাধ্যমে পুনরায় ফিরে এসে পৃথিবীর পানির ভারসাম্য রক্ষা করে। একে পানি চক্র বলে।

বর্তমানে মানবসৃষ্ট কর্মকান্ডের নেতিবাচক প্রভাবে জীব-ভূ-রাসায়নিক চক্রের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে। বন্যপ্রাণি নিধন, গাছ কাটা, জমি ভরাট, জলাশয় নষ্ট করা, জীববৈচিত্র্যে হুমকি তৈরি করা, পরিবেশ দূষণ ইত্যাদি এদেশের আবহাওয়া ও জলবায়ুর পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। আর সে কারণে জীব-ভূ-রাসায়নিক চক্রের রাসায়নিক ও প্রকৃতিগত পরিবর্তন হচ্ছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	জীব-ভূ-রাসায়নিক চক্রসমূহের নাম লিখুন।

সারসংক্ষেপ

জীব-ভূ-রাসায়নিক চক্র এমনই একটি প্রক্রিয়া যেখানে যাবতীয় রাসায়নিক উপাদানগুলো পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে বায়ুমন্ডল, বারিমন্ডল, জীবমন্ডল ও অশ্মমন্ডলের মধ্য দিয়ে পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসে। জীব-ভূ-রাসায়নিক চক্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রক্রিয়াসমূহ হলো- কার্বন চক্র, নাইট্রোজেন চক্র, অক্সিজেন চক্র, ফসফরাস চক্র, সালফার চক্র এবং পানি চক্র।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। জীব-ভূ-রাসায়নিক চক্র গুরুত্বপূর্ণ-

i. উদ্ভিদের বংশ বিস্তার ii. তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয় iii. পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্ব বিরাজের জন্য

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২। কোনটি জীব-ভূ-রাসায়নিক চক্রে বিরূপ প্রভাব ফেলছে?

(ক) মাছ চাষ (খ) বন উজাড়

(গ) কম্পিউটার চালানো (ঘ) মশা নিধন

৩। কোনটি জীব-ভূ-রাসায়নিক চক্রের অর্ন্তগত?

(ক) কার্বন চক্র (খ) বন চক্র

(গ) পটাশিয়াম চক্র (ঘ) তরল চক্র

পাঠ-১৩.৪ কার্বন চক্র (Carbon Cycle)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

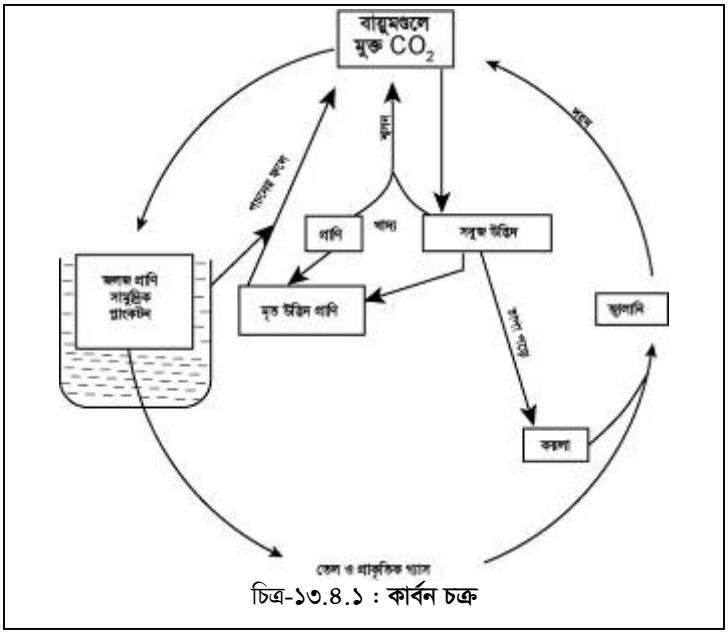
- কার্বন চক্র কী তা জানতে পারবেন এবং
- কার্বন চক্রের প্রক্রিয়ার বর্ণনা দিতে পারবেন।

কার্বন চক্র

জড় পরিবেশ এবং জীবদেহের মধ্যে কার্বন এর চক্রাকারে আবর্তন প্রক্রিয়াকে কার্বন চক্র বলে। কার্বন হলো জীবনের জন্য অত্যাবশ্যকীয় প্রোটিন, লিপিড, কার্বোহাইড্রেট, নিউক্লিক অ্যাসিড ইত্যাদি অণুর গঠন উপাদান। কার্বন বায়ুমন্ডলে CO_2 গ্যাস হিসেবে অবস্থান করে। কার্বন ডাই-অক্সাইড পরিবেশে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বায়ুমন্ডলে এর পরিমাণ শতকরা ০.০৩ ভাগ। CO_2 পানিতে দ্রবীভূত অবস্থায় কার্বনেট ও বাই কার্বনেট হিসেবে থাকে। এছাড়া কার্বন ভূ-গর্ভে খনিজ হিসেবেও পাওয়া যায়।

সালোকসংশ্লেষণ : বায়ুমন্ডলের CO_2 সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ কর্তৃক রাসায়নিক বস্তুতে (যেমন গ্লুকোজ) পরিণত হয়। উদ্ভিদ দেহের অন্যান্য রাসায়নিক বস্তু তৈরিতে গ্লুকোজ ব্যবহারিত হয়। উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় জড় পরিবেশ থেকে CO_2 গ্যাসকে জৈব যৌগে পরিণত করে। সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার রাসায়নিক সমীকরণ হলো-

$$\text{কার্বন ডাই-অক্সাইড} + \text{পানি} \rightarrow \frac{\text{সূর্যালোক}}{\text{ক্লোরোফিল}} + \text{পানি} + \text{গ্লুকোজ} + \text{অক্সিজেন}$$



চিত্র-১৩.৪.১ : **কার্বন চক্র**

শ্বসন : উদ্ভিদ দেহের গ্লুকোজ কোষীয় শ্বসন ক্রিয়ার জ্বালানি হিসেবে ব্যবহারিত হয়। উদ্ভিদজাত দ্রব্য বা উদ্ভিদাংশ খেয়ে যে সব প্রাণি বেঁচে থাকে তারাও গ্লুকোজকে তাদের শ্বসনে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করে। আবার যেসব অনুজীব উদ্ভিদ বা প্রাণির মৃতদেহের পচনকার্য ঘটিয়ে থাকে তারাও গ্লুকোজ ও অন্যান্য রাসায়নিক দ্রব্যকে শক্তির উৎস হিসেবে ব্যবহার করে।

ফলে সবাত শ্বসন প্রক্রিয়ায় কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয়ে পুনরায় বায়ুমন্ডলে চলে যায়। একই ধরনের কার্বন চক্র জলজ জীব এবং পানিতে দ্রবীভূত CO_2 এর মধ্যেও চলতে থাকে।

উদ্ভিদজাত পদার্থ : উদ্ভিদজাত পদার্থ যেমন- কাঠ, কয়লা, কাগজ, পেট্রোল ইত্যাদিতে কার্বন জমা থাকে। এসব পদার্থের দহনে কার্বন যৌগ ভেঙ্গে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস নির্গত হয় এবং বায়ুমন্ডলে মিশে যায়।

কার্বন চক্রের গুরুত্ব : কার্বন চক্র দ্বারা প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা হয়। এছাড়া কার্বন ছাড়া কোনো জৈব পদার্থ গঠিত হতে পারে না এবং সকল জীবদেহ গঠনে কার্বন চক্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

শিক্ষার্থীর কাজ	কার্বন চক্র কী তা লিখুন।

সারসংক্ষেপ

জীবনধারণের জন্য কার্বন গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বায়ুমন্ডলে কার্বন CO_2 গ্যাস হিসেবে উপস্থিত থাকে। সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়া ও শ্বসন প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ জড় পরিবেশ থেকে CO_2 গ্যাসকে জৈব যৌগে পরিণত করে। কার্বন চক্র জলজ জীব ও পানিতে দ্রবীভূত CO_2 এর মধ্যেও চলমান থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কার্বন পাওয়া যায় কীরূপে-

i. পানি ii. খনিজ iii. CO_2

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২। সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ দেহের অন্যান্য রাসায়নিক বস্তু কীসে পরিণত হয়?

(ক) গ্লুকোজ (খ) সুক্রোজ

(গ) মল্টোজ (ঘ) ফ্যাটিএসিড

৩। কোন প্রক্রিয়ায় কার্বন পুনরায় পৃথিবী পৃষ্ঠে ফিরে আসে?

(ক) অবাত শ্বসন (খ) সালোকসংশ্লেষণ

(গ) সবাত শ্বসন (ঘ) উপজাত পত্রক বিন্যাস মাধ্যম

পাঠ-১৩.৫ নাইট্রোজেন চক্র (Nitrogen Cycle)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- নাইট্রোজেন চক্র কী তা বলতে পারবেন এবং
- নাইট্রোজেন চক্রের প্রক্রিয়াগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

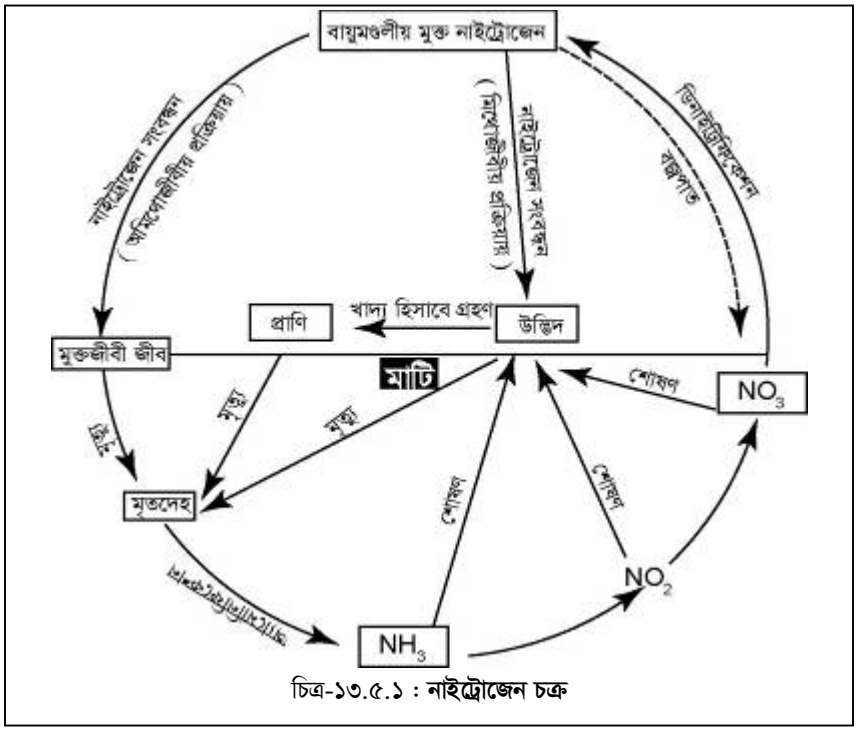
নাইট্রোজেন চক্র

নাইট্রোজেন চক্র জীব-ভূ-রাসায়নিক চক্রের অন্যতম অঙ্গ। নাইট্রোজেন চক্র এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে নাইট্রোজেন বিভিন্নভাবে রূপান্তরিত হয়। এই রূপান্তর জৈব ও শারীরিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। পৃথিবীতে বায়ুমন্ডলের শতকরা ৭৮.০২ ভাগ নাইট্রোজেন রয়েছে। নাইট্রোজেন অ্যামিনো এসিড। প্রোটিন এবং ডিএনএ হিসেবে পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯১৩ সালে প্রথম নাইট্রোজেন চক্র আলোচনা হয়। নাইট্রোজেন চক্র বাস্তুসংস্থান সম্পর্কিত অধ্যয়নে বিশেষ গুরুত্বসহ পাঠ করা হয়। বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এই চক্র প্রতিফলিত হয়।

নাইট্রোজেন চক্র নিম্নোক্ত ধাপগুলোর মাধ্যমে সম্পন্ন হয়। যথা-

১. নাইট্রোজেন সংবন্ধন
২. নাইট্রোজেন আত্মীকরণ
৩. অ্যামোনিফিকেশন
৪. নাইট্রিফিকেশন এবং
৫. ডিনাইট্রিফিকেশন।

১. **নাইট্রোজেন সংবন্ধন :** নাইট্রোজেন গ্যাসকে অ্যামোনিয়াতে (NH_3) রূপান্তরের যে প্রক্রিয়া তাকে নাইট্রোজেন সংবন্ধন বলা হয়। এ প্রক্রিয়ায় দৃঢ়বন্ধন নাইট্রোজেন গ্যাসকে এমন একটি অবস্থায় আবদ্ধ করা হয়, যার ফলে জীবজগত তা গ্রহণ করতে পারে। নাইট্রোজেন সংবন্ধন দুই প্রকার। যথা- ভৌত নাইট্রোজেন সংবন্ধন এবং জৈব নাইট্রোজেন সংবন্ধন।



চিত্র-১৩.৫.১ : **নাইট্রোজেন চক্র**

২. **নাইট্রোজেন আত্মীকরণ :** সবুজ উদ্ভিদ মৃত্তিকা থেকে নাইট্রাইট (NO_2), নাইট্রেট (NO_3) এ্যামোনিয়া (NH_3) আকারে গ্রহণ করে। এ নাইট্রেট প্রথমে অ্যামোনিয়াতে পরিণত হয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন বিক্রিয়ার মাধ্যমে উদ্ভিদ দেহে প্রোটিন এবং নিউক্লিক এসিড তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। যা উদ্ভিদ থেকে নাইট্রোজেন খাদ্যের মাধ্যমে প্রাণিদেহে প্রবেশ করে।

৩. **অ্যামোনিফিকেশন :** যে প্রক্রিয়ায় মাটিতে বসবাসকারী ব্যাকটিরিয়া নাইট্রোজেন যৌগকে অ্যামোনিয়ামে পরিণত করে তাকে অ্যামিনিফিকেশন বলে। এ প্রক্রিয়ায় মৃত উদ্ভিদ ও প্রাণির দেহ পচনের সময়ে ব্যাকটিরিয়াগুলো অতিরিক্ত অ্যামোনিয়াকে পরিবেশেমুক্ত করে দেয়।

৪. **নাইট্রিফিকেশন :** নাইট্রিফিকেশন বলতে নাইট্রোজেনের সংযোজনকে বুঝায়। মৃত উদ্ভিদ, প্রাণিদেহ ও অন্যান্য জৈব পদার্থ থেকে নাইট্রোজেন যৌগগুলি বিভিন্ন ব্যাকটেরিয়ার সাহায্যে বিয়োজিত হওয়ার ফলে প্রথমে অ্যামোনিয়া পরে নাইট্রাইট এবং সবশেষে নাইট্রেট যৌগে পরিণত হয়। জীবদেহ থেকে নাইট্রোজেন মাটিতে ফিরে আসার এই পদ্ধতিকে নাইট্রিফিকেশন বলে।

৫. **ডিনাইট্রিফিকেশন :** মাটির নাইট্রেট যৌগ যে প্রক্রিয়ায় ব্যাকটিরিয়ার দ্বারা রূপান্তরিত হয়ে আবার নাইট্রোজেন গ্যাস হিসেবে বায়ুমন্ডলে ফিরে আসা তাকে ডিনাইট্রিফিকেশন বলে।

নাইট্রোজেন চক্র পরিবেশের উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। মানবসৃষ্ট কর্মকান্ড দ্বারা এই চক্র ও তার কার্যক্রম প্রভাবিত হয়। বৈশ্বিক তাপ বৃদ্ধি, কার্বন ডাই-অক্সাইডের মাত্রা বৃদ্ধিতে এটি অবদান রাখে। কৃত্রিম রাসায়নিক পদার্থ যা বায়ুমন্ডলে চাপ সৃষ্টি করে (যেমন- এরোসল, কীটনাশকের ব্যবহার) এমন পদার্থ ব্যবহার, কৃষিতে সারের ব্যবহার ইত্যাদি নাইট্রাস অক্সাইড বৃদ্ধিতে সহায়ক।

শিক্ষার্থীর কাজ	নাইট্রোজেন চক্র কী তা লিখুন।

সারসংক্ষেপ

নাইট্রোজেন চক্র পরিবেশ ও প্রাণিকূলের জীবনধারণে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। বাস্তুসংস্থানের ক্ষেত্রেও বিশেষ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। নাইট্রোজেন চক্র এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে নাইট্রোজেন এক রূপ থেকে অন্য রূপে রূপান্তরিত হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√)চিহ্ন দিন।

ফাহিম তার দাদাকে জিজ্ঞেস করলেন প্রাণি ও উদ্ভিদ কীভাবে পরিবেশের উপর নির্ভরশীল? উত্তরে দাদা বললেন প্রাণি ও উদ্ভিদ খাদ্য, পানি, আলো পরিবেশের কাছ থেকেই পায়। পরিবেশের প্রতি তাই আরও যত্নশীল হতে হবে যেন আমরা নষ্ট না করে ফেলি।

১। উদ্দীপকে কোন চক্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছে?
(ক) কার্বন চক্র (খ) নাইট্রোজেন চক্র
(গ) ফসফরাস চক্র (ঘ) পানি চক্র

২। পৃথিবীর বায়ুমন্ডলের কত ভাগ নাইট্রোজেন?
(ক) ৭৮.০২% (খ) ৭০.০২%
(গ) ৮০.০২% (ঘ) ৯০.০২%

পাঠ-১৩.৬ বাংলাদেশের বনাঞ্চল (Forests of Bangladesh)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশের বনভূমির অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং
- বাংলাদেশের বনভূমির প্রকারভেদ কী কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

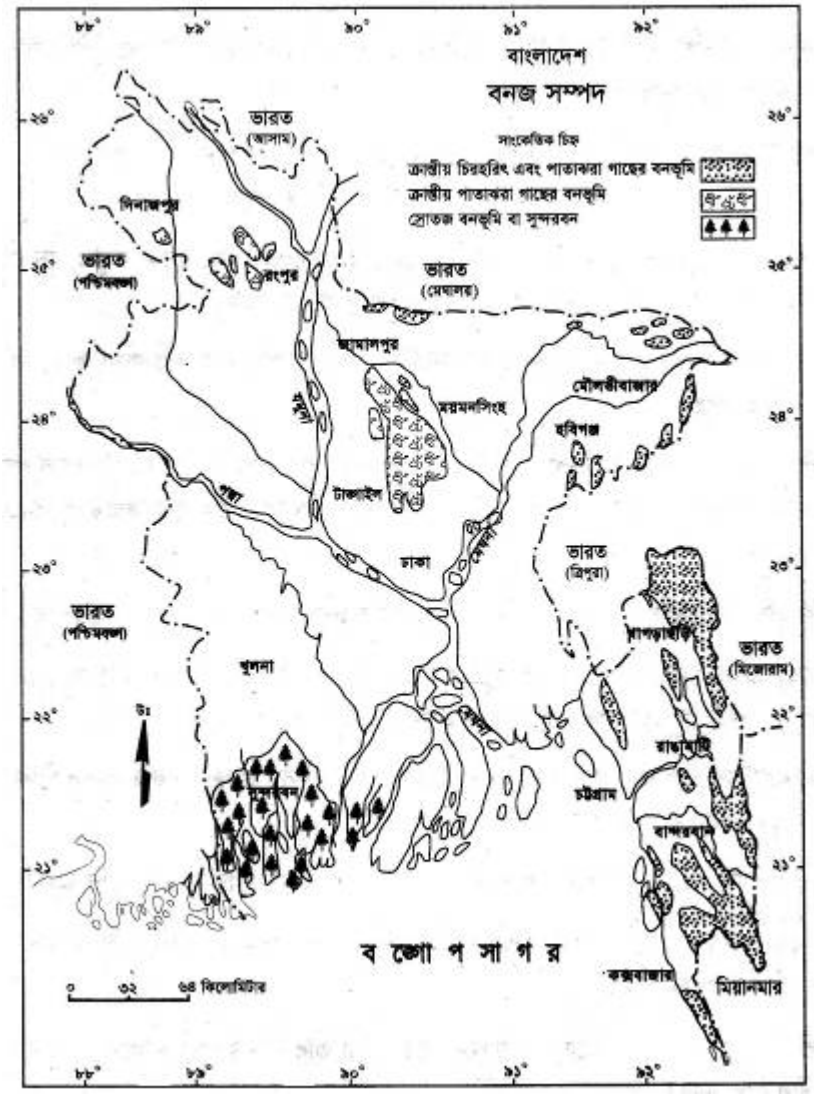
বাংলাদেশের বনাঞ্চল

বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার একটি রাষ্ট্র। এদেশের ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে ভূ-প্রকৃতি, নদ-নদী ঋতুভিত্তিক বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। বাংলাদেশের মধ্যভাগ দিয়ে একটি ক্রান্তীয় রেখা অতিক্রম করেছে। এর ফলে সূর্যের পর্যাপ্ত আলো, উর্বর মৃত্তিকা, নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু ও বৃষ্টিপাত বনাঞ্চলের জন্য বিশেষ সুবিধা প্রদান করে। কোনো দেশের পারস্পরিক ভারসাম্য এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য মোট জমির ২৫ ভাগ বনভূমি থাকা প্রয়োজন। এদেশের বনভূমি দিন দিন কমে যাচ্ছে। ২০১৩-২০১৪ সালের হিসাব অনুযায়ী এদেশের বনভূমির পরিমাণ শতকরা ১৭ ভাগ। এই অপ্রতুল বনভূমিকে আরও বৃদ্ধি করা উচিত কারণ বনভূমি দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পাশাপাশি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। তাই বনভূমি থেকে প্রাপ্ত বনজ সম্পদ সংরক্ষণ অতি জরুরি।

বনভূমির প্রকারভেদ : এদেশের আবহাওয়া ও জলবায়ু এবং মৃত্তিকার ধরনের উপর ভিত্তি করে বনভূমিকে মোট ৩ টি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়।

১) ক্রান্তীয় চিরহরিৎ ও পাতাঝরা গাছের বনভূমি
২) ক্রান্তীয় পাতাঝরা গাছের বনভূমি
৩) স্রোতজ বনভূমি বা সুন্দরবন।

১) ক্রান্তীয় চিরহরিৎ ও পাতাঝরা গাছের বনভূমি : বাংলাদেশের দক্ষিণাংশ অর্থাৎ রাঙামাটি, বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, চট্টগ্রাম এবং সিলেটের পাহাড়ি এলাকায় এই ধরনের বনভূমি দেখা যায়। পাহাড়ের প্রবল বৃষ্টিপাত সম্পন্ন অঞ্চলে ক্রান্তীয় চিরহরিৎ ও পাতাঝরা গাছের বনভূমি পাওয়া যায়। এখানকার প্রধান বৃক্ষ চাপালিশ, তেলসুর, ময়না, গর্জন, জারুল, গামার, কড়ই, সেগুন প্রভৃতি।



চিত্র-১৩.৬.১ : বাংলাদেশের বনাঞ্চল

২) ক্রান্তীয় পাতাঝরা গাছের বনভূমি : শীতকালে এই বনভূমির পাতা ঝরে যায় বলেই এই ধরনের বনভূমির নাম ক্রান্তীয় পাতাঝরা গাছের বনভূমি। এই ধরনের বনভূমি সাধারণত পাওয়া যায় প্লাইস্টোসিনকালের সোপানসমূহে । গ্রীষ্মকালে এই বনভূমিতে নতুন পাতা গজায়। ক্রান্তীয় পাতাঝরা গাছের বনভূমিকে মূলত দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- (১) দিনাজপুর ও রংপুর জেলার বরেন্দ্র বনভূমি এবং (২) ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল ও গাজীপুর জেলার মধুপুর ও ভাওয়ালের বনভূমি। বরেন্দ্র ভূমি অঞ্চলের প্রধান বৃক্ষ শাল এবং মধুপুর ও ভাওয়ালের বনভূমির প্রধান বৃক্ষ গজারি। তাই এটি গজারি বৃক্ষের বনভূমি নামেও পরিচিত।

৩) স্রোতজ বনভূমি বা সুন্দরবন : সুন্দরবন এদেশের বৈচিত্র্যময় রত্নভান্ডার সমৃদ্ধ বনভূমি যার আয়তন ৬৭৮৬ বর্গকিলোমিটার। উত্তরে খুলনা, সাতক্ষীরা, বাগেরহাট জেলা, দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর, পূর্বে হরিণঘাটা নদী, পিরোজপুর ও বরিশাল জেলা ও পশ্চিমে রাইমঙ্গল নদী, হাড়িয়াভাঙ্গা নদী এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গের কিছু অংশজুড়ে এই বনভূমি বিস্তৃত, সমুদ্রের জোয়ার ভাঁটা এবং প্রচুর বৃষ্টিপাতের কারণে এখানে সুন্দরী, গরান ও গেওয়া গাছ দেখা যায়। এখানকার প্রধান বৃক্ষ সুন্দরী।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশের বনভূমি কত প্রকার ও কী কী তা লিখুন।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রাকৃতিক পরিবেশের বৈশিষ্ট্যের কারণে তিন ধরনের বনভূমি রয়েছে। এগুলো হলো– ক্রান্তীয় চিরহরিৎ ও পাতাঝরা গাছের বনভূমি, ক্রান্তীয় পাতাঝরা গাছের বনভূমি এবং স্রোতজ বনভূমি বা সুন্দরবন। এদেশে শতকরা ১৭ ভাগ বনভূমি রয়েছে যা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। মানুষের কর্মকান্ডের ফলে দিন দিন বনভূমি কমে যাচ্ছে। তাই আমাদের উচিত বনভূমির পরিমাণ বৃদ্ধি করা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১, ২ ও ৩ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

জনাব আলিমুদ্দিন একজন সমাজকর্মী হিসেবে তার এলাকার লোকজনদের বললেন আমরা প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করতে গিয়ে প্রকৃতিকে ধ্বংস করা উচিত নয়। কারণ প্রকৃতিকে ধ্বংস করলে মানব অস্তিত্বও ধ্বংসের মুখোমুখি হবে। আলো, বাতাস, গাছপালা সবই প্রকৃতির আশীর্বাদ।

১। উদ্দীপকের আলোকে কোন প্রাকৃতিক সম্পদের কথা বলা হয়েছে?
(ক) মৎস্য সম্পদ (খ) বিদ্যুৎ সম্পদ (গ) বনজ সম্পদ (ঘ) বৃষ্টিপাত

২। কোন দেশের মোট কতভাগ বনভূমি থাকা প্রয়োজন?
(ক) ৭ ভাগ (খ) ২ ভাগ (গ) ২৩ ভাগ (ঘ) ২৫ ভাগ

৩। কোনটি ক্রান্তীয় চিরহরিৎ ও পাতাঝরা বনভূমির বৈশিষ্ট্য?
(ক) উষ্ণ তাপমাত্রা (খ) অধিক বৃষ্টিপ্রবণ অঞ্চল
(গ) কম বৃষ্টিপ্রবল অঞ্চল (ঘ) সমভূমির বনভূমি

পাঠ-১৩.৭ বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য (Biodiversity of Bangladesh)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য বর্ণনা করতে পারবেন এবং
- বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য

সিন্ধু-গঙ্গা সমতল ভূমির অংশ হিসেবে জীববৈচিত্র্যের এক অপূর্ব লীলাভূমি বাংলাদেশ। বাংলাদেশ সবুজে শ্যামলে ঘেরা এমনই একটি দেশ যেখানে মাটি, পানি, বন বনানী, প্রাকৃতিক পরিবেশ নানা ধরনের জীবের জীবনধারণের জন্য উপযোগী। নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া ও জলবায়ু, উর্বর মৃত্তিকা, নিরক্ষরেখার কাছাকাছি অবস্থানের কারণে পর্যাপ্ত সূর্যালোক, অধিক বৃষ্টিপাত আর সকুজ প্রকৃতি এদেশে নানা ধরনের প্রাণি ও জীবজগতের অভয়ারণ্যের মূল কারণ। সুন্দরবনের সুবিশাল জীব সম্প্রদায় এবং কক্সবাজারের সমুদ্রগর্ভের জলজ প্রাণি সবই এদেশের জীবসম্পদ। বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সম্পূরক উদ্ভিদ, মাছ, উভচর প্রাণি, সরীসৃপ, পাখি ও স্তন্যপায়ী প্রাণির একটি ঐতিহ্য রয়েছে। দেশের প্রাকৃতিক বনাঞ্চলসমূহের অবস্থানগত কারণে জীববৈচিত্র্যময় সম্পদে ভরপুর। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, বাংলাদেশের বনাঞ্চলগুলোতে ৫০০০ এর অধিক সম্পূরক উদ্ভিদ প্রজাতি পাওয়া যায়। কেবল চট্টগ্রামের বনাঞ্চলে প্রায় ২,২৬০ টি উদ্ভিদ প্রজাতি রয়েছে। এসব উদ্ভিদের মধ্যে কাস্টল উদ্ভিদ, আঁশ উৎপাদনকারী উদ্ভিদ, ঔষধি উদ্ভিদ বিদ্যমান।

বাংলাদেশের ১৩২ জাতের স্তন্যপায়ী, ৫৭৮ জাতের পাখি, ১৫৪ জাতের সরীসৃপ ও ১৯ জাতের উভচর জীব শনাক্ত করা হয়েছে। ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অব নেচার রেড ডাটা বুক এ প্রকাশ করেছে যে বাংলাদেশের ২৩টি প্রজাতির বন্যপ্রাণির অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন, এছাড়াও এদেশের প্রায় ২৯টি বন্যপ্রাণির অস্তিত্ব বিপন্ন। মূলত নগরায়ন, খাদ্য ও বাসস্থানের সংস্থান, ঔষধ ও পরিধেয় বস্ত্রের উপাদান জোগাড় করার কারণে ধ্বংস করা হচ্ছে জীবের নিরাপদ আবাসস্থল। মানব সমাজ সকল প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন জলাশয়, সমুদ্র, বনাঞ্চল উজাড় করছে তাদের নিজস্ব স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কাজে।

সুন্দরবন এবং মধুপুর ও ভাওয়ালের গড়সহ বিভিন্ন বনভূমিতে বিদ্যমান প্রাণি ও জীবজন্তু যেমন- রয়েল বেঙ্গল টাইগার, চিত্রা হরিণ, সরীসৃপ, অজগর, বুনো হাঁস, কালো হাঁস, নীল গাই, রাজশুকন, বুনো মহিষ, মিঠা পানির কুমির, ঘরিয়াল আজ প্রায় বিলুপ্ত হতে হতে চরম হুমকির মধ্যে জীবনধারণ করছে। বাংলাদেশের প্রায় ৩৯ প্রজাতির প্রাণি হুমকির সম্মুখীন। বনবিজ্ঞানীগণের মতে, বাংলাদেশে ১২৫টির মত বৃক্ষ প্রজাতি বিপন্ন প্রায়। এদেশের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে তাই এখনি যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত। পরিবেশ দূষণ, বন্যপ্রাণি হত্যা করে তাদের চামড়া বা হাড় দিয়ে পণ্য তৈরি, প্রাণি পাচার ইত্যাদি সমস্যা বন্যপ্রাণি সংরক্ষণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কারণ বলে বিবেচিত হয়েছে। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক সংস্থা, সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা, এবং দেশের বাইরের খ্যাতিমান সংস্থা, জাতিসংঘসহ নানা প্রতিষ্ঠান এই জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। এদেশে জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব অনুধাবন করে জীববৈচিত্র্যের সংরক্ষণ ও বৃদ্ধিকে উৎসাহিত করতে হবে।

বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য সরকার দেশের বনাঞ্চলসমূহের কিছু অংশ সংরক্ষিত এলাকা হিসেবে ঘোষণা করেছে। জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হচ্ছে। এছাড়া উপকূলীয় ও জলভূমিস্থ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা ও টেকসই ব্যবহার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কক্সবাজার, সেন্টমার্টিন দ্বীপ এবং হাকালুকি হাওরের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বনের জীববৈচিত্র্য ও প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণের অংশ হিসেবে ঢাকার অদূরে ''বঙ্গবন্ধু সাফারী পার্ক, গাজীপুর নামে একটি বন্যপ্রাণি সাফারি পার্ক এবং চট্টগ্রামের রাঙ্গুনিয়ায় 'শেখ রাসেল এভিয়ারি ইকোপার্ক' প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়া জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের লক্ষ্যে সংরক্ষিত প্রাকৃতিক বনাঞ্চলের গাছ আহরণ বন্ধ রাখা ছাড়াও সৃজিত বনায়নের পুরাতন গাছ আহরণ বন্ধ রাখা হয়েছে। বন্যপ্রাণি নিধন ও পাচার রোধে পুলিশ, কাস্টমস, কোস্টগার্ড ও বনবিভাগের সমন্বয়ে গঠিত ক্রাইম কন্ট্রোল ইউনিটকে কার্যকরী করা হয়েছে। বিরল প্রজাতির ডলফিন সংরক্ষণের লক্ষ্যে নগরবাড়ি-মোহনগঞ্জ ডলফিন অভয়ারন্য, সালিন্দা-নাগডেমরা ডলফিন অভয়ারন্য এবং নাজিরগঞ্জ অভয়ারন্য নামে ৩টি নতুন সংরক্ষিত এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য সম্পর্কে লিখুন।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশ প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের কারণে জীববৈচিত্র্যের দিক থেকে সমৃদ্ধশীল। কিন্তু মানবসমাজের কর্মকান্ড যখন পরিবেশের উপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে তখন তা জীববৈচিত্র্যের জন্য হুমকির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করা অতি জরুরি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৩.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১, ২ ও ৩নং প্রশ্নের উত্তর দিন।
রুবি একজন চাকুরীজীবি। তিনি তার সহকর্মীদের সাথে কথোপকথনে বললেন যে, প্রায় প্রতিদিনই গ্রাম থেকে মানুষ ঢাকা শহরে চাকুরীর সন্ধানে আসে। এই বাড়তি জনসংখ্যার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য, বাসস্থান, চিকিৎসা, পোশাক পরিচ্ছদসহ জীবনধারণের নানা উপাদানের অপ্রতুলতা দেখা যায়। তিনি আরও বললেন, এই অধিক জনসংখ্যা প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশে চাপ সৃষ্টি করছে।

১। উদ্দীপকের আলোকে কোন সমস্যাটির কথা তুলে ধরা হয়েছে?
(ক) জনসংখ্যার চাপ (খ) জীববৈচিত্র্যের বিলুপ্তি (গ) বাস্তুসংস্থানের চাপ (ঘ) প্রাকৃতিক দুর্যোগ

২। কোন কোন বৈশিষ্ট্য এদেশে জীব সম্প্রদায়ের জন্য সাহায্যকারী?
i. উর্বর মৃত্তিকা ii. জলজ প্রাণির আধিক্য iii. অধিক বৃষ্টিপাত
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩। বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ করতে কী করা উচিত?
(ক) জীব হত্যা রোধ করা (খ) জীবের অভয়ারণ্য ধ্বংস করা
(গ) জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে উৎসাহ বৃদ্ধি (ঘ) বিদেশে প্রাণি পাচার করা

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল প্রশ্ন- ১

শহরের জনসংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বর্ধিত জনসংখ্যা দেশের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, প্রাকৃতিক সম্পদের উপর বাড়তি চাহিদা তৈরি করছে। এদেশের প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষার জন্য তাই প্রকৃতিকে সংরক্ষণ জরুরি।

ক. জীববৈচিত্র্যে কী?
খ. কার্বন চক্র বলতে কী বুঝায়?
গ. জীব-ভূ-রাসায়নিক চক্রের বৈশিষ্ট্য লিখুন।
ঘ. বাংলাদেশের জীববৈচিত্র্যের ধরণ সম্পর্কে লিখুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১৩.১ : ১. খ ২. ক ৩. ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১৩.২ : ১. ক ২. খ ৩. ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১৩.৩ : ১. ক ২. খ ৩. ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১৩.৪ : ১. খ ২. ক ৩. গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১৩.৫ : ১. খ ২. ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১৩.৬ : ১. গ ২. ঘ ৩. খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১৩.৭ : ১ খ ২. গ ৩. গ

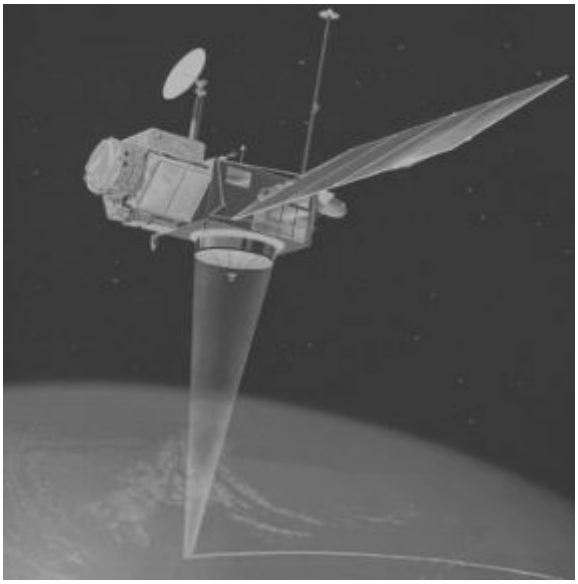
জিআইএস ও দূর অনুধাবন
(GIS and Remote Sensing)

ইউনিট ১৪

ভূমিকা

বর্তমান বিশ্বে তথ্য ও প্রযুক্তির ব্যবহার ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যান্য ক্ষেত্রের ন্যায় ভৌগোলিক ক্ষেত্রেও প্রযুক্তির ব্যবহার প্রসারিত হয়েছে। ভূগোলের সাথে মানচিত্র নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। মানচিত্র তৈরি, পঠন এবং ব্যবস্থাপনায় জিআইএস ও দূর অনুধাবন ব্যবহার করা হয়। এ দুইটি পদ্ধতি প্রযুক্তির উন্নততর সংস্করণ। এই ইউনিটে জিআইএস ও দূর অনুধাবন সম্পর্কে প্রাথমিক আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশে জিআইএস এবং দূর অনুধাবনের বিকাশ সম্পর্কেও বর্ণনা করা হয়েছে।





ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ১ সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ ১৪.১ : জিআইএস এর ধারণা
পাঠ ১৪.২ : দূর অনুধাবন এর ধারণা
পাঠ ১৪.৩ : জিআইএস ও দূর অনুধাবন এর ব্যবহার
পাঠ ১৪.৪ : বাংলাদেশে জিআইএস ও দূর অনুধাবন এর বিকাশ

পাঠ-১৪.১ জিআইএস এর ধারণা (Concept of GIS)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- জিআইএস এর সংজ্ঞা ও বিকাশ সম্পর্কে বলতে পারবেন এবং
- জিআইএস এর কার্যপ্রণালি ও উপাদানগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।

জিআইএস এর ধারণা

বর্তমান বিশ্বে বহুল আলোচিত এবং ব্যবহৃত বিষয় হলো জিআইএস। জিআইএস প্রযুক্তি মানচিত্র প্রণয়নের একটি উন্নততর সংস্করণ। মানচিত্র তৈরি, পঠন, ব্যবহার এবং ব্যবস্থাপনায় জিআইএস এর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। মানচিত্রের বহুমুখী ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ায় উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহার করে মানচিত্রকে সমৃদ্ধ করার প্রচেষ্টা এবং প্রসার অব্যাহত রয়েছে। জিআইএস পদ্ধতির মাধ্যমে সঠিক তথ্য সম্বলিত কোনো স্থানের মানচিত্র তৈরি করা যায়।

জিআইএস (GIS)

Geographical Information System (GIS) বা ভৌগোলিক তথ্য পদ্ধতি হলো ভৌগোলিক তথ্য সংরক্ষণ এবং বিশ্লেষণ ব্যবস্থা। সাধারণ অর্থে জিআইএস বলতে স্থানিক ও অস্থানিক উপাত্ত সংগ্রহ করে কম্পিউটার প্রযুক্তির মাধ্যমে তথ্য সমন্বয় করে তা মানচিত্রে উপস্থাপন করাকে বুঝায়। অর্থাৎ জিআইএস হলো কম্পিউটারের মাধ্যমে কোনো তথ্য ধারণ করে ভূ-পৃষ্ঠের কোনো অবস্থানের চিত্র বর্ণনা করা।

GIS সফট্ওয়্যার নির্মাতা প্রতিষ্ঠান ESRI (Environmental System Research Institute) এর মতে, yGeographical Information System (GIS) is an organized collection of computer hardware, software, geographical data and personnel designed to efficiency capture, store, update, manipulate, analyze and display all of geographically referenced information."

সুতরাং বলা যায় যে, কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার এবং সফট্ওয়্যারের মাধ্যমে ভৌগোলিক তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, পরিবর্তন, বিশ্লেষণ ও প্রদর্শন করাই জিআইএস।

জিআইএসের বিকাশ (Development of GIS) : জিআইএসের ইতিহাস খুব বেশি দিনের না হলেও দ্রুততম সময়ে তা বিকশিত হয়েছে। বৃটিশ গবেষক সোহো (Soho) ১৮৫৪ সালে লন্ডন শহরের ভয়াবহ কলেরা রোগের উপর কাজ করেন। তিনি নিশ্চিত হন যে, কিছু পাম্পের পানি দূষিত হয়ে কলেরা ছড়াচ্ছে। লন্ডন শহরের ঐ এলাকার পানির পাম্প এবং চারপাশে কী পরিমাণ লোকের মধ্যে কলেরা ছড়াচ্ছে বা মারা যাচ্ছে সে সম্পর্কে উপাত্ত সংগ্রহ করে তা মানচিত্রে দেখান। তাঁর এ গবেষণার ফলে সমস্যা অনুধাবন করে কলেরা রোগ দূর করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা সহজ হয়। সোহোর এই চিন্তা পরবর্তীতে জিআইএস এর ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। ১৯৬৪ সালে কানাডিয়ান 'The Canadian Geographic Information System (CGIS)' এর মাধ্যমে জিআইএস এর ব্যবহার শুরু হয়। সত্তরের দশকে নগর পরিকল্পনায় প্রথম কম্পিউটারভিত্তিক জিআইএস ব্যবহার করা হয়। ১৯৮০ সালের পর জিআইএস এর ব্যাপক প্রসার ঘটে। ১৯৮৬ সালে ESRI বাণিজ্যিকভাবে Arc/Info সফট্ওয়্যার তৈরি শুরু করে। বাংলাদেশে ১৯৯১ সালে প্রথম জিআইএস এর ব্যবহার শুরু হয়।

জিআইএস এর কার্যপ্রণালি (Function of GIS) : জিআইএস প্রযুক্তি নিম্নোক্তভাবে কার্য সম্পন্ন করে থাকে। যথা-

১. উপাত্ত সংগ্রহ
২. উপাত্ত আদান-প্রদান

৩. উপাত্ত সংস্করণ
৪. উপাত্ত বিশ্লেষণ এবং
৫. উপাত্ত উপস্থাপন ও ব্যবস্থাপনা।

জিআইএসের মাধ্যমে কোনো স্থানের মানচিত্র তৈরি করে সহজেই উক্ত স্থানের সুবিধা-অসুবিধা বা কোনো সমস্যা নিরূপণ করে উক্ত বিষয় সম্পর্কে সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা যায়। নির্দিষ্ট সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার এবং ব্যবস্থাপনার জন্য জিআইএস প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

জিআইএসের উপাদান (Elements of GIS) : জিআইএস পাঁচটি উপাদানের সমন্বয়ে কাজ করে থাকে। এগুলো হলো-

১. হার্ডওয়্যার
২. সফট্ওয়্যার
৩. উপাত্ত
৪. উপাত্ত ভিত্তি এবং
৫. প্রশিক্ষিত ও দক্ষ মানুষ।

১. হার্ডওয়্যার : হার্ডওয়্যার কম্পিউটারের অত্যাবশ্যকীয় উপাদান। কম্পিউটারের হার্ডওয়্যারের মধ্যে রয়েছে মাদারবোর্ড, প্রসেসর, র‍্যাম, হার্ডডিস্ক, মনিটর, কী বোর্ড, মাউস, ক্যাসিং, প্রিন্টার, স্ক্যানার, ডিজিটাইজার, প্লটার প্রভৃতি।

২. সফট্ওয়্যার : জিআইএস ব্যবহারের জন্য বিশেষায়িত সফট্ওয়্যার ব্যবহার করতে হয়। প্রতিটি জিআইএস সফট্ওয়্যারের নির্দিষ্ট কিছু কর্মক্ষমতা রয়েছে। সেজন্য প্রয়োজন অনুযায়ী সফট্ওয়্যার কম্পিউটারে ইনস্টল করতে হয়। জিআইএস সফট্ওয়্যারের মধ্যে রয়েছে Arc/Info, Idrisi, ERDAS Imagine, Arc view, Arc GIS প্রভৃতি।

৩. উপাত্ত : জিআইএস এর তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো উপাত্ত। জিআইএসে উপাত্ত দুই প্রকার। এগুলো হলো- স্থানিক এবং অস্থানিক। স্থানিক উপাত্ত (Spatial Data) বলতে ভূ-পৃষ্ঠে দৃশ্যমান সকল কিছুকে বুঝায়। যেমন-পাহাড়, পর্বত, নদীনালা, খালবিল, রাস্তাঘাট, বাড়িঘর প্রভৃতি। আর অস্থানিক উপাত্ত (Non-Spatial Data) বলতে অদৃশ্য গুণবাচক উপাত্ত যেমন- কোনো এলাকার শিক্ষার হার, জন্মহার, মৃত্যুহার, জনসংখ্যার বিস্তরণ ইত্যাদিকে বুঝায়। স্থানিক এবং অস্থানিক উভয় প্রকার উপাত্ত জিআইএস প্রযুক্তির জন্য অত্যাবশ্যকীয় উপাদান।

৪. উপাত্ত ভিত্তি : উপাত্ত ভিত্তি হলো স্থানিক ও অস্থানিক উপাত্তের সংশোধিত রূপ। উপাত্ত ভিত্তির ওপর নির্ভর করে জিআইএস প্রযুক্তি ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় তথ্য মানচিত্রে উপস্থাপন করা হয়। সংগৃহীত তথ্য বা ডাটাবেস জিআইএস সফট্ওয়্যারের মাধ্যমে জিআইএসে ব্যবহার উপযোগী ডাটাবেস তৈরি করে। ডাটাবেস ফাইল যা সহজে জিআইএস সফট্ওয়্যারের অন্তর্ভুক্ত করে সংযোজন, বিয়োজন বা সংশোধনের মাধ্যমে অস্থানিক উপাত্তের সাথে যুক্ত করা হয়। ফলে উপাত্ত অধিক সমৃদ্ধ হয়।

৫. প্রশিক্ষিত ও দক্ষ মানুষ : জিআইএস এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে প্রশিক্ষিত ও দক্ষ মানুষ। কারণ একজন দক্ষ মানুষ কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার, সফট্ওয়্যার এবং উপাত্ত সমন্বয় করে মানচিত্র তৈরি করে ।

শিক্ষার্থীর কাজ	জিআইএসের সফট্ওয়্যারগুলোর নাম লিখুন।

সারসংক্ষেপ

জিআইএস এর পূর্ণাঙ্গরূপ হলো ভৌগোলিক তথ্য পদ্ধতি (Geographical Information System বা GIS)। জিআইএস এর উদ্ভাবনের ইতিহাস খুব বেশি দিনের না হলেও তা দ্রুত প্রসার এবং জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। ১৯৬৪ সালে কানাডায় সর্বপ্রথম জিআইএস ব্যবহার শুরু হয়। পরবর্তীতে তা ক্রমান্বয়ে উন্নতি লাভ করতে থাকে। এই প্রযুক্তির মাধ্যমে কোনো স্থানের সঠিক তথ্য সম্বলিত মানচিত্র তৈরি করা যায়। জিআইএস পাঁচটি উপাদানের সমন্বয়ে কাজ করে। এগুলো হলো- কম্পিউটার হার্ডওয়্যার, সফট্ওয়্যার, উপাত্ত, উপাত্ত ভিত্তি এবং মানুষ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৪.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১. GIS এর পূর্ণাঙ্গ রূপ কী?

(ক) Geographical Information Society (খ) Geographical Information Survey

(গ) Global Information Survey (ঘ) Geographical Information System

২. জিআইএস এর সফট্ওয়্যার হলো-

i. Arc/Info

ii. Arc View

iii. Arc GIS

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও ii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ুন এবং ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

কানাডায় কম্পিউটারের মাধ্যমে বিশেষ সফট্ওয়্যার ব্যবহার করে মানচিত্র তৈরির একটি নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা হয়। এই পদ্ধতির কয়েকটি উপাদান রয়েছে যেগুলোর সমন্বয়ে এই প্রযুক্তি কাজ করে থাকে। যা আজ সারা বিশ্বে বহুল ব্যবহৃত এবং জনপ্রিয়।

৩। সর্বপ্রথম কত সালে জিআইএস প্রযুক্তি চালু হয়?

(ক) ১৮৬৪ (খ) ১৯২৪

(গ) ১৯৪৪ (ঘ) ১৯৬৪

৪। কোনটি জিআইএস এর উপাদান নয়?

(ক) হার্ডওয়্যার (খ) উপাত্ত

(গ) আনবিক ঘড়ি (ঘ) মানুষ

পাঠ-১৪.২ দূর অনুধাবন এর ধারণা (Concept of Remote Sensing)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- দূর অনুধাবনের সংজ্ঞা ও বিকাশ সম্পর্কে বলতে পারবেন এবং
- দূর অনুধাবনের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতি ও সুবিধা-অসুবিধা বর্ণনা করতে পারবেন।

দূর অনুধাবনের ধারণা

দূর অনুধাবন এর ইংরেজি প্রতিশব্দ Remote Sensing। যার অর্থ হলো দূর থেকে কোনো কিছু দেখার চেষ্টা করা। এটি এক ধরনের বিজ্ঞান যা ভূ-পৃষ্ঠে কোনো দৃশ্যমান বস্তু বা প্রপঞ্চ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে থাকে। দূর অনুধাবন এমন একটি যান্ত্রিক কৌশল (Device) যার মাধ্যমে কোনো লক্ষ্য বস্তু বা প্রপঞ্চের সাথে দূরত্ব বজায় রেখে তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

Lints এবং Simonett (1976) দূর অনুধাবনকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে, ''Remote sensing is the aquisition of physical data of an object without touch or contract".

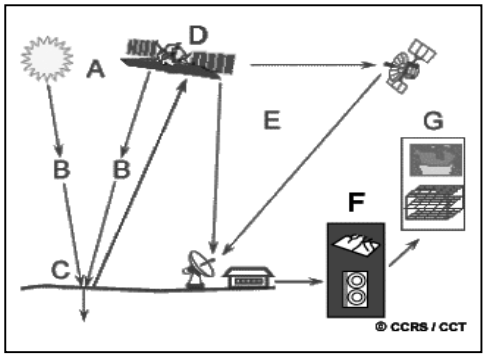
সুতরাং বলা যায়, দূর অনুধাবন হলো এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে কোনো একটি বস্তু বা প্রপঞ্চকে স্পর্শ না করে দূর থেকে তথ্য সংগ্রহ করা যায়।

দূর অনুধাবনের বিকাশ (Development of Remote Sensing) : ১৯৪৬-১৯৫০ সালের মধ্যবর্তী সময়ে দূর অনুধাবনের কাজ শুরু হয়। এ সময় V-2 রকেটে (Rocket) মহাশূন্যে যাওয়ার প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ছোট ক্যামেরার সাহায্যে রকেট, ব্যালিস্টিক মিসাইল, উপগ্রহ ও মানব বহনকারী মহাশূন্যযান থেকে প্রচুর আলোকচিত্র গ্রহণ করা হয়। সে সময়কার আলোকচিত্র নিম্নমানের হলেও দূর অনুধাবন পদ্ধতির সম্ভাবনার সূচনা তৈরি করেছিল। ১৯৬০ সালে দূর অনুধাবন পদ্ধতি চালু হয়। সত্তরের দশকে তা উন্নতি লাভ করে। পরবর্তীতে তা আরও বিকশিত হতে থাকে।

দূর অনুধাবনের জন্য তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি : বিভিন্ন সংবেদন (Sensors) পদ্ধতি ব্যবহার করে দূর থেকে সংগৃহীত তথ্যাবলী বিশ্লেষণের মাধ্যমে কোনো এলাকা, বস্তু বা প্রপঞ্চ সম্বন্ধে বাস্তব ধারণা লাভ করা যায়। এ পদ্ধতিতে সংগৃহীত তথ্যগুলো শক্তি বিন্যাস শব্দ তরঙ্গ বা বিদ্যুৎ চুম্বকীয় শক্তি বিন্যাস প্রভৃতির মাধ্যমে পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, অভিকর্ষ শক্তি বিন্যাসের সাহায্যে অভিকর্ষ বিশিষ্ট পদার্থের বিভিন্নতা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা যায়।

দূর অনুধাবনের উপাদান (Elements of Remote Sensing) : দূর অনুধাবনের কতকগুলো উপাদান রয়েছে। নিম্নে এগুলো উল্লেখ করা হলো-

১. শক্তির উৎস **(A)**
২. রেডিয়েশন এবং বায়ুমন্ডল **(B)**
৩. লক্ষ্যবস্তুর সাথে মিথস্ক্রিয়া **(C)**
৪. সেন্সর দ্বারা শক্তির রেকর্ড **(D)**
৫. ট্রান্সমিশন, রিসিপসন এবং প্রসেসিং **(E)**
৬. ইন্টার প্রিটেশন এবং বিশ্লেষণ **(F)** এবং
৭. এপ্লিকেশন **(G)**।



চিত্র- ১৪.২.১: দূর অনুধাবনের উপাদান

দূর অনুধাবনের সুবিধা-অসুবিধা (Advantages & Disadvantages) : দূর অনুধাবনের সুবিধা-অসুবিধাগুলো নিম্নে তুলে ধরা হলো-

সুবিধা

১. দূর অনুধাবনের ব্যবহারিক দিক খুব বিস্তৃত।
২. এর সাহায্যে সংগৃহীত তথ্যাবলী দ্বারা সহজেই মানচিত্র অঙ্কন করা যায়।
৩. এটি প্রযুক্তিভিত্তিক পদ্ধতি হওয়ায় নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়।
৪. এটি একটি একক ইমেজ (Image) যা থেকে অনেকগুলো তথ্য সংগ্রহ করা যায়।
৫. দূরবর্তী বস্তু বা প্রপঞ্চ থেকে সহজেই তথ্য পাওয়া যায়।
৬. দূর অনুধাবন চিত্র স্যাটেলাইটের মাধ্যমে সংগঠিত হয় বলে তা দিন-রাত্রি সবসময় সংগ্রহ করা যায়।
৭. দূর অনুধাবন কৌশলের মাধ্যমে পৃথিবী পৃষ্ঠের পদার্থ যত সূক্ষ্ম হোক না কেন তা স্বতন্ত্রভাবে দেখা যায়।

অসুবিধা

১. দূর অনুধাবনের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ খুব ব্যয়বহুল।
২. তথ্য বিশ্লেষণের জন্য এটি একটি জটিল প্রক্রিয়া।
৩. যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে পারস্পরিক ক্রিয়ার সঠিক ফলাফল নাও দিতে পারে।
৪. শুধুমাত্র ভূ-পৃষ্ঠের তথ্যাদি পাওয়া যায়।

শিক্ষার্থীর কাজ	দূর অনুধাবনের চিত্রটি অনুশীলন করুন।

সারসংক্ষেপ

দূর অনুধাবন হলো এমন একটি যান্ত্রিক কৌশল যার মাধ্যমে কোনো লক্ষ্য বস্তু বা প্রপঞ্চের সাথে দূরত্ব বজায় রেখে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। ১৯৬০ সালে এ পদ্ধতি চালু হয় এবং সত্তরের দশকে তা উন্নতি লাভ করে। দূর অনুধাবনের বিভিন্ন সেন্সর পদ্ধতি ব্যবহার করে তথ্যাবলী সংগ্রহ করা হয়। এ পদ্ধতির কতকগুলো উপাদান রয়েছে। যেমন-শক্তি, রেডিয়েশন, বায়ুমন্ডল প্রভৃতি। এ পদ্ধতির কিছু সুবিধা-অসুবিধাও রয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৪.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। দূর অনুধাবন পদ্ধতি চালু হয় কত সালে?
(ক) ১৯৬০ সালে (খ) ১৯৬৪ সালে
(গ) ১৯৭০ সালে (ঘ) ১৯৭৪ সালে

২। নিচের কোনটি দূর অনুধাবনের উপাদান?
(ক) শক্তি (খ) রেডিয়েশন
(গ) ট্রান্সমিশন (ঘ) সবগুলো

৩। দূর অনুধাবনের অসুবিধা হলো-
(ক) ব্যয়বহুল (খ) দূর থেকে তথ্য সংগ্রহ করা যায়
(গ) মানচিত্র অঙ্কন করা যায় (ঘ) নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায়

পাঠ-১৪.৩ জিআইএস এবং দূর অনুধাবন এর ব্যবহার (Uses of GIS & Remote Sensing)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি

- জিআইএস ও দূর অনুধাবনের ব্যবহার বর্ণনা করতে পারবেন।

জিআইএস এবং দূর অনুধাবনের ব্যবহার

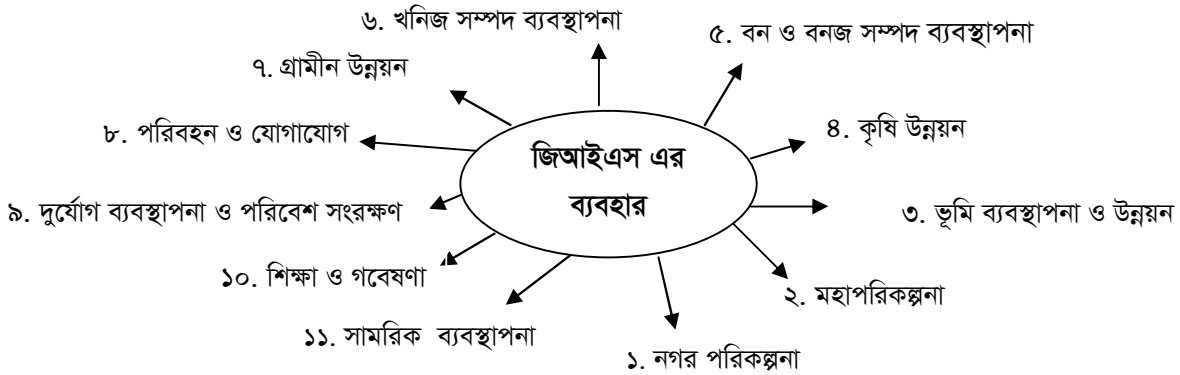
পরিবর্তনশীল বিশ্বে প্রতিটি দেশ উন্নয়নের জন্য বহুমুখী প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন সুষ্ঠু পরিকল্পনা। তথ্য ও প্রযুক্তির এই যুগে পরিকল্পনা ও উন্নয়নে ব্যবহার করা হচ্ছে Geographical Information System বা GIS। এই প্রযুক্তির সাথে সম্পৃক্ত দূর অনুধাবন বা Remote Sensing। নিম্নে জিআইএস এবং দূর অনুধাবনের ব্যবহার আলোচনা করা হলো-

জিআইএস এর ব্যবহার (Uses of GIS)

১. নগর পরিকল্পনা : একটি আধুনিক এবং পরিকল্পিত নগর পরিকল্পনার জন্য জিআইএস ব্যবহার করা হয়। নগর এলাকার আবশ্যকীয় সেবা প্রতিষ্ঠান যেমন- রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ, পানি ও গ্যাস সরবরাহ লাইন, পানি নিষ্কাশন, স্যুয়ারেজ ব্যবস্থা ইত্যাদির সূক্ষ্ম ও সর্বোচ্চ ব্যবহারের জন্য জিআইএস প্রযুক্তি ব্যবহার করে মানচিত্র প্রণয়ন করা হয়। যা যথাযথ পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

২. মহাপরিকল্পনা : যে কোনো শহরের মহাপরিকল্পনা করার সময় ভূমি ব্যবহারের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া মূল্যায়ন করে প্রয়োজনে বিকল্প স্থান নির্ধারণ করা হয়ে থাকে যা জিআইএস এর মাধ্যমে খুব সহজে সম্পন্ন করা যায়।

৩. ভূমি ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন : ভূমির প্রকৃতি, পানি নিষ্কাশন, সেচ ব্যবস্থা, মৃত্তিকার গুণাগুণ প্রভৃতির ওপর ভিত্তি করে ভূমির শ্রেণিবিভাগ করে সঠিক পরিকল্পনা করা যায়। এছাড়া ভূমির যথাযথ মালিকানা নির্ধারণ করে নকশা প্রণয়ন করলে এ সংক্রান্ত জটিলতা অনেকাংশে দূর হবে।



৪. কৃষি উন্নয়ন : ভূমি জরিপের মাধ্যমে ডাটাবেজ তৈরি করে মানাচত্র প্রণয়ন করলে ভূমি ব্যবহার সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাওয়া যায়। ফলে ভূমির গুণাগুণ অনুযায়ী কৃষিকাজ করে অধিক ফসল উৎপাদন করা যায়।

৫. বন ও বনজ সম্পদ ব্যবস্থাপনা : বন ও বনজ সম্পদের ব্যবস্থাপনায় জিআইএস প্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। যেমন- বন বা বনজ সম্পদ কোনো দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ হলে তা মানচিত্রে তুলে ধরে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়।

৬. খনিজ সম্পদ ব্যবস্থাপনা : জিআইএস এর মাধ্যমে কোনো অঞ্চল বা দেশে কী পরিমাণ সম্পদ যেমন- তেল, গ্যাস, লৌহ ইত্যাদি মজুদ রয়েছে তার ডাটাবেজ তৈরি করে মানচিত্রে উপস্থাপন করা যায়। ফলে খনিজ সম্পদভিত্তিক কোথায় কী ধরনের শিল্প গড়ে উঠতে পারে তার সঠিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করা যায়।

৭. গ্রামীন উন্নয়ন : গ্রামীন এলাকায় উৎপাদিত বিভিন্ন কৃষিজাত পণ্য বাজারজাতকরণ, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান স্থাপন প্রভৃতি প্রয়োজন হয়। কৃষিজাত পণ্যের অধিক উপযোগিতা ও ব্যবহার এবং প্রতিষ্ঠানের সর্বাধিক সুবিধা জনগণ যাতে পেতে পারে সেজন্য সার্বিক পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে জিআইএস প্রযুক্তি ব্যবহার করা যায়।

৮. পরিবহন ও যোগাযোগ : দেশের সকল মহাসড়ক, আঞ্চলিক সড়ক, পাকা ও কাঁচা সড়ক, নগর, বন্দর, সড়ক পরিবহন ব্যবস্থাপনা ও দুর্ঘটনার ধরণ প্রভৃতি উপাত্ত সংরক্ষণ ও বিশ্লেষণ করে জিআইএস প্রযুক্তির মাধ্যমে নিরাপদ এবং আধুনিক সড়ক ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়।

৯. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশ সংরক্ষণ : দেশের দুর্যোগপ্রবণ (যেমন- ঘূর্ণিঝড়, সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা) এলাকা চিহ্নিত করে মানচিত্র অঙ্কন করে ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস ও দুর্যোগ মোকাবেলায় জিআইএস ব্যবহার করা যায়। এছাড়া বিশ্বব্যাপী আলোচিত বিষয় পরিবেশ সংরক্ষণেও জিআইএস ব্যবহার করা যায়। জিআইএসের মাধ্যমে পারিবেশিক প্রভাব মূল্যায়ন, পরিবেশগত ঝুঁকি, মডেল তৈরি, দূষণ উৎস প্রভৃতি চিহ্নিত করে মানচিত্রে তুলে ধরে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়।

১০. শিক্ষা ও গবেষণা : শিক্ষা ক্ষেত্রে যেমন- কোন্ রুট দিয়ে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় বা যে কোনো প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের যাতায়াত সহজ হবে তা জিআইএসের দ্বারা করা যায়। আবার গবেষণার ক্ষেত্রে যেমন- কোনো এলাকার জলাবদ্ধতার ওপর গবেষণা করতে হলে এই প্রযুক্তির মাধ্যমে ডাটাবেজ তৈরি করে মানচিত্র অঙ্কন করা যায়। এই মানচিত্র থেকে সেই এলাকার সার্বিক পরিস্থিতি জানা যায়।

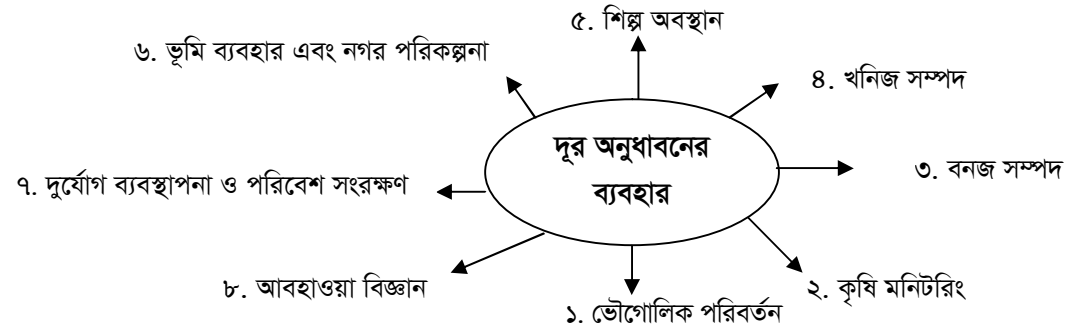
১১. সামরিক ব্যবস্থাপনা : সামরিক বাহিনীর রণকৌশল প্রণয়নের ক্ষেত্রে জিআইএস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যুদ্ধকালীন সময়ে শত্রুর অবস্থান, গতিবিধি পর্যবেক্ষণ, সেনা মোতায়েনের নকশা, গোলাবারুদসহ যুদ্ধ সরঞ্জাম সরবরাহ প্রভৃতিতে জিআইএস ব্যবহার করা হয়।

উপরিউক্ত ক্ষেত্রগুলো ছাড়াও ভূমি জরিপ, অপরাধ দমন, চিকিৎসা, ব্যবসা-বাণিজ্য, আবাসন, স্বাস্থ্য, ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা, রাজনৈতিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে জিআইএস ব্যবহার করা হয়।

দূর অনুধাবনের ব্যবহার (Uses of Remote Sensing)

১. ভৌগোলিক পরিবর্তন : পৃথিবী পৃষ্ঠের কোনো স্থানের পরিবর্তন সংক্রান্ত বিষয় নির্ণয় করার জন্য দূর অনুধাবন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এর দ্বারা সংগৃহীত তথ্য মানচিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়।

২. কৃষি মনিটরিং : কৃষিক্ষেত্রে মনিটরিং এর জন্য এ পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়। যেমন-বন্যা, রোগ-ব্যাধি ইত্যাদির ধরণ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা যায়। এছাড়া আবাদী জমি, পতিত জমি, কৃষির ধরণ, ইত্যাদি তথ্যাবলী জানার জন্য জিআইএস ব্যবহার করা হয়। এ থেকে প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহার করে কৃষিক্ষেত্রে পূর্বাভাস দেয়া যায়।



৩. বনজ সম্পদ : কোথায় কোন ধরনের গাছ জন্মে, রোগের আক্রমণ, দাবানল বা দূষণ প্রভৃতির ইমেজ (ছবি) সংগ্রহ করে ব্যাখ্যা করা যায়।

৪. **খনিজ সম্পদ :** খনিজ সম্পদের অবস্থান, অনুসন্ধান ইত্যাদি ক্ষেত্রেও এ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

৫. শিল্প অবস্থান : শিল্পের অবস্থান, বিস্তৃতি, পরিবহন ব্যবস্থা, আবাসিক এলাকার অবস্থান প্রভৃতি শনাক্ত করে মোট শিল্প প্রতিষ্ঠানের আয়তন হিসাব করা যায়।

৬. **ভূমি ব্যবহার এবং নগর পরিকল্পনা :** দূর অনুধাবনের মাধ্যমে কোনো এলাকার ভূমি ব্যবহারের ধরণ জানা যায়। ভূমি ব্যবহার এবং নগর পরিকল্পনার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করতে পারে।

৭. **দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশ সংরক্ষণ :** দূর অনুধাবন কোনো দুর্যোগ আক্রান্ত এলাকার সঠিক এবং যথাসময়ে তথ্য প্রদান করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, ভূমিকম্পের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ এলাকার ছবি, ক্ষয়ক্ষতির মূল্যায়ন এবং অন্যান্য তথ্য সংগ্রহের জন্য এ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এছাড়া কোনো এলাকার পরিবেশগত পরিবর্তনের তথ্য (যেমন- নদীভাঙ্গন এলাকা চিহ্নিতকরণ) সংগ্রহ করে পরিবেশ সংরক্ষণের পদক্ষেপ গ্রহণে দূর অনুধাবন সহায়তা করে।

৮. আবহাওয়া বিজ্ঞান : ঘূর্ণিঝড়ের উৎপত্তি, অগ্রগতি, বিস্তৃতি, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ প্রভৃতি সম্পর্কে পূর্বাভাস পাওয়ার জন্য দূর অনুধাবন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

উপরিউক্ত ব্যবহারগুলো ছাড়াও জরিপ, সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও মূল্যায়ন, সমুদ্রবিদ্যা, ভূমি অবক্ষয়, জনবসতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে দূর অনুধাবন ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও দুর্গম ও বিপদজনক এলাকার তথ্য সংগ্রহ করে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা যায়। সর্বোপরি ভূগোলবিদদের কাছে ভৌগোলিক কার্যে দূর অনুধাবন একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে।

শিক্ষার্থীর কাজ	জিআইএস এবং দূর অনুধাবনের ব্যবহার ছকবদ্ধ করুন।

সারসংক্ষেপ

বর্তমানে জিআইএস এবং দূর অনুধাবনের ব্যবহার এই প্রযুক্তির চাহিদাকে বিস্তৃত করেছে। জিআইএস এর বহুমুখী ব্যবহারের মধ্যে রয়েছে নগর পরিকল্পনা, মহাপরিকল্পনা, ভূমি ব্যবস্থাপনা, কৃষি উন্নয়ন, বনজসম্পদ ব্যবস্থাপনা, গ্রামীন উন্নয়ন, পরিবহন ও যোগাযোগ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও পরিবেশ সংরক্ষণ প্রভৃতির মানচিত্র অঙ্কন। আর জিআইএস এর তথ্যের গুরুত্বপূর্ণ উৎস দূর অনুধাবন। এটি পৃথিবী পৃষ্ঠের বিভিন্ন অবস্থা বা বিষয়ের সঠিক ইমেজ সংগ্রহ করে তা থেকে মানচিত্র অঙ্কন এবং প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে সহায়তা করে থাকে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৪.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। জিআইএস ব্যবহার করা হয়-

i. নগর পরিকল্পনায় ii. গ্রামীন উন্নয়নে iii. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায়

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২। দূর অনুধাবন আবহাওয়া বিজ্ঞানের কোন ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়?

(ক) ঘূর্ণিঝড়ের উৎপত্তিস্থল নির্ণয়ে (খ) ক্ষয়ক্ষতি নির্ণয়ে

(গ) ঘূর্ণিঝড়ের বিস্তৃতি নির্ণয়ে (ঘ) সবগুলো

৩। দুর্গম ও বিপদজনক এলাকায় ইমেজ সংগ্রহ করা যায় কীভাবে?

(ক) দূর অনুধাবনের মাধ্যমে (খ) ক্যামেরার মাধ্যমে

(গ) ভিডিও ক্যামেরার মাধ্যমে (ঘ) মোবাইলের মাধ্যমে

পাঠ-১৪.৪ বাংলাদেশে জিআইএস ও দূর অনুধাবনের বিকাশ (Development of GIS & Remote Sensing in Bangladesh)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- বাংলাদেশে জিআইএস ও দূর অনুধাবনের বিকাশ সম্পর্কে বলতে পারবেন।

বাংলাদেশে জিআইএস ও দূর অনুধাবনের বিকাশ

বাংলাদেশে জিআইএস এবং দূর অনুধাবনের ব্যবহার খুব বেশি দিনের নয়। কানাডায় ১৯৬৪ সালে জিআইএস এর উদ্ভব হলেও বাংলাদেশে এ প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয় ১৯৯১ সালে। ২০০০ সালের পর তা দ্রুত বিস্তৃত হতে থাকে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের Irrigation Support Project for Asia and the Near East (ISPAN) এর অধীনে Flood Action Plan-19 (FAP-19) এ জিআইএস সর্বপ্রথম প্রয়োগ করা হয়। বর্তমানে ISPAN এর স্থলাভিষিক্ত হয়েছে Centre for Environmental and Geographic Information Services (CEGIS)। পরবর্তীতে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে জিআইএস এর প্রয়োগ ও প্রসার ঘটতে থাকে। SPARRSO (Space Research and Remote Sensing) জিআইএস সফট্ওয়্যার ইনস্টল করে ১৯৯১ সালে। বাংলাদেশ সেন্টার ফর এডভান্সড স্টাডিজ (BCAS) ১৯৯৩ সালে জিআইএস এর ব্যবহার শুরু করে। এটি একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন প্রকল্পে জিআইএস সংক্রান্ত কাজ করে। এছাড়া জিআইএস প্রশিক্ষণ কেন্দ্র হিসেবেও কাজ করে থাকে।

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো অটোমেটেড ফটোগ্রাফিসহ জিআইএস এবং দূর অনুধাবন পদ্ধতি চালু করেছে। এ প্রতিষ্ঠানটি পরিকল্পনা, উন্নয়ন, শুমারিভিত্তিক জনসংখ্যা প্রভৃতি উপাত্ত সরবরাহ করে এবং জিআইএস এর মাধ্যমে মানচিত্রে তুলে ধরে। বাংলাদেশ বন বিভাগ ১৯৯৫ সালে বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় বনজ সম্পদ সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনা প্রকল্পে জিআইএস ব্যবহার করে। পরবর্তীতে জিআইএস এর ব্যবহার প্রসারিত হতে থাকে।

রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক) জিআইএস এর ব্যবহার শুরু করে ১৯৯৩ সালে। এই প্রতিষ্ঠানটির জিআইএস ব্যবহারের প্রধান ক্ষেত্র নগর পরিকল্পনা। সড়ক ও জনপথ বিভাগ ১৯৯৫ সালে জাতীয় পরিবহন নেটওয়ার্ক এর মানচিত্র তৈরির জন্য একটি প্রকল্পে প্রথম জিআইএস ব্যবহার করে। ১৯৯৬ সালে এ প্রকল্পটি সড়ক ও রেলপথের ভৌগোলিক ডাটাবেজ তৈরি করে। সার্ভে অব বাংলাদেশও জিআইএস ব্যবহার করছে ডিজিটাল মানচিত্র তৈরির জন্য। প্রতিষ্ঠানটি যৌথভাবে কাজ করে স্পারসো, বিবিএস, জাইকা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সাথে। নগর গবেষণা কেন্দ্র (CUS) বিভিন্ন নগরের নকশা ডিজাইন এবং পরিকল্পনার জন্য জিআইএস ব্যবহার করে থাকে।

উপরিউক্ত প্রতিষ্ঠানগুলো ছাড়াও পরিবেশ অধিদপ্তর, মৃত্তিকা সম্পদ উন্নয়ন ইনস্টিটিউট (SRDI), স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (LGRD), পানি সম্পদ পরিকল্পনা সংস্থা (WARPO),বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ (BIWTA), বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড (BWDB), ভূমি জরিপ অধিদপ্তর প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান জিআইএস ব্যবহার করছে। এছাড়া অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে এশিয়াটিক সোসাইটি, কেয়ার বাংলাদেশ, আর্ক বাংলাদেশ, জিএসআরসি, আইসিডিডিআরবি, জাইকাসহ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে জিআইএস ব্যবহার করা হচ্ছে।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জিআইএস এবং দূর অনুধাবন : জিআইএস এর গুরুত্ব এবং চাহিদা বিবেচনা করে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষাদান করা হয়। ১৯৯৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগ জিআইএস ল্যাব চালু করা হয়। স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে জিআইএস ও দূর অনুধাবনের উপর পাঠদান করা হচ্ছে। বর্তমানে বিভাগটিতে মাস্টার্স পর্যায়ে বিশেষায়িতভাবে জিআইএস এবং দূর অনুধাবনের উপর পাঠদান করা হয়। এছাড়াও জিআইএস ও দূর অনুধাবনের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়েও জিআইএস এবং দূর অনুধাবনের উপর পাঠদান করা হয়। এছাড়া এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনস্টিটিউট অব রিমোট সেনসিং প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে জিআইএস এবং দূর অনুধাবনের উপর পাঠদান করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান জিআইএস এবং দূর অনুধাবনের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করে থাকে।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশে যেসব প্রতিষ্ঠানে জিআইএস ব্যবহার করা হয় সেগুলো ছকবদ্ধ করুন।

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশে জিআইএস এবং দূর অনুধাবনের ব্যবহার খুব বেশি দিনের নয়। কানাডায় ১৯৬৪ সালে জিআইএস এর উদ্ভব হলেও বাংলাদেশে এ প্রযুক্তির ব্যবহার শুরু হয় ১৯৯১ সালে। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের FAP-19 এ জিআইএস সর্বপ্রথম প্রয়োগ করা হয়। বর্তমানে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে জিআইএস এবং দূর অনুধাবন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এছাড়া বিভিন্ন উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জিআইএস এবং দূর অনুধাবনের উপর পাঠদান করা হয়। ফলে দ্রুত গতিতেই বাংলাদেশে এ প্রযুক্তিগুলোর ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৪.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। বাংলাদেশে জিআইএস এর ব্যবহার শুরু হয় কবে?
(ক) ১৯৯০ সালে (খ) ১৯৯১ সালে (গ) ১৯৯২ সালে (ঘ) ১৯৯৩ সালে

২। কোন প্রতিষ্ঠানটিতে জিআইএস ব্যবহার করা হয়?
(ক) স্পারসো (খ) পরিবেশ অধিদপ্তর (গ) মৃত্তিকা সম্পদ ইনস্টিটিউট (ঘ) সবগুলো

৩। কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে ইনস্টিটিউট অব রিমোট সেনসিং অবস্থিত?
(ক) রাজশাহী (খ) চট্টগ্রাম (গ) জাহাঙ্গীরনগর (ঘ) খুলনা

চূড়ান্ত মূল্যায়ন

সৃজনশীল-১

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি স্টাডি সেন্টারের ভূগোল বিষয়ের টিউটোরিয়াল ক্লাসে একজন শিক্ষার্থী টিউটরের কাছে জানতে চাইলেন মানচিত্র কীভাবে অঙ্কন করা হয়? টিউটর বললেন, অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশের সাহায্যে সমতল কাগজে মানচিত্র তৈরি করা যায়। এছাড়া বর্তমানে আধুনিক প্রযুক্তির সহায়তায় কম্পিউটারের মাধ্যমে উন্নততর প্রযুক্তিতে মানচিত্র প্রণয়ন করা হয়। এ প্রযুক্তির ব্যবহার এবং ব্যাপকতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ক. আলোচ্য প্রযুক্তিটি কী?
খ. উল্লিখিত প্রযুক্তিটি কীভাবে কার্য সম্পন্ন করে?
গ. উল্লিখিত প্রযুক্তির প্রায়োগিক গুরুত্ব আলোচনা করুন।
ঘ. উদ্দীপকের প্রযুক্তিটিতে যেসব উপাদান ব্যবহার করা হয় সেগুলো বর্ণনা করুন।

সৃজনশীল-২

১৯৬০ সালের পরবর্তী সময়ে নতুন একটি প্রযুক্তি আবিস্কৃত হয়। এ প্রযুক্তির সাহায্যে বিভিন্ন প্রকার আলোকচিত্র ধারণ করা যায়। এমনকি দুর্গম এলাকার আলোকচিত্র সংগ্রহ করা যায়। এতে বিভিন্ন প্রকার সংবেদন পদ্ধতিও ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে এই প্রযুক্তি বহুমুখী কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে।

ক. আলোচ্য প্রযুক্তিটির নাম কী?
খ. উদ্দীপকের প্রযুক্তিতে কী কী উপাদান ব্যবহার করা হয়?
গ. উল্লিখিত প্রযুক্তির বিদ্যমান সুবিধা-অসুবিধাসমূহ তুলে ধরুন।
ঘ. উদ্দীপকের প্রযুক্তিটির প্রায়োগিক গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৪.১: ১. ঘ ২. ঘ ৩. ঘ ৪. গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৪.২: ১. ক ২. ঘ ৩. ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৪.৩ : ১. ঘ ২. ঘ ৩. ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৪.৪ : ১. খ ২. ঘ ৩. গ

ইউনিট
১৫

ব্যবহারিক : মানচিত্র ও স্কেল
(Practical : Map and Scale)

ভূমিকা

ভূগোল বিজ্ঞানের অত্যন্তগুর ত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে মানচিত্র। মানচিত্রের মাধ্যমে ভূগোলের বিভিন্ন প্রপঞ্চ উপস্থাপনের জন্য মানচিত্রের ধারণা, উপাদান, ব্যবহার, শ্রেণিবিভাগ, সংকোচন, প্রসারণ, স্কেল ও স্কেলের শ্রেণিবিভাগ সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এগুলোর সবই ব্যবহারিক ভূগোলের প্রধান আলোচ্য বিষয়।







ইউনিট সমাপ্তির সময়	ইউনিট সমাপ্তির সর্বোচ্চ সময় ২ সপ্তাহ

এই ইউনিটের পাঠসমূহ

পাঠ ১৫.১ : মানচিত্রের ধারণা, উপাদান ও ব্যবহার
পাঠ ১৫.২ : মানচিত্রের শ্রেণিবিভাগ
পাঠ ১৫.৩ : স্কেল ও এর শ্রেণিবিভাগ
পাঠ ১৫.৪ : সরল ও কর্ণীয় স্কেল
পাঠ ১৫.৫ : মানচিত্রের সংকোচন ও প্রসারণের সুবিধা-অসুবিধা
পাঠ ১৫.৬ : স্কেলের সাহায্যে অবস্থান ও দূরত্ব নির্ণয়
পাঠ ১৫.৭ : মানচিত্রের সংকোচন পদ্ধতি
পাঠ ১৫.৮ : মানচিত্রের প্রসারণ পদ্ধতি

পাঠ-১৫.১ মানচিত্রের ধারণা, উপাদান ও ব্যবহার
(Cocept, Elements and Uses of Map)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মানচিত্রের ধারণা ও উপাদানসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারবেন এবং
- মানচিত্রের ব্যবহার সম্পর্কে বলতে পারবেন।

মানচিত্রের ধারণা

পৃথিবীর মহাদেশ এবং মহাসাগরসমূহের বিভিন্ন অংশের সীমা, আয়তন, অবস্থান এবং তাদের মধ্যকার পারস্পরিক দূরত্ব বুঝানোর জন্য নির্দিষ্ট মাপনীর (Scale) প্রেক্ষিতে সমগ্র ভূ-পৃষ্ঠের অংশবিশেষের যে নকশা প্রস্তুত করা হয়, তাকে মানচিত্র বলে। বিভিন্ন প্রকার সংকেত এবং রং (কালার) ব্যবহারের মাধ্যমে ভূ-পৃষ্ঠের বিভিন্ন স্থানগুলোর পারস্পরিক দূরত্ব, আয়তন ও সীমা ঠিক রেখে প্রাকৃতিক বিভিন্ন প্রপঞ্চ (যেমন : ভূ-প্রকৃতি, নদ-নদী, পাহাড়, সমুদ্র, সমুদ্র স্রোত) এবং অর্থনৈতিক বিষয়াদি ((যেমন : ধান, পাট গম উৎপাদন) শিল্প-কারখানা এবং নগর বিষয়ক বিষয়াদী (যেমন : গ্রামীন বসতি, পৌরবসতি) প্রভৃতি মানচিত্রে বিভিন্ন সংকেতের মাধ্যমে দেখানো হয়। বিশেষ মান ভিত্তিক এ চিত্র অঙ্কিত হয় বলে একে মানচিত্র বলে। মানচিত্র অঙ্কনের জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন স্কেল ও অভিক্ষেপ।

ভূগোলবিদদের মতে- ''প্রচলিত সাংকেতিক চিহ্ন, নির্দিষ্ট স্কেল ও অভিক্ষেপের সাহায্যে সমতল কাগজের উপর অঙ্কিত সমগ্র পৃথিবী বা এর অংশবিশেষের প্রতিরূপকে মানচিত্র বলে''।

মানচিত্রের উপাদান : মানচিত্রের প্রধান উপাদান ৫টি । যেমন- ১) সীমানা ২) স্কেল, ৩) অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখা, ৪) উত্তরদিক এবং ৫) শিরোনাম ও সাংকেতিক চিহ্ন।

১. **সীমানা (Boundary):** প্রতিটি মানচিত্রের চারিপাশে নির্দিষ্ট সীমানা থাকবে।

২. **উত্তরদিক (North Line) :** প্রতিটি মানচিত্রের উত্তর দিক N বা উত্তর বা (▲) এই অ্যারোচিহ্নের মাধ্যমে দেখাতে হবে। অ্যারোচিহ্ন সর্বদা মানচিত্রের উপরের দিকে থাকবে।

৩. **অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখা (Latitude and Longitude)** : যে এলাকার মানচিত্র সেই এলাকার অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখা সঠিকভাবে দেখাতে হবে।

৪. **স্কেল (Scale)** : মানচিত্রটি অবশ্যই নির্দিষ্ট স্কেলে অঙ্কন করতে হবে। মানচিত্রে যে কোনো দুটি স্থানের মধ্যে দূরত্ব এবং ভূ-পৃষ্ঠে বা ভূমিভাগে ঐ দুটি স্থানের মধ্যে প্রকৃত দূরত্বের যে অনুপাত বা সম্পর্ক তাকে মাপনী বা স্কেল বলে।

৫. **শিরোনাম ও সাংকেতিক চিহ্ন (Headings and Symbols) :** মানচিত্রের শিরোনাম উল্লেখ করে বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট মানচিত্রের বিষয়াদি সঠিক সংকেতের সাহায্যে উল্লেখ করতে হবে।

মানচিত্রের ব্যবহার : মানচিত্রের ব্যবহারিক গুরুত্ব অপরিসীম। নিম্নে মানচিত্রের ব্যবহার উল্লেখ করা হলো-

১. যে কোনো স্থানের ভৌগোলিক তথ্যসমূহ সঠিকভাবে মানচিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়।

২. মানচিত্রের সাহায্যে গ্রাম, শহর, স্থলপথ, জলপথ, নদনদী, পাহাড়, পর্বত, মালভূমি, সমভূমি, পর্যটনের স্থানসমূহ, ভূ-প্রকৃতি, কৃষিজ, শিল্পজাত দ্রব্য উৎপাদন, বন্টন প্রভৃতি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য মানচিত্রের মাধ্যমে প্রদর্শিত হয় বলে সহজে তথ্যসমূহ বিশ্লেষণ করা যায়।

৩. মানচিত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন স্থানের দূরত্ব নির্ণয় করা যায় এতে যাতায়াত সহজ হয়।

৪. বিভিন্ন ধরনের মানচিত্র প্রাকৃতিক ভূগোলের স্থানকে সমৃদ্ধ করেছে। যেমন- আবহাওয়া মানচিত্র থেকে আবহাওয়া, মৃত্তিকা মানচিত্র থেকে মৃত্তিকা, সমুদ্র স্রোতের মানচিত্র থেকে সামুদ্রিক স্রোতসমূহ প্রভৃতি সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়।

৫. সমুদ্রে জাহাজ চালাতে, বিমান ভ্রমণে মানচিত্র সম্পর্কে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এমনকি যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর অবস্থান জানতেও মানচিত্রের জ্ঞান প্রয়োজন।

৬. প্রশাসনিক কর্মকান্ড, প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ এবং পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য মানচিত্র ব্যবহৃত হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	আপনার বাড়ি যে জেলায় অবস্থিত ঐ জেলার একটি মানচিত্র অঙ্কন করুন। এতে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ উল্লেখ থাকবে। যথা: ১) মানচিত্রের প্রধান ৫টি উপাদান, ২) প্রশাসনিক সীমা, ৩) প্রধান কৃষিজ বা শিল্পজ পণ্য।

সারসংক্ষেপ

ভূগোলের ব্যবহারিক অংশের অত্যন্তগুরুত্বপূর্ণ বিষয় মানচিত্র। মানচিত্রের সাহায্যে প্রাকৃতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক যে কোনো ভৌগোলিক প্রপঞ্চ উপস্থাপন এবং অনুধাবন করা যায়। মানচিত্রের প্রধান পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো মানচিত্রের সীমানা, উত্তর দিক, অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখা, শিরোনাম, সাংকেতিক চিহ্ন ও স্কেল।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৫.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ১, ২ ও ৩ নং প্রশ্নের দিন।

ফয়সাল একাদশ শ্রেণির ছাত্র। শিক্ষক ব্যবহারিক ক্লাসের প্রথম দিনে বাংলাদেশের মানচিত্র দেখালেন। শিক্ষক প্রদর্শিত মানচিত্রে কোন কোন বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে তা শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ করতে বললেন।

১। মানচিত্রের প্রধান উপাদান কয়টি?

(ক) ৫টি (খ) ৬টি

(গ) ৭টি (ঘ) ৮টি

২। মানচিত্রের উত্তর দিক বা North line দেখানোর জন্য অ্যারোচিহ্ন কোন দিকে দেখানো হয়?

(ক) নিচের দিকে (খ) উপরের দিকে

(গ) মাঝামাঝি (ঘ) ডানদিকে

৩। স্কেলের বৈশিষ্ট্যসমুহ নিম্নরূপ-

i. মানচিত্র নির্দিষ্ট স্কেলে অঙ্কন করতে হবে

ii. মানচিত্রে দুটি স্থানের দূরত্ব এবং ভূ-পৃষ্ঠে দুটি স্থানের মধ্যকার দূরত্বের অনুপাত হলো স্কেল

iii. স্কেলের সাহায্যে দূরত্ব সহজে পরিমাপ করা যায়।

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) ii ও iii (গ) i, ii ও iii (ঘ) iii

৪। যে কোনো স্থানের ভৌগোলিক তথ্যসমূহ কীসের সাহায্যে স্কেল ব্যবহার করে সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা যায়?

(ক) মানচিত্র (খ) লেখচিত্র

(গ) পাইচিত্র (ঘ) বারচিত্র

পাঠ-১৫.২ মানচিত্রের শ্রেণিবিভাগ (Classification of Maps)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মানচিত্রের শ্রেণিবিভাগ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

মানচিত্রের শ্রেণিবিভাগ

মানচিত্রের স্কেলকে প্রধানত তিনটি বিষয়ের ভিত্তিতে শ্রেণিবিভাগ করা হয়েছে। যথা- ক. ব্যবহারিক বিশেষত্ব ও বিষয়বস্তু অনুসারে খ. স্কেলের উপর ভিত্তি করে এবং গ. ভৌগোলিক উপাদানের ভিত্তিতে।

ক. ব্যবহারিক বিশেষত্ব ও বিষয়বস্তু অনুসারে : ব্যবহারিক বিশেষত্ব ও বিষয়বস্তু অনুসারে মানচিত্রকে প্রধান পাঁচটি ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা-

১. **মৌজা মানচিত্র (Cadastral Maps) :** ভূমি জরিপের মাধ্যমে প্রাপ্ত বিভিন্ন ভূ-সম্পত্তি, কৃষিক্ষেত্র, বাড়িঘর, অন্যান্য স্থাপনার সীমানা অঙ্কন করা হয় যে মানচিত্রে তাকে মৌজা মানচিত্র বা সম্পত্তি জরিপ মানচিত্র বলে। মৌজা মানচিত্রে জমির মালিকানা নথিভুক্ত করা হয়। এই মানচিত্রে ভূ-পৃষ্ঠের অতিক্ষুদ্র অংশের প্রতিরূপ প্রদর্শন করা হয় বলে মৌজা মানচিত্র অঙ্কন করতে অভিক্ষেপের প্রয়োজন হয় না। মৌজা মানচিত্রে প্রতিভূ অনুপাত সাধারণত ৬"=১ মাইল, ২৫"=১ মাইল ধরা হয়। বাংলাদেশের মৌজা মানচিত্রের স্কেল ১৬"= ১ মাইল থেকে ৬৪"=১ মাইল এবং অন্যান্য দেশে মৌজা মানচিত্রের স্কেল ১:২০,০০০ ধরা হয়।

২. **ভূ-সংস্থানিক মানচিত্র (Topographical Map) :** ভূমির বন্ধুরতা, নদ-নদী, বনজঙ্গল, পরিবহন পথ, শহর, গ্রাম, বন্দর, ঘরবাড়ি, ভূমির ব্যবহার প্রভৃতি বিভিন্ন ভূ-প্রাকৃতিক প্রপঞ্চসমূহকে বিভিন্ন সাংকেতিক চিহ্ন বা প্রতীক, বিন্দু এবং রঙের মাধ্যমে যে মানচিত্রে উপস্থাপন করা হয় তাকে ভূ-সংস্থানিক মানচিত্র বলে। ভূ-সংস্থানিক মানচিত্রের স্কেল বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম হয়। যেমন- ভারত, বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে ১", $\frac{১"}{২}$ এবং $\frac{১"}{৪}$ তে ১ মাইল, অস্ট্রেলিয়ায় ১"= ১ মাইল ধরা হয়।

৩. **আন্তর্জাতিক মানচিত্র (International Map):** পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জাতীয় ভূ-সংস্থানিক মানচিত্র (National Topographical map) লক্ষ্য করলে দেখা যায়, মানচিত্রের স্কেল ও অভিক্ষেপ বিভিন্নরকম এমনকি সাংকেতিক চিহ্নও বিভিন্ন রকম। এই অসুবিধা দূর করার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ একই অভিক্ষেপ, স্কেল ও সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করার জন্য সিদ্ধান্তগ্রহণ করেছেন। এই ধরনের মানচিত্রকে আন্তর্জাতিক মানচিত্র বলা হয়। এই মানচিত্রের জন্য একই আকারের শীট বা কাগজ ব্যবহৃত হয় এবং এর স্কেল ১:১০, ০০, ০০০ ধরা হয়।

৪. **দেওয়াল মানচিত্র (Wall Map) :** শ্রেণিকক্ষে সমগ্র পৃথিবী, মহাদেশ বা দেশের তথ্যাদি, কোনো একটি গোলার্ধে ছাত্র-ছাত্রীদের নিকট উপস্থাপনের জন্য যে বড় আকারের মানচিত্র ব্যবহার করা হয় তাকে দেওয়াল মানচিত্র (Wall Map) বলে। এছাড়া সরকারি ও বেসরকারি অফিস, সামরিক দপ্তর এবং বাসাবাড়িতে এই মানচিত্র ব্যবহৃত হয়। এ মানচিত্রের স্কেল ভূ-সংস্থানিক ও ভূচিত্রাবলির মানচিত্রের মধ্যবর্তী পর্যায়ের হয়।

৫. **ভূ-চিত্রাবলী (Atlas) :** ভূ-চিত্রাবলীতে সাধারণত ভূ-প্রাকৃতিক, জলবায়ু, কৃষিজ, খনিজ, শিল্প, শহর, নগর স্থলপথ ইত্যাদি বিষয়ের তথ্যাদি বিভিন্ন রং ও চিহ্নের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। এই ধরনের মানচিত্রের স্কেল সাধারণত ১ঃ১০০০,০০০ বা ১ঃ১০০০,০০০,০০০ হয়ে থাকে।

খ. স্কেলের উপর ভিত্তি করে: স্কেলের উপর ভিত্তি করে মানচিত্রকে প্রধান দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১. **ক্ষুদ্র স্কেলের মানচিত্র :** যখন ব্যাপক এলাকাকে ছোট করে কাগজে অঙ্কন করা হয় তখন তাকে ক্ষুদ্র স্কেলের মানচিত্র বলে। এ ক্ষেত্রে সমগ্র পৃথিবী বা মহাদেশ বা দেশের বড় এলাকাকে একটি ছোট কাগজে দেখানো হয়। ভূ-চিত্রাবলীর মানচিত্র ও দেওয়াল মানচিত্র ক্ষুদ্র স্কেলের মানচিত্র।

২. বৃহৎ স্কেলের মানচিত্র : ক্ষুদ্র এলাকাকে বৃহৎ স্কেলে অঙ্কন করে যখন অনেক বড় করে দেখান হয়, তখন তাকে বৃহৎ স্কেলের মানচিত্র বলে। যেমন, ১"=১৬ মাইল; ১৬"= ১মাইল। যেমন মৌজা মানচিত্র বা ক্যাডাস্ট্রাল মানচিত্র, ভূ-সংস্থানিক মানচিত্র বৃহৎ স্কেলের মানচিত্র।

গ. ভৌগোলিক উপাদানের উপর ভিত্তি করে : ভৌগোলিক উপাদানের উপর ভিত্তি করে মানচিত্রকে প্রধান দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা : প্রাকৃতিক মানচিত্র ও সাংস্কৃতিক মানচিত্র।

১. প্রাকৃতিক মানচিত্র (Physical Map): প্রাকৃতিক ভূগোলের প্রাকৃতিক বিষয়াদি যে মানচিত্রে উপস্থাপন করা হয় তাকে প্রাকৃতিক মানচিত্র বলে। প্রাকৃতিক মানচিত্র বৃহৎ স্কেলে অঙ্কন করা হয়। সাধারণত প্রাকৃতিক মানচিত্রে ভূমির বন্ধুরতা সমোন্নতি রেখার মাধ্যমে দেখানো হয়। এছাড়া সড়কপথ, রেলপথ, নৌপথ, উদ্ভিদের বণ্টন, মৃত্তিকার প্রকারভেদ প্রভৃতি প্রাকৃতিক মানচিত্রে উপস্থাপন করা হয়।

২. সাংস্কৃতিক মানচিত্র (Cultural Map): যে মানচিত্রে সাংস্কৃতিক তথ্যাদি উপস্থাপিত হয় তাকে সাংস্কৃতিক মানচিত্র বলে। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক প্রভৃতি তথ্যাদি সাংস্কৃতিক মানচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়। সাংস্কৃতিক মানচিত্রে প্রচলিত চিহ্ন, বিন্দু, ছায়াপাত, ভ্রুলেখ প্রভৃতি ব্যবহার করে তথ্য ও উপাত্ত উপস্থাপন করা হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	বাংলাদেশের নদ-নদী, ভূ-প্রকৃতি, ভূমির বন্ধুরতা, ধান, গম ও পাট উৎপাদান প্রভৃতি কোন ধরনের মানচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপিত হবে এবং কোন কোন সংকেত ব্যবহৃত হবে। শিক্ষার্থীরা দলগতভাবে আলোচনা করবেন।

সারসংক্ষেপ

ব্যবহারিক বিশেষত্ব ও বিষয়বস্তু, স্কেলের ও ভৌগোলিক উপাদানের উপর ভিত্তি করে মানচিত্রের শ্রেণিবিভাগ করা হয়। ব্যবহারিক বিশেষত্ব ও বিষয়বস্তু অনুসারে মানচিত্রকে প্রধান পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা- মৌজা মানচিত্র, ভূ-সংস্থানিক মানচিত্র, আন্তর্জাতিক মানচিত্র, দেওয়াল মানচিত্র ও ভূ-চিত্রাবলী। স্কেলের উপর ভিত্তি করে মানচিত্র দু'প্রকার। যথা- ক্ষুদ্র স্কেলের মানচিত্র ও বৃহৎ স্কেলের মানচিত্র। অপরদিকে, ভৌগোলিক উপাদানের উপর ভিত্তি করে মানচিত্র দু'প্রকার। যথা- প্রাকৃতিক মানচিত্র ও সাংস্কৃতিক মানচিত্র।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৫.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কোন ধরনের মানচিত্র ক্ষুদ্র ও বৃহৎ উভয় স্কেলে প্রকাশ করা যায়?
(ক) বিষয়ভিত্তিক মানচিত্র (খ) পরিমাণগত মানচিত্র
(গ) ঐতিহাসিক সংস্থাপন (ঘ) কোনটিই নয়

২। ভূ-তাত্ত্বিক মানচিত্র, মৃত্তিকা মানচিত্র, আবহাওয়া ও জলবায়ু মানচিত্র, বন্ধুরতা মানচিত্র প্রভৃতি কোন ধরনের মানচিত্রের উদাহরণ?
(ক) সাংস্কৃতিক মানচিত্র (খ) প্রাকৃতিক মানচিত্র
(গ) ক্ষুদ্র স্কেলের মানচিত্র (ঘ) কোনটিই নয়

৩। প্রাকৃতিক মানচিত্র কোন স্কেলে অঙ্কন করতে হয়?
(ক) ক্ষুদ্র স্কেলের মানচিত্র (খ) বৃহৎ স্কেলের মানচিত্র
(গ) ক্ষুদ্র ও বৃহৎ স্কেলের মানচিত্র (ঘ) কোনটিই নয়

৪। অর্থনৈতিক, ঐতিহাসিক, সামাজিক প্রভৃতি তথ্য কোন ধরনের মানচিত্রের অন্তর্ভুক্ত?
(ক) সাংস্কৃতিক মানচিত্র (খ) প্রাকৃতিক মানচিত্র
(গ) প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক মানচিত্র (ঘ) অর্থনৈতিক মানচিত্র

পাঠ-১৫.৩ স্কেল ও এর শ্রেণিবিভাগ
(Scale and its Classification)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- স্কেলের সংজ্ঞা এবং স্কেলের শ্রেণিবিভাগ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

স্কেল

মানচিত্রের দু'টি স্থানের দূরত্ব এবং ভূমিতে ঐ স্থান দু'টির প্রকৃত দূরত্বের অনুপাতকে স্কেল বলে। অন্যভাবে বলা যায়, ভৌগোলিক তথ্য ও উপাত্তসমূহ মানচিত্রে উপস্থাপনের জন্য যে অনুপাতে কমানো বা বাড়ানো হয় তাকে মানচিত্রের স্কেল বলে। যেমন- মানচিত্রে দুটি স্থানের দূরত্ব ২" (দুই ইঞ্চি) এবং ভূমিতে দুটি স্থানের প্রকৃত দূরত্ব ২০ মাইল হয়। তাহলে মানচিত্রের স্কেল হবে-

২" তে ২০ মাইল

বা ১" তে ১০ মাইল ------(১)

বা $\frac{১}{১০ \times ৬৩৩৬০} = \frac{১}{৬৩৩৬০০}$ [এক মাইলে ৬৩৩৬০ ইঞ্চি]

বা, ১: ৬৩৩৬০০ ----------(২)

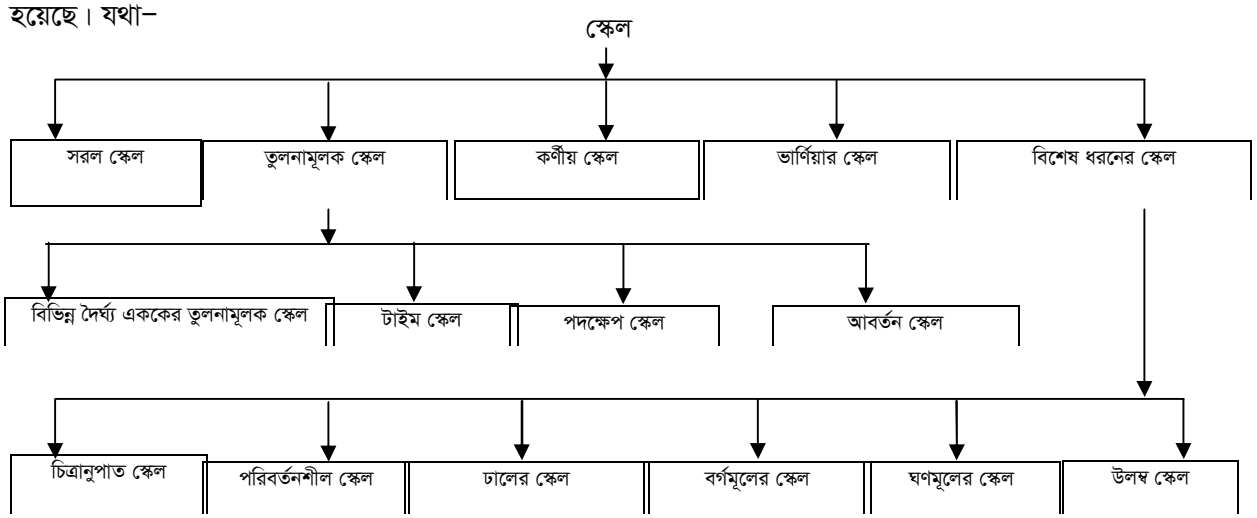
বা, প্রতিভূ অনুপাত (প্র:অ.) ১: ৬৩৩৬০০

সমীকরণ (১) অনুযায়ী

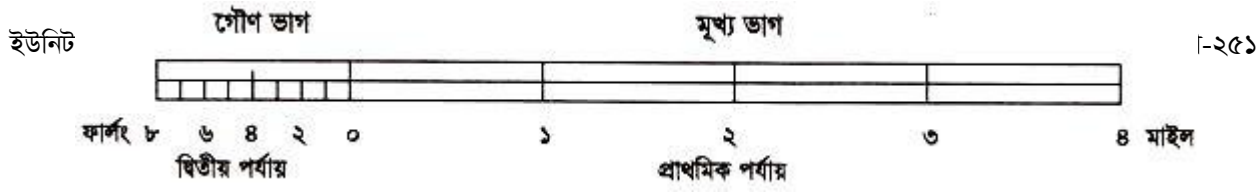
১" তে ১০ মাইল বলতে বুঝায় মানচিত্রে দুটি স্থান যদি এক ইঞ্চি দূরত্বে অবস্থান করে তবে ভূমিতে তাদের প্রকৃত দূরত্ব হবে ১০ মাইল।

সমীকরণ (২) অনুযায়ী মানচিত্রের দূরত্ব ১" হলে ভূমিতে দূরত্ব হবে ৬৩৩৬০০ বা মানচিত্রে দূরত্ব ১ সে.মি হলে ভূমিতে দূরত্ব হবে ৬৩৩৬০০ সে.মি।

স্কেলের প্রকারভেদ (Types of Scale): মানচিত্রের ব্যবহারিক গুরুত্ব ও প্রয়োগের বিভিন্নতা এবং অংকন্ পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে স্কেলকে প্রধানত পাঁচটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয় এবং বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে কিছু স্কেলকে উপশ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা–



ক) **সরল স্কেল (Simple Scale) :** কোনো নির্দিষ্ট মাপ বা হিসাব অনুযায়ী একটি সরল রেখাকে কতিপয় ভাগে বিভক্ত করলে তাকে সরল স্কেল বলে। সরল স্কেলের ক্ষেত্রে মুখ্যভাগে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ এবং গৌণ ভাগে ক্ষুদ্র ইউনিটের পরিমাপ দেখানো হয় (চিত্র-১৫.৩.১)।



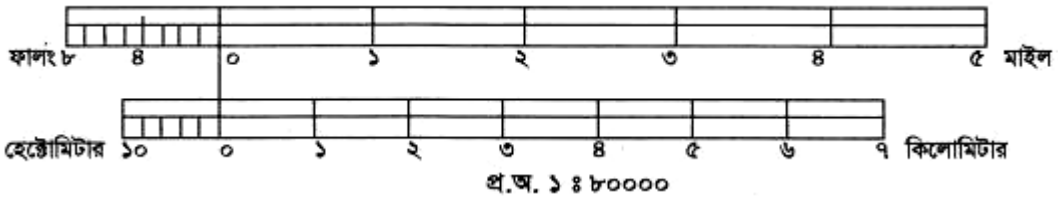
প্র: অ: ১:৮০,০০০

চিত্র ১৫.৩.১ : সরল স্কেল

মানচিত্রে সরল স্কেল বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়। কারণ প্রয়োজনের তাগিদে মানচিত্রকে ছোট বা বড় করলে স্কেলও আনুপাতিক হারে ছোট বা বড় হয়।

খ) **তুলনামূলক স্কেল (Comparative Scale) :** তুলনামূলক স্কেলও এক ধরনের সরল স্কেল। শুধুমাত্র ভিন্ন এককের একাধিক স্কেলের মধ্যে সম্পর্ক তুলনা করার জন্য এ ধরনের স্কেল ব্যবহৃত হয়। তাই তুলনামূলক স্কেলকে বিভিন্ন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা-

১. **বিভিন্ন দৈর্ঘ্য এককের তুলনামূলক স্কেল (Comparative Scale of Different Unit):** বিভিন্ন পরিমাপ এককের স্কেলের একটির সাথে অপরটির তুলনা করার জন্য যখন একই মূলবিন্দু এবং প্রতিভূ অনুপাতে পাশাপাশি একাধিক স্কেল অংকন করা হয়, তখন তাকে বিভিন্ন দৈর্ঘ্য এককের তুলনামূলক স্কেল বলে। এই ধরনের স্কেলে মাইলের সাথে কিলোমিটার, ফুটের সাথে ডেসিমিটার, মিটারের সাথে গজ প্রভৃতি এককের মধ্যে তুলনা করা হয়। (চিত্র-১৫.৩.২)।



চিত্র : ১৫.৩.২ তুলনামূলক স্কেল

২. টাইম স্কেল (Time Scale): যে স্কেলের মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি, দল বা গতিশীল বস্তু নির্দিষ্ট সময়ে কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করে তা দেখানো হয় তাকে টাইম স্কেল বলে। যেমন একজন স্কাউট ঘন্টায় তিন মাইল গতিতে মার্চ করছে। ঐ এলাকার মানচিত্রের প্রতিভূ অনুপাত হচ্ছে ১:১২৬৭২০

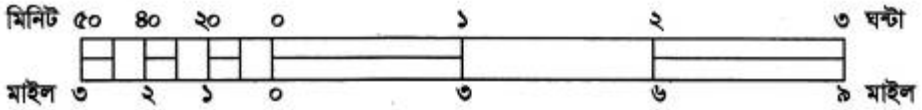
এখানে

মানচিত্রের দূরত্ব ১" হলে ভূমিতে দূরত্ব ১২৬৭২০"= ২ মাইল

বা, " ৬" " " " ৬×২=১২ মাইল

যেহেতু গতিবেগ ঘন্টায় ৩ মাইল এবং মোট দূরত্ব ১২ মাইল তাই ১২ মাইল দূরত্ব অতিক্রমে ১২÷ ৩=৪ ঘন্টা সময় প্রয়োজন হবে। এই ক্ষেত্রে প্রদত্ত টাইম স্কেলটি হবে নিম্নরূপ:

প্রথমে ৬" একটি স্কেল অংকন করে প্রাথমিকভাবে সমান ৪ ভাগে বিভক্ত করে প্রথম প্রাথমিক ঘরটিকে সমান ৬টি উপভাগে বিভক্ত করলে প্রতিটি উপভাগ ১০ মিনিটে অতিক্রান্তদূরত্ব দেখাবে (চিত্র-১৫.৩.৩)।



চিত্র: ১৫.৩.৩ টাইম স্কেল

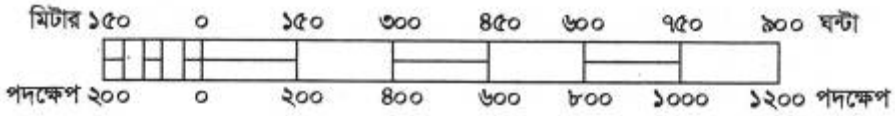
৩. পদক্ষেপ দূরত্ব (Pace Scale): নির্দিষ্ট দূরত্ব এবং নির্দিষ্ট দূরত্ব অতিক্রমে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সংখ্যা দেখিয়ে যে তুলনামূলক স্কেল অংকন করা হয় তাকে পদক্ষেপ স্কেল বলে। সময়ের স্বল্পতার কারণে অথবা দ্রুত জরিপের প্রয়োজনে যেখানে চেইন বা টেপ দিয়ে পরিমাপ করা সম্ভব হয় না সেই সকল ক্ষেত্রে পদক্ষেপ স্কেল ব্যবহৃত হয়। সৈনিকদের পদক্ষেপের দূরত্ব ৩০" বা ৭৫ সে.মি ধরা হয়। তবে ব্যক্তি বিশেষে পদক্ষেপের দৈর্ঘ্য পরিবর্তিত হয়। তাই জরিপের পূর্বে জরিপকর্মীর পদক্ষেপের দূরত্ব পরিমাপ করা পয়োজন।

যেমন: দ্রুত জরিপকৃত একটি এলাকার মানচিত্রের প্রতিভূ অনুপাত ১:১৫,০০০ এবং জরিপকর্মীর পদক্ষেপের দূরত্ব ৭৫ সে.মি।

এখানে মানচিত্রের দূরত্ব ১ সে.মি হলে ভূমিতে দূরত্ব ১৫,০০০ সে.মি =১৫০ মিটার।

বা মানচিত্রের দূরত্ব ১ সে.মি হলে ভূমিতে দূরত্ব $\frac{১৫০০০}{৭৫} = ২০০$ পদক্ষেপ।

এখন পদক্ষেপ স্কেলে, প্রথমে ৭ সে.মি একটি স্কেল অংকন করে তাকে প্রাথমিক ভাবে ৭ ভাগে বিভক্ত করে প্রতিটি ভাগ ১৫০ মিটার এবং ২০০ পদক্ষেপ দেখানো যাবে। প্রথম প্রাথমিক ভাগটিকে সমান ৫টি উপভাগে বিভক্ত করলে প্রতিটি উপভাগ ৩০ মিটার এবং ৪০ পদক্ষেপ দেখাবে।



চিত্র: ১৫.৩.৪ পদক্ষেপ স্কেল

৪. আবর্তন স্কেল (Revolution Scale): পদক্ষেপ স্কেলের ন্যায় সাইকেল বা গাড়ির চাকার আবর্তনের মাধমে দূরত্ব পরিমাপ করা হয়। নির্দিষ্ট দূরত্ব অতিক্রমে প্রয়োজনীয় আবর্তন সংখ্যা দেখিয়ে যে স্কেল অংকন করা হয় তাকে আবর্তন স্কেল বলে। এই ক্ষেত্রে প্রথমেই চাকার পরিধি নির্ণয় করা হয়। পরিধি নির্ণয়ের সূত্রটি হলো-পরিধি $= ২\lambda r$

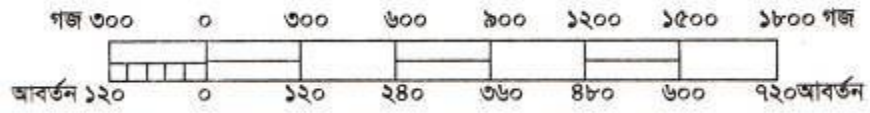
এখানে $\lambda = ৩.১৪৩$

$r =$ চাকার ব্যাসার্ধ

যেমন: ৯০" পরিধির চাকা বিশিষ্ট সাইকেলের মাধ্যমে জরিপকৃত একটি এলাকার মানচিত্রের প্রতিভূ অনুপাত ১:২১৬০০

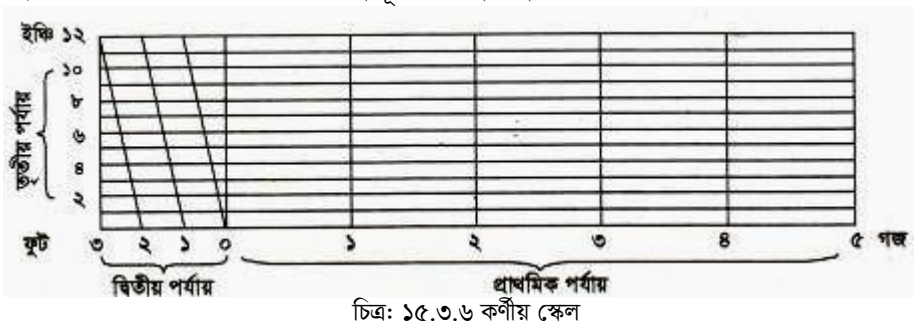
মানচিত্রের দূরত্ব ১" হলে ভূমিতে দূরত্ব $\frac{২১৬০০}{৯০}$ ইঞ্চি = ২৪০ আবর্তন।

সুতরাং আবর্তন স্কেলের জন্য প্রথমে ৩.৫" একটি স্কেল অংকন করে প্রথমে সমান ৭টি ভাগে বিভক্ত করে প্রতিটি ভাগ ৩০০ গজ এবং ১২০ আবর্তন দেখাতে হবে। প্রথম ভাগটিকে সমান ৫টি উপভাগে বিভক্ত করলে প্রতিটি উপভাগ ২৪ গজ এবং ৬০ আবর্তন দেখাবে। (চিত্র: ১৫.৩.৫)



চিত্র: ১৫.৩.৫ আবর্তন স্কেল

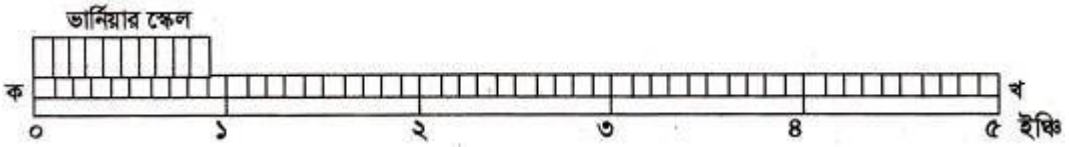
গ) **কর্ণীয় স্কেল (Diagonal Scale):** সুক্ষ্ম পরিমাপের জন্য আয়তক্ষেত্রের পরস্পর বিপরীত কোণদ্বয়ের সংযোজক সরল রেখার সাহায্যে যে স্কেল অংকন করা হয়, তাকে কর্ণীয় স্কেল (Diagonal Scale) বলে। এই স্কেলের মাধ্যমে প্রাথমিক ও দ্বিতীয় পর্যায়ের ক্ষুদ্রতর দূরত্ব পরিমাপ করা হয় (চিত্র ১৫.৩.৬)। আয়তক্ষেত্রের কর্ণ দ্বারা একটি ক্ষুদ্র রেখাকে প্রয়োজন অনুযায়ী সমান সংখ্যক ভাগে বিভক্ত করা যায়। এই মূলনীতি হতেই কর্ণীয় স্কেলের উদ্ভব।



চিত্র: ১৫.৩.৬ কর্ণীয় স্কেল

বিভিন্ন ধরনের সূক্ষ্ম দূরত্ব পরিমাপের জন্য কর্ণীয় স্কেল ব্যবহার করা হয়। সরল স্কেলের ভূমি রেখার উপর সুবিধাজনক উচ্চতার আয়তক্ষেত্র অংকন করে দ্বিতীয় পর্যায়ের গৌণ অংশগুলোতে কর্ণ অংকন করে আয়তক্ষেত্রটিকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক সমদূরবর্তী আনুভূমিক সমান্তরাল রেখার মাধ্যমে ভাগ করে তৃতীয় পর্যায়ে বিভক্ত করে কর্ণীয় স্কেল অংকন করা হয়।

ঙ) **ভার্নিয়ার স্কেল (Vernier Scale):** ফ্রান্সের বিখ্যাত গণিতবিদ পিঁয়েরে ভার্নিয়ার এই স্কেল উদ্ভাবন করেন বলে একে ভার্নিয়ার স্কেল বলে। সূক্ষ্ম পরিমাপের জন্য সরল স্কেলের পাশে সংযুক্ত যে ছোট চলনশীল স্কেল ব্যবহার করা হয় তাকে ভার্নিয়ার স্কেল বলে। ১৫.৩.৭ নং চিত্রে ক খ স্কেলটি, প্রাথমিক স্কেল এবং উপরের ছোট স্কেলটি ভার্নিয়ার স্কেল।



চিত্র: ১৫.৩.৭ ভার্নিয়ার স্কেল

১। **পরিবর্তনশীল স্কেল (Variable Scale)**: অক্ষাংশ পরিবর্তনের সাপেক্ষে সঠিক দূরত্ব পরিমাপের জন্য যে যৌগিক স্কেল অংকন করা হয় তাকে পরিবর্তনশীল স্কেল বলে।

২। **ঢালের স্কেল :** সমোন্নতি মানচিত্রে বিভিন্ন সমোন্নতি রেখার মধ্যবর্তী ঢালের পরিমাণ পরিমাপ করার জন্য যে স্কেল ব্যবহার করা হয় তাকে ঢালের স্কেল বলে। এই স্কেলে নির্দিষ্ট উলম্ব বিরতিতে (সাধারণত ১০০ফুট বা ৫০ ফুট) প্রতি ডিগ্রী ঢালের পরিবর্তনের জন্য আনুভূমিক দূরত্বের পরিমাণ দেখানো হয়।

৩। **বর্গমূলের স্কেল (Square Root Scale)** : মানচিত্রে পরিসংখ্যানিক উপাত্ত দেখানোর জন্যে বিভিন্ন আনুপাতিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন দেশ বা শহরের জনসংখ্যা, জমির পরিমাণ ও উৎপাদন প্রভৃতি উপাত্তকে আনুপাতিক বর্গক্ষেত্র, আয়তক্ষেত্র বা বৃত্তের ক্ষেত্রফলের মাধ্যমে প্রদর্শন করা হয়।

৪। **ঘনমূলের স্কেল (Cube Root Scale)** : বর্গমূলের স্কেলের মতই মানচিত্রে পরিসংখ্যানিক উপাত্তকে বিভিন্ন ঘন (Cube) বা গোলকের আয়তনের মাধ্যমে প্রদর্শন করা হয়।

৫। **চিত্রানুপাত স্কেল (Perspective Scale)** : অনুচিত্র, ভূমি ব্যবহারের প্রতিকী নকশা, ব্লক প্রভৃতি অংকনের সময় প্রয়োজন অনুসারে বিষয়বস্তুকে ছোট বা বড় যে স্কেলে অংকন করা হয় তাকে চিত্রানুপাত স্কেল বলে।

৬। **উলম্ব স্কেল (Vertical Scale)** : আকাশ চিত্রের স্কেল নির্ণয়ের জন্য মানচিত্রের স্কেল নির্ধারণের পদ্ধতি ব্যতিক্রম। এক্ষেত্রে স্কেলের সাথে ক্যামেরার ফোকাল দৈর্ঘ্য এবং বিমান উড্ডয়ন উচ্চতার সম্পর্ক নির্ণয় করা হয়।

এই ক্ষেত্রে স্কেল নির্ণয়ের সূত্রটি হলো–

$$\text{স্কেল} = \frac{\text{আকাশ চিত্রে দু'টি বিন্দুর দূরত্ব}}{\text{ভূমিতে ক্ষেত্র দুটির অবস্থানের দূরত্ব}}$$

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে দলগতভাবে কয়েকটি আকাশচিত্র সরবরাহ করলেন। আকাশচিত্রসমূহের স্কেল থেকে প্রত্যেকটি দল মানচিত্রের স্কেল নির্ধারণ করবেন।

সারসংক্ষেপ

স্কেলের ব্যবহারিক ও প্রয়োগের উপর ভিত্তি করে স্কেলকে প্রাথমিকভাবে পাঁচটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। যথা- সরল স্কেল, তুলনামূলক স্কেল, কর্ণীয় স্কেল, ভার্নিয়ার স্কেল ও বিশেষ ধরনের স্কেল। তুলনামূলক স্কেলকে আবার চারটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা- বিভিন্ন দৈর্ঘ্য এককের তুলনামূলক স্কেল, টাইম স্কেল, পদক্ষেপ স্কেল ও আবর্তন স্কেল। অপরদিকে প্রয়োজনের বিভিন্নতার উপর নির্ভর করে বিশেষ ধরনের স্কেলকে পরিবর্তনশীল স্কেল, চিত্রানুপাত স্কেল এবং উলম্ব স্কেল প্রভৃতি ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৫.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) দিন।

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ১ ও ২ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।

ফয়সালের ছোট মামা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে চাকুরী করেন। একদিন ফয়সাল মামার সাথে সেখানে বেড়াতে গেল। সে দেখতে পেল প্যারেডের সময় সৈনিকরা নির্দিষ্ট দূরত্বে একই সময়ে পা ফেলে।

১। নির্দিষ্ট দূরত্ব অতিক্রমে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ সংখ্যা দেখানোর জন্য উপযোগী স্কেলকে কী বলে?

(ক) টাইম স্কেল (খ) পদক্ষেপ স্কেল

(গ) আবর্তন স্কেল (ঘ) উলম্ব স্কেল

২। সৈনিকদের পদক্ষেপের দূরত্ব কত ধরা হয়?

(ক) ৩০ বা ৭৫" (খ) ২২"

(গ) ৩৬" (ঘ) ২৮"

৩। সূক্ষ্ম পরিমাপের জন্য আয়তক্ষেত্রের পরস্পর বিপরীত কোণদ্বয়ের সংযোজক সরল রেখার সাহায্যে যে স্কেল অংকন করা হয় তাকে কী স্কেল বলে?

(ক) কর্ণীয় স্কেল (খ) পদক্ষেপ স্কেল

(গ) আবর্তন স্কেল (ঘ) উলম্ব স্কেল

৪। টাইম স্কেলের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে-

i. কোনো ব্যক্তি বা দল বা গতিশীল বস্তু নির্দিষ্ট সময়ে কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করে তা টাইম স্কেলের মাধ্যমে দেখানো হয়।

ii. ব্যক্তি, দল বা যানবাহন যে এলাকার উপর দিয়ে যায় সংশ্লিষ্ট এলকায় মানচিত্রের স্কেল বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন।

iii. চলমান ব্যক্তি, দল বা যানবাহনের গতিবেগ লক্ষ্য রাখতে হয়।

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i (খ) ii ও iii (গ) i, ii ও iii (গ) iii

৫। কোনো নির্দিষ্ট মাপ বা হিসাব অনুসারে একটি সরল রেখাকে কতিপয় ভাগে ভাগ করলে তাকে কী বলে?

(ক) তুলনামূলক স্কেল (খ) টাইম স্কেল

(গ) কর্ণীয় স্কেল (ঘ) সরল স্কেল

পাঠ-১৫.৪ সরল ও কর্ণীয় স্কেল (Simple and Diagonal Scale)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- সরল ও কর্ণীয় স্কেলের সংজ্ঞা, গঠন কাঠামো ও সুবিধা-অসুবিধা বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করতে পারবেন এবং
- সরল ও কর্ণীয় স্কেল অঙ্কন করতে পারবেন।

সরল স্কেলের সংজ্ঞা

যে স্কেল দ্বারা প্রাথমিক ও দ্বিতীয় পর্যায়ে ভাগের মাধ্যমে মানচিত্রের ভূমির দৈর্ঘ্য বা অনুপাত পরিমাপ করা হয় তাকে সরল মাপনী বা সাধারণ স্কেল (Simple Scale) বলা হয়। এই স্কেল অঙ্কনের সময় নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যে সরল রেখাকে প্রাথমিক ও দ্বিতীয় পর্যায়ের কতিপয় ভাগে বিভক্ত করা হয় এবং ভাগের প্রত্যেকটির মান বিভাজ্য সংখ্যা (Round Figure) হওয়া বাঞ্চনীয়। বিভাজ্য সংখ্যা এমন হওয়া উচিত যাতে প্রাথমিক পর্যায়ে কোনো একটি ভাগের মান দ্বিতীয় পযায়ে বিভিন্ন ভাগে সহজে বিভাজ্য হয় এবং স্কেলের বিভাগগুলির কোনটি ভগ্নাংশ না হয়। যেমন: ঢাকা হতে মেঘনা ব্রীজ পর্যন্ত৭২ মাইল দীর্ঘ রাস্তা দেখানোর জন্য ৬" দৈর্ঘ্যের একটি সাধারণ স্কেলে প্রাথমিক পর্যায়ে একটি ভাগের বিভাজ্য সংখ্যা বা মান ১২ মাইল এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে উক্ত ১২ মাইলকে আবার ২ বা ৩ বা ৪ বা ৬ ভাগে বিভক্ত করলে প্রত্যেক অংশের বিভাজ্য সংখ্যার মান যথাক্রমে ৬ মাইল বা ৪ মাইল বা ৩ মাইল বা ২ মাইল হবে।

সরল স্কেলের গঠন কাঠামো

সাধারণ স্কেলের দৈর্ঘ্য মাইলের স্কেলে ৪" হতে ৬" পর্যন্ত, কিলোমিটারের স্কেলে ১০ সেন্টিমিটার হতে ১৫ সেন্টিমিটার পর্যন্তহওয়া বাঞ্চনীয়। এই ক্ষেত্রে বিভাজ্য মান অঙ্কিত স্কেলের দৈঘ্য অনুযায়ী হবে অর্থাৎ ৪"-৬" অথবা ১০-১৫ সেন্টিমিটারের মধ্যে হবে এবং প্রস্থ ০.২৫ ইঞ্চি বা ০.৫ সেন্টিমিটার হওয়া উচিত। প্রাথমিক পর্যায়ে এককের মান একাধিক হলে দ্বিতীয় পর্যায়ে কিংবা একাধিক না হলে দ্বিতীয় পর্যায়ে নিম্ন একক ব্যবহার করা হয়। যেমন: প্রাথমিক পর্যায়ে ৫টি ভাগের প্রতিটিতে ১ গজ পর্যন্তদেখাতে হবে। আবার প্রাথমিক পর্যায়ে ১ গজ হলে দ্বিতীয় পর্যায়ে স্কেলকে গজের ঠিক ছোট একক হিসাবে ফুটে বিভক্ত করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রতিটি ভাগে ১ ফুট করে ৩ ফুট বা ১ গজ দেখাতে একই মান ব্যবহৃত হবে।

সরল স্কেল অঙ্কন পদ্ধতি

প্রতিভু অনুপাত ১:৫০ স্কেলে গজ ও ফুট দেখানোর জন্য একটি সরল স্কেল অঙ্কন করুন।

প্রথম ধাপ,

প্রশ্নে যেহেতু গজ দেখাতে বলা হয়েছে। সেহেতু প্রতিভূ অনুপাতকে গজের স্কেলে প্রকাশ করতে হবে।

আমরা জানি, ১ গজ = ৩৬"

$\therefore$ ৩৬" = ১ গজ

$$১" = \frac{১}{৩৬} \text{ গজ}$$

প্রতিভূ অনুপাতের ৫০" $= \frac{১ \times ৫০}{৩৬}$ = ১.৩৮৯ গজ (প্রায়) অর্থাৎ মানচিত্রে ১"= ভূমিতে ১.৩৮৯ গজ (প্রায়) উল্লেখ্য সরল স্কেলের দৈর্ঘ্য গজের স্কেলের ক্ষেত্রে ৪" হতে ৬" পর্যন্তদীর্ঘ হয়। সেহেতু ১ ইঞ্চিতে ১.৩৮৯ গজ স্কেলকে যথাক্রমে ৪ গুণ এবং ৬ গুণ করে (১৩৮৯×৪=৫.৫৫৬ গজ) ৫.৫৫৬ গজ এবং (১.৩৮৯৬×৬=৮.৩৩৪ গজ) ৮.৩৩৪ গজে প্রকাশ করা হলো। এদের কোনটি বিভাজ্য সংখ্যা না হওয়ায় এই দুটি ভগ্নাংশ সম্বলিত সংখ্যার মধ্যবর্তী একটি সংখ্যাকে বিভাজ্য সংখ্যা হিসাবে নির্ধারণ করতে হবে। বিভাজ্য সংখ্যা ৬ গজ নির্ধারণ করলে অঙ্কিত সরল স্কেলের দৈর্ঘ্য হবে ৪"-৬" এবং

দ্বিতীয় পর্যায়ের ভাগে ফুট দেখাতে হবে। যদি বিভাজ্য সংখ্যা এখানে ৭ বা ৮ গজ হয় তাহলে সরল স্কেলের দৈর্ঘ্য ৪"-৬" হবে।

এখন, বিভাজ্য সংখ্যা ৬ গজ দেখানোর জন্য অঙ্কিত স্কেলের দৈর্ঘ্য বের করতে হবে।

১.৩৮৯ গজ = মানচিত্রে ১"

ভূমিতে ১ গজ = মানচিত্রে $\frac{১}{১.৩৮৯}$"

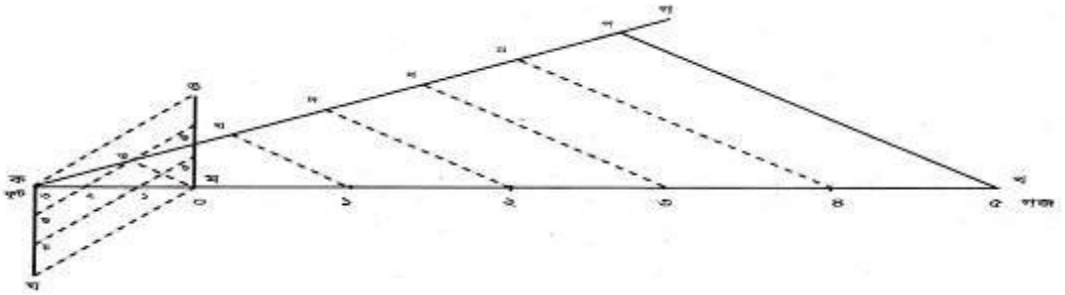
ভূমিতে ৬ গজ (বিভাগ সংখ্যা) = মানচিত্রে $\frac{১\times৬}{১.৩৮৯}$ = ৪.৩১৯" বা, ৪.৩২" (প্রায়)।

∴ ৬ গজ দেখানোর জন্য সরল স্কেলের দৈর্ঘ্য হবে ৪.৩২" (প্রায়) আবার, ৭ গজ দেখানোর জন্য এর দৈর্ঘ্য হবে ১×৭/১.৩৮৯=৫.০৪" প্রায় এবং ৮ গজ দেখানোর জন্য দৈর্ঘ্য হবে ১×৮/১.৩৮৯=৫.৭৬" (প্রায়)।

সুতরাং বলা যায়, ১:৫০ স্কেলে মানচিত্রের ১ ইঞ্চি ভূমিতে প্রায় ১.৩৮৯ গজ দূরত্ব দেখানোর জন্য অঙ্কিত স্কেলের দৈর্ঘ্য প্রায় ৪.৩২ ইঞ্চি। প্রাথমিক ও দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রতিটি অংশের মান যথাক্রমে ১ গজ ও ১ ফুটের সমান।

দ্বিতীয় ধাপ

সরল স্কেলের দৈর্ঘ্য ৪.৩২" নির্ধারনের পর ক খ নামক একটি সরল রেখা আনুভূমিকভাবে অঙ্কন করুন। এই সরল রেখাকে প্রাথমিক পর্যায়ে সমান ৬ ভাগে ভাগ করার জন্য ক বিন্দু হতে ৩.২" দৈর্ঘ্যের ক গ নামক আরেকটি সরল রেখা চিত্র ১৫.৪.১ অনুসারে ৩০° কোণে অঙ্কন করুন। এখন ক গ রেখাকে 'ক' বিন্দু হতে ০.৫০ ইঞ্চি হিসাবে সমান ৬টি ভাগে ভাগ করে প্রত্যেকটি অংশ যথাক্রমে ত, থ, দ, ধ, ন এবং প দ্বারা নির্দেশ করুন। এখন ক খ ও কগ রেখার 'পখ' বিন্দু যোগ করুন। সেট স্কয়ারের (Set Square) সাহায্যে 'পখ' রেখার সমান্তরালে 'কখ' রেখার উপর ন, ধ, দ, থ, ঞ এবং ত বিন্দু হতে অঙ্কিত বিভিন্ন রেখা 'কখ' রেখাকে সমান ৬টি ভাগে বিভক্ত করুণ এবং যার প্রতিটি ভাগের মান ভূমিতে ১ গজের সমান। এই ভাগ গুলোই হলো প্রাথমিক পর্যায়ের ভাগ। 'কখ' রেখাকে সমান ৬ ভাগে বিভক্ত করার পর গঠন কাঠামো অনুযায়ী বাম পার্শ্বের প্রথম ভাগে ৩ বিন্দু বরাবর প্রাপ্ত ম অংশের মান ঘ (শূন্য) হবে। শূন্যের ডান দিকের ৫টি ভাগের ৫ গজ এবং বামদিকে ১টি ভাগের মান ১ গজ হবে (চিত্র ১৫.৪.১)।



প্র.অ. ১: ৫০

চিত্র: ১৫.৪.১ সাধারণ স্কেলে প্রাথমিক ও দ্বিতীয় পর্যায়ের বিভাজন প্রক্রিয়া।

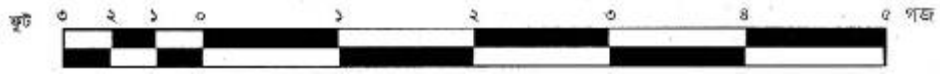
তৃতীয় ধাপ

দ্বিতীয় ধাপে 'কখ' রেখাকে সমান ৬ ভাগে বিভক্ত করার পর বাম দিকের প্রথম অংশকে দ্বিতীয় পর্যায়ে ক্ষুদ্র ভাগে বিভক্ত করলে সাধারণ স্কেলের অঙ্কন সম্পূর্ণ হয়। কিন্তু প্রশ্নানুযায়ী দৈর্ঘ্যের পরিমাণের ক্ষেত্রে গজ অপেক্ষা ফুট ছোট পরিমাপক হওয়ায় বাম দিকে ১ গজের ভাগকে সমান ৩ ভাগ করলে প্রত্যেকটি দ্বিতীয় পর্যায়ের ভাগ ১ ফুট করে দূরত্ব নির্দেশ করে। বামদিকের প্রথম ভাগকে দ্বিতীয় পর্যায়ে সমান ৩ ভাগে বিভক্ত করার জন্য চিত্র ১৫.৪.১ অনুযায়ী 'কঘ' নামক একটি লম্ব অঙ্কন করুন, এবং 'কখ' রেখার ম বিন্দু হতে উপরের দিকে চিত্রানুযায়ী 'মঙ' নামক একটি লম্ব অঙ্কন করুন। অঙ্কিত 'কঘ' এবং 'মঙ' লম্বদ্বয়কে চিত্র ১৫.৪.১ অনুযায়ী ০.৩" ব্যবধানে যথাক্রমে চ ও ছ এবং চ ও ছ অংশে বিভক্ত করুন। এখন চচ এবং ছছ যোগ করলে কম অংশ সমান ৩ ভাগে বিভক্ত হবে এবং প্রতিটি অংশের মান হবে ১ ফুট।

দ্বিতীয় চিত্র একই স্কেলে চিত্রটি নিম্নোক্তভাবে অঙ্কন করা যায়।

প্রথম ধাপ

দ্বিতীয় ধাপের ৪.৩২" দৈর্ঘ্যের সরল রেখাকে প্রাথমিক পর্যায়ে সমান ৬টি ভাগে বিভক্ত করে গজ এবং তৃতীয় স্তরে সর্ববামের অংশকে দ্বিতীয় পর্যায়ে সমান ৩ ভাগ করে মূলত ফুট নির্দেশ করুন। অঙ্কনের সুবিধার্থে ০.২" দূরত্বে 'কখ' রেখাকে যথাক্রমে উলম্বভাবে এর সমান্তরালে অবস্থিত রেখার সাথে যোগ করে ৮টি আয়তক্ষেত্র অঙ্কন (চিত্র ১৫.৪.২) করুন। এখন অঙ্কিত সরল স্কেলকে আরো সুন্দরভাবে উপস্থাপন করার জন্য আয়তক্ষেত্র আনুভূমিকভাবে সমান ২টি অংশে বিভক্ত করায় মোট ৬টি বিভিন্ন আকারের আয়তক্ষেত্র অঙ্কিত হলো। এখন সর্ববামের সর্বনিম্ন ঘর হতে চিত্র অনুযায়ী ১ ঘর অন্তর উপরে নিচে প্রত্যেকটি ঘরকে সম্পূর্ণভাবে কালি বা পেন্সিল দ্বারা পরিপূর্ণ করুন বা বিভিন্ন শেড ব্যবহার করুন।



প্র. অ. ১:৫০

চিত্র: ১৫.৪.২ গজ ও ফুট দেখানোর জন্য অঙ্কিত সাধারণ স্কেল

দ্বিতীয় ধাপ

এই ধাপে অঙ্কিত সরল স্কেলের প্রাথমিক ও দ্বিতীয় পর্যায়ে ভাগের প্রত্যেকটি অংশের মান, স্কেলের শিরোনাম, প্রতিভূ অনুপাত, স্কেলের সীমানা (Boundary/boarder) প্রভৃতি নির্দেশ করুন। স্কেলের দৈর্ঘ্য এবং কাগজের আকারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সরল স্কেলের উপরিভাগে সরল স্কেল লিখুন। অঙ্কিত সরল স্কেলের নিচে বিভিন্ন বিভাগ সংলগ্ন স্থানে প্রত্যেকটি অংশের মান স্কেলের দৈর্ঘ্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ছোট করে লিখুন এবং মূল স্কেলের আরও নিচে ছোট আকারের কিন্তু শিরোনামের চেয়ে ছোট এবং প্রাথমিক ও দ্বিতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন ভাগের মানের চেয়ে বড় আকারে প্র.অ (প্রতিভূ অনুপাত) লিখুন। সামগ্রিকভাবে সরল স্কেল অঙ্কন শেষে অঙ্কিত স্কেলের চারিপার্শ্বে পরিমিত অংশ ব্যবধানে সাধারণ সীমানা অঙ্কন করুন।

উদাহরণ : ২. প্র. অ. ১: ৬৩৩৬০ স্কেলে মাইল ও ফার্লং দেখানোর জন্য একটি সরল স্কেল অঙ্কন করুন।

প্রথম ধাপ

যেহেতু মাইল দেখাতে বলা হয়েছে, সেহেতু প্রতিভূ অনুপাতকে মাইলে পরিণত করতে হবে।

আমরা জানি, ১ মাইল = ৬৩৩৬০"

∴ ৬৩৩৬০" = ১ মাইল

১" = ১/৬৩৩৬০"

$$\therefore \text{প্রতিভূ অনুপাতের } ৬৩৩৬০" = \frac{১ \times ৬৩৩৬০}{৬৩৩৬০} = ১ \text{ মাইল}$$

অর্থাৎ, মানচিত্রে ১" = ভূমিতে ১ মাইল।

সাধারণ স্কেলের দৈর্ঘ্য মাইলের স্কেলে ৪"-৬" হওয়ায় ১ ইঞ্চিতে ১ মাইল স্কেলকে যথাক্রমে ৪ গুণ ও ৬ গুণ করে ৪ মাইল (১×৪= ৪মাইল) ও ৬ মাইল (১×৬=৬ মাইল) পাওয়া গেল। সংখ্যাদ্বয় ও উহাদের মধ্যবর্তী সংখ্যাটিও বিভাজ্য সংখ্যা হওয়ায় অঙ্কন সুবিধার্থে ৪ মাইলকে বিভাজ্য সংখ্যা হিসাবে স্থির করতে সরল স্কেলের দৈর্ঘ্য দেখানো যাবে। আরও উল্লেখ্য যে বিভাজ্য সংখ্যা ৫ বা ৬ মাইল ও অঙ্কিত সরল স্কেলের দৈর্ঘ্য ৪"-৬" পর্যন্তহবে।

এখন বিভাজ্য সংখ্যা ৪ মাইল দেখানোর জন্য অঙ্কিত স্কেলের দৈর্ঘ্য বের করতে হবে।

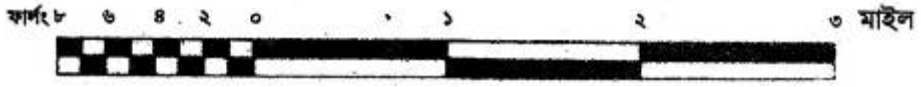
ভূমিতে ১ মাইল = মানচিত্রে ১"

∴ ভূমিতে ৪ মাইল (বিভাজ্য সংখ্যা) = মানচিত্রে ১×৪ = ৪"

∴ ৪ মাইল দেখানোর জন্য মানচিত্রের অঙ্কিত স্কেলের দৈর্ঘ্য হবে ৪"। ১:৬৩৩৬০ স্কেলে মানচিত্রের ১" ভূমিতে ১মাইল এবং অঙ্কিত স্কেলের দৈর্ঘ্য ৪"। প্রাথমিক ও দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রতিটি ভাগের মান যথাক্রমে ১ মাইল ও ১ ফার্লং এর সমান।

দ্বিতীয় ধাপ

প্রথম ধাপ হতে প্রাপ্ত 4" দৈর্ঘ্যের সরল রেখাকে আনুপাতিকভাবে ১" ব্যবধানে প্রাথমিক পর্যায়ে সমান ৪ ভাগে বিভক্ত করা হলো যার প্রতিটি ভাগের মান ভূমিতে ১ মাইলের সমান (চিত্র১৫.৪.৩)



প্র. অ. ১:৬৩৩৬০

চিত্র: ১৫.৪.৩ মাইল ফার্লং দেখানোর জন্য অঙ্কিত সাধারণ স্কেল

তৃতীয় ধাপঃ

দ্বিতীয় ধাপে 4" দৈর্ঘ্যের সরল রেখাকে সমান ৪ ভাগে বিভক্ত করার পর বামদিকের প্রথম অংশকে দ্বিতীয় পর্যায়ের ক্ষুদ্রতম ভাগে বিভক্ত করা হয়। বামদিকের ১টি ভাগের মান ১ মাইল হওয়ায় গঠন কাঠামো অনুযায়ী মাইলের ক্ষুদ্রতম একক হিসাবে ফার্লং দেখানোর জন্য (চিত্র ১৫.৪.৩ অনুযায়ী) ১ ফার্লং করে দূরত্ব প্রকাশ করবে। ১ মাইল = ৮ ফার্লং বলে সর্ববামের ঘরটিকে ৮ ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

চিত্র ১৫.৪.৩ অনুসারে সরল স্কেলটিকে ০.২" প্রশস্থতায় উলম্ব ও আনুভূমিকভাবে মোট ২২টি ভিন্ন আকৃতির আয়তক্ষেত্র অংকন করা হলো এবং সর্ববামের সর্বনিম্ন আয়তক্ষেত্র হতে উপরে নিচে ১ ঘর ব্যবধানে প্রত্যেকটি আয়তক্ষেত্রকে সম্পূর্ণরূপে কালি দ্বারা পরিপূর্ণ করে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে হবে।

প্রাথমিক ও দ্বিতীয় পর্যায়ের ভাগের প্রত্যেকটি অংশের মান, স্কেলের শিরোনাম, প্রতিভূ অনুপাত, স্কেলের সীমানা নির্দেশ করে স্কেলের কাঠামোগত অঙ্কন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করুন।

সরল স্কেলের ব্যবহার

সরল স্কেলের মাধ্যমে মানচিত্রে দুইটি স্থানের দূরত্ব সহজে পরিমাপ করা যায়, কারণ সরল স্কেলকে প্রাথমিক ও দ্বিতীয় পর্যায়ে শ্রেণিবিভাগ করা হয়। এছাড়াও এই স্কেলের প্রধান সুবিধা হলো পরিবর্তিত ক্ষেত্রেও প্রকৃত স্কেলকে নির্দেশ করে। এই পরিমাপের একক যে সমস্ত দেশে প্রচলিত শুধুমাত্র সেই সকল দেশে এই স্কেল ব্যবহার করা যায়।

সংক্ষেপে সরল স্কেলের উদাহরণ

১। ১ ইঞ্চি সমান ৪ মাইল দেখিয়ে একটি সরল স্কেল অঙ্কন করুন।

প্রশ্নানুসারে,

১ ইঞ্চিতে ৪ মাইল নির্দেশ করে

∴ ৫ ইঞ্চিতে (৪×৫) = ২০ মাইল নির্দেশ করে।

এখন ৫ ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের একটি রেখাকে সমান ৪ ভাগে বিভক্ত করলে প্রতি ভাগ হবে ৫ মাইল।

বাম পার্শ্বের সর্বপ্রথম ভাগটিকে পুনরায় ৫ ভাগ করলে প্রতিটি ভাগ হবে ১ মাইল।

আমরা জানি,

১ মাইল = ৬৩৩৬০″

∴ ৪ মাইল = (৬৩৩৬০×৪)″

= ২৫৩৪৪০″

অর্থাৎ প্রতিভূ অনুপাত হবে ১ ঃ ২৫৩৪৪০



প্র. অ: ১: ২৫৩৪৪০

চিত্র ১৫.৪.৪ : সরল স্কেল

২। প্র: অ: ১ ঃ ৫০০০ দেখিয়ে গজের একটি সরল মাপনী অঙ্কন করুন।

প্রশ্নানুযায়ী,

মানচিত্রের ১ ইঞ্চি ভূ-পৃষ্ঠের ৫০০০″ নির্দেশ করে

" ১ " " $\frac{৫০০০}{১২ \times ৩} = \frac{৫০০০}{৩৬}$ গজ

(বা ১৩৮.৮ গজ) নির্দেশ করে।

∴ " ৫ " " = ১৩৮.৮ × ৫

= ৬৯৪.০ গজ

অথবা, " ৬ " " = ১৩৮.৮ × ৬

= ৮৩২.৮ গজ

ভূ-পৃষ্ঠের কত গজ ধরলে তা সহজেই বিভাজ্য হবে অথবা জোড় সংখ্যা হবে এবং মানচিত্রের ৫" থেকে ৬" এর মধ্যে কিনা লক্ষ্য রাখতে হবে। ৬৯৪.০ থেকে ৮৩২.৮ গজের মধ্যে এরূপ জোড় বা সহজেই বিভাজ্য সংখ্যা হলো ৭০০ ও ৮০০ গজ। উক্ত স্কেলের জন্য ৮০০ গজ ধরা হল।

যেহেতু, ভূপৃষ্ঠের $\frac{৫০০০}{৩৬}$ গজ মানচিত্রের ১ ইঞ্চি নির্দেশ করে।

∴ " ১ " " $\frac{৩৬}{৫০০০}$ " "

∴ " ৮০০ " " $\frac{৩৬ \times ৮০০}{৫০০০}$ " "

$= \frac{১৪৪}{২৫} = ৫.৭৬$" নির্দেশ করে।

সুতরাং, সরল স্কেলের দৈর্ঘ্য হবে ৫.৭৬ ইঞ্চি।

৫.৭৬ ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের রেখাটিকে ৮ ভাগ করলে প্রতিভাগ হবে ১০০ গজ এবং বাম পাশের সর্বপ্রথম ভাগটিকে পুনরায় ৫ ভাগে ভাগ করলে প্রতিভাগে ২০ গজ নির্দেশ করবে। স্কেল বা মাপনীর বাম ও ডান প্রান্তেউপরে বা নিচে গজ লিখে প্রতিভূ অনুপাত ১ ঃ ৫০০০ লিখতে হবে।



প্র. অ. ১:৫০০০

চিত্র ১৫.৪.৫ : সরল স্কেল

৩. ১ ঃ ৪০০০০ মিটার দেখিয়ে একটি সরল স্কেল অঙ্কন করুন।

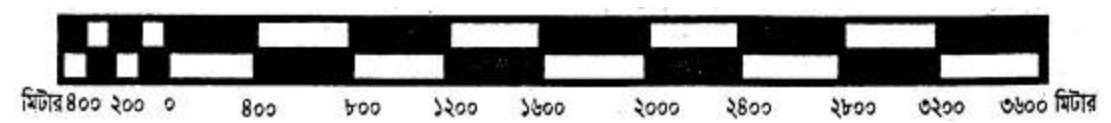
উত্তর: মানচিত্রে ১ সেন্টিমিটার হলে ভূমিভাগে হবে ৪০,০০০ সেন্টিমিটার

" ১০ " " " ৪০,০০০ × ১০ "

আমরা জানি, ১০০ সে.মি. = ১ মিটার

অতএব, ৪০,০০০ × ১০ ÷ ১০০ = ৪,০০০ মিটার।

এখানে ৪,০০০ মিটার জোড় সংখ্যা হওয়ায় অন্য সংখ্যা নির্বাচন করা হয়নি। সুতরাং ১০ সে.মি. দৈর্ঘ্যের একটি রেখা নিলে তা ৪০০০ মিটার নির্দেশ করবে। এখন রেখাটিকে সমান ১০টি ভাগ করলে প্রতি ভাগ ৪০০ মিটার এবং বাম দিকের ভাগটিকে ৪ ভাগ করলে তার প্রতি ভাগ ১০০ মিটার নির্দেশ করবে।



প্র. অ. ১:৪০,০০০

চিত্র ১৫.৪.৬ : সরল স্কেল

৪. প্রতিভূ অনুপাত (প্র.অ.) ১ ঃ ৮৫ এর সাহায্যে গজ ও ফুট দেখিয়ে একটি সরল মাপনী অঙ্কন করুন।

উত্তরঃ প্রশ্নমতে, মানচিত্রের ১″ ভূ-পৃষ্ঠের ৮৫″ নির্দেশ করছে।

$\therefore$ ″ ১″ ″ $\frac{৮৫}{১২\times৩}=\frac{৮৫}{৩৬}$ গজ নির্দেশ করছে।

[স্কেলের দৈর্ঘ্য ৫ থেকে ৬ ইঞ্চির মধ্যে হওয়া বাঞ্চনীয়। এখন বিবেচনা করতে হবে, ভূ-পৃষ্ঠে কত গজ ধরলে স্কেলে ৫-৬ ইঞ্চির মধ্যে হয়।]

অতএব ১″$=\frac{৮৫}{৩৬}$ গজ

$\therefore$ ৫″$=\frac{৮৫}{৩৬}\times৫=\frac{৪২৫}{৩৬}$ বা ১১$\frac{২৯}{৩৬}$ গজ

$\therefore$ ৬″$=\frac{৮৫\times৬}{৩৬}=\frac{৮৫}{৬}$ বা ১৪$\frac{১}{৬}$ গজ

[এখন ১১ থেকে ১৪ গজের মধ্যে সহজে বিভাজ্য সংখ্যা হল ১২ ও ১৪। এ দুটির যে কোনো একটি ধরলেই চলবে। এখানে ১২ গজ ধরা হল।]

অতএব $\frac{৮৫}{৩৬}$ গজ ভূ-পৃষ্ঠ হলে মানচিত্রে হবে ১ ইঞ্চি

$\therefore$ ১ ″ ″ ″ $\frac{৩৬}{৮৫}$ ″

$\therefore$ ১২ ″ ″ ″ $\frac{৩৬\times১২}{৮৫}=৫.০৮$″

[এখানে ৫.০৮ ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের একটি রেখা নিয়ে তাকে ১২ ভাগ করলে প্রতি ভাগে ১ গজ হবে এবং বাম পার্শ্বের ঘরটি ৩ ভাগ করলে প্রতি ভাগে ১ ফুট হবে। পরিশেষে স্কেলের নিচে প্র. অ. ১ ঃ ৮৫ লিখতে হবে।]



প্র. অ. ১:৮৫

চিত্র ১৫.৪.৭ : সরল স্কেল

৪। কোনো মানচিত্রে (প্র.অ.) ১ ঃ ৭৯২০। এর সাহায্যে ফার্লং ও চেইন দেখিয়ে একটি সরল মাপনী অঙ্কন করুন।

উত্তরঃ প্রশ্নানুসারে,

মানচিত্রের ১″ ভূ-পৃষ্ঠের ৭৯২০″

$\therefore$ ″ ১″ ″ $\frac{৭৯২০}{১২\times৩\times২২\times১০}=\frac{৭৯২০}{৭৯২০}=$ ১ ফার্লং

$\therefore$ ″ ৫″ ″ ১ × ৫ = ৫ ফার্লং

[এখন ৫″ দৈর্ঘ্যের একটি রেখা নিয়ে তাকে সমান ৫টি ভাগে ভাগ করলে প্রতি ভাগ ১ ফালর্ং নির্দেশ করবে এবং বাম পাশের সর্বপ্রথম ভাগটিকে ১০ ভাগ করলে প্রতি ভাগে ১ চেইন অথবা ৫ ভাগ করলে প্রতি ক্ষুদ্র ভাগে ২ চেইন হবে।



প্র. অ. ১:৭৯২০

চিত্র ১৫.৪.৮ : সরল স্কেল

৫। প্রতিভূ অনুপাত ১ ঃ ৩১৬৮০০ এর সাহায্যে মাইল ও মাইল দেখিয়ে একটি রৈখিক সরল বা সাধারণ স্কেল অঙ্কন করুন।

উত্তরঃ প্রশ্নানুসারে,

মানচিত্রের ১″ ভূ-পৃষ্ঠের ৩১৬৮০০″

$\therefore$ ″ ১″ ″ $\frac{৩১৬৮০০}{৬৩৩৬০}$ = [যেহেতু ৬৩৩৬০″ = ১ মাইল]

$\therefore$ ″ ১″ ″ ৫ মাইল

$\therefore$ ″ ৫″ ″ ৫ × ৫ = ২৫ মাইল

[এখন ৫″ দৈর্ঘ্যের একটি রেখা অঙ্কন করে সমান ৫টি ভাগে ভাগ করলে প্রতি ভাগ ৫ মাইল নির্দেশ করবে এবং বাম পাশের সর্বপ্রথম ভাগটিকে ৫ ভাগ করলে প্রতি ভাগে ১ মাইল হয়।]



প্র. অ. ১:৩১৬৮০০

চিত্র ১৫.৪.৯ : সরল স্কেল

৬। প্রতিভু অনুপাত ১ ঃ ১০০০ এর সাহায্যে মিটার ও সেন্টিমিটার দেখিয়ে একটি সাধারণ স্কেল অঙ্কন করুন।

উত্তরঃ প্রশ্নানুসারে,

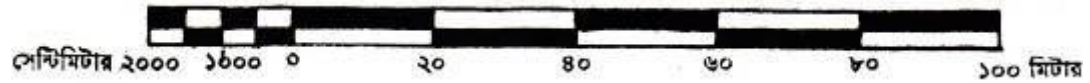
মানচিত্রের ১″ সেন্টিমিটার = ভূ-পৃষ্ঠের ১০০০ সেন্টিমিটার

$\therefore$ ″ ১″ ″ $\frac{১০০০}{১০০}$ = ১০ মিটার

$\therefore$ ″ ১২″ ″ ১০× ১২ = ১২০ মিটার।

[স্কেলের দৈর্ঘ্য ১০-১৫ সে.মি. এর মধ্যে হওয়া বাঞ্চনীয়।]

[এখন ১২ সে. মি. একটি রেখা নিয়ে তাকে ৬ ভাগ করলে প্রতি ভাগ (১২০÷৬=৬) ২০ মিটার নির্দেশ করবে এবং বাম পার্শ্বের ভাগটি ২০০০ সে.মি. (২০×১০০) বুঝাবে। এখন বাম পাশের সর্বপ্রথম ভাগটিকে ৪ ভাগ করলে প্রতি ভাগ ৫০০ সে.মি. হবে।]



প্র. অ. ১:১০০০

চিত্র ১৫.৪.১০ : সরল স্কেল

৭। প্রতিভূ অনুপাত ১ ঃ ১০,০০০ এর সাহায্যে মিটার দেখিয়ে একটি রৈখিক মাপনী অঙ্কন করুন।

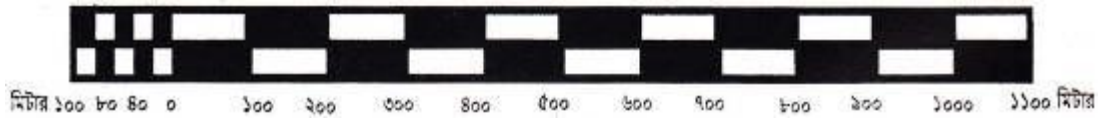
উত্তরঃ প্রশ্নানুসারে,

মানচিত্রের ১ সেন্টিমিটার = ভূ-পৃষ্ঠের ১০,০০০ সেন্টিমিটার

$\therefore$ ″ ১ ″ $\frac{১০,০০০}{১০০}$ = ১০০ মিটার

$\therefore$ ″ ১২ ″ ১০০× ১২ = ১২০০ মিটার।

[এখন ১২ সে. মি. দৈর্ঘ্যের একটি রেখা অঙ্কন করে তাকে ১২ ভাগ করলে প্রতি ভাগ ১০০ মিটার নির্দেশ করবে এবং বাম পাশের প্রথম ভাগটি ৫ ভাগ করলে প্রতি ভাগ ২০ মিটার হবে। সবশেষে মাপনীর নিচে প্র. অ. ১ ঃ ১০,০০০ লিখতে হবে।]



প্র. অ. ১:১০,০০০

চিত্র ১৫.৪.১১ : সরল স্কেল

৮। প্র. অ. ১ ঃ ৪৫ এর সাহায্যে গজ ও ফুট দেখিয়ে একটি সরল মাপনী অঙ্কন করুন।

উত্তরঃ প্রশ্নানুসারে, মানচিত্রের ১″ তে ভূ-পৃষ্ঠের ৪৫″ বা $\frac{৪৫}{৩৬}$ = গজ

$\therefore$ ″ ৫″ ″ ″ $\frac{৪৫}{৩৬} = ৫ = \frac{২৫}{৪}$ বা $৬\frac{১}{৪}$ গজ

$\therefore$ ″ ৬″ ″ ″ $\frac{৪৫ \times ৬}{৩৬} = \frac{১৫}{২}$ বা $৭\frac{১}{২}$ গজ

[এখানে ৬ থেকে ৭ গজের মধ্যে ৬ গজ সহজেই বিভাজ্য। তাই ৬ গজকে ভূ-পৃষ্ঠের.দৈর্ঘ্য ধরা হয়েছে।]

যেহেতু $\frac{৪৫}{৩৬}$ গজ ভূ-পৃষ্ঠের মানচিত্রে হবে ১ ইঞ্চি

$\therefore$ ১ ″ ″ ″ ″ $\frac{৪৫}{৩৬}$ ইঞ্চি

$\therefore$ ৬ ″ ″ ″ ″ $\frac{৩৬ \times ৬}{৪৫} = \frac{২৪}{৫}$ বা ৪.৮ ইঞ্চি

[এখন ৪.৮ ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের একটি রেখা নিয়ে তাকে ৬ ভাগ করলে (৪.৮ ÷ ৬) প্রতি ভাগ ০.৮″ হবে। এর এক একটি ভাগ স্কেলের গজ হবে এবং বাম পার্শ্বের ভাগটিকে তিন ভাগ করলে প্রতি ভাগে ১ ফুট হবে এবং প্র. অ. ১ ঃ ৪৫ লিখতে হবে।]



প্র. অ. ১: ৪৫

চিত্র ১৫.৪.১২ : সরল স্কেল

৯। প্র. অ. ১ ঃ ৫০০,০০০ হলে কিলোমিটার ও মিটার দেখিয়ে একটি সরল মাপনী অঙ্কন করুন।

উত্তরঃ প্রশ্নানুসারে, মানচিত্রের ১ সেন্টিমিটারে ভূ-পৃষ্ঠের ৫০০,০০০ সে.মি. প্রকাশ করছে।

$\therefore$ ″ ১ ″ ″ $\frac{৫০০,০০০}{১০০,০০০} = ৫$ কি.মি. ″ ″

$\therefore$ ″ ১২ ″ ″ ৫×১২=৬০ কি.মি. ″ ″

[অঙ্কন পদ্ধতি: এখন ১২ সে.মি. দৈর্ঘ্যের একটি রেখা নিয়ে তাকে ৬ ভাগ করলে প্রতি ভাগ ১০ সে.মি. এবং বাম পার্শ্বের প্রথম ভাগটিকে ৫ ভাগ করলে প্রতি ভাগ (১০ সে.মি. × ১০০০ = ১০,০০০ মি. ÷৫ = ২০০০) ২০০০ মিটার নির্দেশ করবে।]



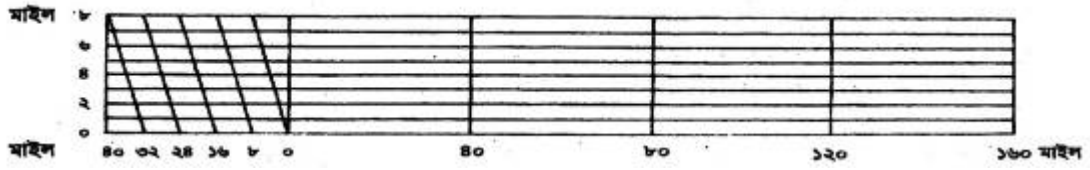
প্র. অ. ১:৫০০০.০০০

চিত্র ১৫.৪.১৩ : সরল স্কেল

কর্ণীয় স্কেল (Diagonal Scale)

কর্ণীয় স্কেলের সংজ্ঞা: যে স্কেলে প্রাথমিক, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের ভাগ থাকে তাকে কর্ণীয় স্কেল বলে। একটি নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের সরল রেখাকে আনুভূমিকভাবে প্রাথমিক ও দ্বিতীয় পর্যায়ে এবং উলম্বভাবে তৃতীয় পর্যায়ের ভাগে বিভক্ত করা হয়।

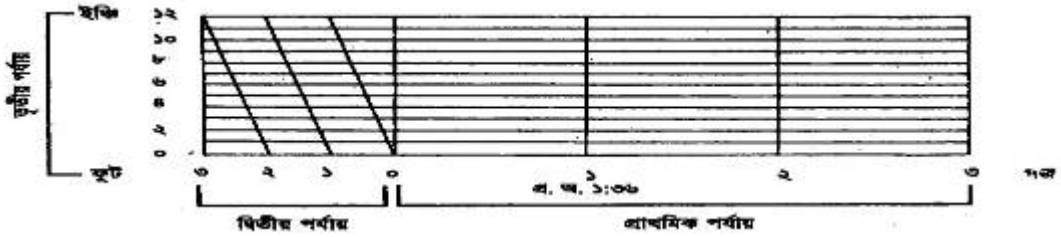
কর্ণীয় স্কেলের গঠন কাঠামো: সাধারণ স্কেলের দ্বিতীয় পর্যায়ের বিভাগসমূহকে উলম্ব প্রক্রিয়ায় তৃতীয় পর্যায়ে পুনরায় নির্দিষ্ট মাপ অনুযায়ী বিভক্ত করে কর্ণীয় স্কেল অঙ্কন করা হয়। কণীয় স্কেলের গঠন কাঠামো নিম্নরূপ:



প্র. অ. ১:২৫৩৪৪০০

চিত্র ১৫.৪.১৪: কর্ণীয় স্কেল

কর্ণীয় স্কেলের দৈর্ঘ্য মাইলের স্কেলে ৪" হতে ৬" এবং কিলোমিটার স্কেলে ১০ হতে ১৫ সেন্টিমিটার পর্যন্তহয়। এক্ষেত্রে বিভাজ্য মানও ৪" হতে ৬" এবং ১০ হতে ১৫ সেন্টিমিটার এর মধ্যে হওয়া উচিত। কর্ণীয় স্কেলের উলম্ব দৈর্ঘ্য বা উচ্চতা ১" হতে ১.৫" ও ২-৪ সেন্টিমিটার পর্যন্তউঁচু হয়।



চিত্র ১৫.৪.১৫ : কর্ণীয় স্কেলে প্রাথমিক, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের ভাগ

কর্ণীয় স্কেলে প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতিটি অংশের পরিমাপ এককের মান একাধিক না হলে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের বিভাজনে নিম্নতর একক প্রকাশ করতে হবে। যদি প্রাথমিক পর্যায়ের মান একাধিক হয় হিসাব অনুযায়ী একই একক বা ক্ষুদ্রতর একক ব্যবহার করতে হবে। যেমন প্রাথমিক পর্যায়ে ১ গজ হলে দ্বিতীয় পর্যায়ে ১ ফুট এবং তৃতীয় পর্যায়ের ১" পর্যন্তদেখাতে হবে। আবার প্রাথমিক পর্যায়ে প্রতিটি অংশের মান ১০০ কিলোমিটার হলে দ্বিতীয় পর্যায়ে ১ কিলোমিটার পর্যন্তদেখাতে হবে।

কর্ণীয় স্কেলের অঙ্কন পদ্ধতি

কর্ণীয় স্কেলের দৈর্ঘ্য ও বিভাজ্য সংখ্যা নির্ণয় সরল স্কেলের ন্যায়। শুধুমাত্র তৃতীয় পর্যায়ের শ্রেণিকরণ কৌশল ভিন্ন। নিম্নে উদাহরণের সাহায্যে কর্ণীয় স্কেল অঙ্কন প্রক্রিয়া বর্ণনা করা হলো।

উদাহরণ-১: প্র.অ. ১:৫০ স্কেলে গজ, ফুট ও ইঞ্চি দেখানোর জন্য একটি কর্ণীয় স্কেল অঙ্কন করুন।

প্রথম স্তর : প্রশ্নে যেহেতু গজ দেখাতে বলা হয়েছে, সেহেতু প্রতিভূ অনুপাতকে গজের স্কেলে পরিণত করতে হবে।

আমরা জানি, ১ গজ = ৩৬″

$$\therefore\ 1'' = \frac{1}{36}\ \text{গজ}$$

প্রতিভূ অনুপাতের ৫০″ $= \frac{1\times 50}{36} =$ ১.৩৮৯ গজ (প্রায়)।

অর্থাৎ, মানচিত্রে ১″ = ভূমিতে ১.৩৮৯ গজ (প্রায়)।

উল্লেখ্য যে কর্ণীয় স্কেলের দৈর্ঘ্য যেহেতু গজের স্কেলে ৪" হতে ৬" পর্যন্তহয়, সেহেতু ১ ইঞ্চিতে ১.৩৮৯ গজ। স্কেল যথাক্রমে ৪ গুণ ও ৬ গুণ করে ৫.৫৫৬ গজ (১.৩৮৯×৫.৫৫৬ গজ) এবং ৮.৩৩৪ গজ (১.৩৮৯×৬ = ৮.৩৩৪ গজ) পাওয়া গেল। এদের কোনোটি বিভাজ্য সংখ্যা হিসাবে স্থির করতে হবে। বিভাজ্য সংখ্যা ৬ গজ স্থির করলে অঙ্কিত কর্ণীয় স্কেলের দৈর্ঘ্য ৪″-৬″ পর্যন্তহবে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের ভাগে ফুট এবং তৃতীয় পর্যায়ের ভাগে ইঞ্চি দেখানো যাবে। আরও উল্লেখ্য যে বিভাজ্য সংখ্যা ৭ গজ বা ৮ গজ হলেও অঙ্কিত স্কেলের দৈর্ঘ্য ৪″ হতে ৬″ পর্যন্তহবে।

এখন বিভাজ্য সংখ্যা ৬ গজ দেখানোর জন্য অঙ্কিত কর্ণীয় স্কেলের দৈর্ঘ্য বের করতে হবে।

∴ ভূমিতে ১.৩৮৯ গজ = মানচিত্রে ১″

ভূমিতে ১ গজ = মানচিত্রে $^{১}/_{১.৩৮৯}$″

∴ ভূমিতে ৬ গজ (বিভাজ্য সংখ্যা) = মানচিত্রে $\frac{১\times৬}{১.৩৮৯}$ = ৪.৩২" (প্রায়)।

অর্থাৎ, ৬ গজ দেখানোর জন্য মানচিত্রে অঙ্কিত কর্ণীয় স্কেলের দৈর্ঘ্য হবে ৪.৩২" (প্রায়)।

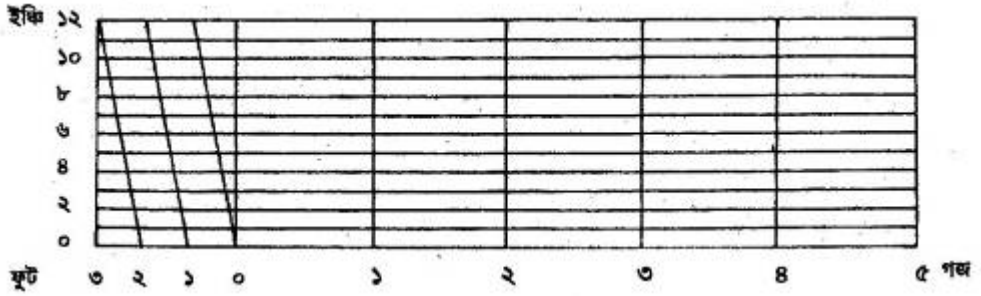
অর্থাৎ ১:৫০ স্কেলে মানচিত্রের ১ ইঞ্চি ভূমিতে ১.৩৮৯ গজ দূরত্ব নির্দেশ করে। ৬ গজ দেখানোর জন্য অঙ্কিত কর্ণীয় স্কেলের দৈর্ঘ্য প্রায় ৪.৩২ ইঞ্চি। প্রাথমিক, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ে প্রতিটি অংশের মান যথাক্রমে ১ গজ, ১ ফুট ও ১ ইঞ্চির সমান।

এখন ইঞ্চি দেখানোর জন্য অঙ্কিত কর্ণীয় স্কেলের উলম্ব দৈর্ঘ্য বা উচ্চতা বের করতে হবে। গঠন-কাঠামো অনুযায়ী এই স্কেলে প্রাথমিক পর্যায়ের প্রতিটি অংশের মান ১ গজ, দ্বিতীয় পর্যায়ে ১ ফুট এবং তৃতীয় পর্যায়ে ১ ইঞ্চি হবে। ১ ফুটে ১২" হওয়ায় এই স্কেলের উলম্ব দৈর্ঘ্য সাধারণ অঙ্কন সুবিধার্থে ১.২" (০.১″×১২=১.২″) হওয়া বাঞ্চনীয়। বর্তমান আলোচনায় প্রাথমিক পর্যায়ে ১ গজ পর্যন্ত, দ্বিতীয় পর্যায়ে ১ ফুট পর্যন্তএবং তৃতীয় পর্যায়ে ১ ইঞ্চি পর্যন্তদেখানোর জন্য ৪.৩২" দীর্ঘ কর্ণীয় স্কেল অঙ্কন করা হলো।

উক্ত ৪.৩২″ দৈর্ঘ্যের কর্ণীয় স্কেলে প্রাথমিক পর্যায়ে ১ গজ, দ্বিতীয় পর্যায়ে ১ ফুট এবং তৃতীয় পর্যায়ে ১ ইঞ্চি দেখিয়ে কর্ণীয় স্কেলটি অংকন করা হয়েছে।

দ্বিতীয় ধাপ: প্রথম ধাপ হতে নির্ণয় করা ৪.৩২" দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট একটি আনুভূমিক সরল রেখাকে প্রাথমিক পর্যায়ে সমান ৬ ভাগে বিভক্ত করা হলো এবং প্রতিটি অংশের মান ১ গজের সমান। এই বিভাজন প্রক্রিয়াও সরল স্কেলের অনুরূপ।

তৃতীয় ধাপ: প্রথম পর্যায়ের শ্রেণিবিভাগ থেকে সর্ববামের অংশকে বৈশিষ্ট্যানুযায়ী ১ ফুট পর্যন্তদেখানোর জন্য ৩ ভাগে বিভক্ত করা হলো। চিত্র ১৫.৪.১ অনুযায়ী অঙ্কন কৌশলের মাধ্যমে বিভাজন করা হয়েছে কারণ রুলারের সাহায্যে বিভাজন প্রক্রিয়া সুবিধাজনক নয়।



প্র. অ. ১:৫০

চিত্র ১৫.৪.১৬ : গজ, ফুট, ইঞ্চি দেখানোর জন্য অঙ্কিত কর্ণীয় স্কেল

চতুর্থ ধাপ: এই ধাপে ইঞ্চি দেখানোর জন্য ৪.৩২" দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট আনুভূমিক সরল রেখার উভয় প্রান্তেউলম্বভাবে সমকোণে ১.২" দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট্য দুইটি রেখা অঙ্কন করে ১২ ভাগে বিভক্ত করা হল এবং আনুভূমিক রেখার সমান্তরাল ১২টি ভাগ অনুযায়ী সরলরেখা অঙ্কন করা হলো। সর্বনিম্ন আনুভূমিক রেখা হতে প্রাথমিক পর্যায়ের বিভাজন বিন্দু বরাবর শীর্ষ রেখা পর্যন্তউলম্ব রেখা অঙ্কন করা হলো। তৃতীয় পর্যায়ের বিভাজন কৌণিকভাবে দেখানের জন্য দ্বিতীয় পর্যায়ের বিভক্তকৃত

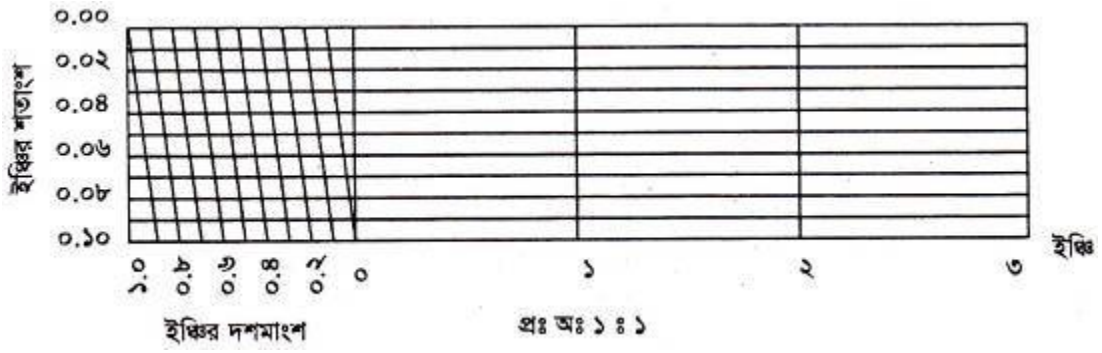
বিভিন্ন অংশ শীর্ষ রেখায় দ্বিতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন বিভক্ত বিন্দুর সাথে আনুভূমিক রেখা হতে কৌণিকভাবে যোগ করে কর্ণীয় স্কেল অঙ্কন করা হলো।

পঞ্চম ধাপ: এই ধাপে অঙ্কিত কর্ণীয় স্কেলে প্রাথমিক, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের বিভাজনের প্রত্যেকটি অংশের মান, স্কেলের শিরোনাম, প্রতিভূ অনুপাত, স্কেলের সীমানা নির্দেশ করা হলো। অঙ্কিত স্কেলের উপরিভাগে স্কেলের দৈর্ঘ্য ও কাগজের আকারের সাথে সামঞ্জস্য রেখে পরিমিত আকারে সুন্দরভাবে কর্ণীয় স্কেল অঙ্কন করা হলো। মূল স্কেলের নিচে বিভিন্ন বিভাগ সংলগ্ন স্থানে প্রত্যেকটি অংশের স্কেল অঙ্কন শেষ হলে পরিমিত ব্যবধানের স্কেলের চতুর্থ পার্শ্বের সাধারণ সীমানা অঙ্কন করা হলো।

উদাহরণ ২. প্র.অ. ১:১ থেকে একটি কর্ণ মাপনী অঙ্কন করুন তাতে ইঞ্চি, ইঞ্চির দশমাংশ ও ইঞ্চির শতমাংশ নির্দেশ করুন।

অঙ্কন পদ্ধতি : প্রশ্নমতে, মানচিত্রের ১ ইঞ্চি ভূ-পৃষ্ঠের ১ ইঞ্চি নির্দেশ করে

৪ ইঞ্চি দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট্য একটি রেখাকে =৪ ভাগ করলে প্রতি ভাগের দূরত্ব হবে ১ ইঞ্চি। বাম দিকের প্রাথমিক ভাগটি =১০ ভাগে বিভক্ত করার পর প্রাথমিক ও ক্ষুদ্র ভাগগুলো থেকে লম্ব টানতে হবে। প্রতিটি ক্ষুদ্র ভাগ ০.১ ইঞ্চি দূরত্বে হবে। দশমিকের পরবর্তী বিভাজনের জন্য লম্বগুলোকে আবার ১০টি ভাগে ভাগ করতে হয় এবং এদের অস্থায়ী (পরে মুছে ফেলতে হয়) সমান্তরাল রেখা দিয়ে যুক্ত করতে হয়। এবং ক্ষুদ্র ভাগগুলোর ওপরের ও নিচের প্রান্তকে কৌণিকভাবে যুক্ত করলে দশমিকের পর দুই ঘরের ভাগ পাওয়া যাবে। এ কৌণিক মাপনী থেকে $\frac{১}{১০০}$ ইঞ্চি পর্যন্তপরিমাপ পাওয়া যায়।



চিত্র ১৫.৪.১৭: কর্ণীয় স্কেল

কর্ণ মাপনী অঙ্কনের উদাহরণ

উদাহরণ ৩। প্রতিভূ অনুপাত ১:৬৩,৩৬০ অনুযায়ী মাইল, ফার্লং ও চেইন দেখিয়ে একটি কর্ণ মাপনী অঙ্কন করুন।

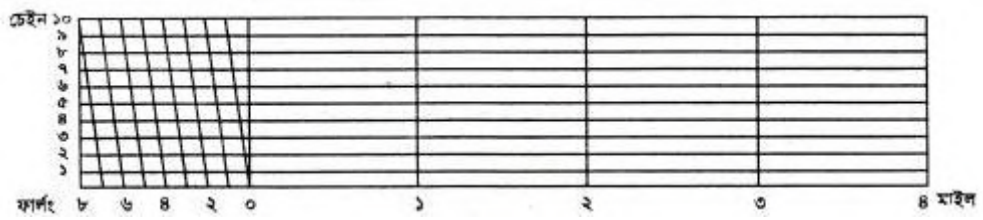
উত্তর: প্রশ্নানুসারে,

মানচিত্রের ১″ ভূ-পৃষ্ঠের ৬৩৩৬০″ নির্দেশ করে

∴ ″ ১″ ″ $\frac{৬৩,৩৬০}{৬৩,৩৬০}$ বা ১ মাইল নির্দেশ করে

∴ ″ ৫″ ″ ৫ মাইল নির্দেশ করে

অঙ্কন পদ্ধতি: ৫ ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের রেখা অঙ্কন করে ৫ ভাগে ভাগ করলে প্রতি ভাগ ১ মাইল হয়। এবং বাম পার্শ্বে প্রথম ভাগটিকে ৮ ভাগ করলে প্রতি ভাগ ১ ফার্লং হয়। রেখাটির উভয় প্রান্তেলম্ব অঙ্কন করে তাদের ১০ টি ভাগে বিভক্ত করে পরস্পর যুক্ত করলে প্রতি ১ ভাগ ১ চেইন নির্দেশ করে। এরপর বাম পার্শ্বের ভাগটির ওপর থেকে নিচের ভাগে কোণাকোণিভাবে অর্থাৎ ওপরের ১ এর সাথে নিচের ০, ওপরের ২ থেকে নিচের ১ যুক্ত করে এরূপ মাপনী অঙ্কন করা হয়। এরপর ডান দিকে মাইল,বাম দিকে ফার্লং এবং ওপরে চেইন লিখে মাপনীর নিচে প্র.অ. ১:৬৩,৩৬০ লিখতে হয়।



প্র. অ. ১:৬৩,৩৮০

চিত্র ১৫.৪.১৮ : কর্ণ মাপনী

কর্ণীয় স্কেলের ব্যবহার

কর্ণীয় স্কেলে প্রথামিক, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের ভাগ থাকায় কর্ণীয় স্কেল দ্বারা মানচিত্রের দুটি স্থানের দূরত্ব সাধারণ স্কেলের তুলনায় সূক্ষ্মভাবে পরিমাপ করা যায়। প্রকৃতপক্ষে ক্ষুদ্র সরলরেখাকে কতিপয় সমান ভাগে বিভক্ত করার জন্য কর্ণীয় স্কেল ব্যবহৃত হয়। এই স্কেলের প্রধান সুবিধা হলো আধুনিক সংকোচন-সম্প্রসারণ প্রযুক্তিতে মানচিত্রের আকার পরিবর্তন করলে তা প্রকৃত স্কেলকে নির্দেশ করে। তৃতীয় পর্যায়ের ভাগ থাকায় সাধারণ স্কেলের তুলনায় পরিমাপ কঠিন হলেও সূক্ষ্ম পরিমাপের জন্য এই স্কেল খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

শিক্ষার্থীর কাজ	প্র.অ.: ১: ..... দেখিয়ে একটি সরল ও কর্ণীয় স্কেল অঙ্কন করুন।

সারসংক্ষেপ

যে স্কেল দ্বারা প্রাথমিক ও দ্বিতীয় পর্যায়ের ভাগের মাধ্যমে মানচিত্রে ভূমির দৈর্ঘ্য বা এর অনুপাত পরিমাপ করা হয় তাকে সরল স্কেল বলে। এবং যে স্কেলের মাধ্যমে প্রাথমিক, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের ভাগের মাধ্যমে মানচিত্রে ভূমির দৈর্ঘ্য পরিমাপ করা হয় তাকে কর্ণীয় স্কেল বলা হয়। গঠন কাঠামোগত ভাবে প্রাথমিক, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পর্যায়ের ভাগ থাকায় কর্ণীয় স্কেলের মাধ্যমে মানচিত্রে দুইটি স্থানের দূরত্ব স্কেলের তুলনায় সূক্ষ্মভাবে পরিমাপ করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন : ১৫.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। সরল স্কেলের কয়টি একক ব্যবহার করা হয়?
ক) ১টি খ ২টি গ) ৩টি ঘ) ৪টি

২। কর্ণীয় স্কেলের কয়টি একক ব্যবহৃত হয়?
ক) ১টি খ) ২টি গ) ৩টি ঘ) ৪টি

৩। আয়তক্ষেত্র বা বর্গক্ষেত্রের বিপরীত কোণদ্বয় সংযোজক রেখাকে কী বলে?
ক) কর্ণ খ) রেখা গ) লাইন ঘ) কোনটিই নয়

৪। সরল স্কেলের গঠন কাঠামো-

i. স্কেলের দৈর্ঘ্য ৪" হতে ৬" হওয়া বাঞ্চনীয়

ii. অঙ্কন ও বর্ণনার সুবিধার্থে নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের স্কেলকে প্রাথমিক ও দ্বিতীয় পর্যায়ে ভাগ করা হয়

iii. দৈর্ঘ্য অনুপাতে সাধারণ স্কেলের প্রস্থ ০.২৫" বা ০.৫ সেন্টিমিটারের বেশি হওয়া কিংবা সরু সরলরেখা হওয়া উচিত নয়।

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১৫.৫ মানচিত্রের সংকোচন ও প্রসারণের সুবিধা ও অসুবিধা
(Advntages and Disadvantages of Reduction & Enlargement of Maps)



উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- মানচিত্রের সংকোচন ও প্রসারণের সংজ্ঞা বলতে পারবেন এবং
- মানচিত্রের সংকোচন ও প্রসারণের সুবিধা-অসুবিধা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।



মানচিত্রের সংকোচন

স্কেলের পরিবর্তনের মাধ্যমে মানচিত্রের আকার সংকুচিত করা হলে তাকে মানচিত্রের সংকোচন বলে। বৃহৎ আকৃতির মানচিত্রকে ক্ষুদ্র পরিসরে অংকনের জন্য মানচিত্রের সংকোচন প্রয়োজন। একটি নির্দিষ্ট স্কেলের মানচিত্রকে প্রয়োজন অনুসারে বৃহত্তর স্কেলে বিভিন্ন পদ্ধতিতে সংকোচন করা হয়। উল্লেখ্য, মানচিত্রের স্কেল বড় হলে আকার ছোট হয় এবং স্কেল ছোট হলে আকার বড় হয়। কোনো বড় মানচিত্রকে ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে অংকন করার জন্য মানচিত্রের সংকোচন প্রয়োজন। এছাড়াও পাশাপাশি অবস্থিত একাধিক মানচিত্রকে একটি নির্দিষ্ট পরিসরে দেখানোর জন্য মানচিত্রের সংকোচন প্রয়োজন। যে সমস্ত পদ্ধতিতে মানচিত্রের সংকোচন করা হয় তন্মধ্যে যন্ত্র পদ্ধতি, আলোকচিত্র পদ্ধতি, বর্গ পদ্ধতি ও ত্রিভুজ পদ্ধতি উল্লেখযোগ্য।

মানচিত্র সংকোচনের সুবিধা ও অসুবিধা

একটি নির্দিষ্ট স্কেলের মানচিত্রকে এমন একটি স্কেলে সংকোচন করতে হবে যাতে মূল মানচিত্রের বিভিন্ন ভৌগোলিক উপাদানের আকৃতি মানচিত্রের সংকোচনেও সঠিক থাকে। তা না হলে মানচিত্র ব্যবহারে অসুবিধা সৃষ্টি হয়।

অপরদিকে কোনো মানচিত্রের সংকোচন খুব বেশি হলে মূল মানচিত্রে অবস্থিত বিভিন্ন ভৌগোলিক উপাত্তের আকার ও অবস্থানগত ত্রুটি দেখা যায়। অর্থাৎ মানচিত্রের স্কেলের সঠিকতা ও মানচিত্রের আয়তনগত সঠিকতা নিশ্চিত করে মানচিত্রের সংকোচন প্রয়োজন অন্যথায় মানচিত্র সংকোচনের সুবিধার চেয়ে অসুবিধাই অধিক। মূলত ব্যাপক ও বিস্তৃত এলাকার সামগ্রিক ভৌগোলিক উপাত্তকে এক নজরে উপস্থাপন করার জন্য বৃহৎ এলাকার মানচিত্রের উপাত্ত ক্ষুদ্র পরিসরে দেখান হয়।

মানচিত্রের প্রসারণ

সাধারণভাবে স্কেলের পরিবর্তনের ভিত্তিতে মানচিত্রের আকার পরিবর্তিত হয়। মানচিত্রের প্রসারণও মূলত মানচিত্রের আকারগত পরিবর্তন। মানচিত্রের সংকোচনের সাথে প্রসারণের পার্থক্য হলো মানচিত্র প্রসারণের ক্ষেত্রে মানচিত্রের স্কেল ক্ষুদ্রতর হয়। উল্লেখ্য যে মানচিত্রের স্কেল ছোট হলে আকার বড় হয়। প্রয়োজন অনুসারে একটি নির্দিষ্ট স্কেলের মানচিত্রকে ক্ষুদ্রতর স্কেলে বিভিন্ন পদ্ধতিতে প্রসারণ করা হয়। সংক্ষেপে স্কেলের পরিবর্তনের ফলে মানচিত্রের আকার বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হলে তাকে মানচিত্রের প্রসারণ বলে। সে সমস্ত পদ্ধতিতে মানচিত্রের প্রসারণ করা হয় তাদের মধ্যে যন্ত্র পদ্ধতি যেমন: প্যান্টোগ্রাফ (Pantograph), ইডোগ্রাফ (Eidograph), সমানুপাতিক কম্পন (Proportional Camass), ত্রিভুজ পদ্ধতি (Triangular Method) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

মানচিত্রের প্রসারণের সুবিধা ও অসুবিধা

মানচিত্রে অধিকতর তথ্য সংযোজন, বিস্তৃত বিবরণ ও জরিপ কাজের সুবিধার্থে মানচিত্রের প্রসারণ প্রয়োজন। মানচিত্রের প্রসারণ ব্যাপক হলে ভৌগোলিক উপাত্তের আকার ও অবস্থানগত ত্রুটি দেখা যায়। তাই মানচিত্রের প্রসারণের ক্ষেত্রে এমন একটি নির্দিষ্ট স্কেলে প্রসারণ করতে হবে যাতে নির্দিষ্ট স্কেলের মূল মানচিত্রে ভৌগোলিক উপাদানের আকৃতি সঠিক থাকে। এছাড়া মানচিত্র প্রসারণের আয়তনগত সঠিকতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন অন্যথায় মানচিত্রের ব্যবহারের ক্ষেত্রে অসুবিধার সম্মুক্ষীণ হতে হবে। মানচিত্রের প্রসারণের ক্ষেত্রে ত্রিভুজ পদ্ধতির তুলনায় বর্গ পদ্ধতি সহজ ও সুবিধাজনক। ত্রিভুজ পদ্ধতিতে দীর্ঘাকৃতির মানচিত্র ছাড়া অন্য কোনো মানচিত্র স্কেলের কাঠামো অনুযায়ী অঙ্কন করা সম্ভব নয়। এছাড়া প্রসারণকৃত মানচিত্রের অনুপাত বেশি হলে (যেমন: দ্বিগুনের বেশি) মূল মানচিত্রের সাপেক্ষে প্রসারিত মানচিত্রে বিভিন্ন ভৌগোলিক উপাদানের আকারের ক্ষেত্রে পার্থক্য সৃষ্টি হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	নির্দিষ্ট স্কেল নির্ধারণ সাপেক্ষে একই মানচিত্রের সংকোচন ও প্রসারণ করে অঙ্কন করবেন।

সারসংক্ষেপ

স্কেলের পরিবর্তনের ভিত্তিতে মানচিত্রের আকার পরিবর্তন হয়। স্কেলের পরিবর্তনের মাধ্যমে মানচিত্রের আকার সংকুচিত হলে তাকে মানচিত্রের সংকোচন এবং প্রসারিত হলে তাকে মানচিত্রের প্রসারণ বলে। উল্লেখ্য মানচিত্রের স্কেল বড় হলে আকার ছোট হয় এবং স্কেল ছোট হলে আকার বড় হয়।

বহুনির্বাচনী প্রশ্নঃ ১৫.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) দিন।

১। মানচিত্রে প্রসারণের ক্ষেত্রে কোন পদ্ধতিটি সহজ ও সুবিধাজনক?

ক) ত্রিভুজ পদ্ধতি　　খ) বর্গ পদ্ধতি

গ) ইডোগ্রাফ　　ঘ) সমানুপাতিক কম্পাস

২। মানচিত্র সংকোচনের ক্ষেত্রে-

i. স্কেল পরিবর্তনের মাধ্যমে মানচিত্রের আকার সংকুচিত হয়।

ii. বৃহৎ আকৃতির মানচিত্রকে ক্ষুদ্র পরিসরে অঙ্কনের জন্য মানচিত্রের সংকোচন প্রয়োজন।

iii. স্কেল পরিবর্তনের মাধ্যমে মানচিত্রের আকার প্রসারিত হয়।

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii　　(খ) ii ও iii

(গ) i ও iii　　(ঘ) i, ii ও iii

৩। মানচিত্রের প্রসারণ মূলত-

i. মানচিত্রের আকারগত পরিবর্তন

ii. মানচিত্রের স্কেল ক্ষুদ্রতর নয়

iii. জরিপকার্যের সুবিধার্থে নির্দিষ্ট স্কেল মানচিত্রের প্রসারণ করতে হয়

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii　　(খ) ii ও iii

(গ) i ও iii　　(ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১৫.৬ স্কেলের সাহায্যে অবস্থান ও দূরত্ব নির্ণয় (Determine the location and Distance by Scale)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- স্কেলের সাহায্যে অবস্থান ও দূরত্ব নির্ণয় পদ্ধতি ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

ভূগোল বিজ্ঞানে ভৌগোলিক প্রপঞ্চসমূহের অবস্থান ও দূরত্ব নির্ণয় অত্যন্তগুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। দূরত্ব পরিমাপের জন্য স্কেলকে প্রধান দু'ভাগে ব্যবহার করা যায়। প্রথমত, মানচিত্রে অবস্থিত নির্দিষ্ট দুটি বিন্দুর বা অবস্থানের মধ্যবর্তী প্রকৃত দূরত্ব নির্ণয় এবং দ্বিতীয়ত, ভূ-পৃষ্ঠের নির্দিষ্ট দূরত্ব স্কেলের মাধ্যমে নির্ণয় করা যায়।

দূরত্ব নির্ণয়ে স্কেলের ব্যবহার

স্কেল প্রধানত তিনটি পদ্ধতিতে প্রকাশ করা হয়। যথা–

১) বর্ণনাকৃত স্কেলের মাধ্যমে দূরত্ব
২) রেখাচিত্র অনুপাতের মাধ্যমে এবং
৩) প্রতিভূ অনুপাতের মাধ্যমে।

১. বর্ণনাকৃত স্কেলের মাধ্যমে দূরত্ব নির্ণয়

মানচিত্রের স্কেল প্রকাশের জন্য সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি হচ্ছে বর্ণনার মাধ্যমে স্কেল প্রকাশ করা। সরাসরি দুটি স্থানের মধ্যবর্তী দূরত্ব বর্ণনার মাধ্যমে সহজেই প্রকাশ করা যায়। যেমন: ঢাকার শাহবাগ থেকে মহাখালীর দূরত্ব ২০ মাইল। এখানে ১"=২০ মাইল ধরে দূরত্ব নির্ণয় করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে মানচিত্রটি যদি ছোট বা বড় করা হয় তাহলে প্রকাশিত স্কেল নতুন মানচিত্রের জন্য প্রযোজ্য হবে না।

২. রেখাচিত্র অনুপাতের মাধ্যমে দূরত্ব নির্ণয়

১"=৫ মাইল হলো দূরত্ব নির্ণয়ের জন্য বর্ণনাকৃত স্কেল। এই বর্ণনাকৃত স্কেল রেখাচিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়। চিত্র: ১৫.৬.১) বর্ণনাকৃত স্কেল অনুযায়ী মানচিত্রে দুইটি স্থানের দূরত্ব যদি ১" হয় তাহলে ভূমিতে তার দূরত্ব হবে ৫ মাইল। সুতরাং ৪ ইঞ্চি দৈর্ঘ্যের একটি রেখাকে ৪ ভাগে বিভক্ত করলে প্রতিভাগে হবে ৫ মাইল যা ২০ মাইল (৫×৪=২০) দূরত্ব নির্দেশ করছে। অপেক্ষাকৃত স্বল্প দূরত্ব প্রকাশের জন্য বাম দিকের প্রথম ঘরটিকে পুনরায় ৫ ভাগে ভাগ করলে প্রতি ভাগ ১ মাইল করে দূরত্ব নির্দেশ করবে।



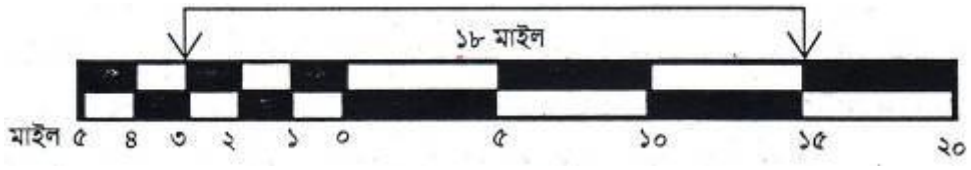
প্র.অ. ১: ৩১৬৮০০

চিত্র: ১৫.৬.১ সরল স্কেল

মানচিত্রের উপরিস্থিত দুটি স্থানের দূরত্ব নির্ণয় করতে একটি কাঁটা কম্পাস বা ডিভাইডারের দুই বাহু প্রসারিত করে মানচিত্রের উপরিস্থিত দুটি স্থানের উপর স্থাপন করতে হবে। কম্পাসের একটি বাহু মানচিত্রে সরল বা সাধারণ বা রৈখিক স্কেলের ০ (শূন্য) চিহ্নিত রেখার উপর স্থাপন করে অন্য বাহুটি স্কেলের ডান দিক বরাবর রাখতে হবে। কম্পাসের দ্বিতীয় বাহুটির প্রাথমিক ভাগগুলোর কোনো একটি স্পর্শ করলে কম্পাসের প্রথম বাহু থেকে দ্বিতীয় বাহু অর্থাৎ উভয় স্থানের মধ্যবর্তী দূরত্ব জানা যাবে। ঢাকার শাহবাগ থেকে মহাখালীর দূরত্ব ২০ মাইল। শাহবাগ থেকে মহাখালীর মধ্যবর্তী দূরত্ব ৪টি প্রাথমিক ভাগের সমান হলে প্রতি ভাগের মান ৫ মাইল হবে। উক্ত দুটি স্থানের মধ্যবর্তী দূরত্ব ২০ মাইল (৪×৫=২০) হবে।

কিন্তু ডিভাইডার বা কম্পাসের দ্বিতীয় বাহুটি প্রাথমিক ভাগের কোনো বিন্দু স্পর্শ না করে দুটি ভাগের মধ্যবর্তী কোনো স্থান স্পর্শ করলে কাঁটা কম্পাসটি তুলে নিয়ে দ্বিতীয় বাহুটি কোনো প্রাথমিক ভাগের উপর স্থাপন করে প্রথম বাহুটিকে বাম দিকের দ্বিতীয় পর্যায়ের ভাগগুলোর কোনোটির উপর স্থাপন করতে হবে। দ্বিতীয় বাহুটি প্রথম পর্যায়ের ভাগগুলোর তৃতীয়

রেখা স্পর্শ করলে এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের ভাগগুলোর প্রত্যেকটি ১ মাইল করে দুটি স্থানের মধ্যবর্তী দূরত্ব (৫×৩+৩=১৫+৩)=১৮ মাইল হবে (চিত্র ১৫.৬.২)।



প্র.অ. ১: ৩১৬৮০০

চিত্র ১৫.৬.২ : সরল স্কেল

উল্লিখিত পদ্ধতিতে মানচিত্রের যে কোনো স্থানের অবস্থান ও দূরত্ব স্কেল ব্যবহার করে সহজেই নির্ণয় করা যায়।

৩. প্রতিভূ ভগ্নাংশ বা প্রতিভূ অনুপাত (Representative Fraction (R.F.)

মানচিত্রের দুটি বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব ও ভূমিতে অবস্থিত অনুরূপ দুটি বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্বের অনুপাতকে ভগ্নাংশে বা ক্ষুদ্র এককে প্রকাশ করাকে প্রতিভূ ভগ্নাংশ বা প্রতিভূ অনুপাত বলে।

মানচিত্রের স্কেলকে ভগ্নাংশে বা অনুপাতে প্রকাশ করা হয়। এ পদ্ধতিতে ভগ্নাংশের প্রথম অংশ লব ও দ্বিতীয় অংশ হর নামে পরিচিত। যেমন- ১:১০০০০। বিশ্বের সকল দেশে এ পদ্ধতি ব্যবহার করা যায়। এ ভগ্নাংশ বা অনুপাত সাধারণভাবে ইঞ্চিতে প্রকাশিত হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীরা যে কলেজে পড়ে সেই কলেজ থেকে তার পাশ্ববর্তী যে কোনো স্থানের দূরত্ব নির্ণয় করবে।

সারসংক্ষেপ

স্কেলের মাধ্যমে মানচিত্রের অবস্থান ও দূরত্ব নির্ণয় করা যায়-বর্ণনার মাধ্যমে, রেখাচিত্র অঙ্কনের মাধ্যমে এবং প্রতিভূ অনুপাতের মাধ্যমে। ভূগোল বিজ্ঞানের ভৌগোলিক প্রপঞ্চসমূহের অবস্থান নির্ণয় অত্যন্তগুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৫.৬

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

আরিনের বাসা মহাখালীতে। সে বাবার সাথে শাহবাগ যাদুঘর দেখতে গেল এবং বাবাকে জিজ্ঞেস করল তার বাসা থেকে শাহবাগের দূরত্ব কত এবং যাদুঘরটির অবস্থান কোথায়?

১। মানচিত্রে কোনো কিছুর অবস্থান ও দূরত্ব কীভাবে নির্ভুলভাবে প্রকাশ করা যায়?

ক) স্কেলের মাধ্যমে খ) স্কেচ অঙ্কন করে

গ) অনুমানের ভিত্তিতে ঘ) ইউনিটের মাধ্যমে

২। স্কেল প্রধান কয়টি পদ্ধতিতে প্রকাশ করা যায়?

ক) ২টি খ) ৩টি গ) ৪টি ঘ) ৫টি

৩। প্রতিভূ অনুপাত হচ্ছে-

i. মানচিত্রে অবস্থিত দুটি বিন্দুর দূরত্ব ও ভূমিতে অবস্থিত অনুরূপ দুটি বিন্দুর দূরত্বের অনুপাত ভগ্নাংশে বা ক্ষুদ্র এককে প্রকাশের মাধ্যম

ii. ভগ্নাংশের প্রথম অংশ লব ও দ্বিতীয় অংশ হর নামে পরিচিত

iii. প্রতিভূ অনুপাত সাধারণত ইঞ্চিতে প্রকাশ করে

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

পাঠ-১৫.৭ মানচিত্রের সংকোচন পদ্ধতি (Map Reduction Method)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- এই পাঠ শেষে আপনি মানচিত্রের সংকোচন ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মানচিত্রের সংকোচন

মানচিত্রের সংকোচন এবং প্রসারণ প্রক্রিয়া মূলত একই। শুধুমাত্র রূপান্তর প্রক্রিয়ায় অনুপাত ভিন্ন হয়। একটি নির্দিষ্ট স্কেল হতে অপেক্ষাকৃত বৃহত্তর স্কেলে রূপান্তর হলো মানচিত্রের সংকোচন। মানচিত্র সংকোচনের পদ্ধতিসমূহ হলো (১) যান্ত্রিক পদ্ধতি (২) আলোকচিত্র পদ্ধতি (৩) ছক বা বর্গ পদ্ধতি (৪) ত্রিভুজ পদ্ধতি। উল্লিখিত পদ্ধতিসমূহের মধ্যে ছক বা বর্গ পদ্ধতি সর্বাপেক্ষা সহজ ও সুবিধাজনক। তবে আধুনিক যন্ত্র পদ্ধতিতে একটি নির্দিষ্ট স্কেলে সহজ ও নির্ভুল ভাবে মানচিত্রের সংকোচন করা হয়। নিম্নে উদাহরণের মাধ্যমে বর্গ এবং ত্রিভুজ পদ্ধতিতে মানচিত্রের সংকোচন প্রক্রিয়া বর্ণনা করা হলো।

বর্গ পদ্ধতি

১:৬০০০০০ স্কেলে যশোর জেলার একটি মানচিত্রকে ১:৮০০০০০ স্কেলে পুনরাঙ্কিত করুন।

প্রথম স্তর : নতুন ও মূল মানচিত্রের অনুপাত নির্ণয়ের মাধ্যমে মানচিত্রের সংকোচন করা হয়। সূত্রানুযায়ী,

$$\frac{\text{নতুন মানচিত্রের স্কেল}}{\text{মূল মানচিত্রের স্কেল}} = \text{পরিবর্তিত মানচিত্রের অনুপাত।}$$

বা, $\frac{১/৮০০০০০}{১/৬০০০০০}$

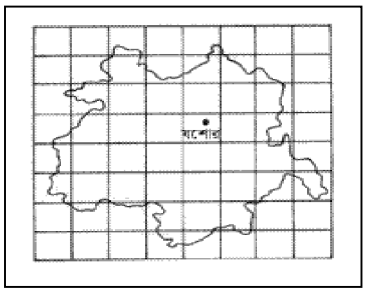
বা, $\frac{১}{৮০০০০০} \times \frac{৬০০০০০}{১} = \text{বা } \frac{৩}{৪}$ বা ০.৭৫ গুণ।

মূল মানচিত্রের তুলনায় নতুন মানচিত্রের অনুপাত ৩:৪ এবং নতুন মানচিত্র ০.৭৫ গুণ সংকুচিত হবে। অর্থাৎ সরবরাহকৃত বা মূল মানচিত্র অপেক্ষা নতুন মানচিত্রের আকার ০.৭৫ গুণ সংকুচিত হবে বা মূল মানচিত্রের একটি বর্গের বাহুর দৈর্ঘ্য অপেক্ষা নতুন বা সংকুচিত মানচিত্রের প্রতিটি বাহুর দৈর্ঘ্য ০.৭৫ গুণ কম হবে।

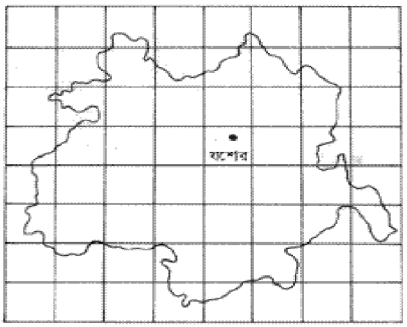
দ্বিতীয় স্তর : এই স্তরে মূল মানচিত্রকে চিত্র ১৫.৭.১ অনুযায়ী ১ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট বাহুর সাহায্যে আনুভূমিকভাবে ৮টি এবং উলম্বভাবে ৮টি হিসাবে মোট ৬৪ টি বর্গে বিভক্ত করা হলো। সংকুচিত মানচিত্রের জন্য ০.৭৫ সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট বাহুর সাহায্যে সমসংখ্যক বর্গক্ষেত্র অঙ্কন করা হলো।

তৃতীয় স্তর : এই স্তরে মূল মানচিত্রের বর্গের অনুকরণে সংকুচিত নতুন মানচিত্রের বর্গের মধ্যে মূল মানচিত্রের উপাত্ত হুবহু রূপান্তর করলে মানচিত্রের সংকোচন হয়। উল্লেখ্য যে মূল মানচিত্রের তথ্য নতুন মানচিত্রে রূপান্তরের সময় সাবধানতা অবলম্বন প্রয়োজন। অন্যথায় মানচিত্রের আকার ও আয়তনগত পার্থক্য সৃষ্টি হতে পারে।

পুরাতন মানচিত্র মানচিত্র



সংকোচিত নতুন মানচিত্র



প্র.অ. ১:৬০০০০ প্র. অ.১: ৮০০০০

চিত্র ১৫.৭.১ যশোর জেলার সংকুচিত মানচিত্র

ত্রিভুজ পদ্ধতি: ১:৬৪০০০০ স্কেলে গঙ্গা নদীর অংশ বিশেষের মানচিত্রকে ১:৮০০০০০ স্কেলে ত্রিভুজ পদ্ধতিতে পুনরাঙ্কিত করুন।

সূত্রানুযায়ী,

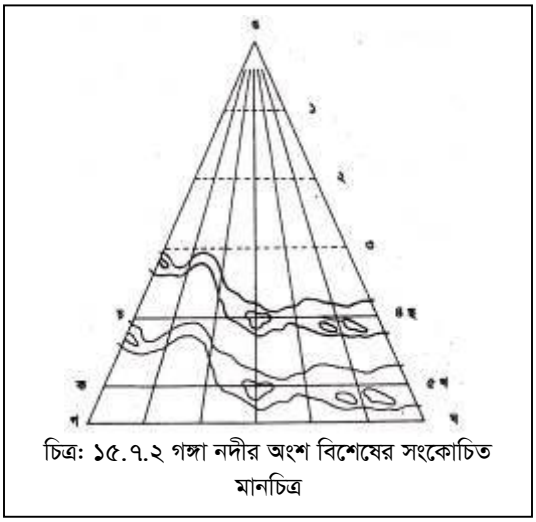
$$\frac{\text{নতুন মানচিত্রের স্কেল}}{\text{মূল মানচিত্রের স্কেল}} = \text{পরিবর্তিত মানচিত্রের অনুপাত।}$$

$$\therefore \frac{১:৮০০০০০}{১:৬৪০০০০}$$

$$\text{বা, } \frac{১/৮০০০০০}{১/৬৪০০০০}$$

$$\text{বা, } \frac{১}{৮০০০০০} \times \frac{৬৪০০০০}{১} = \text{বা } \frac{৪}{৫} \text{ বা ৪:৫ বা ০.৮ গুণ।}$$

মূল মানচিত্রের তুলনায় নতুন মানচিত্রের অনুপাত ৪:৫ এবং এটি ০.৮ গুণ সংকুচিত হবে। সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের মাধ্যমে ৪:৫ অনুপাতে মূল মানচিত্রকে সংকুচিত করা হয়েছে।



চিত্র: ১৫.৭.২ গঙ্গা নদীর অংশ বিশেষের সংকোচিত মানচিত্র

অর্থাৎ মূল মানচিত্রের তুলনায় নতুন মানচিত্রের অনুপাত হবে ৪:৫ এবং এটি ০.৮ গুন সংকুচিত হবে। সরবরাহকৃত বা মূল মানচিত্রকে ৪:৫ অনুপাতে সংকোচনের জন্য চিত্র ১৫.৭.২ অনুযায়ী 'গঘঙ' নামক সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ অঙ্কন করে 'ঙ' বিন্দু হতে 'গঙ' রেখাকে সমান ৫ ভাগে বিভক্ত করে 'কখ' রেখাকে সমান্তরালে 'চছ' রেখা সংকুচিত করবে। এখন 'ঙ' বিন্দু হতে 'কখ' রেখাকে সমান ৫ ভাগে বিভক্ত করে 'গঘ' রেখা বরাবর বিভাজন রেখা অঙ্কন করে মূল মানচিত্রের আদলে 'চছ' রেখা বরাবর ভৌগোলিক তথ্যাদি রূপান্তর করে মানচিত্রের সংকোচন করা হল (চিত্র ১৫.৭.২)।

সারসংক্ষেপ

নির্দিষ্ট স্কেল অনুযায়ী মানচিত্র সংকোচনের অনুপাত নির্ণয় করে বিভিন্ন পদ্ধতিতে মানচিত্রের সংকোচন করা যায়, তন্মধ্যে বর্গ এবং ত্রিভুজ পদ্ধতি উল্লেখযোগ্য। ত্রিভুজ পদ্ধতির তুলনায় বর্গ পদ্ধতি অধিক সহজ এবং সুবিধাজনক।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-১৫.৭

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। মানচিত্র সংকোচনে কোন পদ্ধতি সহজ ও সুবিধাজনক?

ক) ত্রিভুজ পদ্ধতি খ) বর্গ পদ্ধতি গ) ত্রিভুজ ও বর্গ পদ্ধতি ঘ) কোনটিই নয়

পাঠ-১৫.৮ মানচিত্রের প্রসারণ পদ্ধতি (Map Enlargement Method)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি-

- এই পাঠ শেষে আপনি মানচিত্রের প্রসারণ পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

মানচিত্রের প্রসারণ

মানচিত্রে অধিক তথ্য সংযোজন এবং জরিপ কার্যের সুবিধার্থে মানচিত্রের প্রসারণ প্রয়োজন। যন্ত্রপাতি, প্যান্টোগ্রাফ, ইডোগ্রাফ, সমানুপাতিক কম্পাস, ত্রিভুজ পদ্ধতি, আলোকচিত্র পদ্ধতি এবং ছক বা বর্গ পদ্ধতি প্রভৃতি পদ্ধতিতে মানচিত্রের প্রসারণ করা হয়। তন্মধ্যে বর্গ ও ত্রিভুজ পদ্ধতি অধিক ব্যবহৃত হয়। ত্রিভুজ পদ্ধতিতে প্রসারিত মানচিত্রের আকার আয়তন পরিবর্তন হয়। ত্রিভুজ পদ্ধতিতে দীর্ঘাকৃতির মানচিত্র ব্যতীত অন্য কোনো মানচিত্র স্কেলের কাঠামো অনুযায়ী অঙ্কন করা সম্ভব নয়। এছাড়া প্রমানিত মানচিত্রের অনুপাত বেশি (যেমন দ্বিগুনের বেশি) হলে মূল মানচিত্রের সাপেক্ষে প্রমাণিত মানচিত্রে বিভিন্ন ভৌগোলিক উপাদানের আকার ও আয়তক্ষেত্রে পার্থক্য তৈরি হয়। এ কারণে মানচিত্রের প্রসারণে ত্রিভুজ পদ্ধতির তুলনায় বর্গ পদ্ধতি অধিক সহজ ও সুবিধাজনক নিম্নে দুটি পদ্ধতিতেই মানচিত্রের প্রসারণ বর্ণনা করা হলো:

বর্গ পদ্ধতি: এই পদ্ধতিতে মানচিত্রের প্রসারণ নির্ভর করে প্রতিটি বর্গের বাহুর দৈর্ঘ্যের উপর এবং বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ভর করে নতুন ও মূল মানচিত্রের স্কেলের অনুপাতের উপর।

$$\text{প্রসারিত মানচিত্রের অনুপাত} = \frac{\text{নতুন মানচিত্রের স্কেল}}{\text{মূল মানচিত্রের স্কেল}}$$

সূত্রানুযায়ী নতুন মানচিত্রের অনুপাত ০১ অপেক্ষা বেশি হলে মানচিত্রটি প্রসারিত হবে।

যেমন: ১:৬০০০০০ স্কেল অনুযায়ী ঢাকা জেলার একটি মানচিত্রকে ১:৫০০০০০ স্কেলে পুনরাঙ্কিত করুন।

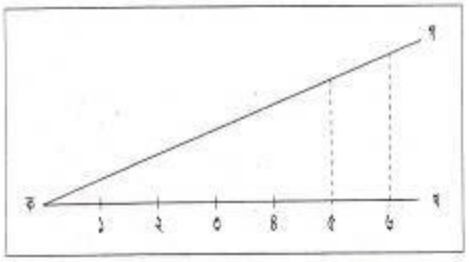
নতুন ও মূল স্কেলের মানচিত্রের অনুপাত নির্ণয়ের মাধ্যমে মানচিত্রের প্রসারণ সম্ভব।

$$\therefore \frac{১:৫০০০০০}{১:৬০০০০০}$$

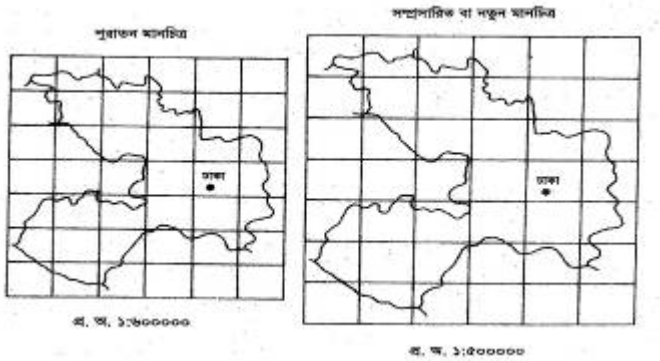
$$\text{বা, } \frac{১/৫০০০০০}{১/৬০০০০০}$$

$$\text{বা, } \frac{১}{৫০০০০০} \times \frac{৬০০০০০}{১} = \frac{৬}{৫} \text{ গুণ বা ১.২ গুণ।}$$

অর্থাৎ সরবরাহকৃত বা মূল মানচিত্র অপেক্ষা নতুন মানচিত্রের আকার ১.২ গুণ প্রসারিত হবে বা মূল মানচিত্রের একটি বর্গের বাহুর দৈর্ঘ্য অপেক্ষা নতুন বা সম্প্রসারিত মানচিত্রের প্রতিটি বাহুর দৈর্ঘ্য ১.২ গুণ বেশি হবে।



চিত্র: ১৫.৮.১ মূল ও নতুন মানচিত্রে বর্গের বাহুর দৈর্ঘ্য নির্ণয় পদ্ধতি



চিত্র: ১৫.৮.২ মানচিত্রের প্রসারণ

অঙ্কন পদ্ধতিঃ পুরাতন মানচিত্রকে চিত্রানুযায়ী ১ সে.মি দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট বাহুর আনুভূমিকভাবে ৬টি এবং উলম্বভাবে ৭টি মোট ৪২টি বর্গে বিভক্ত করা হলো। প্রসারিত মানচিত্রের জন্য ১.২ সে.মি দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট বাহুর সাহায্যে সমসংখ্যক বর্গক্ষেত্র অঙ্কন করা হয়েছে। অনুপাত পদ্ধতিতে মূলত নতুন মানচিত্রের বর্গের প্রতিটি বাহুর দৈর্ঘ্য স্থির করা যায়। প্রথম স্তর থেকে প্রাপ্ত নতুন ও মূল মানচিত্রের অনুপাত $\frac{৫}{৬}$ বা ৬:৫। চিত্রানুযায়ী কখ নামক আনুভূমিক রেখাকে সমান ৬টি অংশে বিভক্ত করে ৫ম ও ৬ষ্ঠ অংশে কখ রেখার উপর দুটি লম্ব অঙ্কন করা হলো। এখানে নির্ণীত ৬:৫ অনুপাতের ৫ম অংশের লম্ব দ্বারা মূল মানচিত্র প্রতিটি বর্গের একটি বাহুর দৈর্ঘ্য এবং ৬ষ্ঠ অংশের লম্ব দ্বারা নতুন মানচিত্রে প্রতিট বাহুর দৈর্ঘ্য পরিমাপ করা হয়। (চিত্র ১৫.৮.১) মূল মানচিত্রের বর্গের অনুকরণে নতুন বর্গের মানচিত্রের মধ্যে মানচিত্রের সীমারেখা, নদী, রাস্তা ও অন্যান্য তথ্যাদি হুবহু রূপান্তর করলে মানচিত্রের প্রসারণ কাজ সম্পন্ন হয়। (চিত্র ১৫.৮.২)

ত্রিভুজ পদ্ধতিঃ বিভিন্ন আকৃতির ত্রিভুজ অঙ্কনের মাধ্যমে মানচিত্রের প্রসারণ প্রক্রিয়াকে ত্রিভুজ পদ্ধতি বলে। ত্রিভুজ পদ্ধতিতে মূলত সংকীর্ণ এলাকাকে তথা নদী, খাল, রাস্তা, রেলপথ প্রভৃতি পুনরায় অঙ্কন করা হয়।

১:৬০০০০০ স্কেলে রাজশাহী শহর সংলগ্ন গঙ্গা নদীর অংশ বিশেষের মানচিত্রকে ১:৪০০০০০ স্কেলে পুনরাঙ্কিত করুন।

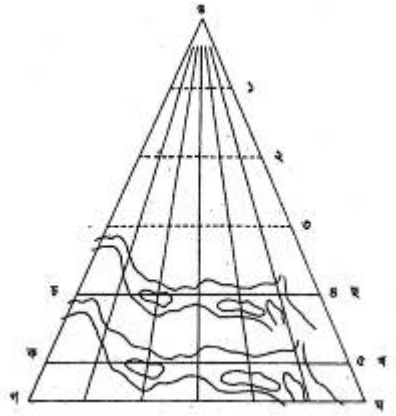
ত্রিভুজ পদ্ধতিতে মানচিত্রের আকার প্রসারণের জন্য মূল মানচিত্রের সাপেক্ষে নতুন মানচিত্রের অনুপাত নির্ণয় করা হয়। এবং এই ক্ষেত্রে বর্গ পদ্ধতির ন্যায় সূত্র ব্যবহার করা হয়। সূত্রানুযায়ী,

$\frac{\text{নতুন মানচিত্রের স্কেল}}{\text{মূল মানচিত্রের স্কেল}}$ = পরিবর্তিত মানচিত্রের অনুপাত।

$\therefore \frac{১:৪০০০০০}{১:৬০০০০০}$

বা, $\frac{১/৪০০০০০}{১/৬০০০০০}$

বা, $\frac{১}{৪০০০০০} \times \frac{৬০০০০০}{১} = \frac{৩}{২}$ গুণ বা $১\frac{১}{২}$ গুণ বা ৩:২।



চিত্রঃ ১৫.৮.৩ রাজশাহী জেলার সংলগ্ন গঙ্গা নদীর অংশ বিশেষের প্রসারিত মানচিত্র

অর্থাৎ মূল মানচিত্রের তুলনায় নতুন মানচিত্রের অনুপাত হবে ৩:২ এবং নতুন মানচিত্র ১.৫ গুণ প্রসারিত হবে।

মূল মানচিত্রের তুলনায় নতুন মানচিত্রের অনুপাত ৩:২ বা ১.৫ গুণ। সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের মাধ্যমে ৩:২ অনুপাতে মূল মানচিত্র নতুন মানচিত্রে প্রসারিত করা হয়েছে (চিত্রঃ ১৫.৮.৩)।

অঙ্কন পদ্ধতিঃ

সরবরাহকৃত মানচিত্রের মাঝামাঝি খক রেখা অঙ্কন করে ঙ বিন্দু হতে 'ক' ও 'খ' বিন্দু বরাবর 'গঘঙ' নামক সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ অঙ্কন করে 'ঙ' বিন্দু হতে 'গঙ' রেখাকে সমান ৩ ভাগে বিভক্ত করে 'কখ' রেখার সমান্তরালে 'চছ' রেখা অঙ্কন করা হলো যা মূলত সরবরাহকৃত মানচিত্রকে ৩:২ অনুপাতে প্রসারিত করবে। এখন 'ঙ' বিন্দু হতে 'কখ' রেখাকে সমান ৬ ভাগে বিভক্ত করে 'গঘ' রেখা বরাবর সরবরাহকৃত মানচিত্রের উপর অঙ্কিত ত্রিভুজের অনুকরণে 'চছ' রেখা বরাবর গঙ্গা নদীর সীমারেখা হুবহু অঙ্কন করে প্রসারিত মানচিত্র অঙ্কন করা হয়।

তবে আধুনিক যান্ত্রিক পদ্ধতিতে মানচিত্রের প্রসারণ সহজ ও নির্ভুল।

শিক্ষার্থীর কাজ	শিক্ষার্থীরা নিজস্ব এলাকার মানচিত্রকে বিভিন্ন স্কেলে প্রসারিত করবেন।

সারসংক্ষেপ

মানচিত্রের প্রসারণ একটি নির্দিষ্ট স্কেল হতে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রতর স্কেলে মানচিত্রের রূপান্তর। অধিক তথ্য সংযোজনের জন্য মানচিত্রের প্রসারণ প্রয়োজন। ত্রিভুজ পদ্ধতি অপেক্ষা বর্গ পদ্ধতিতে সহজে মানচিত্রের প্রসারণ সম্ভব। তবে আধুনিক যন্ত্র পদ্ধতিতে সহজ এবং নির্ভুল উপায়ে মানচিত্রের প্রসারণ করা যায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ১৫.৮

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√)চিহ্ন দিন।

১। মানচিত্র প্রসারণের ক্ষেত্রে কোন স্কেল ব্যবহৃত হয়?
- ক) ক্ষুদ্রতর স্কেল
- খ) বৃহত্তর স্কেল
- গ) অনুমানের ভিত্তিতে
- ঘ) কোনটিই নয়

২। নতুন স্কেলের অনুপাত ০১ এর বেশি হলে মানচিত্রের
- ক) সংকোচন হয়
- খ) প্রসারণ হয়
- গ) সংকোচন ও প্রসারণ
- ঘ) কোনটিই নয়

৩। সংকীর্ণ এলাকা যথা রাস্তা, নদীনালা প্রভৃতি কোন পদ্ধতিতে প্রসারণ অধিক সুবিধাজনক?
- ক) বর্গ পদ্ধতি
- খ) ত্রিভুজ পদ্ধতি
- গ) সমানুপাত কম্পাস পদ্ধতি
- ঘ) ইডোগ্রাফ পদ্ধতি

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৫.১ :	১. ক	২. খ	৩. গ	৪. ক	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৫.২ :	১. ক	২. খ	৩. খ	৪. ক	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৫.৩ :	১. খ	২. ক	৩. ক	৪. গ	৫. ঘ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৫.৪ :	১. খ	২. গ	৩. ক	৪. ঘ	
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৫.৫ :	১. খ	২. ক	৩. ঘ		
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৫.৬ :	১. ক	২. খ	৩. ঘ		
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৫.৭ :	১. খ				
পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ১৫.৮ :	১. ক	২. খ	৩. ক		

চূড়ান্তমূল্যায়ন

১. মানচিত্রের সংকোচন ও প্রসারণ কাকে বলে? এর পদ্ধতিসমূহ আলোচনা করুন।

২. জরিপকাজের জন্য সংকোচন ও প্রসারণের মধ্যে কোনটি গুরুত্বপূর্ণ? মানচিত্র সংকোচন ও প্রসারণের সূত্রসমূহ লিখুন।

৩. ১:৭০০০০ স্কেলে গোপালগঞ্জ জেলার একটি মানচিত্রকে ১:৫০০০০ স্কেলে বর্গ পদ্ধতিতে প্রসারিত করে অঙ্কন করুন।

৪. প্র.অ. ১:৩৬ সাহায্যে গজ ও ফুটের একটি সরল স্কেল অঙ্কন করুন।

৫। প্র. অ. ১:৩৬ অনুযায়ী গজ, ফুট ও ইঞ্চি দেখিয়ে একটি কর্ণ মাপনী অংকন করুন।

৬। প্র.অ. ১:১০০০০০ অনুযায়ী মাইল, ফার্লং ও চেইন দেখিয়ে একটি কর্ণীয় মাপনী অঙ্কন করুন।

৭। নিচের বর্ণনামূলক মাপনীগুলোর প্রতিভূ অনুপাত (R.F) প্রকাশ করুন।
- ক) ১"=২০০ গজ
- খ) ১"=৪ ফার্লং
- গ) ১"= ৫ মাইল
- ঘ) ১ সে.মি=৫০ মিটার

৮। নিম্নলিখিত প্রতিভূ অনুপাত অনুযায়ী বর্ণনামূলক মাপনী বের করুন।
- ক) ১:৬৩৩৩৬০
- খ) ১:৩১৬৮০
- গ) ১:৭৯২০
- ঘ) ১:১০০০০০

এইচএসসি প্রোগ্রাম
নমুনা প্রশ্ন
ভূগোল প্রথম পত্র
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

সময় : ৩৫ মিনিট পূর্ণমান-৩৫

১. ভূগোল বিষয়টি কীসের আলোকে পৃথিবী ও মানুষের আন্তঃসম্পর্ক আলোচনা করে?
ক. স্থান ও কাল খ. স্থান ও পানি
গ. কাল ও বিবর্তন ঘ. সময় ও সুযোগ

২. ভূগোলের কোন অংশে ভূ-ত্বকের ইতিহাস ও গঠন অনুসন্ধান করা হয়?
ক. জীবতত্ত্বে খ. ভূমিরূপতত্ত্বে
গ. জলবায়ুতত্ত্বে ঘ. সমুদ্রতত্ত্বে

৩. শিলা কত প্রকার?
ক. ২ খ. ৩
গ. ৪ ঘ. ৫

৪. কোন পর্বত গম্বুজ আকৃতির হয়?
ক. ভঙ্গিল পর্বত খ. চ্যুতি-স্তূপ পর্বত
গ. আগ্নেয় পর্বত ঘ. ল্যাকোলিথ পর্বত

৫. পৃথিবীর অন্যতম বৃহত্তম ব-দ্বীপ কোনটি?
ক. বাংলাদেশ খ. মিসিসিপি
গ. নরওয়ে ঘ. ফিনল্যান্ড

৬. চীনের হোয়াংহো কোন ধরনের সমভূমি?
ক. পলল পাখা খ. লোয়েস সমভূমি
গ. হ্রদ সমভূমি ঘ. হিমবাহ সমভূমি

৭. সমুদ্রের কোথায় ভূমিকম্প হলে সুনামি হয়?
ক. তটদেশীয় অঞ্চল খ. ঝিনুক অঞ্চল
গ. সমুদ্রের তলদেশে ঘ. তীরবর্তী অঞ্চল

৮. পৃথিবীর সর্বোচ্চ জলপ্রপাত কোনটি?
ক. নায়াগ্রা খ. ভিক্টোরিয়া
গ. অ্যাঞ্জেল ঘ. হুন্ডু

নিচের চিত্রটি দেখুন এবং ৯ ও ১০ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।



৯. চিত্রটি নদীর কোন অবস্থায় দেখা যায়?
ক. পার্বত্য অবস্থায় খ. সমভূমি অবস্থায়
গ. শেষ অবস্থায় ঘ. মধ্যগতি অবস্থায়

১০. চিত্রের ভূমিরূপ গঠিত হয় নদীর-
i. পার্বত্য অবস্থায় ii. ক্ষয়কার্যের ফলে
iii. সঞ্চয়কার্যের ফলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i খ. ii
গ. iii ঘ. i , ii ও iii

১১. রাসায়নিক বিচূর্ণীভবন বেশি ঘটে কোন অঞ্চলে?
ক. নিরক্ষীয় অঞ্চলে খ. ক্রান্তীয় অঞ্চলে
গ. ক্রান্তীয় মৌসুমী অঞ্চলে ঘ. মেরুদেশীয় অঞ্চলে

১২. বায়ুমন্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ শতকরা কত?
ক. ০.০০৩% খ. ৭৮.০২%
গ. ২০.৭৮% ঘ. ০.০৩%

১৩. ব্রহ্মপুত্র নদী কোন জেলা দিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে?
(ক) চাপাইনবাবগঞ্জ (খ) সিলেট
(গ) ফেনী (ঘ) কুড়িগ্রাম

১৪. স্ট্রাটোমন্ডলের বৈশিষ্ট্য হলো-
i. এখানে বাতাস হালকা থাকে
ii. বায়ুর উর্ধ্বগতি বা নিম্নগতি নেই
iii. বায়ু সমান্তরাল গতিতে চলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii.

১৫. GIS এর পূর্ণাঙ্গ রূপ কী?
ক. Geographical Information Society
খ. Geographical Information Survey
গ. Global Information Survey
ঘ. Geographical Information System

১৬. কত ডিগ্রী অক্ষাংশকে 'গর্জনশীল চল্লিশা' বলা হয়?
ক. ৪০-৪৭ ডিগ্রী দক্ষিণ অক্ষাংশকে
খ. ৪০-৪৭ ডিগ্রী উত্তর অক্ষাংশকে
গ. ২০-৪৫ ডিগ্রী দক্ষিণ অক্ষাংশকে
গ. ২০-৪৫ ডিগ্রী উত্তর অক্ষাংশকে

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ুন এবং ১৭ ও১৮ নং প্রশ্নের উত্তর দিন।
রফিক তার বাবার সাথে সিলেটে বেড়াতে গেলেন। সেখান থেকে তিনি জৈন্তাপুর পাহাড়ে বেড়াতে গিয়ে দেখলেন পাহাড়ের এক দিকে বৃষ্টি হচ্ছে, অন্যদিকে হচ্ছে না।

১৭. রফিক কোন ধরনের বৃষ্টিপাত দেখেছিলেন?
ক. পরিচলন বৃষ্টি খ. শৈলোৎক্ষেপ বৃষ্টি
গ. সংঘর্ষ বৃষ্টি গ. ঘূর্ণিবাত বৃষ্টি

১৮. পাহাড়ের অপর ঢালে বৃষ্টি না হওয়ার কারণ-
i. বায়ুতে জলীয়বাষ্পের অভাব ii. বায়ুর উষ্ণতা কম
iii. বায়ুতে জলীয়বাষ্প বৃদ্ধি হওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

১৯. সমুদ্রের গভীরতা মাপার যন্ত্রটি নাম কী?
ক. ফ্যাদোমিটার খ. ব্যারোমিটার
গ. ল্যাক্টোমিটার ঘ. ম্যানোমিটার

২০. ক্রান্তীয় মহাদেশীয় জলবায়ুর অপর নাম কী?
ক. ব্রাজিলিয়ান জলবায়ু খ. নিরক্ষীয় জলবায়ু
গ. সুদানি জলবায়ু ঘ. আফ্রিকান জলবায়ু

২১. বায়ুর আর্দ্রতা পরিমাপক যন্ত্রের নাম কী?
ক. হাইগ্রোমিটার খ. ব্যারোমিটার
গ. ফ্যাদোমিটার ঘ. অ্যানিমোমিটার

২২. ভূ-মধ্যসাগরীয় জলবায়ুর বৈশিষ্ট্য হলো-
i. বৃষ্টিবহুল শীতকাল ও বৃষ্টিহীন গ্রীষ্মকাল
ii. মহাদেশগুলোর পশ্চিমাংশে এ জলবায়ু দেখা যায়
iii. রৌদ্রকরোজ্জ্বল আবহাওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

২৩. আটলান্টিক মহাসাগর দেখতে ইংরেজি কোন অক্ষরের মত?
ক. 'S' অক্ষরের মতো খ. 'T' অক্ষরের মতো
গ. 'M' অক্ষরের মতো ঘ. 'O' অক্ষরের মতো

২৪. পৃথিবীর বৃহত্তম মহীসোপান কোন অঞ্চলে অবস্থিত?
ক. আটলান্টিক মহাসাগরের উত্তর-পশ্চিমাংশে
খ. আটলান্টিক মহাসাগরের উত্তর-পূর্বাংশে
গ. প্রশান্তমহাসাগরের উত্তর-পশ্চিমাংশে
ঘ. প্রশান্তমহাসাগরের উত্তর-পূর্বাংশে

২৫. অ্যালবাট্রস মালভূমি কোন মহাসাগরে অবস্থিত?
ক. ভারত মহাসাগর খ. আটলান্টিক মহাসাগর
গ. প্রশান্তমহাসাগর ঘ. উত্তর মহাসাগর

২৬. সমুদ্রস্রোত সৃষ্টির প্রধান কারণ কী?
ক. ঋতু পরিবর্তন খ. বায়ুপ্রবাহ
গ. জোয়ার ভাঁটা ঘ. আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত

২৭. কীসের মাধ্যমে পৃথিবী বা কোনো অঞ্চল সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান লাভ করা যায়?
ক. মানচিত্র খ. বই
গ. রেডিও ঘ. টেলিভিশন

২৮. জীববৈচিত্র্য প্রধানত কয় প্রকার?
(ক) ৩ (খ) ৪
(গ) ৭ (ঘ) ২

২৯. প্রতিভূ অনুপাতের ক্ষেত্রে-
i. ইংরেজিতে Representative Fraction (R.F) লেখা হয়
ii. বাংলায় সংখ্যা সংক্ষেপে প্র. অ. লেখা হয়
iii. উভয় সংখ্যার মাঝে অনুপাত চিহ্ন (:) ব্যবহার করা হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৩০. যানবাহনের ধোঁয়া থেকে কোনটি নির্গত হয়?
ক. সেনেট খ. অক্সিজেন
গ. বাষ্প ঘ. সিসা

৩১. পৃথিবীর উপর কোনটির আকর্ষণ সবচেয়ে বেশি?
ক. সূর্য খ. চন্দ্র
গ. নক্ষত্র ঘ. তারা

৩২. সর্বপ্রথম কত সালে জিআইএস প্রযুক্তি চালু হয়?
(ক) ১৮৬৪ (খ) ১৯২৪
(গ) ১৯৪৪ (ঘ) ১৯৬৪

৩৩. ক্লোরোফ্লোরো কার্বন নির্গত হয়-
i. রেফ্রিজারেটর থেকে
ii. এয়ারকন্ডিশনার থেকে
iii. রং তৈরির কারখানা থেকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii.

৩৪. সুন্দরবনের প্রধান বৃক্ষ কোনটি?
ক. গজারি খ. শাল
গ. সেগুন ঘ. সুন্দরী

৩৫. ভূ-পৃষ্ঠের প্রধান আবরণকে কী বলে?
ক. ভূ-ত্বক খ. শিলা
গ. খনিজ ঘ. ভূ-আলোড়ন

এইচএসসি প্রোগ্রাম
নমুনা প্রশ্ন
ভূগোল প্রথম পত্র
সৃজনশীল প্রশ্ন

সময় : ২ ঘন্টা ১০ মিনিট পূর্ণমান-৪০

যে কোনো ৪টি প্রশ্নের উত্তর দিন।

১. জায়েন ও জুই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল বিভাগে অধ্যয়নরত। জায়েনের বাড়ি রাজশাহী জেলায় এবং জুইয়ের বাড়ি খাগড়াছড়ি জেলায়। জুইয়ের বাড়ির আশেপাশে অনেক পাহাড়-পর্বত রয়েছে। অপরদিকে জায়েনের বাড়ির আশেপাশের মাটি লালচে ধরনের এবং এখানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ দেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় বেশ কম। সে কারণে এখানে দিনের তাপমাত্রা দেশের অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় অনেক বেশি হয়ে থাকে।

ক. ভূ-প্রকৃতি কাকে বলে? ১
খ. পার্বত্য এলাকার ৫টি বৈশিষ্ট্য লিখুন। ২
গ. জুইয়ের নিজ এলাকার ভূ-প্রকৃতির বিবরণ দিন। ৩
ঘ. 'উদ্দীপকের আলোকে জায়েন ও জুইয়ের এলাকার ভূ-প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের তারতম্য বিদ্যমান'- বিশ্লেষণ করুন। ৪

২. বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা বুড়িগঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত। শহরের অনেক কল-কারখানার বর্জ্য এ নদীতে ফেলা হয়ে থাকে। কল-কারখানা ও যানবাহনের কালো ধোঁয়া শহরের বায়ুতে সীসার পরিমাণ বৃদ্ধি করায় এখানকার বায়ু দূষিত হচ্ছে।

ক. দূষণ কাকে বলে? ১
খ. পানি দূষণের ৫টি কারণ লিখুন। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দূষণের কারণসমূহ আপনার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত দূষণসমূহ রোধকল্পে করণীয় সম্পর্কে আপনার মতামত দিন। ৪

৩. দৃশ্যকল্প-১ : মিসেস লাবণ্য টেলিভিশনে দেখলেন জাপান সাগরের তলদেশে ভূমিকম্পের ফলে সাগর তীরবর্তী এলাকায় পানি প্রায় ৬ ফুট উঁচু হয়ে স্থলভাগের দিকে যাচ্ছে।

দৃশ্যকল্প-২ : মি. নাসের সাহেব জিওগ্রাফি চ্যানেলে দেখলেন প্রশান্তমহাসাগরীয় একটি স্থানে ফাটল দিয়ে ভূ-অভ্যন্তরস্থ গলিত পদার্থ বের হয়ে আসছে।

ক. ভূমিকম্প কাকে বলে? ১
খ. আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুপাতের কারণ কী? ২
গ. দৃশ্যকল্প-১ এ ঘটে যাওয়া দুর্যোগটি সৃষ্টির কারণ ব্যাখ্যা করুন। ৩
ঘ. দৃশ্যকল্প-১ এবং দৃশ্যকল্প-২ এর ঘটনার ফলাফলের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করুন। ৪

৪. ইউরোপ থেকে আমেরিকাগামী বাণিজ্য জাহাজগুলো যে মহাসাগর অতিক্রম করে তার আকৃতি অনেকটা ইংরেজি S অক্ষরের মতো এবং গড় গভীরতা প্রায় ৩,৯৩২ মিটার।

ক. পৃথিবীর গভীরতম খাতের নাম কী? ১
খ. মধ্য আটলান্টিক শৈলশিরা কী? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মহাসাগরের অবস্থান ও আয়তন বর্ণনা করুন। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মহাসাগরের তলদেশের ভূমিরূপ বিশ্লেষণ করুন। ৪

৫.



ক. উল্লিখিত শিলাটি কোন প্রক্রিয়ায় গঠিত? ১
খ. উদ্দীপকের শিলার প্রকৃতি লিখুন। ২
গ. উল্লিখিত শিলার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন। ৩
ঘ. দৈনন্দিন জীবনে উক্ত শিলার গুরুত্ব ব্যাখা করুন। ৪

৬. শাম্মী তার মামার বাড়ি কক্সবাজার বেড়াতে গিয়ে দেখতে পেলেন বিশাল জলরাশির ভান্ডার। শাম্মী তার মামার কাছে এ জলরাশি সর্ম্পকে জানতে চাইলেন। শাম্মীর মামা তাকে এর কারণ এবং গুরুত্ব ব্যাখ্যা করলেন।

ক. আলোচ্য জলরাশির ভান্ডারটির নাম কী? ১
খ. পৃথিবীর পানির উৎসসমূহের নাম লিখুন। ২
গ. শাম্মীর মামার বর্ণনাকৃত বিষয়টি পরিবেশের উপর কী প্রভাব বিস্তার করে? ৩
ঘ. পানিচক্রের প্রক্রিয়াটি বর্ণনা করুন। ৪